রচনাবলী

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮১
সপ্তম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৮

— একশ কুড়ি টাকা —

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়, মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট—অনুপ রায়

SYED MUJTABA ALI RACHANAVALI VOL III
An anthology of complete works of Syed Mujtaba Ali Vol III
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata-73

Price Rs. 120/-

ISBN : 81-7293-262-6

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন,
কোলকাতা-৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	[ক]
টুনি মেম		
টুনি মেম		১
এক পুরুষ		২০
কবিরাজ চেখফ		৫৯
॥ দুলালী ॥		৬৫
(দুলালীর সমালোচনা)		৭৬
আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব"		৮০
উল্‌টা-রথ		৯৪
ও-ঘাটে যেও না বেউলো		১০০
সুখী হবার পন্থা		১০৪
বিষের বিষ		১০৮
রাজহংসের মরণগীতি		১১২
হিটলার		১১৯
নব হিটলার		১২২
শাঁসালো জর্মনি		১২৬
দশের মুখ খুদার তবল		১২৯
হাসির অ-আ, ক-খ		১৩২
হাসি-কান্না		১৩৮
রসিকতা		১৪১
নানাপ্রশ্ন		১৪৫
জাতীয় সংহতি		১৫০
ভারতীয় সংহতি		১৫৩
ভাষা		১৫৫
ভ্যাকিউয়াম		১৫৭
ধর্ম		১৬১
ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা		১৬৩
ধর্ম ও কম্যুনিজম		১৬৬
এক ঝাণ্ডা		১৬৯
"রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"		১৭২
ওয়ার এম		১৭৫
দ্য গল্‌		১৭৮

তলস্তয় ১৮২
প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দা'নুনদ্‌জিয়ো ১৮৫
খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ ১৮৯
"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার/সম্মুখে ঘন আঁধার" ১৯৩

রাজা উজীর

হিটলারের প্রেম ২০১
পূর্ণ প্রেম ২১০
গেলীর প্রবেশ ২১৪
গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক ২৩২
লক্ষ মার্কের বরমান ২৩৮
কন্‌রাট আডেনাওয়ার ২৪৪
বিদ্রোহী ২৫৬
প্রোটকল ২৬০
পপ্‌লারের মগডালে ২৬৯
হাতে কমণ্ডুলু, মাথায় তুর্কী টুপি ২৭৬
ভূতের মুখে রাম নাম ২৭৯
শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায় ২৮৩
'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়' ২৮৮
"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—" ২৯১
ল্যাটে ২৯৫
আঁদ্রে জিদ ২৯৮
আড্ডা ৩০১
পাসপরট্‌ ৩০৫
আড্ডা—পাসপরট্‌ ৩০৮
'ঈসট্‌ ইজ্‌ ঈসট্‌ অ্যানড্‌—' ৩১৪
বিষবৃক্ষ ৩১৭
'দুঃখ তব যন্ত্রণায়' ৩২০
'সাঙ্গ হয়েছে রণ—' ৩২৫
জেরূস্‌লম ৩২৮
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ৩৩২
রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাত্তার ৩৩৫
অল্পে তুষ্ট ৩৩৯
ভঙ্গ বনাম কুলীন ৩৪৯
অর্থমর্থম্‌ ৩৫৩
আবার আবার সেই কামান গর্জন! ৩৫৮
প্রেম ৩৭২

গ্রন্থ-পরিচয় ৩৭৫

ভূমিকা

আমাদের ছেলেবেলা থেকেই এরকম ধারণা ছিল যে ভাষায় গুরু-চণ্ডালি মেশামেশি হলে সেটা একটা খুব দোষের ব্যাপার। ভাষাকে শুদ্ধ রাখার জন্য বঙ্কিমের আমল থেকেই এরকম একটা শমন জারি হয়েছিল।

আসলে কোন্‌টা যে গুরু ভাষা আর কোন্‌টা যে চণ্ডালি ভাষা সে সম্পর্কে স্পষ্ট আলাদা কোনও সীমারেখা কেউ টানতে পারেনি এ পর্যন্ত। এককালে সাধু ক্রিয়াপদ এবং চলতি ক্রিয়াপদের একটা ব্যবধান ছিল। এখন সাধু ক্রিয়াপদ প্রায় লুপ্তই বলা যায়—অন্তত সাহিত্যে। আবার, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর, অত্যন্ত পরিশীলিত নায়ক নায়িকার মুখে করিনে, পারিনে, যাইনে, কিংবা বললেম, করলেম, গেলেম—এইরকম ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, তখন আমরা খেয়াল করিনি, ওগুলি আসলে বীরভূমের গ্রাম্যভাষা থেকে নেওয়া।

এখন আমরা জেনেছি, ভাষা বহতা নদীর মতন। যদি তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তা হলে যেখানে থেকে যাই-ই সংগ্রহ করুক, কিছুতেই তার অঙ্গে মলিনতার স্পর্শ লাগে না। এই ব্যাপারটি আমাদের সবচেয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এই দিক থেকে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকারী। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাশিল্প সম্পর্কে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত। আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদের ওপর সে ভার রইলো।

আলী সাহেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে অসংখ্য ছোট ছোট লেখা লিখেছেন, সেগুলির সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে রম্যরচনা। আমার মতে, এই নামটি খুবই ভুল। তিনি যা লিখেছেন, সেগুলি আসলে প্রবন্ধ। যেহেতু সেগুলি আমাদের পড়তে ভালো লাগে, কিংবা মজা পাই, কখনও একলা একলা হেসে উঠি, তাই কি ওগুলো প্রবন্ধ হতে পারবে না?

এক সময় ঠাট্টা করে বলা হতো, যে লেখা পড়লে কিছুই মানে বোঝা যায় না, তারই নাম আধুনিক কবিতা। সেই রকমই, এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, যখন যে লেখা পড়তে ইচ্ছেই করে না তারই নাম ছিল প্রবন্ধ। সৈয়দ মুজতবা আলীই প্রবন্ধকে সেই অকাল মৃত্যুদশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি অন্তত একশোটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে, অন্তত সাতটি ভাষা সেঁচে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা-ই বিতরণ করেছেন তাঁর রচনায়। এগুলি প্রবন্ধ ছাড়া আর কি? তাঁর অনেক বক্তব্য সম্পর্কে মতান্তর আছে, তাতে কি আসে যায়? কোন্ প্রাবন্ধিক অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করতে পারেন? তাঁর রচনার পর থেকেই, তথাকথিত প্রাবন্ধিকদের দুর্বোধ্য, কষ্টকল্পিত বাক্যের রচনা পাঠকরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। যথার্থ পণ্ডিতরাও এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন, শুধু নিজের বিষয়ের ওপর দখল থাকাই বড় কথা নয়, সাবলীল ভাষায় তা প্রকাশ করতে না জানলে লেখক হওয়া যায় না।

বিচারপতির মতন একটা উঁচু জায়গায় বসে থাকবেন লেখক আর সেখান থেকে পাঠকদের উদ্দেশে জ্ঞান কিংবা উপদেশ দান করবেন, সাহিত্যের এই ভূমিকা এখন আর নেই। সারা পৃথিবীতেই পাঠকরা এখন সাহিত্যিককে গুরু হিসেবে দেখতে চান না, বন্ধু হিসেবে চায়। সেই দিক থেকে আলী সাহেব ছিলেন সমস্ত শ্রেণীর পাঠকদের বন্ধু। তাঁর ভাষা যেন অবিকল আড্ডার ভাষা। আমরা কখনও কখনও তাঁর সাহচর্য বা সঙ্গ পেয়েছি। তিনি আমাদের চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, প্রতিষ্ঠায় এবং বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্রই তিনি যেই 'এসো ব্রাদার' বলে ডাক দিতেন, অমনি আমরা তাঁর সমসাময়িক হয়ে যেতাম। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। এমন বহু বিষয়ের অবতারণা করতেন, যা আমরা আগে কখনও শুনিনি। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্যে কোনও রকম দম বন্ধ করা আবহাওয়া ছিল না। মুহুর্মুহু হাসিতে ঘর ফেটে যেত, কখনও চোয়ালে ব্যথা হয়ে যেত আমাদের। তাঁর জানা প্রত্যেকটি বিষয়েই নিশ্চিত আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, অগাধ পাণ্ডিত্যের চেয়ে এরকম খোলামেলা পণ্ডিত হওয়া অনেক ভালো।

আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, কিন্তু এমন আরও হাজার হাজার পাঠক নিশ্চিত আছে, যারা সৈয়দ মুজতবা আলীকে কখনও চোখেও দেখেনি। সেই সব পাঠকরাও তাঁর লেখার মধ্যে পেয়েছে দরাজ বন্ধুত্বের আহ্বান। পত্র-পত্রিকা খুলে প্রথমেই যাঁর লেখা পড়তে ইচ্ছে করতো, তিনিই মুজতবা আলী। এবং এই আকর্ষণ তিনি প্রায় তাঁর মৃত্যু-বছর পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

যাঁরা হাস্যরসাত্মক রচনা লেখেন, তাঁদের একটি বিশেষ গুণ নিশ্চিত থাকা দরকার। আমাদের দেশে অনেকেই এটা জানেন না বলেই আমাদের সরস সাহিত্যের শাখাটি এত দুর্বল। সেই গুণটি হলো নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করার ক্ষমতা। সামান্য একটু আত্মম্ভরিতা কিংবা স্বপ্রচারে হাস্যরস একেবারে চুপ্‌সে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর কোনও লেখাতে এর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। একবার এক জার্মান পণ্ডিত তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শেক্সপীয়রের কোন্ রচনাটি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। আলী সাহেব উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যামলেট। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছিলেন, শেক্সপীয়ারের ঐ একটাই বই আমি পড়েছি কি না! এই শেষের বাক্যটি বলার মতন বুদ্ধি কিংবা রসিকতা-বোধ যে-সে লোকের থাকে না।

এক জায়গায় তিনি নিজের চেহারা সম্পর্কে এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন :

"আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেনস্ বার্স্ট করলো, আমার শ্যাটারিং সৌন্দর্য সইতে না পেরে।...

"ফোটো হোলো না। অইল পেন্টিং-ওলা বলেন, কালো হলেও চলতো তা সে মিশই হোক না। কিন্তু এ যে বাবা খাজা রঙ। কালো কালির ওপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলে পড়া, না-সবুজ, না-নীল না-কিছু। আমার প্যালেট লাটে।"

এই বর্ণনা পড়ার পর পাঠক একবার সৈয়দ মুজতবা আলীর যৌবন বয়েসের ছবি মিলিয়ে দেখুন।

আলী সাহেব সর্বাধিক পরিচিত তাঁর সরস প্রবন্ধগুলির জন্যই। উপন্যাস বা গল্প খুব বেশী লেখেননি। যে-কটি লিখেছেন, তাতেই প্রমাণিত হয়েছে, চরিত্র সৃষ্টি এবং কাহিনী

নির্মাণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এবং আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাঁর ছোট ছোট লেখাগুলিতে প্রচুর হাস্যরস থাকলেও, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস এবং গল্পে করুণ রসই বেশী। শবনম্ উপন্যাস পড়তে পড়তে যে অনবরত চোখের জল মোছে না, সে পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই না। কয়েকটি গল্পের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সেই যে গল্পে আছে; পূর্ব বঙ্গের এক ছোট স্কুলের পণ্ডিতমশায়ের কথা। লাটসাহেবের পরিদর্শন উপলক্ষে যে পণ্ডিতমশাইকে জীবনে প্রথম জামা গায়ে দিতে হয়েছিল। লাটসাহেবের প্রিয় কুকুরটির ছিল একটি পা কাটা। সেই কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ শুনে পণ্ডিতমশাই হিসেব করেছিলেন, তিনঠেঙে কুকুরের প্রতিটি পায়ের জন্য যা খরচ হয় তার থেকে কম খরচে তাঁকে আটজনের একটি সংসার কি করে চালাতে হয়। গল্পটির নাম মনে নেই, কিন্তু এইসব গল্পই সারা জীবন পাঠক মনে রাখে। কিংবা সেই শিলেটি খালাসীটির কাহিনী, যে দেশের স্ত্রী এবং জাহাজের চাকরি পরিত্যাগ করে মেম বিবাহ করে আত্মগোপন করে আছে। লেখক গিয়েছিলেন তাকে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী এবং শিশুদের দেখে মুখ ফুটে বলতে পারলেন না সেকথা। আশ্চর্য করুণ মধুর সে কাহিনী।

আমাদের দুঃখ এই, ঢিলেঢালা স্বভাব বা আলস্যের জন্য তিনি দীর্ঘ কাহিনী বেশী লিখে যেতে পারেননি। তাতে ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যেরই। আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ লাগে, বিশেষ একটি রচনার কথা ভেবে। এটির নাম 'এক পুরুষ'। এটির মধ্যে একটি মহৎ উপন্যাসের সম্ভাবনা ছিল। সিপাহী যুদ্ধের শেষে একজন দিল্লীবাসী মুসলমান সুবেদার আত্মগোপন করে রইলেন বীরভূমের এক গ্রামে। বৈষ্ণবের ছদ্মবেশে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে আমাদের দেশে প্রচুর অখাদ্য লেখা হয়েছে। আলী সাহেবের কাছ থেকে আমরা একটি সার্থক লেখা পেতে পারতাম। তা ছাড়া, আর একটি বিরাট সম্ভাবনাও ছিল। সাধারণত হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমান চরিত্র থাকে না, মুসলমান লেখকদের লেখায় থাকে না হিন্দু চরিত্র—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই। আলী সাহেব দুই সমাজকেই জানতেন খুব ভালো ভাবে, দু'দিকের শাস্ত্র-ধর্মগ্রন্থই পড়েছেন খুব মন দিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাজের সার্থক রূপায়ণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

কিন্তু "এক পুরুষ" নামের কাহিনীটি তিনি হঠাৎ দুম করে থামিয়ে দিলেন। এটা অন্যায় ছাড়া আর কিছুই না। নিজের সাফাই গাইলেন এইভাবে :

"এখানেই 'এক পুরুষ' শেষ।

"বইখানা তিন-পুরুষে সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুই যখন 'তিন পুরুষ' লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে 'যোগাযোগ' নাম দিলেন, তখন যাঁর কৃপায় 'মূক বাচাল হয়' তাঁরই কৃপায় এস্থলে বাচাল মূক হল।" এটা কি স্রেফ অলস লোকের কু-যুক্তি নয়?

যাই হোক, ক্ষোভ বা অভিমান করে আর কি হবে! তাঁর রচনা যতখানি পেয়েছি, তাও তো অমূল্য। এমন রচনা পৃথিবীর যে কোনও ভাষাতেই দুর্লভ। আমাদের বাংলা ভাষাতেই তিনি লিখে গেছেন এজন্য আমরা গর্ব করতে পারি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

টুনি মেম

শ্রীমতী ডাক্তার শ্রীলা ঘোষের

করকমলে—

৪/২/৬৪

টুনি মেম

বেশী দিনের কথা নয়, হালের। পড়িমড়ি হয়ে শেয়ালদায় আসাম লিঙ্কে উঠেছি। বোলপুরে নাববো। কামরা ফাঁকা। এককোণে গলকম্বলে মান-মুনিয়া দাড়িওলা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক মাত্র। তিনি আমার দিকে আড়নয়নে তাকান, আম্মো।

একসঙ্গেই একে অন্যকে চিনতে পারলুম।

আমি বললুম, 'খান না রে?'

সে হাঁকল, 'মিতু না রে?'

যুগপৎ উল্লম্ফন, ঘন ঘন আলিঙ্গন। পাঠশালে পাশাপাশি বসতুম। তারপর এই তিরিশটি বছর পরে দেখা। প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হলে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুই এ রকম বদ্‌খদ দড়ি-দাড়া রেখেছিস কেন?'

খানটা ঐ পাঠশালার যুগেও ছিল হাড়ে টক শয়তান। প্রশ্ন শুধোলে ইহুদিদের মত পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যায়। শুধোলে, 'দাড়া কারে কয়?'

'হাঁড়ি বড় সাইজের হলে হাঁড়া হয়, গাড়ি গাড়া। দাড়ি হিন্দী উর্দুতে স্ত্রীলিঙ্গ!—কিন্তু দাড়া পুংলিঙ্গ। তোরটা দাড়ি নয়, দাড়া।'

অবশ্য অস্বীকার করিনে, তাকে দেখাচ্ছিল গত শতাব্দীর ফরাসী খানদানীদের মত। খানের রং প্যাটপেটে ফর্সা। গায়ে প্রচুর পাঁঠার রক্ত। শুধালুম, 'তা তোর পাকিস্তান ছেড়ে এই না-পাক দেশে এসেছিস কি করতে?'

'আজমীরের খাজা মুঈন-উদ্-দীন চিশতীর কাছে মানত করেছিলুম, বাবার আশীর্বাদে আল্লা যদি আমাকে এস্ পি-তে প্রোমোশন করেন তবে বাবার দরগা দর্শনে যাব, ভালো-মন্দ যা আছে তাই দিয়ে শীর্নী চড়াবো। সেই সেরে ফিরছি। এই নে প্রসাদী-গোলাপের পাপড়ি।'

আমি মাথায় ছুঁয়ে বললুম, 'ও! তুই বুঝি পুলিসে ঢুকেছিলি?'

বললে, 'হ্যাঁ, সাব-ইন্‌স্‌পেকটার হয়ে।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'বলিস কি রে? আর এরই মধ্যে এস্ পি!'

প্রসাদীর পাপড়ি মাথায় ঠেকিয়ে বললে, 'খাজা মুঈন-উদ্-দীন চিশতীর দোওয়া আর হিন্দুদের কৃপায়!'

'হিন্দুদের কৃপায়!'

'হ্যাঁ ভাই, তেনাদেরই কেরপায়। তেনারা যদি পূব বাঙলার পুলিসের ডাঙর ডাঙর নোকরি ছেড়ে ঝেঁটিয়ে পশ্চিম বাঙলা আর আসামে না চলে যেতেন তা হলে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় প্রোমোশন পেতুম কি করে? তারা থাকলে হয়তো অবিচার করে আমাকে দু'একটা না-হক প্রোমোশন দিত, কিন্তু একদম দিনকে রাত, রাতকে দিন তো করা যায় না। আর তুই তো বিশ্বাস করবি নে—তুই চিরকালই সন্দেহপিচাশ, যে কটি হিন্দু রয়ে গেল তারা গণ্ডায় গণ্ডায় না হোক জোড়ায় জোড়ায় প্রোমোশন পেয়েছে। জানিস, মণ্ডল সিভিল সার্জন হয়েছে?'

আমি ভিরমি যাই আর কি। গাড়ল ফোড়াটি পর্যন্ত কাটতে জানতো না।

খান বললে, 'সব তো শুনলি। তোর বইও আমি দু'চারখানা পড়েছি। আচ্ছা বল তো, এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখিস, না কিছু কিছু দেখা-শোনার জিনিস, অভিজ্ঞতার বস্তু?'

'কিছুটা বানিয়ে, কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে।'

'তাজ্জব! আমি তো ভাই বিস্তর খুন-খারাবী দেখলুম। এক-একটা এমন যে, আস্ত একখানা উপন্যাস হয়। কিন্তু তারই রিপোর্ট লিখতে গেলে আমার তালুর জল আর নিবের কালি শুকিয়ে যায়। কি করে যে তুই লিখিস।'

আমি বললুম, 'আমাকেও যদি সুদ্ধমাত্র ফ্যাক্টের ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে লিখতে হত তাহলে আমার রিপোর্টটা হত তোর চেয়েও ওঁচা। কল্পনা এসে উৎপাত করতো। তা সে কথা যাক্ গে। আমার দিনকাল বড্ডই খারাপ যাচ্ছে—প্লটের অপর্যাপ্ত অনটন। সম্পাদক মিঞা আবার গল্পই চান, 'ইলসট্রেট' করবেন। বল না একটা।'

দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাত বললে, 'কোন্টা বলি, কেসগুলো তো মাথার ভিতর আব-জাব করছে। আচ্ছা দাঁড়া, ভেবে নি।'

এমন সময় সিগনেল অভাবে ট্রেন খামোকা মাঝপথে দাঁড়ালো। খান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এরা কি জাত রে?'

তাকিয়ে দেখি, মিশকালো সাঁওতাল মেয়ে—তার উপর মেখেছে প্রচুর তেল। শাড়ির উপর বেঁধেছে গামছা, উত্তমাঙ্গে চোলিফোলি কিছু নেই, নিটোল দেহ, সুডোল ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষেরটা বোঝা গেল পরিষ্কার, কারণ হাত দুটি যতদূর সম্ভব উঁচু করে পলাশ ফুল পাড়বার চেষ্টা করছিল খোঁপায় গুঁজবে বলে। হলদে পলাশ এ অঞ্চলে লালের তুলনায় ঢের কম। কি জানি, মেয়েটা হয়তো ভেবেছে, লাল কালোর চাইতে হলদে কালোর কনট্রাস্টে খোলতাই বেশী।

বললুম, 'সাঁওতাল। হ্যাঁ, আমাদের দেশে অতদূর ওরা পৌঁছয়নি। কিংবা হয়তো ছিল এককালে। কাল যে-রকম হিন্দু পূব বাঙলা ছেড়ে চলে এল, এরা হয়তো পরশু।'

খান দেখি, আমার কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না। আপন মনে কি যেন ভাবছে। ওস্তাদ গাওয়াইয়া যে রকম গান শুরু করার পূর্বে হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে যান। তখন বিরক্ত করতে নেই।

গাড়ি ছাড়লো। একটু কাছে এসে বললে, 'ঐ কালো মেয়ে আরেকটি মেয়ের কথা আমার স্মরণে এনে দিল। তার রঙ ছিল এর চেয়েও কালো। কিন্তু সে কী কালো! সব রঙের অভাবে নাকি কালো হয়! হ্যাঁ তাই; কোন রঙই সাহস করে তার শরীর চড়াও করতে পারেনি। আমি তাকে দেখেছিলুম তার শারীরিক মানসিক চরম দুরবস্থায়। তবু চোখ ফেরাতে পারিনি। হিন্দুরা কেন যে "কালী" "কালী" করে তখন বুঝতে পেরেছিলুম।'

গাড়ি বর্ধমানে এসে থামলো। বর্ধমানে আমি গত সাত বছর ধরে অর্ডার দিয়ে কখনও কেলনারের কাছ থেকে চা-আণ্ডা পাইনি। কাজেই ফর সেফটিস সেক প্রথমেই ভাঁড়ের চা কিনে রাখলুম। বিস্তর ছুটোছুটি করে কিছু-কিঞ্চিতের যোগাড় হল। স্থির করলুম, বোলপুরে খানকে একটা পুর পাক্কা খানা তুলে দেব। সেখানকার গোসাঁই আমাকে নেক-নজরে দেখে।

গাড়ি ছাড়তে খান বললে, 'আমি তখন আক্রুগড়ে। এস্ আই—আমরা বাঙলায় লিখি এছাই। রোজ থানায় বসে ভাবি, ইয়া আল্লা, চাকরির এ দুস্তর দরিয়া পেরিয়ে কবে গিয়ে এমন মোকামে পৌঁছব যেখানে হরহামেশা পয়সাটা আধলাটার হিসেব না করতে হয়। ঘুষ খেতে তখনও শিখিনি—'

আমি শুধালুম 'এখন শিখেছিস? তা—'

বললে, 'হ্যাঁ, তবে সে অন্য ধরণের। পরে তোকে বুঝিয়ে বলবো।'

আক্রুগড় বড় মনোরম জায়গা। অনেকটা শিলঙের মত উঁচু-নিচুতে ভর্তি, টিলাটালার টক্কর। কোন্ এক সায়েব নাকি মালয় না কোথা থেকে কৃষ্ণচূড়া এনে এখানে পুঁতে দেয়। এখন শহরটা আগাপাস্তলা তাই দিয়ে ভর্তি। শহরটা এমনিতেই সবুজ; তার উপর এল গোলমোরের কালো সবুজ আর তার মাঝখানে ফুটে ওঠে বাড়িগুলোর পোড়া লালের টাইলের ছাদ।

চতুর্দিকে অজস্র চা-বাগান আর তেলের খনি। সায়েব-সুবো, বেহারী মারওয়াড়িতে শহরটা গিসগিস করছে। আর খাস আসামীদের তো কথাই নেই—তারা বড় নম্র, বড় সরল। আক্রুগড়ের বটতলাতে চার আনা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে আকছারই যা যায়। এখন কি অবস্থা তা অবশ্য জানি না।

বড়কর্তা বলেছিলেন, কিছু একটা জবরদস্ত নূতন না করতে পারলে কুইক প্রোমোশন হয় না। জবরদস্ত নূতন করবেটাই বা কি? এখানে খুনখারাবী হয় অত্যল্প। উঠোনই নেই তো আমি নাচি কি করে?

তাই থানায় বসে বসে পুরনো দিনের খাতাপত্র দেখি, ফাইল পড়ি। সেইটেই একদিন লেগে গেল কাজে। পরে বলছি।

আমার চেনা এক রাজমিস্ত্রী আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একদিন বললে, মোল্লাবাজারের পিছনে উঁচু টিলার উপর যে খালি বাঙলো আছে তার বাবুর্চীখানার ভিত মেরামত করতে গিয়ে সে একটা লাশ আবিষ্কার করেছে—ঠিক লাশ নয়, কঙ্কালই বলা যেতে পারে—পচা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো।

রক্তের সন্ধান পেয়ে বললুম, ''তুমি ওখানে যাও। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছ এই ভাব করে আমাকে খবর পাঠাও।''

তা না হলে পরে প্রমাণ করতে হবে, ওটা সত্যই সেখানে ছিল, বাইরের থেকে এনে কেউ চাপায়নি।

জিনিসটা যে খারাবী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাবুর্চীখানার নীচে কম্বলে জড়ানো পোঁতা কঙ্কাল! এখানে কস্মিনকালেও কোনও গোরস্তান ছিল না—টিলার ঢালুর দিকে কতটুকু জায়গা যে, ওখানে মানুষ গোরস্তান বানাতে যাবে। তাহলে এটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপার। শুধু খারাবী নয়, খুন-খারাবী।'

আমি বললুম, 'সাক্ষাৎ শার্লক হোম্স।'

শুধোলে , 'সে আবার কে?'

আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললুম, 'তুমি এগোও; আমি আর রসভঙ্গ করবো না।'

বললে, 'প্রথম রক্তের সন্ধান পেয়ে আমি যেন হন্যে হয়ে উঠলুম। সমস্ত রাত ঘুম

হল না। মাথার ভিতর ঘুরছে, কতরকম নরহত্যার ছবি, যেন.স্বয়ং পাঁচকড়ি দে সেগুলো এঁকে যাচ্ছেন, আর দীনেন্দ্রকুমার রায় আপন হাতে রঙ গুলে দিচ্ছেন। বেবাক লালে লাল।'

আমি বললুম, 'রসভঙ্গ করতে হল। অপরাধ নিসনি। হোম্‌স হল বিলিতী অরিন্দম।'

খান বললে, 'তাই বল। কিন্তু তুই ভাবিস নে, তোকে একটা রগরগে খুনের কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি মাত্র। এতে আছে বড় দুঃখের কথা। বড় বিষাদ বেদনা। স্বর্গ আমি দেখিনি, কিন্তু স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য একজনকে আমি দেখেছি। সে দৃশ্য আর কারও দেখবার দরকার নেই।

কি বলছিলুম? হ্যাঁ। ভোর হতে-না-হতেই আমি থানায় এসে উপস্থিত। কিন্তু মূর্খের মত আমি রাজমিস্ত্রীকে বলে রাখিনি, সে কখন আসবে। সে যদি এসে ফিরে যায়; কিংবা কেসটা হাতছাড়া হয়ে যায়!

আজ হাসি পায়। রাতদুপুরে এখন যদি জমাদার এসে খবর দেয়, পদ্মার চরে ডাকাতিতে পাঁচটা চরুয়া আর তিনটে ডাকাত মারা গিয়েছে, আমি তা হলে পাশবালিশ জাবড়ে ধরে বলি, "যা-যা, দিক্ করিসনি!"

রাজমিস্ত্রী হেলে দুলে বেলা প্রায় বারোটায় এলেন—আমাকে অষ্ট ঘণ্টা দগ্ধানোর পর।

যেন সদ্য এইমাত্র ফার্স্ট ইনফর্মেশন পেয়েছি, এরকমধারা মুখের ভাব করে দুটি "কন্‌স্টবল" সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলের দিকে রওনা দিলুম। গিয়ে দেখি অত্যন্ত কুস্থান, অর্থাৎ অকুস্থানই বটে।'

আমি বললুম, 'ঐ মলো। অকুস্থান হয়েছে আরবী "ওয়াকেয়া", অর্থাৎ "ঘটনা" আর "স্থান" নিয়ে।'

খান বললে, 'থাক্ থাক্, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। অকুস্থলের হালটা ভালো করে শোন।

তিন বছর ধরে বাঙলোটায় বসতি ছিল না বলে বাবুর্চিখানার দোরজানালা চুরি গিয়েছে, ঘরটা পড়ো-পড়ো। কে এক নূতন সায়েব আসবে বলে ওটার ভিত মেরামত করতে গিয়ে বেরিয়েছে একটা কঙ্কাল, পচা কম্বলে জড়ানো। মাথার চুল ছাড়া আর সব পচে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমি নয়া শিকারীর মত সন্তর্পণে এগোলুম বলে খুলির ভিতর মাটির মধ্যে পেয়ে গেলুম একটা বুলেট—তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খুলির পিছনের দিকে একটা ঐ সাইজের গর্ত।

আব্রুগড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় স্পেশ্যালিস্ট নেই যে, আমায় তদ্দণ্ডেই বাতলে দেবে ব্যাপারটা কি, অন্তত এই যে কঙ্কাল, এর লাশটা কবে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল। শহরের অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন আমাদেরই জেলার ধীরেন সেন। তাঁকে ধরে এনে শুধালুম। বললেন, অন্তত তিন বছর। বিচক্ষণ লোক। রায়টা দিলেন কঙ্কাল উপেক্ষা করে, কম্বলটা উত্তমরূপে পরখ করে।

তা হলে প্রশ্ন, তিন বছর পূর্বে ঐ বাঙলোয় থাকতো কে—যার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল?

খবর পাওয়া গেল, আইরিশম্যান পেট্রিক ও'হারা সায়েব। সে এখন কোথায়? জেলে?

কেন? সে-কথা জেনে কি পুলি-পিঠের নেজ গজাবে?

আমার মন খনে এদিকে ধায়, খনে ওদিকে ধায়। বন্ধ ঘরে আগুনে লাগলে মানুষ যেমন মতিচ্ছন্ন হয়ে খনে এ-দরজায়, খনে ও-দরজায় ধাক্কা দেয়—কোনও একটাও ভালো করে একাগ্রমনে খোলবার চেষ্টা করে না—আমার হল তাই। কোনও একটা ক্লু পাঁচ মিনিটের তরেও ঠিকমত ফলো আপ করতে পারি নে।

এখন জ্ঞানগম্যি হয়েছে ঢের। এখন বুদ্ধি হয়েছে বলে বুঝেছি যে, এসব রহস্য সমাধান বুদ্ধির কর্ম নয়। রুটিনের ঘানিতে সব-কিছু ফেলে দিতে হয়। তেল বেরিয়ে আসবেই আসবে, সমস্যা সমাধান হবেই হবে।

যে-কাজ আজ পাঁচ মিনিটে করতে পারি, তখন লেগেছিল এক হপ্তা। ততদিনে প্রশ্নগুলো মোটামুটি সামনে খাড়া করে নিয়েছি :

(১) লোকটা কে?

(২) এটা খুন তো?

(৩) কে খুন করলে?

(৪) কার বন্দুকের গুলি?

কঙ্কাল থেকে মানুষ সনাক্ত অসম্ভব না হলেও বড়ই কঠিন। তন্ন তন্ন করেও আঙটি-টাঙটি, বাঁধানো দাঁত, ডেন্টিস্টের কোনও প্রকারের কেরদানী কিছুই পাওয়া গেল না। ব্লাঙ্কো!

আমি তো এ-শহরে এসেছি মাত্র কয়েক মাস হল, কিন্তু পুরনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানে, কিন্তু অহমিয়ারা সরল হলেও এ-তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানে যে, পুলিসের ঝামেলাতে খোদার খামোখা জড়িয়ে পড়তে নেই। ব্লাঙ্কো!

ইতিমধ্যে রিপোর্ট পৌঁছল, খুলির ভিতর যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, সেই বুলেটই খুলির ফুটোটার জন্য দায়ী।'

আমি বাঁকা হাসি হেসে বললুম, 'মারাত্মক আবিষ্কার। এ তো কানাও বলতে পারে। আর ঐ দেখ, তোর কৃষ্ণসুন্দরী আর একপাল সাঁওতালী। ওদের বসতির দিকে এগোচ্ছি এখন।'

গাড়ি তখন খানা জংশনে 'লুপ' লাইনে ঢুকবে বলে ধীরে ধীরে চলছিল।

খান অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'নাঃ, টুনি মেমের পায়ের নখের কণাও এরা হতে পারে না।'

আমার অভিমান হল। সাঁওতালী আমাদের প্রতিবেশী মেয়ে।

লক্ষ্য না করেই খান বললে, 'বুলেটে যে খুলি ফুটো করেছে, সে তো তুই বুঝিস, আমিও বুঝি, কিন্তু আদালত কি বুঝবে? তারা প্রমাণ চায়। হুঁঃ, আদালত তো আদালত! অডিটের বেলা জানো না কি হয়? পেনশন্ নেবার জন্য তুমি সার্টিফিকেট দাখিল করলে যে, তুমি এপ্রিল মাসে জীবিত আছ। অডিট শুধালে, "কিন্তু মার্চ মাসের সার্টিফিকেট কই? আপনি যে মার্চ মাসে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কি? না হলে যে মার্চ মাসের পেনশন্টা পাবেন না।" '

আমি বললুম, 'সেটা কিন্তু ঠিক। দিল্লীর যাদুঘরে কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বিদেশী ভিজিটরকে ছোট্ট একটি শিশুর খুলি দেখিয়ে বললেন, "ইটি শঙ্করাচার্যের খুলি।" ভিজিটর অবাক

হয়ে শুধালে, "তাঁর খুলি এত ছোট ছিল?" মন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "এটা তাঁর শিশুবয়সের খুলি। দুটো কিংবা ছটা খুলি যখন হতে পারে, তখন দুটো কিংবা ছটা জীবন হবে না কেন? তা হলে একটা মার্চ মাসে গ্যাপ পড়াটাই বা বিচিত্র কি? ওসব কথা থাক্, তারপর কি হল বল।'

'তখন অনুসন্ধান করতে লাগলুম খুনটা হয়েছে ও'হারা সায়েব এই বাঙলোয় থাকাকালীন, না তার পরে কেউ খুন করে লোকটাকে নির্জন পোড়ো বাড়িতে পুঁতে গেছে?

ও'হারা জেলে। দীর্ঘ মেয়াদে।

থানার পুরনো ফাইল কাগজপত্র ঘেঁটে যা আবিষ্কার করলুম, সেও বিচিত্র। সায়েব ছটা ইংরেজ পরিবারকে চকোলেটের ভিতর বিষ ঠেসে তাই খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। প্রমাণের অভাব হয়নি। আব্রুগড় থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরের এক ছোট্ট ডাকঘর থেকে ও'হারা পাঠিয়েছিল ছটি রেজেস্ট্রি পার্শেল ছজন ইংরেজের নামে—পোস্ট মাস্টার সেই মর্মে সাক্ষী দিয়েছিল।

এঁদের দুজন থাকতো আব্রুগড়ে, বাকিরা কাছে-পিঠের চা-বাগানে। একই সঙ্গে একই জিনিস খেয়ে সবাই মর-মর হয়েছিল বলে সিভিল সার্জন বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে যে চকোলেটের মধ্যে গড়বড় সড়বড় আছে। তাই তারা সে-যাত্রা রক্ষা পায়। কেউ মরেনি।

কিন্তু ছটা কেন, একটা পরিবার—একটা পরিবারই বা কেন—একজন লোককে খুন করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শ্রীঘর! ও'হারা আলিপুরে।'

ইতিমধ্যে বীরভূমের খোয়াইডাঙা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খান বললে, 'এদের সঙ্গে আমাদের সবুজ সিলেটের কোনও মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর রুক্ষ শুষ্ক একটা কঠোর সৌন্দর্য আছে।' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম। মনে পড়েছে। হঠাৎ আমার মাথায় এক নূতন বুদ্ধির উদয় হল। ও'হারা যখন আইরিশম্যান তখন তার বন্দুক থাকাটা অসম্ভব নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, ছিল। আমি জানতুম কারও দীর্ঘ মেয়াদের জেল হলে তার বন্দুক সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হয়। সেটা সেখানে পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, খুলির মাথায় যে বুলেট পাওয়া গেছে, সেটা নিঃসন্দেহে ঐ বন্দুক থেকে ছোঁড়া হয়েছে।

যাক। এতক্ষণে এক কদম এগোলুম কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্ন যে লোকটা খুন হয়েছে সে কে?

কলকাতায় যখন কলেজে পড়তুম তখন আমাদের হস্টেলে রামানন্দ চাটুজ্যে একবার জর্নালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসেন। মেলা কথা কওয়ার পর তিনি শেষ করেন এই বলে যে, যে-কোনও জ্ঞান, যে-কোনও খবর, তার মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, কোনও না কোনও দিন জর্নালিজমের কাজে সেটা লেগে যেতে পারে।

পুলিসের কাজেও দেখলুম তাই। সেই যে আমি অবসর সময়ে থানায় বসে বসে পুরনো ফাইলের কাসুন্দি ঘাঁটতুম তাই লেগে গেল কাজে।

থানায় থানায় একখানা খাতাতে লেখা থাকে কে কবে নিরুদ্দেশ হল—অবশ্য যদি আত্মীয়স্বজন খবর দেয়। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ—কত লোক কত রকমে 'কপ্পূর' হয়ে

যায়, কে বা রাখে তার খবর। তবু মনে পড়ল তিন বছর আগে এক বিহারী মজুর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কঙ্কালটা জড়ানো ছিল একটা চেক্ কম্বলে, এ ডিজাইনটা বিহারীদের ভিতর খুবই পপুলার!

যে পাড়াতে সে থাকতো সেখানে জোর অনুসন্ধান চালালুম। অবশ্য ছদ্মবেশে। চায়ের দোকানে আশকথা পাশকথা কওয়ার পর একে ওকে তাকে শুধোই, সেই বিহারী রামভজনের কি হল?

যা খবর পাওয়া গেল সেটা আমাকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে দিলে। তার নির্যাস :—

''রামভজনের বউ টুনি মেম—''

আমি আশ্চর্য হয়ে বাধা দিয়ে বললুম, 'বিহারী মজুরের বউ মেম হয় কি করে?'

খান বললে, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। টুনি ও'হারা সায়েবের বাঙলোয় কাজ করতো। পরে সায়েবের রক্ষিতা হয়ে যায়। তাই বিহারীরা তার নাম দেয় ''টুনি মেম''।

রামভজন নাকি একদিন তার দেশের ভাই-বেরাদরকে বলে, সে দেশে চলে যাচ্ছে; যা জমিয়েছে তাই দিয়ে খেত-খামার করবে। হয়তো তারও বাড়া আরেকটা কারণ ছিল। সামনাসামনি না হোক আড়ালে-আবডালে অনেকেই টুনি মেমকে নিয়ে মস্করা-ফিস্কিরি করতো। অতি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে, রামভজনকে বাদ দিয়ে নয়।

এবং শেষ খবর, টুনি মেম আর তার স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার সময় নাকি ওদের দুজনকে ও'হারার বাঙলোর গেটের সামনে দেখা যায়।'

আমি শুধালুম 'তারপর?' কৌতূহল তখন আমার মাথায় রীতিমত চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমাকে হতাশ করে খান বললে, 'ব্লাঙ্কো। মাস তিনেক পর যখন রামভজনের পরিচিত নূতন মজুররা আব্রুগড়ে এল—ওরা কিস্তিতে কিস্তিতে আসছে যাচ্ছে হামেশাই—তখন তারা বললে, রামভজন আদপেই দেশে পৌঁছয়নি। আব্রুগড়ের কেউ বললে, টুনি মেমের বেহায়াপনায় তিরিবিরক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে, কেউ বললে, দার্জিলিং না কোথায় যেন চা-বাগানে কাজ নিয়েছে।'

'আর টুনি মেম?'

'সে তখন ও'হারার রক্ষিতা। কিন্তু 'রক্ষিতা'' বললে হয়তো ও'হারা ও টুনি মেম দুইজনারই প্রতি অবিচার করা হয়। ও'হারা টুনি মেমকে রেখেছিল রাণীর সম্মান দিয়ে আর টুনি মেম ও'হারাকে ভালোবেসেছিল লায়লী যে-রকম মজনূনকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এ-সব আমি পরে জানতে পেরেছিলুম।

আমি তখন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আবছা আবছা ছবি এঁকে ফেলেছি।

টুনি মেম স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে ও'হারার বাঙলোয় নিয়ে যায়। শীতকাল ছিল বলে রামভজন তার সেই চেক কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তার পর যে-কোনও কারণেই হোক ও'হারা তাকে গুলি করে মেরে বাবুর্চীখানার ভিতের ভিতর পুঁতে ফেলে। যে-লোক ছ'টা পরিবারের খুনের চেষ্টা করতে পারে তার পক্ষে এটা ধুলো-খেলা।

চায়ের দোকানে তদন্ত শেষ হলে পর একদিন থানা থেকে সরকারীরূপে চায়ের দোকানে যে সবচেয়ে বেশী ওকীবহাল ছিল তাকে ডেকে পাঠালুম। সে বললে কসম খেয়ে,

কোন কিছু তার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে রামভজনের ঐ রকম একখানা চেক কম্বল ছিল।

তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই, ও'হারা যদি রামভজনকে খুন করে থাকে তবে তার একমাত্র সাক্ষী টুনি মেম।

টুনি মেম কোথায়?

খবর পেলুম ও'হারার জেল হওয়ার পর টুনি মেম বড় দুরবস্থায় পড়ে। শেষটায় কোন পথ না পেয়ে ও'হারা সাহেবের বাবুর্চির সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এইবার সত্যি আমার সামনে যেন পাথরের পাঁচিল খাড়া হল। বহু অনুসন্ধান করেও কিছুমাত্র হদিস পেলুম না, খানসামা আর টুনি মেম গেল কোথায়।

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, সায়েবদের এই যে বাবুর্চি ক্লাসের লোক, এরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে চাকরি পায় না। পুডিং-পাডিং রোস্টোমোস্টো দুনিয়ার যত সব অখাদ্য এরা রাঁধে, শুয়ার গোরুর ঘ্যাঁট এরা যেসব বানায় সেগুলো দূর থেকে দেখেই শেষ বিচারের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়—খায় কোন্ বঙ্গ-সন্তানের সাধ্যি! অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ও'হারার বাবুর্চি নিশ্চয়ই অন্য কোন সায়েবের চাকরি নিয়েছে।

তোকে পূর্বেই বলেছি, আক্রুগড়ের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগান আব-জাব করছে। আমি প্রতি উইক-এন্ডে আজ এটা কাল সেটায় তদন্ত করতে লাগলুম। পরনে খানসামা বাবুর্চির পোশাক। সবাইকে শুধোই, বাবুর্চির চাকরি কোথাও খালি আছে কিনা। আরও শুধাই, আমার এক ভাই নাম ভাঁড়িয়ে এক কুলী রমণীর সঙ্গে বসবাস করছে—আসল কারণ অবশ্য আমি ও'হারার খানসামাটার নাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি—আমাদের মা তার জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে—তার খবর কেউ জানে কি না?

বাগানের পর বাগান ব্লাঙ্কো ড্র করেই যাচ্ছি আর আমার রোখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

শেষটায় আল্লার কুদরৎ, পয়গম্বরের মেহেরবানী, আর মুর্শীদের 'দোয়ার' তেরস্পর্শ ঘটে গেল।

এক চা-বাগিচার কম্পাউন্ডার শুধু যে খবরটা দিলে তাই নয়, বাঁকা হাসি হেসে বললে, "ও টুনি মেম! দেখে এসো গে তোমার বউদি কী সুখেই না আছেন।"

আমি মেলা তর্কাতর্কি না করে ধাওয়া করলুম ম্যানেজার সায়েবের বাঙলোর দিকে। সেখানে গিয়ে শুনি, বাবুর্চি পরশু দিন থেকে উধাও, তার 'বউ' কুলী লাইনের একটা কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

পড়ি পড়ি এই পড়ি, ত্রিভঙ্গ মুরারী-গোছ অতিশয় জরাজীর্ণ একখানা ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়েঘর। ঝাঁপের তৈরী দরজাখানা পাশের মাটিতে পচছে।

ভিতরের দৃশ্য আরও মারাত্মক। স্যাঁতসেঁতে নয়, রীতিমত ভেজা মাটির ভিত। হেথায় গর্ত, হোথায় গর্ত। আল্লার মালুম গর্তে সাপ না ইঁদুর আছে। এক কোণে একটা ভাঙা উনুন। কবে যে তাতে শেষ রান্না হয়েছিল ছাই দেখে অনুমান করতে পারলুম না। তারই পাশে একটা সানকি গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু'একটা ভাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে তলানিতে গড়াচ্ছে। তারই পাশে মলমূত্র। নোংরা দুর্গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটি হাড্ডিসার বছর তিনেকের ছেলে চোখ বন্ধ করে ধুঁকছে।

ছেলেটিকে কিন্তু তবুও যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেটা আমার চোখ এড়ায়নি। কেউ না বললেও আমি চট্ করে বলে দিতে পারতুম ইটি ও'হারার সন্তান। শুনেছি স্বর্গের দেবশিশুরা অমর, কিন্তু এই মরলোকে এসে যদি তাঁদের কাউকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তবে বোধ হয় তার চেহারা এরকমই দেখাতো।

আমি যে গলা খাঁকরি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম সে একেবারের তরে চোখও খুলল না। সে শক্তিটুকুও তার গেছে।'

অল্পক্ষণের জন্য নীরব থেকে খান বললে, 'বহু বৎসর পুলিসে কাজ করে করে আমি এখন সঙ্গ-দিল—পাষাণহৃদয়। তখন সবে পুলিসে ঢুকেছি—আমি ওদিক থেকে চোখ ফেরালুম।

সে আরও নিদারুণ দৃশ্য। একটা বছর দেড়েকের বাচ্চা তার মায়ের সায়া ধরে টানাটানি করছে। তারও সর্বাঙ্গে অনাহারের কঠিন ছাপ। ভালো করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। আর সে কী বীভৎস গোঙরানো—থেকে থেকে হঠাৎ অনাহারের দুর্বলতা যেন তার গলা চেপে ধরে আর কক্ করে গোঙরানো বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার নীরবতা আরও বীভৎস।

চ্যাটাইয়ের উপরে শুয়ে টুনি মেম। পরনে মাত্র একটি সায়া—শতচ্ছিন্ন, বুক ঢেকে একখানা গামছা—জরাজীর্ণ। হাত দুখানা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে—কি জানি জীবন-মরণ-অনশন কিসের চিন্তা করছে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আসন্ন-প্রসবা।

ক্ষণতরে পুলিসের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমার ভিতরকার মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। আমি সবলে তার কণ্ঠরোধ করে পুলিসের কর্তব্যে মন দিলুম। অর্থাৎ এ-রমণী যেন টের না পায় আমি পুলিস। ও'হারার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি।

তাই খানসামার ভাইয়ের পার্ট প্লে করে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করলুম, "কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়াটা আপন বউকে ফেলে"?'

খান আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'জানিস মিতু, এত দুঃখের ভিতরেও মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। কারণটা বুঝতে পেরেছিস? জানিস তো, আমার সিলেটীরা যদি কুলী-রমণী গ্রহণ করি তবে সে হয় রক্ষিতা, কিংবা লোকে বলে খানকি-নটীর বেলেল্লাপনা, কুলী রমণীকে স্ত্রীর সম্মান সেও দেয় না, আর পাঁচজনের তো কথাই নেই। তাই এত দুঃখের ভিতরও বিবাহিত স্ত্রীর সম্মান পেয়ে তার চোখেমুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।

আমি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছি, "কোথায় গেলেন আমার পরাণের ভাই? আচ্ছা আমার খবর নিস নে, নিসনি, কিন্তু হতভাগার মা যে কেঁদে কেঁদে দেশটা ভাসিয়ে দিলে তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করলে না! এদিকে আবার বউ-বাচ্চা পোষবার ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে!"

আমার চেঁচামেচি শুনে কুঁড়েঘরের সামনে একপাল কুলী মেয়েমদ্দ জমায়েত হয়ে গিয়েছে। আমি দোরে দাঁড়িয়ে বললুম, "তোমাদের মধ্যে কেউ রাজী আছ, এদের জন্যে রান্নাবান্না করে দিতে, ঘর সাফসুতরো করতে, আর বেচারী বউটার সেবা-টেবা করতে?

এখ্‌খুনি তাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি। মাসের শেষে ফের পুরো মাইনে পাবে। আর এই আরও দু'টাকা হাঁড়িকুড়ি চালডালের জন্য।"

সবাই চেঁচিয়ে বললে, "মুন্নি, মুন্নি!"

মুন্নি এগিয়ে এল। পুরনো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা। পরে জানতে পারলুম, এই গরিব বিধবা একমাত্র মুন্নিই যতখানি পারে টুনি মেমেদের দেখভাল্ করেছে। সেও নিঃসম্বল, কীই বা করতে পেরেছে! কিন্তু জানিস মিতু, দুর্দিনে দুটি দরদের কথাই বলে কটা লোক!

আর জানিস্, সেই মুন্নি আমাকে মৃদুকণ্ঠে কি বললে? বললে, "আমাকে মাইনে দিতে হবে না সায়েব। ওদের জন্যে যা রান্না করবো তার থেকে দু'মুঠো আমাকে খেতে দিলেই হবে।"

এর পরও যে খুদাতালায় বিশ্বাস করে না তাকে চড় মারতে ইচ্ছে করে।

মুন্নিকে বললুম, "এই নাও আট আনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে মুড়ি-মুড়কি যা পাও নিয়ে এসো।"

চায়ের কথা বললুম না। ঐ একটিমাত্র জিনিস চা-বাগানে ফ্রী। বিস্তর কুলী বিন্ দুধ-চিনি সুদ্ধমাত্র চায়ের লিকার খেয়ে ক্ষিদে মারে।

পাঁচজন সাধারণ মানুষের স্বভাব, কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে এসে সাহায্য না করার, কিন্তু তখন যদি এরই একজন বুকে হিম্মৎ বেঁধে সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

একজন ইতিমধ্যে বসবার জন্য আমাকে একটা মোড়া এনে দিয়েছে। আমি বললুম, "আমি একটা চারপাই কিনতে চাই। বেচবে?"

চারপাই বলতে-না-বলতে এসে গেল। ভিজে ভিত্ থেকে উদ্ধার পেয়েও কিন্তু টুনি মেমের মুখের ভাব বদলালো না।

তোকে বলেছি—হার্ড-বয়েল্ড পুলিসম্যান আমি তখনও হইনি, এমন কি অতিশয় সফ্ট-বয়েল্‌ডও না, তাই এই পুলিসের ভণ্ডামি করতে আমার বাধো-বাধো—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এইবারে তুই আরম্ভ করলি সত্যি সত্যি মিথ্যে ভণ্ডামি। ভুলে গেছিস নাকি, ইস্কুলে আসবার সময় কাঁধে করে মা-হারা একটা কাঠবেড়ালিকে সঙ্গে নিয়ে আসতিস? মাস্টারমশাই সেটার জন্য চোটপাট করাতে "গফ্‌ট" ইস্কুল ছেড়ে নবাবী তালবের ওপরে "রাজার ইস্কুলে" ট্রেনসফার নিলি?'

খান যেন আদৌ শুনতে পায়নি। বললে, 'আসন্নপ্রসবা রমণী পুরুষের চিত্তহারিণী হয় না। কিন্তু তোকে কি বলবো, মিতু, ওরকম সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

অনাদর, অবহেলা এবং সর্বোপরি অনাহার তাকে ম্লান করে দিয়েছে সত্য কিন্তু খাঁটি সোনার উপরকার ময়লা কতক্ষণ থাকবে! একে দু-দিন খেতে দিলে দুটি মিষ্টি কথা বললে এ তো চোখের সামনে কদম গাছের মত বেড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ফুল ফোটাবে। এই তো এখ্‌খুনি যখন মুড়ি এল আর ছেলেটি এই প্রথমবার প্রসন্ন নয়নে তার দিকে তাকালো, তখন তার মায়ের সৌন্দর্য যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো।

গয়ার কালো পাথরে কোঁদা মূর্তিটি যেন টুনি মেম। হিন্দুদের যে সুন্দর সুন্দর কালো পাথরের মূর্তি আছে সেগুলো সুন্দর আমি জানি, কিন্তু কালো বলে আমার মন কখনও সাড়া দেয়নি। টুনি মেমকে দেখে বুঝলুম, মরা কালো পাথর জ্যান্ত টুনির রঙের সঙ্গে

পাল্লা দিতে গিয়ে কী মারই না খেয়েছে!

আমি তো তেমন ফর্সা নই, আমি মজেছিলুম টুনির রঙ দেখে। আর ও'হারা তো আইরিশম্যান। সে যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! গৌরী শ্রীরাধা কেন কৃষ্ণ-লীন হয়েছিলেন টুনি মেমকে দেখে বুঝতে পারলুম। তা সে যাক গে, তোকে আর কি বোঝাব। দেখাবার হলে দেখাতাম। ঐ একটি মেয়ে এ-রঙ নিয়ে জন্মেছিল। তার আগেও না, পরেও না।

ইতিমধ্যে মুন্নি খিচুড়ি চড়িয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা টেমি টিম টিম করে জ্বলছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলুম।

বাগানের ছোটবাবু মুসলমান। তাকে সার্টিফিকেট দেখাবার ছল করে আমার পুলিসের পরিচয় দিলুম। খাওয়া-দাওয়া করলুম কিন্তু তাঁর বাবুর্চীর সঙ্গে, পাছে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হয়।

রাত ন'টার সময় টুনি মেমের ঘরে ফিরে দেখি মুন্নি তাকে আরও চারটি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে বললে, "ক'দিন ধরে কিছুই জোটেনি, সায়েব; আজ হঠাৎ খাবেই বা কী করে! তবু বলছি, পেটের বাচ্চার জন্য দুটি খেতে।"

টুনির পরনে শাড়ি। সেদিকে তাকাতে মুন্নি বললে, "আট আনা পয়সা দিয়ে মুদির দোকান থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।"

আমি বললুম, "খুব ভালো করেছ।"

মুন্নি আপন কাঁথাখানা নিয়ে এসেছে। সেটা চেটাইয়ের উপর পেতে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি মোড়াটা চারপাইয়ের পাশে এনে বসলুম। টুনি সেই আগের মত শুয়ে আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর।

আমি উঠি উঠি করছি এমন সময় টুনি চোখ বন্ধ রেখেই কোনও প্রকারের ভূমিকা না নিয়ে বললে, "আপনি সব কিছু জানতে চান—না?"

আমি হকচকিয়ে উঠলুম। কিন্তু তার পরের কথাতেই আশ্বস্ত হলুম। বললে, "কি করে এ অবস্থায় পৌঁছলুম!"

খান বললে, উত্তেজনা ঔৎসুক্যে আমি তখন অর্ধমৃত। "না, না, না, তোমার এখন শরীর দুর্বল, তুমি—" ঐ ধরনের কিছু একটা বলা-না-বলার মত কি যেন একটা অর্ধপ্রকাশ করেছিলুম।

টুনি বললে, "আমি আপনাদের ভাষায় কুলী। আপনারা মানুষ বলেই গণ্য করেন না, অথচ জানেন, আমি একদিন রাজরানীর সম্মান পেয়েছিলুম।"

খান বললে, 'বিশ্বাস করবি নে, মিতু, ঠিক এইরকম ধরনের মার্জিত ভাষায় কথা বলেছিল। আমি তো অবাক!'

আমি বললুম, "আম্মো।'

খান বললে, 'সেটা পরে পরিষ্কার হল। তোকে সব বলছি, টুনি মেম যা বলেছিল।

বললে, "অনেক অপমান নির্যাতন সয়েছি। হেন অপমান নেই যা আমায় সইতে হয়নি—মুখ বুজে। নূতন অপমান আর কি হতে পারে? তাই মনে হচ্ছে আমার যাবার সময় বুঝি ঘনিয়ে এল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মুন্নির নাক অল্প অল্প ডাকছে। টেমিটা বাতাসে এদিক-ওদিক নাচছে।

টুনি বললে, ''ও'হারা সায়েবের বোন এসেছিল বিলেত থেকে এ-দেশের হাতী গণ্ডার দেখবে বলে। তারই আয়া হয়ে আমি ওবাড়িতে ঢুকি। মেম চলে যাওয়ার পরও তিনি আমায় ছাড়লেন না।

''আপনি মুরুব্বী, আপনাকে সব কথা বলতে আমার বাধছে। তবু যে বলছি, তার কারণ আপনি এসেছেন আমার ত্রাণ-কর্তা, আমার বন্ধুরূপে। আপনাকে না বলবো তো বলবো কাকে? আর এ যে আমার বুকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। এ-বোঝা না নামিয়ে তো আমার নিষ্কৃতি নেই। আপনি শুনুন।

''আমাদের প্রণয় হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের দিকে তাকানোই পাপ, প্রণয় সে তো মহাপাপ। তার জন্য যে সাজা পরমাত্মা আমায় দেবেন তার জন্য আমি তৈরী।

''কিন্তু ভাবো দিকিন ভাই সায়েব, আমি কুলী-কামিন্। আমি কালো, কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বলতো, আমার সর্বাঙ্গ নাকি চুম্বক, পুরুষকে টানে। টানতো নিশ্চয়ই—বিশেষ করে ছোঁড়ারা যখন হ্যাংলার মত আমার দিকে তাকাতো তখনই সেটা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ওরা কি চায়, সেটা আমি আরও ভালো করেই বুঝতে পারতুম। আমাকে রক্ষিতা করে রাখবার সাহসও এদের ছিল না। যাক, এসব কথা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

''তখন যদি কেউ আমাকে রানীর সম্মান দেয় তখন সে প্রলোভন জয় করা কি সহজ পরীক্ষা? সায়েব আমাকে প্রথম দিন থেকেই ইংরেজী পড়াতে শুরু করলে, বললে, 'তোমাকে আমি আমার মনের মত করে গড়ে তুলবো।' ভালোবাসলে মানুষ কি না করতে পারে। কিংবা হয়তো পূর্বজন্মে আমি কোন পাঠশালা-মক্তবের আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়ে সেবা করেছিলুম বলে এ জন্মে তাঁরই পুণ্যের ফলে আমার লেখা-পড়া যে গতিতে এগিয়ে চললো সেটা দেখে স্বয়ং সায়েবই অবাক।''

এতক্ষণ পরে টুনি মেম আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয় দেখে নিল এসব সূক্ষ্ম জিনিস বোঝবার স্পর্শকাতরতা আমার কতখানি আছে? আফ্‌টার অল্, সে তো আমাকে জানে খানসামার ভাই খানসামা হিসেবে!

আমার চোখে কি দেখল কে জানে। আজও আমার কাছে রহস্য।

কিন্তু বলে যেতে লাগলো ঠিক সেই ভাবেই।

বললে, ''বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি হয়েছিল বলতে পারি নে, কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা, কুলী-মজুররা যে ভালোবাসি, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে টান হয়, সেটাকে আমি নিন্দা করছি নে, কিন্তু সায়েবের পাশে বসে প্রেমের ভালো ভালো গান আর কবিতা পড়ে পড়ে আমি এক নূতন ভাবে তাকে ভালোবাসতে লাগলুম, আর সে যে আমাকে কত দিক দিয়ে কতখানি ভালোবাসে সেটাও দিনের পর দিন আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগলো।''

টুনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে থামাই। কিন্তু সে তখন আপনমনে যেন কথা বলছে। আবার কখনও বা সংবিতে ফিরে চোখ দুটি মেলে আমার দিকে

তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আপন কথা বলে যায়।

"সায়েবের মত এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সামান্য কয়েক ঘণ্টা দিনে কাজ করতো চা-গাছের সার নিয়ে, আর তার জন্য পেত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আর খরচ করতো বেহুঁশের মত। আমি কিছু বললে হেসে উত্তর দিত, যত খুশি যে যখন কামাতে পারে তখন যত খুশি খরচ করবে না কেন?

এই তো আমার স্বামীকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল—"

খান বললে, আমি তখন উত্তেজনার চরমে। এইবারে জানতে পারবো, সেই টাকা নিয়ে টুনি মেমের স্বামী দেশে ফিরে গিয়ে খেতখামারের প্ল্যান করছিল কি না? সে টাকা পেয়েছিল কি? না ও'হারা ডবল ক্রসিং করছিল! রামভজন গুলি খেল কি করে, কেন, কার হাতে? কিন্তু হঠাৎ কেন জানি নে, টুনি মেম কথার মোড় ফিরিয়ে নিল। আমি শুধু লক্ষ্য করলুম; টুনির মুখ কেমন যেন ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল। পাছে সে সন্দেহ করে বসে, আমি কি মতলব নিয়ে এসেছি, তাই আমিও ঐ ব্যাপারটার উপর চাপ দিলুম না। মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এতখানি যখন বলেছে, পরে মোকা পেলে বাকিটুকু পাম্প করে নেব।

কারণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, টুনি মেম তো সাধারণ কুলী-কামিন্ নয়ই, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে ভীষণ শক্ত মেয়ে। খুদাদাদ্ (বিধিদত্ত) চরিত্রবল তার নিশ্চয়ই ছিল, তার উপর এত বেশী তুফান-ঝড় এত বেশী বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে মার খেয়ে খেয়ে আজ এই স্যাঁতসেঁতে কুঁড়েঘরে এসে পৌঁছেছে যে এখন সে নির্ভয়—তার আর যাবে কি, তার আর হারাবার মত কি আছে যে সে তারই ভয়ে আপন গোপন কথা ফাঁস করবে? সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে তবে আমার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই যে আঁকশি দিয়ে তার পেটের কথা বার করি। এই এক ফোঁটা দুব্‌লা পাতলা মেয়ে, পুলিসের এক ফুঁয়ে সে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে উড়ে যাবে, কিন্তু আমি এ-তত্ত্বটাও জানি যে সে ভাঙবে না, তার দার্ঢ্য অবিশ্বাস্য।

টুনি মেম বললে, "কিন্তু সায়েব ছিল পাগল। আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি, সায়েব ছিল পাগল। দুটো জিনিসে যে তার পাগলামি কত বিকট রূপ ধারণ করতে পারতো সে যারা দেখেছে তারাই বলতে পারবে।"

তারই স্মরণে টুনি মেম যেন আঁতকে উঠলো। বললো, "বেশ ভালমানুষের মতো দিব্যি দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমাকে আদর-সোহাগ করার অন্ত নেই, সারা সকালটা হয়তো কাটলো ক্যাটালগ দেখে বিলেত থেকে আমার জন্য কি সব আনাবে বলে, তারপর হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটানা মদ খাওয়া। চললো দিনের পর দিন। কাজকর্ম তো বন্ধ বটেই, নাওয়াখাওয়ারও খোঁজ নেই। একটুখানি সুব্যবস্থায় পেয়ে যদি বললুম, 'দুটি মুখে দাও', তবে সে কাতর স্বরে হয় বলতো, 'নেশা কেটে যাবে', নয় বলতো, 'মুখ দিয়ে কিছুই নামবে না।' ঘুম আর মদ, মদ আর ঘুম। আমার জাতভাইরা এদেশে এসে মদ খেতে শেখে। তাদের কেউ কেউ খায়ও প্রচুর। ও জিনিস আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়, কিন্তু ওরকম বেহদ মদ কাউকে আমি খেতে দেখিনি, শুনিনি। সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়।

"আমি তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছি কতবার—তুমি যদি ঐ মদটা না খেতে তবে আমি নির্ভয়ে বলতে পারতুম, আমার মত সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সুস্থ অবস্থায়

থাকলেও সেও আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করতো, আর কখনও খাবে না। কী লজ্জা! যাকে আমি মাথার মণি করে রেখেছি, সে দেবে হাত আমার পায়ে! অবশ্য এ কথাও ঠিক, আস্তে আস্তে তার এই মদের বান কমতির দিকে চললো। আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সইবে কেন?' "

খান দম নিয়ে বলল, 'দেখ মিতু, এর পর বহুকাল চা অঞ্চলে কাজ করার ফলে বিস্তর সায়েবকে প্রচুর কালো মেয়ে নিতে দেখেছি, এবং ছেড়ে যেতেও দেখেছি, কাচ্চা-বাচ্চা থাকলে তাদের মিশনারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকেও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে, —এসব ওদের ডালভাত। কিন্তু টুনি মেম স্বতন্ত্র।'

আমি বললুম, 'সে আর তোকে বলতে হবে না। তার পর কি হল, তাই বল। বোলপুর আর বেশী দূর নয়।'

খান বললে, 'টুনির কাহিনীও শেষ হতে চললো। শোন্। টুনি বললে, "আমার দ্বিতীয় দুঃখ ছিল, সায়েবের অসম্ভব রাগ। ঐ মদেরই মত। বেশ দিন কাটছে, হাসিখুশির মানুষ সায়েব। হঠাৎ কোনও আরদালি বা বেয়ারা একটা কিছু বললে, আর সায়েব রেগে পাগলের মত বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে করলে তাড়া। আমি কতবার যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠেকিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু বুঝতুম, যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এ-রকম ধারা করতো। তা নয়। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায়। আমার নিজের কোনও ভয় ছিল না, কারণ আমার উপর সে একবার মাত্র রেগে গিয়ে পরে এমনই লজ্জা পেয়েছিল যে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না যে সে আমার উপর রাগবে না। কিন্তু চাকরবাকরকে নিয়ে হত মুশকিল। আমার স্বামীকে—"

খান থামলো। আমি তেড়ে বললুম, 'ঐ রাগের মাথায় খুন করেছিল নাকি?'

খান বললে, 'ভাই, এবারেও আমাকে প্রলোভন সম্বরণ করতে হল। ঠিক যখন আমার মনে হল, এবারে টুনি আসল কথায় আসবে ঠিক তখন সে আবার তার কথার মোড় ঘোরাল। আমি নাচার। আবার মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এই নিয়ে দু'বার হল; তিনবারের বার নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু টুনি পাড়লো অন্য কথা। বললে, "ঐ রাগই আমার সর্বনাশ করলো।" তারপর আমাকে শুধালে আমি এদেশে অনেকদিন ধরে আছি কি না? আমি বললুম, না, ভাইয়ের সন্ধানে হালে এসেছি। তখন টুনি বললে, "তাহলে জানতে, যা সবাই জানে। ঐ নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

"সায়েব ক্লাবে বড় একটা যেত না। একদিন ফিরে এল চিৎকার করতে করতে বদ্ধ মাতালের মত, অথচ মদ খায়নি। পাগলের মত শুধু চেঁচাচ্ছে, 'আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি দেখাচ্ছি আমি কি করতে পারি।' আমি চেষ্টা করেছিলুম সায়েবকে ঠাণ্ডা করতে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলুম না। টাকা নিয়ে মোটরে করে ফের বেরিয়ে গেল।

"ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই। তাই নিয়ে আমি কখনও দুঃখ করিনি। আমার সায়েবকে পেয়েই আমি খুশি ছিলুম, আমি সুখী ছিলুম, কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে এল আর সায়েব ফিরল না তখন যে আমি কি করি, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। এর পূর্বে সায়েব আমাকে কখনও একা ফেলে যায়নি। একা

থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু সে রাত্রে কেমন যেন এক অজানা ভয় এসে আমাকে অসাড় করে দিল। সে রাত্রিটা আমার কি করে কেটেছিল আজ আর বলতে পারবো না।

"পরদিন সায়েব সন্ধ্যের দিকে ফিরে এল। আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলুম বাথরুমের দিকে। সে কিন্তু আমাকে দু-হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে বসালো উঁচু একটা চেয়ারের উপর। নীচে আমার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি মোড়ার উপর বসে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে আমার দিকে। সায়েব এ ভাবে প্রায়ই আমাকে বসাতো, আর একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার বড় লজ্জা করতো। আমি কে, আমি কি?

"ভাই সায়েব, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে সব কথা বলতে দাও।

"ঠিক তার চারদিন পর পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল।

"কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ এরকম লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদায় না। আমি সায়েবের রক্ষিতা, আমার তো কোনও হক নেই। পুলিস বাড়ি তালাবন্ধ করে সিল-মোহর মেরে চলে গেল। আমি এক বস্ত্রে বাঙলোর বারান্দা থেকে বাগানের বকুলতলায় এসে বসে রইলুম। সেখানে সায়েব আমার জন্য একটা সিমেন্টের বেদী বানিয়েছিল।

"যে চাকর নফর সেদিন সকালবেলা পর্যন্ত আমার পা চেটেছে, তারাই এখন আমাকে লাথিঝাঁটা মারলো। চাকরি গেছে যাক কিন্তু ঐ 'কুলী মেম'টাকে যতখানি পারি অত্যাচার-অপমান করে তার দাদ তুলে নিয়ে যাই।

"আমি একটি কথাও বলিনি।

"মোকদ্দমাতে সব কথা বেরুল। সবাই জানে। সেই যেদিন সায়েব ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন ক্লাবের কয়েকজন মুরুব্বী তাকে নাকি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, অনেক চা-বাগিচার ইংরেজ ছোকরা দিশী মেয়ে রাখে কিন্তু আমার সায়েব আমাকে নিয়ে খোলাখুলি যে মাতামাতি করছে সেটা ইংরেজ সমাজের পক্ষে বড়ই কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

"আমি জানতুম, আমার সায়েব এ-সব চা-বাগিচার সায়েবদের ঘেন্না করতো। কতবার তাকে বলতে শুনেছি যে-সব নেটিভদের উপর সায়েবরা ডাণ্ডা মেরে বেড়ায়, তারা শিক্ষাদীক্ষার কোনও সুযোগই পায়নি, তাই তারা আজ মজুর, আর ঐ সায়েবরা আপন দেশে সব সুযোগ পেয়েও নিতান্ত অপদার্থ হতভাগা বলে কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপন দেশে মজুরের কাজ করতে হলে যেটুকু ধাতুর প্রয়োজন সেটুকু এসব লক্ষ্মীছাড়াদের নেই বলে তারা এদেশে এসে নেটিভদের উপর দাবড়ে বেড়ায়।

"তোমাকে বলেছি, ভাইয়া, আমার সায়েব অপমানিত বোধ করে রেগে একেবারে পাগলের মত হয়ে যেত। সে নাকি তখন যে কটা সায়েবকে হাতের কাছে পেয়েছে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে করে চড় কষিয়েছে আর চিৎকার করে একই কথা বার বার বলেছে, 'আমি তোমাদের মত ভণ্ড ছোটলোক নই! আমি যাকে নিয়েছি তাকে আমি আমার স্ত্রীর সম্মান দিয়েই রেখেছি।' এখানে বলে রাখি, ভাই সায়েব, এরা সবাই জানতো কথাটা সত্যি। আক্রুগড়ের পাদ্রী সায়েব আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়তে নারাজ জেনে সায়েব ঠিক করেছিল, কলকাতায় আমাদের বিয়ে হবে।"

খান অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'তিনবারের বারও ঘোড়া জল খেল না। কারণ আমি তখন থাকতে না পেরে টুনিকে শুধালুম, তার স্বামী সম্বন্ধে যখন কোনও খবর নেই তখন তাদের বিয়ে হত কি করে? অবশ্য আমি ভাবখানা করেছিলুম যেটা ওটা

অমনি একটা কথার কথা, যেন নিছক একাডেমিক প্রশ্ন! আজও বুঝতে পারিনি টুনি মেম আমাকে সন্দেহ করেছিল কিনা। টুনি শুধু বললে, সায়েব নাকি তাকে বলেছিল, সে কলকাতার উকিলদের কাছ থেকে তাদের সম্মতি আনিয়েছে, তবে সেটা নাকি খুব পরিষ্কার নয়। চুলোয় যাক্ গে সে-সব কথা, আমার ইচ্ছে শুধু জানবার তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে সে কি জানে কিন্তু সেই যে ও'হারার বদমেজাজীর কথা বলার সময় সে তার স্বামীর কথার আভাস দিয়েছিল, এবারে সেটুকুও না।'

আমি বললুম, 'ঐ কথাটুকু আমিও তো জানতে চাই।'

খান বললে, 'টুনি জল খেয়ে নিয়ে খেই তুলে বললে, ''সায়েবকে ক্লাব বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। সেদিন বাড়ি ফিরে সায়েব আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল—সে তো বলেছি—তারপর মোকদ্দমায় বেরুল, সায়েব পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরের একটা ছোট্ট পোস্টআপিসে গিয়ে যে ছজন সায়েব তার গায়ে হাত তুলেছিল তাদের নামে ছ'প্যাকেট বিষ-মাখানো চকলেট বিজ্ঞাপন হিসাবে পাঠায়। আচ্ছা, বল তো ভাইয়া, আমি যে বলেছিলুম সায়েবের মাথায় ছিট ছিল সেটা কি ভুল বলেছি? এটা কি ধরা পড়তো না? পাঁচটা পরিবারের লোক যদি একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর—সায়েবলোগের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জনকে ডাকা হয় তবে কি মূল ধরা পড়বে না? পার্সেলের উপর যে পোস্ট অফিস থেকে সেগুলি এসেছিল তার খেই ধরে পুলিস দু'দিনের ভিতর ধরে ফেলল যে সে-ই পার্সেলগুলো পাঠিয়েছিল। পোস্টমাস্টার আদালতে তাকে সনাক্ত করলে।''

খান মন্তব্য করে বললে, 'টুনি মেমের নরম আর শক্ত দুটো দিকই দেখতে পেলুম তার পরের কথাতে। বললে, ''মানুষ মারা পাপ, আর ভাবো দিকিনি ঐ সব পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট কাচ্চাবাচ্চাগুলো। আবার পাঠিয়েছিল একটা ছোট ডাকঘর থেকে। ধরা পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু একথাও তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমি ঘুণাক্ষরেও সায়েবের এই দুর্বুদ্ধির কথা অনুমান করতে পারলে তার সামনে গলায় দড়ি দিতুম।

''আদালতে সায়েব একটি কথাও বলেনি।

''শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়লো, সায়েব নাকি হাজতে যাবার সময় তার উকিলকে বলেছিল, সে তার 'স্ত্রী'র ন্যায্য সম্মান রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র। একথা শুনে শহরের লোক কি বলেছিল জানিনে, কিন্তু ঐ আমি আমার শেষ সম্মান পেলুম।

''সেই সম্মানের উঁচু আসন থেকে আরম্ভ হল আমার পতন।

''আমি তখন যাই কোথায়? দেশের দশের চোখে আমি সায়েবের রক্ষিতা। রক্ষিতাকে রক্ষা করনেওলা যখন আর কেউ নেই তখন সে যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নয়, মরার জায়গা একটা আছে। বেশ্যাপাড়া। কিংবা মরতে পারি ফাঁস দিয়ে। কিন্তু—''

টুনি মেম খানিকক্ষণ চুপ করে বললে, ''কিন্তু তখন সায়েবের বাচ্চা আমার পেটে। তার প্রাণ নিই কি করে?''

খান বললে, 'এর পর টুনি মেম কি করে ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে সেই জাহান্নমের রদ্দি কুঁড়েঘরে এসে পৌঁছল তার বর্ণনা দেয়নি। তুই সেটা যে রকম খুশি কল্পনা করে নিতে পারিস।'

আমি বললুম, 'অ্যাম স্যাডিস্ট নই। আমি বীভৎস রসে আনন্দ পাই নে। তারপর কি

হল তুই বলে যা।'

খান বললে, 'টুনি সে রাত্রে আর কিছু বলেনি। তার ক্লান্তি দেখে আমিও আর খোঁচাখুঁচি করিনি।

ওদিকে আমার বসের সঙ্গে কথা ছিল, টুনিকে আবিষ্কার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানাই। অতি অনিচ্ছায় পরের দিন তাঁকে কোড টেলিগ্রাম করে জানালুম। গেলুম স্টেশনে তাঁকে রিসীভ করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি নামলেন পুলিসের য়ুনিফর্ম পরে। আমি অবাক হয়ে বললুম, "স্যার, করেছেন কি? টুনি বড় শক্ত মেয়ে। পুলিসকে সে একটি কথাও বলবে না। এমন কি আপনি চাকর নফরের বেশ পরলেও ধরে ফেলতে পারে।"

খেলাম উৎকট ধমক। বললেন, "রেখে দাও ওসব জ্যাঠামো। এই ঘোষালবান্দা ঘড়েল ঘড়েল খুনীদের পেটের নাড়ির 'কির্‌মি' বের করেছে একশ' সাতান্ন বার, আর আজ তুমি এলে শোনাতে, কি করে এক ফোঁটা ছুঁড়ির ঠোঁটের কথা বের করতে হয়। চল, তোমাকে হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।" আমি তাঁকে বহুৎ বোঝাবার চেষ্টা করলুম। খেলুম গণ্ডা তিনেক ধাঁতানি। কীই বা করি আমি? তিনি দুঁদে অফিসার। পাঠান আসামীকে তিনি খুন কবুল করাতে পেরেছেন বলে তাঁর খুশ-নাম ছিল—পাঠানকে "বেইমান" বলে অপমান করলে সে রেগেমেগে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়, এই অজানিত প্যাঁচটি জানতেন বলে। আমি চুপ করে গেলুম।

গট্ গট্ করে মিলিটারি বুটে পাড়া সচকিত করে তিনি ঢুকলেন টুনি মেমের কুঁড়েঘরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর, মশাই, আরম্ভ হল দুঁদে পুলিসের যত রকম কায়দা-কেতা ফন্দিফিকির সন্ধি-সুড়ুক তার নির্মম প্রয়োগ। দুনিয়ার ভয়-প্রলোভন, মৃদু ইঙ্গিত, কটু সম্ভাষণ সব-কুচ্ চালালেন ঘড়েল পুলিস-কর্তা।

কিন্তু সেই যে পুলিস দেখে টুনি মেম মুখ বন্ধ করেছিল সে মুখ আর সে খুললে না। ঝাড়া ছ'টি ঘণ্টা পুলিস সায়েব তাঁর চেষ্টা দিয়ে ঘেমে নেয়ে বেরুলেন সেই কুঁড়েঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনি মেম একটা হ্যাঁ-না পর্যন্ত বলেনি।

আমার লজ্জাটুকু পুলিসকর্তা রাখলেন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলুম তিনি যেন প্রকাশ না করেন যে আমার কাছ থেকে সব কিছু জানতে পেরে তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন। আমি যে খানসামার ভাই সেই খানসামার ভাইই থেকে যাই। কিন্তু টুনি মেমের নীরবতার পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে পুলিসকর্তা ঘায়েল হয়ে গিয়ে সেকথাটাও প্রকাশ করে দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতে হল—বস্ যে।

টুনি একবার আমার দিকে এক লহমার তরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘৃণা তাচ্ছিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি।'

খান বললে, 'তার পরদিন প্রসবের সময় টুনি মেম এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করলো।'

এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

'হুঁ।'

আমি শুধালুম, 'তাহলে ঐ যে লোকটা খুন হয়েছিল তার কোন হিল্যে হল না?'

খান অনেকক্ষণ কোন উত্তরই দিলে না। শেষটায় বললে, 'সে যাক্ গে। এর পরও আমি বহু রহস্যের সমাধান করতে পারিনি—সে নিয়ে আমার শোক নেই। আমি শুধু এখনও টুনি মেমের শেষ চাউনির কথা ভাবি। সে চাউনিতে কি ছিল?

দুর্দশার চরমে বাচ্চা দুটো যখন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তখন আমি এসে তাদের চোখের জল মুছে দিলুম, টুনি তখন নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তাকে তার সর্ব দেহমন নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল —তিনি যে তার ডুবুডুবু ভাঙা নৌকোখানিকে পারে এনে ভিড়ালেন। আমাকে সে দেখেছিল তাঁরই দূতরূপে, তাঁরই ফিরিশতারূপে। তারপর হঠাৎ দেখে, আমি দেবদূত নই, আমি শয়তান। তার দুর্দিনে যেসব চাকর-বাকর তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছিল আমি তাদের চেয়েও অধম। আমার মতলব ছিল তার বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে-দাইয়ে তাকে খুশী করে, তার জীবনের চরমধন তার "স্বামীকে" ঝোলাবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

এর পর আর কোনও কথা হয়নি। গাড়ি বোলপুরে এসে থামল।

চেল্লাচেল্লিতে ম্যানেজার গোসাঁই স্বয়ং এসে খানকে ডবল খানা দিলে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুনি মেমের বাচ্চা দুটোর কথা। চেঁচিয়ে খানকে শুধালাম, 'ওদের কি হল?' খান শুনতে পেল না। হাসিমুখে শুধু হাত নাড়লে।

এক পুরুষ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক।

বিদ্রোহ শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনের যুদ্ধে যাকে ইংরেজিতে বলে 'মপিং অপ্', যেন স্পঞ্জ দিয়ে মেঝের এখান ওখান থেকে জল শুষে নেওয়া—তাই চলেছে। আজ এখানে ধরা পড়ল জন দশেক সেপাই, কাল ওখানে জন বিশেক। কাছাকাছি কামান থাকলে পত্র-পাঠ বিদ্রোহীগুলোকে তাদের মুখের সঙ্গে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিংবা ফাঁসি। গাছে গাছে লাশ ঝুলছে, যেন বাবুই পাখির বাসা।

পাঁচ শ' দু-আস্পা (দ্বি-অশ্ব) অর্থাৎ এক হাজার ঘোড়া রাখার অধিকারী বা মনবসদার গুল বাহাদুর খান বর্ধমানের কাছে এসে মনস্থির করলেন, এখন আর সোজা শাহী সরকারী রাস্তায় চলা নিরাপদ নয়। তিনি অবশ্য আপদ কাটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেননি। তিনি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন গদর (মিউটিনি) শেষ হয়ে গিয়েছে—তাঁরা হেরে গিয়েছেন। তিনি কেন, তাঁর সেপাইরা আশা ছেড়ে দিয়েছিল, তিনি নিজে নিরাশ হওয়ার বহু পূর্বেই। সলাহ্পরামর্শ করার জন্য তিন রাত্রি পূর্বে যে জলসা বসেছিল তাতে তারা অনুমতি চায়, অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে গরিব-গুরবো ফকীর-ফুকরো সেজে যূথভঙ্গ হয়ে যে যার আপন শহরের দিকে রওয়ানা হবে। এলাহাবাদ, কনৌজ, ফর্রুখাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মলীহাবাদ, মীরাট—যার যেখানে ঘর।

গুল বাহাদুর খান বলেছিলেন, সেটা আত্মহত্যার শামিল। পথে ধরা পড়বে, আর না পড়লেও বাড়িতে পৌঁছানোর পর নিশ্চয়ই। তাঁর মনের কোণে, হয়তো তাঁর অজানতে,

অবশ্য গোপন আশা ছিল বেঁচে থাকবার। সুদ্ধ মাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নয়,—তাঁর বয়স বেশী হয়নি, হয়তো আবার নূতন গদর করার সুযোগ তিনি এ জীবনে পাবেন। কিন্তু যখন দেখলেন, সেপাইদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে—আজকের দিনের ভাষায় যাকে বলে 'মরাল' টুটে গিয়েছে—তখন তিনি তাদের প্রস্তাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। শেষরাত্রে আধোঘুমে অনুভব করলেন, সেপাইরা একে একে পায়ে চুমো খেয়ে বিদায় নিলে—তিনি আগের দিন মগরিবের নামাজের পর অনুরোধ করেছিলেন, বিদায় নেওয়া-নেওয়ির থেকে তাঁকে যেন রেহাই দেওয়া হয়।

শুনলেন, সেপাইরা চাপা গলায় একে অন্যকে শুধোচ্ছে, কাজটা কি ঠিক হল, বাড়ি পৌঁছানোর আশা কতখানি, সেখানে পৌঁছেই বা কিস্মতে আছে কি, এ রকম সর তাজ্ (মাথার মুকুট) সর্দার পাবো কোথায়?

গুল বাহাদুর খানের কিন্তু কোনও চিত্তবৈকল্য হয়নি। তাঁর কাছে এরা সব নিমিত্ত মাত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁর প্রাণের একমাত্র গভীর ক্ষুধা—জাহান্নমী শয়তান ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে শাহানশাহ বাদশা সরকার-ই-আলা বাহাদুর শাহের প্রাচীন মুগলবংশগত শান্‌শৌকৎ, তখ্‌ৎদৌলৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। আজ যদি এই সেপাইদের দিল্ দেউল হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে। এরা তো আর কিছু কাপুরুষ নয়। কিন্তু এরা কাকের মত একবারই বাচ্চা দিতে জানে। একবার তারা চেষ্টা দিয়েছিল। সফল হতে পারেনি। দু'বার চেষ্টা দেওয়া তো এদের কর্ম নয়। তাই নিয়ে আফসোস্ করে কি ফায়দা! খুদা যদি বাঁচিয়ে রাখেন, আল্লার যদি মেহেরবানী হয় তবে আবার নয়া সেপাই জুটবে, নয়া দামামা পিটিয়ে জেগে উঠবে—তার আশা তিনিই করতে পারেন, এরা করবে কি করে?

গদর আরম্ভ হয়েছিল এলোপাতাড়ি কিন্তু পরে দিল্লীতে লালকেল্লার তসবীখানাতে যে মন্ত্রণাসভা বসেছিল সেখানে স্থির হয়, গুল বাহাদুরকে পাঠানো হবে বাঙলা দেশে। সেখানকার বাগ্‌দীরা এককালে ছিল বাদশাহের সেপাহী। ইংরেজ তাদের বিশ্বাস করতো না বলে ইংরেজ ফৌজে তাদের স্থান হয়নি। শুধু তাই নয়, ইংরেজ তাদের অন্য কোনও রকম কাজ তো দিলই না, উল্টে হুকুম করলে তারা যদি আপন জমি নিজে চাষ না করে তবে সে জমি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করবে। বাগ্‌দীদের আত্মসম্মানে লাগে জোর ঘা। যে তলোয়ার দিয়ে সে দুশমনের কলিজা দু'টুকরো করে দেয়, তাই দিয়ে সে খুঁড়বে মাটি! তার চেয়ে সে তলোয়ার আপন গলায় বসিয়ে দিলেই হয়, কিংবা মোকা পেলে দুশমনের গলায়—

গুল বাহাদুরকে বাঙলাদেশে পাঠানো হয়, এই বাগ্‌দী ডোমদের জমায়েৎ করে এক ঝাণ্ডার নীচে খাড়া করবার জন্য।

আফসোস্, আফসোস্! হাজার আফসোস্! একটু, আর একটু আগে আরম্ভ করলেই তো—গুল বাহাদুর নিজের মনেই বললেন, 'থাক্ সে আফসোস্। এখন বর্তমানের চিন্তা করা যাক্।'

বাগ্‌দীদের সাহায্যেই তিনি যোগাড় করলেন ধুতি নামাবলী। তিনি এখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব। বাঙলা জানেন না, জানেন হিন্দী। আসলে সেটাও ঠিক জানেন না। তিনি ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে বলেছেন দিল্লীর উর্দু, মক্তবে শিখেছেন ফার্সী, আর বলতে পারেন দিল্লীর আশেপাশের হিন্দীর অপভ্রংশ হরিয়ান। কিন্তু তাই নিয়ে অত্যধিক

শিরঃপীড়ায় কাতর হবার কোনও প্রয়োজন নেই। এই রাঢ় দেশে কে ফারাক করতে যাবে, দিল্লীর হরিয়ানা থেকে বৃন্দাবনের ব্রজভাষা।

দাড়িগোঁফ কামাতে গিয়ে একটুখানি খটকা বেধেছিল, এক লহমার তরে। তারপর মনে মনে কান্নার হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তা কামাবো বইকি, নিশ্চয়ই কামাবো। লড়াই হেরেছি, তলওয়ার ফেলে দিয়েছি, পালাচ্ছি মেয়েছেলের মত—এখন তো আমাকে মেয়েমানুষ সাজেই মানায় ভালো।'

শেষটায় হঠাৎ অট্টকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'ইয়াল্লা, আমি কি গুনা করেছিলাম যে এ সাজা দিলে?'

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টও মৃত্যুর পূর্বে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'হে প্রভু, তুমি আমাকে বর্জন করলে কেন?'

বাগ্‌দীরা তাঁর হাহাকার হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল। তেঁতুলতলায় শুইয়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

দুপুররাতে চাঁদের আলো মুখে পড়াতে ঘুম ভাঙলো। দেখলেন, ঘুমিয়েও ঘুমোননি। ঘুমন্ত মগজও তাঁর জাগ্রত অবস্থার শেষ হাহাকারের খেই ধরে মাথা চাপড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সান্ত্বনাও খুঁজে পেয়েছে। কি সান্ত্বনা? গুল বাহাদুর, এ কি তোমার ফাটা কিস্মৎ, না তোমার বাপ-ঠাকুর্দার ভাঙা কপাল? মনে নেই, দেওয়ান-ই খাসের যেখানে লেখা,

"অগর ফিরদৌস বররূয়ে জমীন অস্ত
ওয়া হমীন অস্ত হমীন অস্ত হমীন অস্ত।"
"ভূস্বর্গ যেখানে খুশী বলো, মোর মন জানে
এখানে, এখানে দেখো তারে, এই এখানে।"

তারই সামনে নাদির কর্তৃক হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত, পদদলিত বাদশা মুহম্মদ শাহ কপালে করাঘাত করে কেঁদে উঠেছিলেন,

'শামাতে আমাল-ই-মা সুরুতে নাদির গিরিফ্‌ৎ।'
'কপাল ভেঙেছে, আমারই কর্মফল
নাদির মূর্তিতে দেখা দিল।'

তখন কি তোমার পিতামহ তাঁর নুন-নিমকের মালিক শাহিনশার সে দুর্দৈব দাঁড়িয়ে দেখেননি? বাদশার খাস আমীর সর্-বুলন্দখান, হাজার দু-আস্‌পা মনসবের মালিক তোমার পিতামহ তখন কি করতে পেরেছিলেন? আলবত্তা, হাঁ, হাবেলীতে ফিরে এলে তাঁর জননী তাকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেল, আর তলওয়ারখানা শাহিনশাকে ফেরত দিয়ে এসো।'

তারপর দীন দুনিয়ার মালিক আকবর-ই-সানী (দ্বিতীয় আকবর) যখন ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাতের বাদশার কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন তাঁর তনখাহ্ বাড়িয়ে দেবার জন্য—মেথর যে-রকম জমাদারের কাছে তন্‌খা বাড়াবার জন্য আর্জী পেশ করে—তখন সে বেইজ্জতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তোমার বাপ। শোনোনি যে বাঙালীন্ বাবু[১] সে দরখাস্ত

১ রাজা রামমোহন রায়।

নিয়ে বিলায়েত গিয়েছিলেন তিনি পর্যন্ত নাকি তার জবান, ঢং আর শৈলী দেখে শরম বোধ করেছিলেন।

তাই বলি তুমি এত বুক চাপড়াচ্ছ কেন?

তাঁদের তুলনায় তোমার মনসবই (পদমর্যাদা) বা কি, বাদশাহ তোমাকে চেনেনই বা কতটুকু? নানাসায়েব, লছমীবাঈ এঁরা সব গায়েব হয়েছেন, আর তুমি তাঁতী এখন ফার্সী পড়বে! হয়েছে, হয়েছে, বেহদ হয়েছে। গিদড়ের গর্দানে লোম গজালেই সে শের-বাবর হয় না।

আল্লা জানেন, এসব তত্ত্বকথা চিন্তা করে গুল বাহাদুর খান কতখানি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে অনুমান করা যেত না, তিনি তাঁর কপালের গর্দিশ কতখানি বরদাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বড় রাস্তা থেকে নেমে ডান দিকে মোড় নিয়ে, ফের বাঁ দিকে পুরো পাক খেয়ে তিনি পেরলেন অজয় নদ। উঁচু পাড়ি বেয়ে উঠেই দেখলেন, সমুখে দিকদিগন্ত প্রসারিত খরদাহে দগ্ধ সবিতার অগ্নিদৃষ্টিতে অভিশপ্ত চিতানল—ভস্মীভূত প্রান্তর।

অবাঙালী তো কথাই নাই, এ দেশের আপন সন্তানও এই তেপান্তরী মাঠের সামনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে। এর নাম 'বাঙলা' রেখেছে কোন্ কাষ্ঠরসিক!

কিন্তু গুল বাহাদুর শিউরে ওঠেননি; তাঁর জীবন কেটেছে দিল্লী আগ্রার চারদিকের খাকছার দেশ দেখে দেখে। সেরেফ উনিশ-বিশের ফারাক।

তাবৎ তেপান্তরের ওপারেও লোকালয় থাকে। সাহারার মত মরুভূমি পেরিয়েও বেদুয়িন যখন ওপারে ডেরা পাততে পারে তখন এই তেপান্তরের পরেও নিশ্চয়ই বসতি আছে। কিন্তু সেখানে থাকে কী সর্বহারা লক্ষ্মীছাড়ারাই। যাদের প্রাণ ছাড়া আর কিচ্ছু দেবার নেই শুধু তারাই তো পারে এ রকম ডাকডাকিনীর মাঠে পা ফেলতে!

ভালোই। ভালোই হল। এই তেপান্তরই তাঁর ও ইংরেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইবে অচল অভেদ্য দুর্গবৎ। সেই হতভাগ্যদের সঙ্গেও তাঁর বনবে ভালো, hail fellow well-met. 'এক বাথানের গরু'।

গুল বাহাদুর বললেন, 'শুক্‌র্, অলহমদুলিল্লা।'

মাঠে ফেললেন পা।

॥ দুই ॥

সংসারের অধিকাংশ লোক না গোলাম না বাদশাহ। বাদবাকীর কেউ সর্দার কেউ চেলা। ওদের কেউ কেউ জন্মায় হুকুম দেবার জন্য, আর কেউ কেউ সে হুকুম তামিল করার জন্য। ভাগ্যচক্রে অবশ্য কখনও হুকুম-দেনেওলাও জন্মায় হুকুম-লেনেওলা হয়ে। তখনো কিন্তু তার গোত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে তখন বাদশা হয়ে জন্মালে উজীরের হুকুমমত ওঠ-বস করে, উজীর হলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকে কোটালের দিকে—তার আদেশ কি। আবার উল্টোটাও হয় ঠিক ঐ রকমই। সে পাইক হয়ে জন্ম নিয়েও ফৌজদারকে হামেহাল বাতলে দেয় তার কর্তব্য কোন্ পথে।

দুঁদে জমিদারের জেল হলে সে তিন দিনের মধ্যেই চোর-ডাকাত নিয়ে কয়েদীখানায়

দল খাড়া করে, সপ্তাহের মধ্যেই জেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট তার কথায় হাঁচে, তার হুকুমে কাশে। মোকা পাওয়া মাত্রই উপরওয়ালাকে জানায়, 'অমুক কয়েদীর কন্ডাকট্‌ ভেরি ভেরি গুড; অ্যামনেস্টির সময় একে অনায়াসে খালাস দেওয়া যেতে পারে।' জমিদার বেরিয়ে গেলেই সে তখন খালাসী পায়।

গুল বাহাদুরের জন্ম হয়েছিল হুকুম দেবার জন্য। নামাবলী গায়ে দিয়েই আসুন আর রাইডিং বুট পরেই আসুন, ডোমের দল তাকে চট করে চিনে ফেলল। পিঠে থাবড়া খেয়েই ঘোড়া চিনতে পারে ভালো সোওয়ার কে?

তেপান্তরের মাঠের প্রত্যন্ত প্রদেশে, গ্রাম যেখানে শুরু, সেখানে এক পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিলেন গুল বাহাদুর। চালের ভিতর দিয়ে আসমান দেখা যায়। রাতে আকাশের তারা তাঁর দিকে মিটমিটিয়ে তাকায়, দিনে কাঠবেরালী। ঘরের কোণের গর্ত থেকে একটা সাপ মাথা তুলে তার দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে ছিল। গুল বাহাদুর বলেছিলেন, 'তশরীফ নিকালিয়ে', 'আত্মপ্রকাশ করতে আজ্ঞা হোক'। গদরের সময়ে তিনি নিমকহারামী দেখেছেন প্রচুর। সাপ তো তাঁর নুননিমক খায়নি যে তাঁকে কামড়াতে যাবে।

ডোমরা তাঁর ঘর মেরামত না করে দিলে গুল বাহাদুর কদাচ এই গর্ত বন্ধ করতেন না।

চিকনকালা গ্রামে আসার পরদিন গুল বাহাদুর গিয়েছিলেন গ্রামের ভিতর একটা রোঁদ মারতে—দিল্লীর চাঁদনীচৌকে যাওয়ার মত। এক জায়গায় দেখেন ভিড়। তিনি ভিতরে যাওয়ার উপক্রম করতেই ডোমরা তড়িঘড়ি পথ করে দিলে। একটা ছেলে গাছ থেকে পড়ে পা মচকিয়েছে। তার মা হাঁউমাউ করে আসমান ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে জমিনের উপর ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বরিশাল গান্‌ ফাটিয়ে বললেন, 'চোপ!'

মার কথা দূরে থাক সুরে ডোমিস্থান সে হুঙ্কারে কে কার ঘাড়ে পড়বে ঠিক নেই। এই যে খুদাতালার এত বড় দুনিয়া, তার আধেকখানাই তো ঐ তেপান্তরী মাঠ, সেখানেও যেন তারা পালাবার পথ পাচ্ছে না। হুঙ্কার তারা বিস্তর শুনেছে, নামাবলীও বিস্তর দেখেছে, কিন্তু নামাবলীর তলা থেকে এ রকম অট্টরব! নিরীহ্‌ গোপীযন্ত্র থেকে গদরের কামান ফাটে নাকি!

'চোপ্‌' বলে গুল বাহাদুরের হাত গোঁপের দিকে উঠেছিল। তখন মনে পড়ল তিনি গোঁপ কামিয়ে ফেলেছেন।

গুল বাহাদুর ছেলেটার পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

কে এক ওলন্দাজ না অন্য জাতের আর্টিসট্‌ বলেছেন, 'যারা এচিং কিংবা অন্য কোনও প্রিন্টিঙের কাজ করে তাদের হাতের তেলো হবে রাজকুমারীর মত কোমল, পেশী হবে কামারের মত কট্টর। প্লেট থেকে ফালতো রঙ তোলার সময় রাজকুমারীর মখমলী তেলো দিয়ে আলতো আলতো করে তুলবে রঙ, আর প্রিন্ট করার সময় দেবে কামারে পেশীর জোরে মোক্ষম দাবাওট্‌!

গুল বাহাদুর তাঁর মোলায়েম তেলো দিয়ে ছোঁড়াটার গোড়ালি বুলোতে বুলোতে হঠাৎ পাটা পাকড়ে ধরে কামারের পেশী দিয়ে দিলেন হ্যাঁচকা ঝাঁকুনি। ছেলেটা আঁতকে উঠে রব ছাড়লে, 'কক্‌!'

তিনি বললেন, 'ঠীক্ হৈ, বেটা, আরাম হো যায়েগা। ফির বন্দর জৈসা কুদেগা!'

এতক্ষণ ছেলেটার পা'টা উরু থেকে কাঠের মত শক্ত হয়ে উপর-নিচ করছিল না; এবারে গুল বাহাদুর সেটাকে কব্জা-ওলা বাক্সের ডালার মত উপর নিচু করলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তীন্ দন্ সোলাকে রাখবে।'

'রাখবে' শব্দটা বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর বাঙলা শেখার প্রচেষ্টার ফল। ডোমরা বুঝলে। 'সোলাকে'ও বুঝলে—'শুইয়ে', 'তীন' তো সোজা 'তিন' কিন্তু 'দন্'-টা কি চীজ্?

গুল বাহাদুরকে গদরের সময় জাত-বেজাতের সেপাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে হয়েছিল। তিনি তাই শিখে গিয়েছিলেন, বিদেশী কোনও শব্দ না বুঝতে পারলে তাকে শোনাতে হয় ঐ শব্দের সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় প্রতিশব্দ। যেমন 'ইনসান' বললে যদি না বোঝে তবে বলতে হবে 'আদমী', তারপর 'মানস' 'লোগ' 'বেটা' 'বাচ্চা' ইত্যাদি। একটা না একটা বুঝে যাবেই।

গুল বাহাদুর বললেন, 'তীন্ দন্, তীন্ শাম, তীন্ রোজ।'

এক ডোম চিৎকার করে বললে, 'বুঝেছি গো, বুঝেছি। তিন দিন, তেরাত্তির।'

জীবনের দীর্ঘতর অংশ চিকনকালা গ্রামে কাটিয়ে গুল বাহাদুর বীরভূমী ডোমী ভাষা শিখেছিলেন, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত তাঁর হিন্দুস্থানী হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। তাঁর 'দিন' শোনাতো 'দন', 'কিতাব' 'কতাব', 'হিন্দু' 'হন্দু', 'বিলকুল' 'বল্‌কল্' —বাগ্দীদের কানে।

অঙ্গারখার দামন্ (চাপকানের নিম্নাঞ্চল) ওঠাতে গিয়ে গোঁপে তা দিতে যাবার মত তাঁর খেয়াল হল, তিনি ধুতি উত্তরীয়ধারী!

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আঙ্গিনায় পলাশতলায় চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে। আসমানে দেখেছেন মীজান্ (দাঁড়িপাল্লা, মধ্যিখানে তিনটে তারা কাঁটার মত, দু'দিকে ভার—আমাদের কালপুরুষ)। তখড় খেয়াল গেল, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, সবই আগের থেকে উদয় হয়েছেন। মনে মনে বিড় বিড় করতে লাগলেন, মীজান, অকরব, কওস, সম্বুলা, জদী, দলো, হুৎ—!

দিল্লীতেও তিনি ছাতের উপরই থাকতেন বেশীর ভাগ।

ঠাকুরদা শখ করে বানিয়েছিলেন যমুনার উপর একখানি চক-মেলানো বাড়ি। বাড়িখানি ছোট কিন্তু উচ্চতায় সে বাড়ি ও-পাড়ার সব বাড়ি ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজকের দিনের ভাষায় একেই বলে বাড়ি হাঁকানো। বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুরদার চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে যায় নি। নাতিকে কোলে বসিয়ে বলতেন, ঐ দেখো, ঐ দেখো, ঐ দূরে, যমুনার ওপারে শাহদারা, গাজীয়াবাদ, নাতি দেখতো ওপারে শুকনো মাঠ খাঁ খাঁ করছে, আর তার মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়। কুৎবউদ্দীন আইবক থেকে আরম্ভ করে বাবুর, হুমায়ুন, রফীউদ্দৌলা মুহম্মদ শাহ সবাই গিয়েছেন ওপারে হরিণ শিকার করতে। বুড়ো বাদশাহের হরিণ-শিকারের বয়স গেছে—তিনি এখন লাল কেল্লার ছাতের উপর থেকে ওড়ান ঘুড়ি। শাহজাহদারা এখনও যান, তিনিও বহুবার গিয়েছেন।

বাহাদুর শাহ ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। অবশ্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জওক ও গালিবের তুলনায় তাঁর রচনা নিম্নাঙ্গের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এমন একটা সরল সহৃদয়তার গুঞ্জন থাকতো যেটা কারও কান এড়িয়ে যেত না। এবং তাঁর মধ্যে ছিল

এমন একটা সদগুণ যেটা জওক কিংবা গালিব কারোরই ছিল না। জওক গালিবের মধ্যে হামেশাই হত লড়াই। তৎসত্ত্বেও একে অন্যের প্রশংসা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। শোনা যায় শ্রেষ্ঠতর কবি গালিব নাকি এক মুশায়েরাতে (কবি সম্মেলনে) জওকের কোন কবিতার দু'ছত্র শুনে তাঁকে সর্বসমক্ষে বার বার কুর্নিশ করতে করতে বলেছিলেন, 'আপনার এ দুটি ছত্র আমাকে বকশিশ দিন; আমি তার বদলে আমার সমস্ত কাব্য আপনাকে দিয়ে দেবো।' কিন্তু এঁদের কাব্যের চিকন কাজ বাদশাহ বাহাদুর শাহ যতখানি অনুভব করতে পারতেন এঁরা একে অন্যের ততখানি পারতেন না। বাহাদুর শাহ ছিলেন সে যুগের—সে যুগের কেন তাবৎ উর্দুযুগের—সবসে বঢ়িয়া সমজদার।

বদর আমলের ইংরেজরা তাঁর কাব্যপ্রেমকে নিয়ে কত যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টামস্করা করেছে তার অন্ত নেই। তাদের রাজদরবারেও পোইট লরিয়েট নামক একটি প্রাণী পোষা হয়। তাদের কুরান-পুরাণে আছে, গ্রেট ন্যাশানাল অকেশনে তিনি টপ্পা-ফপ্পাভী লিখতে পারেন, ঐ সব অকেশনে দর্জী-ওস্তাদরা যে রকম রাজা রাণীর পাতলুন-ব্লুসার্জ বানায়, কিংবা বলতে পারেন হটেন্‌টট্‌দের রাজদরবারে পালপরবে যে রকম পোষা বাঁদর দু'চক্কর 'নাচভী লেচে ল্যায়।'

আসলে তাদের রাজারা দেবসেনাপতি, অসুরমর্দন, রুদ্রাত্মজ কার্তিকের বংশ-অবতংস। তারা তীব্রতম চিৎকারে আকাশ বাতাস সসাগরা পৃথিবী (যে রাজত্বে সূর্য অস্তমিত হন না) প্রকম্পিত করে শিকার করেন খ্যাকশ্যালী। দি লর্ড বি থ্যান্‌ক্‌ট—তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

তাবৎ ইংরেজই অগা, ও-কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে। কারণ পরবর্তী যুগের এক ইংরেজই দুঃখ করে বলেছেন, 'যে সব গাড়লরা গদরের সময় ভারতবর্ষ শাসন করতো তাদের সামনে শেলি কিংবা কীটস এলে যে সম্মান বা অসম্মান পেতেন কবি বাহাদুর শাহ সেই সব গবেটদের কাছে সেই মূল্যই পেয়েছেন। এবং সে সব সম্বন্ধীরা এই মামুলী খবরটুকুও জানতো না যে, তাদের দুই নম্বরের মাথার মণি ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন এবং ইংরেজ লেখক জোর গলায় বলেছেন সে কবিতা বাহাদুর শাহের কাব্যের তুলনায় অতিশয় নিকৃষ্ট এবং ওঁচা।

গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, গদর শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে নওরোজের রাতে যে মুশায়েরা বসেছিল তাতে সভাপতির আসন নিয়েছিলেন বাদশা সালামৎ বাহাদুর শাহ। সেই শেষ মুশায়েরা!

থাক্, থাক্ কি হবে ভেবে?

ভাববোই বা কেন? আমার অতীতকে আমি আঁকড়ে ধরে থাকবো না, আর ভবিষ্যৎকেও আমি আলিঙ্গন করতে ভয় পাবো না।

রাজত্ব বধূরে যেই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণধার অসি'পরে সে দেয় চুম্বন।

কি ভয় তাতে? আমার রথ চলবে এগিয়ে, পথের পতাকা পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁপবে অতীতের স্মরণে। তাই বলে কি আমার এগিয়ে চলা বন্ধ হবে?

বরঞ্চ বলবো নবজন্ম লাভ, অবশ্য আমি জাতিস্মর।

এই তো সেই আকাশ। এ-আকাশ আর দিল্লীর আকাশে তো কণামাত্র তফাৎ নেই।

এ-আকাশ তো আমার। হেসে মনে পড়লো ফিরদৌসীর একটি দোঁহা। সম্পত্তির ভাগাভাগির সময় একজন অন্য বখরাদারকে বললে,

আজ্ ফর্শ-ই-খানা তা ব্ লব্-ই বাম্ আজ আন্-ই-মন্
আজ্ বাম্-ই খানা তা ব্ সুর্‌ইয়া আজ্ আন্-ই-তো
মেঝের থেকে ছাতটুকু তাই নিলেম কুল্লে· আমি
ছাতের থেকে আকাশ তোমার সেইটে তো ভাই দামী।

প্রথম যখন দোহাঁটি পড়েছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল এ কি কাষ্ঠ-রসিকতা। আজ হৃদয়ঙ্গম হল, এ শ্লেষ নয়, বিদ্রূপ নয়—ছাত থেকে আকাশই মূল্যবান—সেখানেই মুক্তি, সেখানেই নির্বাণ।

ঐ তো আকাশের তারা। তাঁর পেয়ারা ঘোড়ার জিনের সামনের উঁচু দিকটা ঠিক এই রকমই পেতলের স্টাড দিয়ে তারার মত সাজান ছিল। এ তো কিছু অজানা সম্পদ নয়। দার্শনিক গজ্জালীও তাঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (কিমিয়া সাদৎ) গ্রন্থে বলেছেন, 'আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দেখো, আর আপন অন্তরের দিকে তাকাও—বুঝতে পারবে সৃষ্টির মাহাত্ম্য।'

দুই-ই অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে চলে। শুধু হৃদয়ের আইন বোঝা কঠিন। স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে ভাবি, স্বেচ্ছায় করছি—তারারাও হয়তো তাই ভাবে।

তরল অন্ধকার। এ অন্ধকার বুকের উপর দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে না। এর চেয়ে অনেক বেশী মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে পলাশের ডালগুলো। তারা আঁকাবাঁকা শাখা দিয়ে অন্ধকারের গায়ে এঁকেছে বিচিত্র আলিম্পন। গাছের শক্ত ডাল, অশরীরী অন্ধকার, দূরদূরান্তের তারার দেয়ালি—সবাই একসঙ্গে মিলে গিয়ে পেলব মধুর স্পর্শ দিয়ে শান্তি এনে দিচ্ছে গুল বাহাদুরের দগ্ধ ভালে। এইটুকু তাঁর চোখের মণিতে ধরা দিয়েছে সে সন্ধ্যার অনন্ত আকাশ থেকে পলাশের ডগাটুকু পর্যন্ত। যমুনার পারে প্রাসাদের উপরে এরা তাঁকে যেমন করে সোহাগ জানাতো ঠিক তেমনি তারা এসে ধরা দিল ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের উপর শায়িত ফকীর গুল বাহাদুরের কাছে।

কৃতজ্ঞ গুল বাহাদুর তাঁর দীর্ঘ দুই হাত তাদের দীর্ঘতম প্রসারণে উচ্চ বিস্তার করে আসমানের দিকে তুলে মোনাজাৎ করলেন,

তোমার আমার মাঝখানে, বিভু, নাই কোনও বাধা আর
তোমার আশিষ বাহিয়া আনিল তরল অন্ধকার।

॥ তিন ॥

আরব্য রজনীর গল্পে আছে, কোথায় যেন দমস্কস্ না বাগদাদ শহরে, এক ঝুড়ি আণ্ডা সামনে নিয়ে বসে অন্-নশ্ শার স্বপ্ন দেখছিল। হুবহু স্বপ্ন না, দিবা-স্বপ্ন। ঐ ডিমগুলোই তার সাকুল্য সম্পত্তি। এক ডিম বিক্রি করে মুনাফা দিয়ে সে কিনবে আরও ডিম। তারই লাভে পুষবে মুরগী। তারই লাভে সে যাবে হিন্দুস্থান, সদাগরী করতে। তারই লাভে সে হয়ে যাবে শেষটায় শহরের সবচেয়ে মাতব্বর আমীর। তখন প্রধানমন্ত্রী—ওজীর-ই-

আলু—যেচেসেধে তাঁর মেয়েকে দেবেন তার সঙ্গে বিয়ে! তারপর আরও অনেক কিছু হবে। হয়ে হয়ে একদিন এই এমনি খামোখা তার রাগ হয়েছে বেগম সায়েবার উপরে। তিনি অনেক সাধাসাধি করছেন তার মান ভাঙাবার জন্য। অন্‌-নশ্‌ শার মানিনী শ্রীরাধার মত অচল অটল। বরঞ্চ হঠাৎ আরও বেশী ক্ষেপে গিয়ে মারলেন বেগম সায়েবাকে এক লাথ। হায়রে, হায়! এতক্ষণ ছিল শুদ্ধমাত্র খেয়ালের পোলাও খাওয়া,—দিবা-স্বপ্ন—এখন অন্‌-নশ্‌ শার মেরে দিয়েছে সত্যিকার লাথি। সেটা পড়ল সামনে-রাখা ডিমের ঝুড়ির উপর। কুল্লে আণ্ডা ভেঙে ঠাণ্ডা।

এ-গল্প কখনও ফ্রক্ পরে ইংলন্ডে কখনও দাড়ি রেখে আফগানিস্থানে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। এবং সর্বযুগের সর্বদেশের প্র্যাকটিকেল পাণ্ডারা বেচারী অন্‌-নশ্‌ শারকে নিয়ে কতই না ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। সেও লজ্জায় রা-টি কাড়ে না।

কিন্তু এ কথাটা কেউ ভেবে দেখে না যে এ-সংসারে অহরহই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে যাঁরা বৃহত্তম ভুবনে চলে যেতে জানে তাঁদের সবাই অন্‌-নশ্‌ শার—ঐ শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। যারা আপন নাকের ডগার বাইরে তাকাতে জানে না তারাই দৈনন্দিন দৈন্যে শেষদিন পর্যন্ত নাকানি-চুবোনি খায়। দিবা-স্বপ্ন আলবাৎ দেখতে হয়—কিন্তু শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। গুল বাহাদুর ঠেকে শিখেছেন। গদরের আণ্ডা বিক্রী হওয়ার পূর্বেই তাঁরা স্বাধীনতার উজীরকুমারীকে লাথি মেরে বসিয়েছিলেন। তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন। এখন আর কুঁড়েঘরে বসে বালাখানা-রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন নয়, গদরের খেয়ালী পোলাও নয়। এখন দেখতে হবে নাকের ডগা ছাড়িয়ে ত্রিশ গজ দূরের স্বপ্ন মাত্র—সাংসারিক সচ্ছলতার স্বপ্ন।

তার প্রথম আণ্ডা এল অযাচিত, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

ডোমেরা এসে সভয়ে তাঁকে নিবেদন জানালে, শিবু মোড়ল যায় যায়। মরার আগে বাবাজীর চরণ-ধূলি চায়।

গুল বাহাদুর পড়লেন বিপদে। ওপারে যাওয়ার সময় মুসলমান সে সব তওবা-তিল্লা করে থাকে—অনেক হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা জৈনদের পর্যুসনের মত—সেগুলো তিনি কোনওমতে সামলে নিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের তিনি জানেনই বা কতটুকু? তাঁর আমলে দিল্লীর হিন্দুরা তো শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতি-সভ্যতায় পুরো-পাক্কা মুসলমান বনে গিয়েছে। তারা পরে চোস্‌ৎ চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, মাথায় দুকল্লী কিস্তি টুপী আর মশাইরায় হাঁটু গেড়ে বসে বয়েৎ আওড়ায়—'মক্কা-মদীনার মালিক, ইয়া আল্লা, আমাকে ডেকে নাও নবীর নূর হজরত মুহম্মদের পদপ্রান্তে।'

বরন্দাবন্ (বৃন্দাবন)-কে কন্‌জ্ গলিয়াঁমে (কুঞ্জ গলিতে) কিসন্‌জী (শ্রীকৃষ্ণ) কভি কভি বান্‌সরী (বাঁশরী) বজাওৎ (বাজান), এই তো হিন্দুধর্ম বাবদে তাঁর এলেম! ঐটুকু জ্ঞানের ন্যাজ তিনি শিবু মোড়লের হাতে তুলে দিয়ে তাকে নির্ভয়ে বৈতরণীতে নামতে ভরসা দেবেন কি প্রকারে?

ধরা পড়ার ভয় আছে, অথচ না গিয়েও উপায় নেই। গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'চুলোয় যাক্ গে। এ রকম ভয়ে ভয়ে কাটাবো আর কতদিন!' মৃত্যু যে অহরহ মানুষের চুলের ঝুঁটি পাকড়ে ধরে আছে সেটা স্মরণ করে কটা লোক? কিংবা বলা যায়, গুল বাহাদুর ভাবলেন, গায়ে গু মেখে বসে থাকলেই কি আর যম ছেড়ে দেবে?

শিবু মোড়লের ইঙ্গিতে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল—মায় তার ছ'বচ্ছরের ছেলেটাও। অবাক ইশারায় গুল বাহাদুরকে তক্তপোষের একদম কাছে ডেকে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'আমার ছেলেটাকে তুমি মানুষ করো। সব তোমাকেই দিলুম।'

গুল বাহাদুর ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। ছেলেটার ভার কাঁধে তুলতে তাঁর কণামাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে আসলে মুসলমান।

মোড়ল বললে, 'আমার অনেক শত্রু; ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।'

দুশ্চিন্তার ভিতরেও গুল বাহাদুরের মনে পড়লো, হজরৎ মহম্মদের পূর্বেও আরবরা ছিল বর্বর। তারাও নির্ভয়ে অনাথকে মেরে ফেলে তার টাকাকড়ি উট তাম্বু কেড়ে নিত। তাই হজরতের নবধর্ম স্থাপনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল অনাথের রক্ষা। মনে পড়ল, স্বয়ং আল্লা হজরতকে 'মধ্যদিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই, ওরে' বলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনিও অনাথরূপেই জন্ম নিয়েছিলেন,—

'অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা আছিল যা সব মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি, তিনিই সুপথ দেখিয়ে দেছেন তোরে
সে-কৃপার কথা স্মরণ রাখিস্। অসহায় শিশু, ওরে,
দলিস্‌নে কভু। ভিখারী-আতুর বিমুখ যেন না হয়
তাঁর করুণার বারতা যেন রে ঘোষিস্ জগৎময়।'

এ তো আল্লার হুকুম, রসুলের আদেশ। মানা-না-মানার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তোমার ঘাড় মানবে।

কিন্তু তিনি যে মুসলমান। ডোম হোক আর মেথরই হোক, মোড়লের ছাবালের মুখে তিনি জল তুলে দেবেন কি প্রকারে? গুল বাহাদুর চুপ।

শিবু তার লাল ঘোলাটে চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকালে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'গোসাঁই, তুমি গোসাঁই নও, সে-কথা আমি জানি। তুমি কি, তাও আমি জানি। কিন্তু আর কেউ জানে না। জানার দরকারও নেই।'

'কি করে জানলে?' এ প্রশ্ন গুল বাহাদুর শুধালেন না। তিনি পল্টনের লোক; বললেন, 'আমি মুসলমান, জানো?'

শিবুর শুকনো মুখ খুশীতে তামাটে হয়ে উঠলো। গুল বাহাদুরের হাতখানা আপন হাড্ডিসার দু'হাতে তুলে নিয়ে বললে, 'বাঁচালে, গোসাঁই, তরালে আমাকে।' তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'মুসলমানেরই এক দর্গায় মানত করে মা পেয়েছিল আমাকে। আমি পেয়েছি আনন্দীকে। পীর সৈয়দ মুরতুজার ভৈরবীর নাম ছিল আনন্দী।'

মুসলমান পীরের দরগায় যে হিন্দু বন্ধ্যা সন্তানের আশায় যায়, এ দৃশ্য গুল বাহাদুর বহুবার দেখেছেন দিল্লীতে নিজাম উদ্‌দীন আউলিয়ার দরগায় কিন্তু পীরের আবার ভৈরবী হয় কি করে, আর ভৈরবীই বা কি চীজ, আনন্দী শব্দটাও হিন্দু হিন্দু শোনায়, এ সব গুল বাহাদুর কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে জানে মুসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে এসে কি রূপ নিয়েছে।

'বাচ্চাকা ভালা বোলনা-চোলনা, বহুড়ীকা ভালা চুপ'—বাচ্চার ভালো বক্‌বকানো, কনের ভালো চুপ—ভালো সেপাইও বহুড়ীর মত চুপ করে শুনে যায়, গুল বাহাদুর চুপ

করে শুনে যেতে লাগলেন।

মোড়লের দম ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। তাই আশকথা-পাশকথা সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু তার ইচ্ছাগুলো বলে যাচ্ছিল, বিষয়-আশয় বোঝবার বয়স হলেই তাকে মামার বাড়ি বিষ্টুপুরে পাঠিয়ে দিয়ো। সেখানে তার জমিজমা এখানকার চেয়ে ঢের বেশী।'

গুল বাহাদুর পুরনো কথায় ফিরে গিয়ে শুধালেন, 'তোমার ছেলে আমার সঙ্গে থাকলে মুসলমান হয়ে যাবে না?'

মোড়ল বললে, 'না। আমরা জাতে ডোম। মুসলমানের হাতে খেলেও আমাদের জাত যায় না, আমরা মুসলমানও হই নে। থাক্ অতশত কথা। তুমি নিজেই জেনে যাবে। শোনো, আর যা করতে হয় করো, ছেলেটাকে কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়ো না, ওকে ভদ্রলোক বানিয়ো না।'

'সে কি!'

'না, ভদ্রলোক বানিয়ো না। আর শোনো, জলের কলসীর তলায় মাটির নীচে কিছু টাকা আছে। তোমাকে দিলুম।'

গুল বাহাদুরের আবার মনে পড়ল, হজরত তাঁর যৌবন আরম্ভ করেছিলেন, এক বিধবার ব্যবসায়ে কর্মচারীরূপে। বললেন, 'টাকা ব্যবসাতে খাটাবো। তোমার ছেলে পাবে মুনাফার আট আনা।'

মোড়ল বললে, 'যা খুশী করো, কিন্তু লগ্নীর ব্যবসা করো না।'

গুল বাহাদুরের মুখ লাল হয়ে উঠল। ভদ্র মুসলমান সুদের ব্যবসা করে না।

মোড়ল বললে, 'আর শোনো, খুশ বিরামপুরের ঘোষালদের মেজোবাবুর সঙ্গে আলাপ করো। তোমারই মত। কিন্তু সাবধানে। আর শোনো, তোমারই মত আরেকজন আশ্রয় নিয়েছে বর্ধমানের কাছে, দামোদরের ওপারে—'

এবারে গুল বাহাদুর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তবু উত্তেজনা চেপে রেখেই তাড়াতাড়ি শুধালেন, 'কোন্ গ্রামে?'

মোড়ল তখন হঠাৎ চলে গিয়েছে ওপারে, যেখানে খুব সম্ভব গ্রামও নেই শহরও নেই।

গুল বাহাদুর দু'হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মোড়লের চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে আবৃত্তি করলেন,

'ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

আল্লার কাছ থেকে এসেছি, আর তাঁর কাছে ফিরে যাব।'

কাফেরের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে কট্টর-মোল্লারা উল্লাসভরে এ-মন্ত্র উচ্চারণ না করে বলে ওঠে ভিন্ন মন্ত্র—

ফী নারি জাহান্নামা।

একমাত্র ইংরেজের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে গুল বাহাদুর মন্ত্রটি একশ'বার আবৃত্তি করতেন। আল্লার একশ' নাম—মানুষ তার নিরনব্বুই জানে—সেই নিরনব্বুই নামের উদ্দেশ্যে নিরানব্বুই বার আর শয়তানের উদ্দেশ্যে একবার!

দাহ-কর্ম শ্রাদ্ধ, তাও আবার ডোমের, এসব কোন-কিছুই গুল বাহাদুর জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখলেন। তবে তাঁর গম্ভীর আঁট-

সাট মূর্তি আনন্দীর হাত ধরে না দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো ঝগড়াঝাঁটি হতে পারতো। মোড়লের মরে যাওয়ার পর বাড়ির সামনে যে ভিড় জমেছিল তার দিকে একবার তাকিয়েই তিনি বুঝতেই পারলেন, শাহ-ইন-শাহ্ বাহাদুর শা'র দরবারে যদি দৈবপাকে চিকনকালা গ্রামের মাতব্বরদের কুর্নিশ জানাবার অনুমতি লাভ হত তবে তাতে দুই নম্বর হত কে? পয়লা নম্বর তো চলে গিয়েছেন, দুই নম্বর হতেন ঝিঙে সর্দার। ভিড়ের মধ্যে ঝিঙের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ভারী গলায় হুকুম দিলেন, 'ইধর আও।'

ঝিঙে ভয়ে ভয়ে, লোকলজ্জায় কিছুটা বুক ফুলিয়ে, এগিয়ে এল—ভিড় রাস্তা করে দিলে। ঝিঙের সঙ্গে শিবুর সদ্ভাব ছিল না।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব-কিছু চালাও।'

ঝিঙে গলে গেল। তার মনে কোনও সন্দ ছিল না, শিবু গত হলেই সে হবে গাঁয়ের মোড়ল। মধ্যিখানে বাদ সাধলে এই লক্ষ্মীছাড়া বাবাজী। শিবু নিশ্চয়ই মরার সময় এ-ব্যাটাকে বিষিয়ে গেছে। তা হলে এটা হল কি করে? থাক্ এখন, পরে জানা যাবে।

ঝিঙে ডবল উৎসাহে সব-কিছু সামলালে। বেশীর ভাগ ব্যবস্থা শিবু মরার আগেই করে গিয়েছিল।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে ঝিঙে সর্দার শিবু মোড়লের দাওয়ায় গুল বাহাদুরের কাছে এসে বসলো। গাঁয়ের দু'চারজন তাদের কথাবার্তা শোনবার জন্য এগিয়ে এলে ঝিঙে দিলে তাদের জোর ধমক। তারা গুল বাহাদুরের দিকে আপিল-নয়নে তাকালে কিন্তু তাঁর কোনও ভাব-পরিবর্তন না দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

তখন তিনি অতি শান্তকণ্ঠে, ধীরে ধীরে বললেন, 'মোড়ল, ধমক না দিয়েই যেখানে কাজ চলে সেখানে ধমকের কি দরকার! কিন্তু সে তুমি বোঝো। আমি বলবার কে? আমি তো এদের চিনি নে। এদের কি করে সামলাতে হয় তার খবর রাখো তুমি।'

'মোড়ল' সম্বোধন ঝিঙে একেবারে পানি হয়ে গেল—জল তো হয়ে গিয়েছিল আগেই। হাত জোড় করে বললে, 'দেবতা, অপরাধ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাকতে বললে না কেন?'

গুল বাহাদুর প্রথমেই লক্ষ্য করলেন ঝিঙে তোতলা। তোতলাকে মোড়ল বানানো কি ঠিক? তখন মনে পড়লো; একাধিক পেগম্বরও ছিলেন তোতলা।

ঝিঙের কথার উত্তরে বললেন, 'তুমি মুরুব্বী, একটা হুকুম দিয়েছ। আমি উল্টো কথা বললে তোমার মুখ থাকতো কি?'

ঝিঙে কিন্তু শিবুর মতো বিচক্ষণ লোক না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধালে, 'শিবু তোমাকে বলে যায়নি আমাকে মোড়ল না করতে?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'না।'

শিবুর মত বিচক্ষণ নয় ঝিঙে, কিন্তু সে শিবুর চেয়ে অনেক বেশী ঘড়েল। ভাবখানা করলে, 'ওঃ! শিবু যদি বলতো তবে তুমি আমায় ডাকতে না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'শোনো, সদ্দার, সব-কথা বলে যাবার ফুর্সৎ পায়নি। পেলেও যে তোমার কথা বলতো, তাও তো জানি নে। আর ওর বলাতে না-বলাতে কিছু আসে যায় না। সে গেছে, এখন গাঁ চালাবো আমরা। ওর ইচ্ছে বড়, না গাঁ-চালানো বড়? ও যদি বলে যেত, আনন্দী গাঁ চালাবে, তাহলে তোমরা কি সেটা মানতে?'

গুল বাহাদুরের মনে পড়লো হজরত মুহম্মদও ইহলোক ত্যাগ করার সময় মুসলমাননের জন্য কোন খলীফা নিয়োগ করে যাননি। গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, তবে কি অনুন্নত সম্প্রদায়ে এই ব্যবস্থাই বেশী কার্যকরী? তবে কি বংশগত রাজ্যাধিকার পরবর্তী যুগের সৃষ্টি? তারপর মনে পড়লো, ঐতিহাসিক ইবনে খলদূন তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে এই নিয়ে কি যেন এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভাবলেন, দেখতে হবে। তারপর মনে পড়লো, এখানে তো বই-পত্র কিছুই নেই। যাক্ গে এ-সব কথা।

ঝিঙেকে বললেন, 'কানাবুড়ী বাতাসীকে বলো সে এ-ভিটেয় থাকবে।'

ঝিঙে অবাক। বাতাসীর মত অথর্ব-অচল ঝগড়াটে সাড়ে যোল আনা অন্ধ এ তল্লাটে দুটি নেই। তার গলাবাজির চোটে দুঁদে মোড়ল শিবুও তার তল্লাটে মাড়াতো না।

ঝিঙে গুল বাহাদুরের মতলব আদপেই বুঝতে পারেনি। তিনি জানতেন, শিবুর যে কিছু লুকানো টাকা আছে সেটা সকলের অজানা নাও হতে পারে। রাত্রে ভিটে খোঁড়ার জন্য চোর আসতে পারে। বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে না আসতে বুড়ী চিৎকার করে করে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক জড়ো করে ফেলবে। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি চক্ষুষ্মানের চেয়ে বেশী। দিল্লীর জামি মসজিদের দেউড়িতে এক অন্ধ শুধু গলা শুনে হাজার লোকের জুতো সামলায়। মাদ্রাসায় ছোঁড়াদের কেউ মজা দেখবার জন্য অন্যের গলা নকল করলে অন্ধ দু'জোড়া জুতো বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার জোড়া, আর এই নাও যার নকল করেছিলে।' লোকে বলতো, আগ্রাতে শুকনো পাতা ঝরে পড়লে এ অন্ধ দিল্লীর চাঁদনি চৌকে বসে শুনতে পায়। বাতাসী অতখানি কেরদানী হয়তো দেখাতে পারবে না, কিন্তু দুটি বেগুন বাঁচাবার জন্য যে বেটি সমস্ত রাত দাওয়ায় বসে কাটায় তার চেয়ে ভালো পাহারাওলা পাওয়া যাবে কোথায়? এখন কয়েক রাত তো পাড়া-প্রতিবেশীরা কান খাড়া রেখে ঘুমুবে—শিবুর ভিটেতে খোঁড়াখুঁড়ির শব্দ হচ্ছে কি না শোনবার জন্যে। কয়েকটা রাত যাক, তারপর তিনি সুবিধে-মত তার ব্যবস্থা করবেন।

কিছুক্ষণের ভিতরেই শোনা গেল পাড়ার শেষপ্রান্ত থেকে বাতাসীর চিৎকার। চিকনকালা গ্রামটাকে সে বেতারকেন্দ্র বানিয়ে বিশ্বভুবনকে জানাচ্ছে, শিবু গেছে বেশ হয়েছে, আগে গেলেও কেউ মানা করতো না, বাতাসী তো নয়ই, কিন্তু এ কি গেরো, সে কেন সামলাতে যাবে শিবুর গোয়াল খামার, ঐ দিকধিড়িঙে মিনসে বাবাজীটা আছে কি করতে, তাকেই তো শিবু ঘটিবাটি চুলোহাড়ি সব-কিছু দিয়ে দিয়েছে, মরে যাই, আর লোক পেল না, কোথাকর হাড়হাভাতে শতেক খোয়ারী—আরও কত কি!

গলার শব্দ কিন্তু এগিয়ে আসছে শিবুর বাড়ির দিকেই।

মোগল শাসনেও চার্জ দেওয়া-নেওয়া নামক মস্করাটা চলতো। গুল বাহাদুর সে-মস্করাটা বাতাসীর সঙ্গে করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর ঘাড়েও তো মাথা মাত্র একটা। সেটা তো চায় ইংরেজ। বুড়ীকে দিয়ে চলবে কেন?

আনন্দীকে হাতে ধরে নিয়ে বললেন, 'চলো।'

যেতে যেতে আনন্দী বললে, 'দাদু, বাবা আমাকে বলেছিল, বাতাসী পিসিকে বাড়ি নিয়ে আসতে। সে তো বলছে, আসবে না।'

গুল বাহাদুর ভারি খুশি হলেন। প্রথমত শিবু যে আহাম্মুখ ছিল না, তার শেষ প্রমাণও পাওয়া গেল বলে এবং তার চেয়েও বড় কথা, ছ'বছরের আনন্দীর বুঝ-সমঝ আছে

দেখে। বাপকা ব্যাটা না হলেও তার ঘোড়া তো নিশ্চয়ই। জোর গলায় হেসে বললেন, ‘কুছ পরোয়া নহী, দাদু, ও বেটি সবকুছ সম্‌হালেগী’, তারপর বললেন, ‘সম্‌হ লেগা।’ মনে মনে বললেন, ‘দুচ্ছাই ভাষা, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গে ফারাক নেই।’ তারপর বললেন, ‘সেই তো ভালো। এরা তো আর দিল্লী দরবারে মুশায়েরা করতে যাবে না যে ভাষাতে পঁয়ষট্টি রকমের বয়নাক্কার প্রয়োজন। ঐ করেই তো আমাদের সব গেল।’ তারপর মনে পড়লো, কই, তাই বা কেন? মাহমুদ বাদশা তো তাঁর সভাপণ্ডিত ফিরদৌসীর সঙ্গে বয়েৎ-বাজী করতেন। তাঁর রাজত্ব তো যায়নি। বাহাদুর শা গালিবের সঙ্গে করলেই বা কি দোষ! ফার্সীর কথাতে তখন মনে পড়লো, সে ভাষাতেও তো পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের তফাৎ নেই। বিরক্ত হয়ে তখন বললেন, ‘কী আশ্চর্য! চলছি ডোম বস্তির মধ্যিখান দিয়ে, আর স্বপ্ন দেখছি গজনীর। অন্-নশ্ শারও এর চেয়ে ভালো। আমাকে এখন দেখতে হবে, ছেলেটার পেটে ক্রিমি।’

গুল বাহাদুর পড়েছেন এ বাবদে বিপদে। ক্রিমির নুস্‌খা (প্রেসক্রিপ্‌সন) তিনি দু’মিনিটেই লিখে দিতে পারেন। কিন্তু সেটা লিখতে পারেন উর্দু কিংবা ফার্সীতে। এবং তার জন্য যেতে হবে ইউনানী দাওয়াখানায়, হেকিমের কাছে। এ তল্লাটে তো এসব জিনিস থাকার কথা নয়। আর বোষ্টম বাবাজী লিখবেন, ফার্সী নুস্‌খা! যদিও গুল বাহাদুর জানতেন, বৃন্দাবন অঞ্চলের বাবাজীরা ফার্সীতে ইউনানী নুস্‌খা বিলক্ষণ লিখতে জানেন।

গুল বাহাদুরের ভুল নয়। চৈতন্যদেব ইসলামী শাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একাধিকবার ইসলামী শাস্ত্র দিয়েই মোল্লাদের কাছে প্রমাণ করেন যে তাঁর প্রচলিত ধর্ম ইসলামের মৌলিক সিদ্ধান্তের সম্মতি পায়।

আনন্দী বললে, ‘দাদু, ঐ দেখো হলদে পলাশ।’

ততক্ষণে তাঁরা গ্রামের বাইরে চলে এসেছেন। আর একটু দূরেই গুল বাহাদুরের ‘রাজপ্রাসাদ’।

দূরদূরান্তে চলে গেছে লাল খোয়াই। বাঁ দিকের উঁচু ডাঙা ভেঙে ভেঙে চলেছে খোয়াইয়ের অগ্রগতি। গুল বাহাদুরের আপন দেশ দোয়াবে প্রকৃতির হাত থেকে মানুষ অহরহ অনুর্বর জমি সওগাত পাচ্ছে চাষের জন্য, আর এখানে খোয়াইয়ের খাঁই আধা-বাঁজা আধা-ফসলের জমির উপর। খোয়াইটা চলে গিয়েছে কতদূরে প্রকাণ্ড একটা লাল সাপের মত এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে ডাঙার ফালিটুকরো এসে যেন সাপের খানিকটা গতিরোধ করছে। ফের যেন অজগরের গ্রাসটা আরো দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুও যেন এ খোয়াই শুষে নিতে জানে। খোয়াইয়ের শুরু থেকে সূর্যাস্তের মোকাম পর্যন্ত গাছপালার কোনও বালাই নেই। পাতার আড়াল থেকে বিকেলের আলোটুকু এখানে এসে কোনও কালো কেশে পড়ে না। সাঁওতালিনীরাও সন্ধ্যের পরে ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।

কিন্তু মাধুর্য আছে—সে মাধুর্য রুদ্রের।

কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) যে বর্ণনা কুরান শরীফে আছে সেটিও রুদ্রমধুর, আশ্চর্য! আল্লাতালা মানুষের মনে ভয় জাগাবার জন্য কিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন কুরানে, কিন্তু তার প্রকাশ দিয়েছেন কাব্যরসের মারফতে। কেন? সোজা কথা। ঐতিহাসিক যখন লড়াইয়ের খবর লিপিবদ্ধ করে কত হাজার লোক মরলো তার বর্ণনা দেয়, তাতে তো

মানুষ ভয় পায় না। কারণ তাতে কাব্যরস নেই। ভয় অনুভূতিবিশেষ। সেটা জাগাতে হলে কাব্যরসের প্রয়োজন। ইতিহাসের শুকনো ফিরিস্তি থেকে মন করে জ্ঞান সঞ্চয়, তাতে ভয় সঞ্চার হয় না।

এই রুদ্র-রসই এখন গুল বাহাদুরের জন্য প্রশস্ত।

ভাগ্যিস তাঁকে পুব-বাংলার ঘনশ্যাম, কচিসবুজ, শিউলিভরা, শিশিরভেজা, পানাঢাকা বেতেসাজা পুব-বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়নি!

গাঁয়ের শেষ গাছ পেরিয়ে এসে তাঁর খেয়াল গেল আনন্দী যেন কি একটা বলেছে। শুধালেন, 'কি বললে, দাদু?'

পিছনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'ঐ যে, হলদে পলাশ!'

পলাশ হলদে হতে পারে, বেগুনী হতে পারে, সবুজও হতে পারে, এই হল গুল বাহাদুরের ধারণা। কিন্তু তাঁর মনে তবু ধোঁকা লাগলো। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দু'চারটে ফুলগাছ তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু আনন্দী কিছু বলে নি। এখনই বা বলছে কেন? এ-গাছটার তেমন তো কিছু জৌলুসও নয়। মাত্র গোটা পাঁচ গুচ্ছে ফুল ফুটেছে। গাছটাও বেঁটে। যেন থাবড়া মেরে চেপটে দেওয়া। এর তুলনায় গাঁয়ের ভিতরকার শিমুলে তো ডালে ডালে ফুল ছিল অনেক বেশী। বললেন, 'পলাশ—উয়ো তো ফুল। হলদে—পিলা। তো ক্যা হল?'

আনন্দী কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে বললো, 'সব পলাশ লাল, এটা হলদে।' বলে সে আঙুল দিয়ে গাঁয়ের ভিতরকার উঁচু উঁচু গাছের লাল পলাশ দেখিয়ে দিলে।

এতক্ষণে বীরভূমের বৃক্ষ-বৃত্তান্ত বাবদে আকাট আগা গুল বাহাদুরের খেয়াল হল, 'তাই তো, আর সব পলাশ লাল, এটা হলদে।'

উদ্ভিদতত্ত্বে এই তাঁর প্রথম পাঠ। আনন্দীর কাছে। বললেন, 'চলো দুটি ফুল পেড়েই নিই।'

ছ'বছরের ছেলে আনন্দীর উল্লাসের অন্ত নেই। বাপ যদিও বলেছিল, 'বাবাজীকে ডরাসনি' তবু তার মন থেকে ওঁর সম্বন্ধে ভয় কাটেনি। একে তো গম্ভীর লোক, তার উপর ঐ যে দুশমনের মত বদ্‌মেজাজী ঝিঙেও যার পায়ের কাছে ভয়ে কাঁচুমাচু—তার সঙ্গে সাহস করে কথা কওয়া যায় কি প্রকারে। তবে তার শিশুবুদ্ধি শিশুযুক্তিতে একটা ভরসা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল। সেটা কি? বাবাজীও বাতাসী বুড়িকে ডরায়। দ্বিতীয় ভরসা পেল এখন। যখন বললে, 'চলো দুটো ফুল পাড়ি।' তার বাপ তাকে ভালোবাসত। তার সম্বন্ধে আনন্দীর কোনও ভয় ছিল না, কিন্তু তাকেও ফুল কুড়োতে বললে ঘাড় বাঁকিয়ে বলতো, 'যা যা, খেলা করগে যা।'

ফুল পাড়তে পাড়তে গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, 'গুল' অর্থাৎ 'ফুল' আর প্রাচীন ফার্সীতে 'অগ্' অর্থ 'জল'। 'গোলাপী' আর 'জোলাব' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' আর 'প' নেই বলে আরবীতে 'গোলাপ' লেখা হয় 'জোলাব'। বিরেচক অর্থে। ছেলেটাকে তাই খাওয়ালেই হবে। কিন্তু এই অজ জায়গায় গোলাপ পাওয়া যাবে কি?

আনন্দীকে শুধালে বহুদূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝালে ওখানে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-ভাবে ইশারা করলে তাতে সে দূরের গ্রাম হতে পারে, বেহেশ্‌তের গুল-ই-স্তান, ফুলের বাগানও হতে পারে।

॥ চার ॥

এতক্ষণে গুল বাহাদুর আসলে ভাবনা নিয়ে চিন্তা করার ফুর্সৎ পেলেন। ছেলেটা নিশ্চিন্ত চেহারায় ঘুমুচ্ছে দেখে তিনি ফিরে গেলেন সকালবেলাকার ঠেলে-রাখা সমস্যাগুলোতে।

শিবু মোড়ল বুঝতে পেরেছে তিনি বৈরাগী নন, তিনি যে মুসলমান সেটা জানতো না। কিন্তু আর কেউ বুঝতে পেরেছে কি? আর ঐ ঘোষালই বা কে? সেই বর্ধমানের ওপারের লোকটাই বা ওখানে এল কোথা থেকে? তাকেই বা খুঁজে পাওয়া যায় কি করে?

অনেক চিন্তা করেও তিনি কোনও হদিস পেলেন না। এমন কি ঘোষাল পদবী যে ডোমের হয় না, ওটা ব্রাহ্মণের পদবী এবং অতএব কাঁছে-পিঠে ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, অর্থাৎ শিক্ষা-সভ্যতার পত্তনও আছে, এইটুকু পর্যন্ত গুল বাহাদুর বিচার করে ধরতে পারলেন না।

তবে শিবু যখন বলেছে সাবধান, তখন তার অর্থ তাড়াহুড়ো করলে বিপদের সম্ভাবনা। আর এখন তো বর্ধমান যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না। এ দেশের আচার-ব্যবহার এ ক'মাসে শিখেছেন কতটুকুই বা? ডোমেদের ভাল করে চিনে নিতে পারলে পরে ডোম সেজে চলাফেরা করা যাবে। তার আগে শিখতে হবে ওদের ভাষা। এযাবৎ তাতেও তো খুব বেশী উন্নতি হয়নি।

আর এই ডোমেদের নিয়ে তিনি করবেন নূতন গদর! দেশ কী, রাজা কারে কয়, ইংরেজ যে শয়তান ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণী নয়—এ-সব খবর তো এরা কিছুই রাখে না। পেটের ধান্দায় এদের কাটে সুবো-শাম। খুব যে তারা শান্ত এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু জীবন-মরণ পণ করে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়ে যাবার মত ধাতু কি এদের শরীরে আছে?

কিন্তু থাকবেই না কেন? গজনীর মাহমুদ, ঘোরের মুহম্মদের আমলে গ্রামাঞ্চলের পাঠানরা কি এদের চেয়ে বেশী সঙ্গীন জঙ্গীলাট ছিল? কিংবা বাবুদের আমলে ফরগনা বদখশানের আশপাশের গামড়িয়ারা? কিংবা হাতের কাছের মারাঠারা? একবার কি একটা সামান্য গুজোব রটাতে এই দিল্লীবিজয়ী বীরের দল দিল্লী থেকে যেন পালাবার পথ পায়নি। ঐতিহাসিক খাফী খান ব্যঙ্গ করে লিখেছেন তখন দিল্লীর এক বুড়ী নাকি একাই তিনজন মারাঠাকে নিরস্ত্র করেছিল। ঐতিহাসিক খুশ-হাল চন্দ্ও বলেছেন, তারা নাকি তখন হাতিয়ার তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছোট বাচ্চার মত 'মাগো, ওমা' বলে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু এসব কাহিনীর বিশ্বাস করা যায় কতটুকু? দিল্লী একদিন এদের হাতে খেয়েছিল মার। সেই বেইজ্জতী ঢাকবার জন্য পরবর্তী যুগে হয়তো তিলকে তাল বানিয়েছে।

তা বানাক আর নাই বানাক, এরাই তো একদিন সাহস করে আবদালীর মুকাবেলা করেছিল। অবশ্য লড়াইয়ের আগে রাত্রে মারাঠা সেনাপতি ভাবসাহেব আপন রোজ-নামচায় লিখেছিলেন, 'আমাদের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে। কাল অবশ্য মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। আমরা মারাঠারা তো কখনও সম্মুখযুদ্ধ লড়িনি; আমাদের রণকৌশল, শত্রুকে

অতর্কিতে আক্রমণ করে তার যথাসম্ভব ক্ষতি করে পালিয়ে যাওয়া—বার বার। সর্বশেষে তার সর্বস্ব লুঠ করা।'

এ সব-কিছু ভাবসাহেব সত্যই লিখেছিলেন কিনা, সে-কথা গুল বাহাদুর জানতেন না। তবে এ কথা জানতেন, মারাঠারা সম্মুখসংগ্রাম সব-সময়ই এড়িয়ে চলে।

কিন্তু একথাও অতি অবশ্য ঠিক, ভাবসাহেব অবশ্য মৃত্যু জেনেও আবদালীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধই লড়েছিলেন। কেন লড়েছিলেন? পেশওয়ার হুকুমে। হুকুমে। তাঁর প্রতি আনুগত্য বশ্যতার দরুন। তাঁর নুন-নেমক খেয়েছি। সে নুনের শেষ কড়ি শোধ না করে দেশের লোকের সামনে মুখ বের করবো কি করে? কিন্তু দিল্লীর বাদশার প্রতি বাঙালী ডোমের কি আনুগত্য, কি বশ্যতা?

তবে কি এদের তাতাতে হবে বাবুর কিংবা মাহমুদের মত লুঠতরাজের লোভ দেখিয়ে? তার সরল অর্থ, দিল্লীর বাদশাহ্ খেদমৎ করতে গিয়ে তারা করবে দিল্লী লুঠ! এ তো চমৎকার ব্যবস্থা!

তখন বড় দুঃখে তাঁর মনে পড়লো, গদরের সিপাহীরও বেপরোয়াভাবে যততত্র লুঠতরাজ করেছে। যাদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম লড়েছে, লুঠ করেছে তাদেরই। কি মূল্য সে স্বাধীনতার!

গুল বাহাদুরের মাথা গরম হয়ে উঠলো। সুরাহীর জল ঢেলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেন, 'যারা গদর ইন্‌কিলাব করে তারা অতশত ভাবনা-চিন্তা করে না। তিমুর নাদির বিজয় অভিযান আরম্ভ করার পূর্বে বু আলী সিনা কিংবা আবু রুশদের দর্শন আর তর্ক শাস্ত্রের কেতাব-পুঁথি নিয়ে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেন না।'

ইংরেজ এ-দেশের দুশমন, এ-দেশের বাদশার দুশমন। তাকে খেদাতে হবে। কি ভাবে তাড়াতে হবে তার জন্য মোল্লা-মৌলবীর কাছ থেকে ফতোয়া আনবার প্রয়োজন নেই। তাহলে পাড়ার পদী পিসির কাছেও যেতে হয়। তিনি ইতু-ঘেঁচুর পুজো-পাটা করে দিন-ক্ষ্যাণ বাৎলে দেবেন—তবে হবে অভিযান শুরু! তওবা, তওবা!! শয়তানের খুন পিনেওলা তলোয়ারকে পয়মন্ত করতে হবে চড়ুই পাখীর ন্যাজের পালক দিয়ে!

কিন্তু একটা জিনিস সর্বক্ষণ গুল বাহাদুরের মনে পীড়া দিচ্ছিল। এই যে ছদ্মবেশ পরে আত্মগোপন করে থাকাটা, এভাবে কাপুরুষের মত কতদিন প্রাণ বাঁচিয়ে থাকতে হবে? দেশ স্বাধীন করার জন্য একটা বড় আদর্শ সামনে ধরেছি বলে এই নীচ আচরণ সর্বক্ষণ হজম করে চলতে হবে? ডোমকে তাতানোর জন্য লুঠতরাজের লোভ কেউ দেখালে সেটা না হয় বরদাস্ত করে নিলুম কিন্তু নিজে একটা নীচ আচরণ করবো—এ-ঢেঁকি ঢোক গিলে হজম করি কি করে? তাও একদিন নয়, দু'দিন নয়—কত বছর ধরে কে জানে?

চুলোয় যাক্ গে অত ভয়। চুলোয় যাক্ গে শিবুর হুঁশিয়ারীর পরামর্শ। আমি বেরবো ঘোষালের সন্ধানে।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাজে ডুব না মারলে চিন্তা করে করে পাগল হয়ে যাব যে।

কাজও এসে হুড়মুড়িয়ে পড়লো তাঁর ঘাড়ে।

শিবুর খেতখামারি ছিল সামান্যই কিন্তু গুল বাহাদুরের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। সে সব সামলাতে গিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন এক নূতন ভুবনে। এটা ধরলে ওটা হাতছাড়া হয়ে যায়, ছাগল-দুটোকে সামলাতে গাইটা না-পাত্তা হয়ে যায়। মরাইয়ের ইঁদুর মারতে হলে

বেরাল পুষতে হয়, বেরালকে পেট ভরে খেতে দিলে সে আবার ইঁদুর মারার প্রয়োজন বোধ করে না। পচা গোবরের গন্ধে মাথা তাজ্জিম তাজ্জিম করে, অথচ সে গোবরের বরবাদ হবে তাও প্রাণ সইতে পারে না।

ইতিমধ্যে ঝিঙে এসে খবর দিলে, একপাল সাঁওতাল কোশখানেক দূর নদী-পারে আস্তানা গেড়েছে। ওদের দিয়ে একটা নূতন আবাদ করানো যায় কিনা।

গুল বাহাদুর লম্ফ দিয়ে উঠলেন। এ একটা কাজের মত কাজ বটে। এ-বিষয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আছে। ভাওলপুর না পাটিয়ালা কোথা থেকে একপাল মেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পালমে যেখানে বাবুর শাহের পাথরের তৈরী সরাঈ—তারই পিছনে। তাঁরই চাচা দানিশ্‌মন্দ খান তাদের দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটা সুন্দর আবাস। চাচার সঙ্গে থেকে তিনি তখন শিখেছিলেন অনেক কিছু। আজ দেখা যাবে চাচাকা ভাতিজা সে এলেমের কিছুটা স্মরণ রেখেছে কিনা।

কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন। শিবুর কলসীর তলায় পাওয়া গিয়েছে শ' আড়াই টাকা। এত টাকা শিবু পেল কোথায়? তবে কি গুপ্তী ডাকাতি করতো? তা আসুক সে টাকা জাহান্নাম থেকে। ঐ দিয়ে আরম্ভ করা যাবে অক্লেশে। তারপর বরাৎ। আল্লা ভরোসা।

প্রথম দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গুল বাহাদুর আনন্দীকে সেলাম করে বললেন, 'হুজুর, আজ থেকে আপনি জমিদার। আপনাকে সমঝে চলতে হবে।'

জমিদার হওয়ার রৌদ্ররস আনন্দী জানে না কিন্তু সে চালাক ছেলে। গুল বাহাদুরের মেজাজ আজ খুশ দেখে সে কোলের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, 'দাদু, আমাকে কেঁদুলীর মেলায় নিয়ে যাবে?'

গুল বাহাদুরের প্রাণ-যমুনায় তখন আনন্দের উজান তরঙ্গ লেগেছে। আনন্দী তখন শয়তানের জন্মভূমি বেলেত যেতে চাইলেও তিনি তখন ঘিনপিত বাদ দিয়ে সেখানে তাকে নিয়ে যেতেন। শুধালেন, 'সে কোথায়?'

বললে, 'অন্নেক দূরে। ঐ হোথা অজয় দিয়ে।'

শীতের শেষে অজয়ের পারে কেঁদুলীর মেলা। বাঙলাদেশের হাজার হাজার বাউল সেখানে জমায়েৎ হয়ে তিন রাত ধরে আউল-বাউল-কেত্তন গান গায়। কেনাকাটাও হয় প্রচুর।

সেখানে গুল বাহাদুরের আরেক অভিজ্ঞতা।

এই যে হাজার হাজার ষণ্ডামার্কা লোক দিনরাত্তির ধেই ধেই করে নৃত্য করছে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে কোনও কিছু করছে কম্মাচ্ছে না, সমাজের তোয়াক্কা করে না, ধর্মের নামে অকাতরে গরীব-দুঃখীর অন্নে ভাগ বসাচ্ছে, দরকারে অদরকারে এক অন্যে কামড়াকামড়ি পর্যন্ত করছে—এ তামাশা তৈরী করলো কোন্ মহাজন? কার আদেশে এরা এসব করে, কার হুকুমে গৃহী এদের সব-কিছু যোগায়? এর কি অর্থ, কি মূল্য?

অথচ গুল বাহাদুরের চট করে মনে পড়া উচিত ছিল যে মুসলমান পীর দূরবেশরাও ঠিক এই কর্মই করে থাকে, তাঁরই হীরের টুকরো দিল্লী শহরে—নিজামউদ্দীনের দরগায়, মেহেরৌলীর কুৎব্‌সাহেব, নাসিরউদ্দীন চেরাগ-দিল্লীর আস্তানায়। সেখানেও তো বাউণ্ডুলে খোদার খাসীরা ঠিক এদেরই মত ধেই ধেই করে নৃত্য করে। যীশুখ্রীষ্টের ভাষায় 'তারাও

সুতো কাটে না, মেহন্নতও করে না।' এবং তাই শুধু নয়, এখানকার এই বাউলদের ভিতর আছে মুসলমানও।

ছেলেবেলা থেকে আপন ধর্মে যে সব জিনিস গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সেগুলো একটু ভিন্ন বেশে দেখা দিলেই মানুষ চমকে ওঠে। তারপর হুঁশ হয়, দুটোই হুবহু এক বস্তু। এ-ও যা, ও-ও তা। কালীঘাটের পাঁঠা কাটাতে আর ইদগার পাশে গোরু জবায়ে তফাৎ কী? গুরুকে মাথায় তুলে তাকে অবতার বলা, আর পীরের পায়ে চুমো খেয়ে তাকে আল্লার নূর বলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া একই, একই, সম্পূর্ণ একই জিনিস।

গুল বাহাদুরের মনে যখন এ চৈতন্যের উদয় হল তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাজ্জব মুল্লুক হিন্দুস্তান। এই এদের আমরা যুগ যুগ ধরে শিরতাজ, মাথার মুকুট করে পরে আসছি আর এদের মনের কোণে কণামাত্র উদ্বেগ নেই এদেশের লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে। এদের কাছে আমরা সব মায়াবদ্ধ জীব (ফানী দুনিয়ার ক্রিমি), আমরা মরলেই কি, বাঁচলেই কি! ইয়া আল্লা মেহেরবান! তোমার কেরামতি বুঝে ওঠা ভার। এ-সংসার থেকে মুক্তি পাওয়াই যদি মানব-জীবনের চরম আদর্শ হয় তবে এ-সংসারে তুমি তাকে পাঠালে কেন?'

হঠাৎ খেয়াল গেল, আনন্দী বাউলদের অনুকরণে ধুতিটাকে লুঙ্গির মত কোমরে বেঁধে এক হাত উপরের দিকে তুলে অদৃশ্য এক-তারা ধরে নাচছে। দিলেন এক ধমক। শিবুর কথামতো একে 'ভদ্রলোক' না হয় নাই বানালুম, কিন্তু একে কখনও বৈরাগী হতে দেব না।

'কি রে আনন্দী, কি রকম আছিস্?'

গলা শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখেন—বাঙালী বাবু। লম্বা লিকলিকে চেহারা, গৌরবর্ণ, সরু বাঁকা নাক, বাদামী—প্রায় নীলরঙের দুটি হাসি-হাসি চোখ, উপরের ঠোঁটটি চাপা—নিচেরটি ডপকী ছুঁড়িদের মত একটু পুরুষ্টু এবং রস-ভর-ভর, পানের লাল না এমনিতেই লাল ঠিক বোঝা গেল না, এক মাথা কোঁকড়া বাবরী চুল কিন্তু একেবারে রুক্ষশুষ্ক, পরনে কটকি জুতো, ধুতি মেরজাই আর কাঁধের উপর বীরভূমি কেটের চাদর।

বললেন, 'এই যে বাবাজী, ঝিঙের মুখে তোমার কথা শুনলুম।'

গুল বাহাদুর অচেনার আগমনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'বসুন।' মনে মনে ভাবলেন, 'ঝিঙের মুখে? তবে কি শিবু কিছু বলেনি!'

গদরের সেপাইদের মধ্যে একে অন্যকে পরিচয় দেবার জন্য গোপন সঙ্কেত ছিল হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে শরীরের কোন এক জায়গায় কেমন যেন আনমনে আস্তে আস্তে চক্কর কেটে যাওয়া—তারা যে গোল চাপাটি দিয়ে খবর পাঠাতো তারই অনুকরণে। গুল বাহাদুর মাটিতে বসে তাঁর আপন হাঁটুর উপর যেন বেখেয়ালে চক্কর আঁকতে লাগলেনন

বাবুটি চমকে উঠে আপন হাঁটুতে একটা চক্কর এঁকেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চল।'

দুজনা নদীপাড়ের বটগাছ-তলায় বসলেন।

পূর্ণিমা রাত্রি। সামনে, উঁচু পাড়ির অনেক নিচে অজয়ের ক্ষীণধারা। তার গতিবেগ প্রায় নেই। যেন মরা অজগর সাপ শুয়ে আছে। চাঁদের আলোতে তার আঁশ যেন চিক্‌চিক্ করছে। দু'একটি মেয়েছেলে সেই আঁশ যেন আঁজলা আঁজলা করে মাথায় মাখছে। তাদের

কালো চুল থেকে ছোট ছোট ঝরণা চিক্‌চিক্ করে পড়ছে। জলের ওপারে বিরাট বালুচরের আরম্ভ। তারপর কাশের ঝোপ, নিচু পাড়, যাত্রীদের আস্তানা সব-কিছু চাঁদের আলোতে ম্লান কুয়াশার হিমিকার গ্লানিতে মিশে গিয়েছে। মেলার কোলাহলকে শান্ত নদীর নৈস্তব্ধ্য এখানে গ্রাস করে ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ!'

'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ! জিন্দাবাদ কুমার সিং!'

কুমার সিং?

॥ পাঁচ ॥

অনেকক্ষণ ধরে দুজনাই চুপ। একে অন্যের সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়, কিন্তু বাহাদুর শাহ আর কুমার সিং যেন তাদের হাতে হাত, বুকে বুক মিলিয়ে দিলেন, যেন কত দিনকার পরিচয়। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন হলে মানুষ যেমন একে অন্যের নিঃশব্দ সঙ্গসুখ প্রথমটায় শুষে নেয়, এদের বেলা তাই হল।

একবার কথা আরম্ভ হলে সে-সুখ যেন ক্ষীণ হয়ে আসে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব খতম!'

'সব খতম। কিন্তু আবার সব শুরু।'

দুজনায় আবার চুপ।

গুল বাহাদুর বললেন, 'আমি দিল্লী থেকে এসেছি। আমার নাম—'

'থাক! নামের প্রয়োজন হলে পরে শুধিয়ে নেব। আমি ঘোষাল।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'বুঝেছি।'

আশ্চর্য হয়ে ঘোষাল শুধালে, 'কি করে?'

'শিবু বলেছিল। আমার কথা, আপনাকে বলেনি?'

'না। বোধ হয় সময় পায়নি।'

গুল বাহাদুর আফসোস্ করে মনে মনে ভাবলেন, 'এরকম একটা বিচক্ষণ লোক চলে গেল। বেঁচে থাকে শুধু গাধা-খচ্চরগুলো।'

ঘোষাল বললেন, 'শোনো আমার কথা সব বলি।'

এবার ঘোষাল অতি বিশুদ্ধ উর্দুতে আপন বক্তব্য আরম্ভ করলেন।

'আমি ছোটবেলায় যাই বেহারে। সেখানে অনেক জায়গায় কাজকর্ম করি—এমন কি ইংরেজের সঙ্গেও। শিউরে উঠো না। পরে বুঝবে। ওদের সঙ্গে কাজ না করলে আমি কখনও এ রকম গভীরভাবে বুঝতে পারতাম না, এরা কি বজ্জাৎ, কি ধড়িবাজ। কিন্তু সেকথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার দরকার এখন নেই। তুমি ফার্সীতে যে-সব বই পড়েছ, আমিও পড়েছি সেগুলোই। আমরা ব্রাহ্মণ কিন্তু আমাদের বংশে বহুকাল ধরে চলে আসছে ফার্সীর চর্চা। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলুম ইতিহাস চর্চার ফলে নয়। আমার পূর্বপুরুষেরা পাঠানদের হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন পূর্ব-বাঙলায়। হেরে গিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেন বীরভূমে। জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান, ঔরঙ্গজেব—ব্যস্—মাত্র এই

তিন বাদশার আমলে বাঙলা পরাধীন ছিল, অর্থাৎ দিল্লীর হুকুম মাফিক চলেছে। তারপর আমরা আবার সরকারী কাজ করেছি। তারপর এল ইংরেজ। পলাশী থেকে এই একশ' বছর আবার আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি।'

গুল বাহাদুর অনেক কিছুই জানতেন না। এই ন'মাস ধরে তিনি চিনেছেন শুধু ডোম আর সাঁওতালদের। এদেশেও ব্রাহ্মণ আছে, এ কথা তিনি মোটামুটি জানতেন। কিন্তু তারা যে গদরে লড়ে এ খবর তাঁর জানা ছিল না। দিল্লীর ব্রাহ্মণেরা পরে চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, আর মাথায় কিস্তিটুপি। তারা করে পুরুতের কাজ। বিয়ে-শাদীতে এসে মন্ত্র-ফন্ত্র পড়ায়—তাও সে-মন্ত্র কাগজে লিখে আনে ফার্সী হরফে। তারা আবার লড়াই করে কি করে? লড়াই তো করে রাজপুতরা, মারাঠারা, ক্ষত্রিয়রা। তা সে যাক গে। তাঁর মনে তখন লেগেছে আর এক ধোঁকা। শুধালেন, 'তোমরা কি শুধু বাঙলার স্বাধীনতা চাও? বাহাদুর শাহকে শাহ-ইন-শাহ বলে মানো না?'

ঘোষাল বললেন, 'ঐ তো আরম্ভ হয়ে গেল, হিন্দুস্থানবাসীদের ঝগড়া-কাজিয়া। এ-সব কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের ভিতরে মিল বেশী, অমিল কম। যদি খুশী হও, তবে না হয় মেনেই নিলুম তোমার বাহাদুর শাহকে। কুমার সিংহকে তো মেনেছিলুম। তোমাকেও মানছি। সবাইকে মেনে নেব—দরকার হলে এবং হবেও। তুমি কি মনে করো, আমরা জিতলে সেই পুরনো মোগলাই রাজত্ব আসবে—বাহাদুর শাহকে বাদশা করতে পারলেও? না বাবাজী, দেশের হাওয়া বদলাচ্ছে। বাবুর বাদশার মত রাজত্ব বাহাদুর কোনও করেননি, আর কখনও কেউ পারবে না।'

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'আপনারা হেরে গেলেন কেন?'

ঘোষাল হাতঝোড় করে বললেন, 'ঐ একটি প্রশ্ন শুধিয়ো না। এর উত্তর দিতে গেলে আবার নূতন করে সেই মর্মন্তুদ পীড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যা ভুলতে পারা একটা জীবনের কর্ম নয়। কোন্ কোন্ ভুল না করলে আমরা জিতে জেতুম সে প্রশ্নও তুলো না। আমি নিশ্চয়ই জানি, সে ভুলগুলো না করলে পরে অন্য ভুল করতুম। না বাবাজী, গলদের মূল উৎস কোথায় ছিল তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও পারিনি। আমরা এখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো ওদিক দিয়ে জল বেরিয়েছে, সেখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো অন্য দিক দিয়ে বেরিয়েছে। সর্বাঙ্গে ঘা, মলম লাগাই কোথায়?'

'এখন তবে কর্তব্য কি?'

ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বিলকুল কোনও ধারণা নেই। এখনও মনে মনে জমা-খরচ মিলোচ্ছি। তুমি এসেছো, ভালই হয়েছে। দিল্লী ফিরে যাচ্ছ না তো?'

প্রশ্নটা যেন নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করা হোল। ঘোষাল জানতেন এর উত্তর কি? গুল বাহাদুরও কোনও কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ঘোষাল বললেন, 'ছদ্মবেশটা মন্দ ধরনি। বাঙলাটাও খুব যে মন্দ শিখছো তাও নয় কিন্তু ডাহা ডোম-ডুমে। এই বেলা ওটাতে লেখা-পড়াও আরম্ভ করে দাও। নিজেই করে নিতে পারবে। কোন ভাবনা নেই। ওতে সাহিত্য বলে কোনও বালাই নেই। আশ্চর্য, সাতশ' না আটশ' বছর ধরে বাঙলাতেই বই লেখা আরম্ভ হয়েছে অথচ এক গণ্ডা কবি বেরোয়নি যাদের ইরানী কবিদের সামনে দাঁড় করানো যায়। ফার্সীতে তিনশ' বছর যেতে-না-যেতেই ফিরদোসী, হাফিজ, সাদী, রুমী, আত্তার, নিজামী, আরও কত কে?'

গুল বাহাদুর মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'বাঙালীরা হয়তো মনে করে, তাদের কবি হাফিজ সাদীর চেয়ে বড়।'

ঘোষাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'তা করতে পারে। সাঁওতালরা হয়তো মনে করে, তাদের তীর ধনুক নিয়ে বন্দুক কামানের সঙ্গে লড়া যায়।'

তুলনাটার ঢপ দেখে গুল বাহাদুর একটু হাসলেন।

ঘোষাল বললেন, 'হাসলে? তা হাসো। আমারও বলার বিশেষ হক্ক নেই। আমিও তেমন কোনও চর্চা করিনি। কিন্তু জানো, সাতশ' বছর বাঙলা চর্চা করার পর তারা গদ্য লিখতে আরম্ভ করেছে এই মাত্র সেদিন। পঞ্চাশ বছরও হয়নি। ঐ যে রাজা রামমোহন রায়—'

গুল বাহাদুর চমকে উঠে বললেন, 'কে?'

'রাজা রামমোহন রায়। চেন নাকি?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পিতার কাছে শুনেছি, বাদশা দুসরা আকবরের চিঠি নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। আমি তো শুনেছি, উনি জানতেন আতি উত্তম ফার্সী এবং আরবী।'

ঘোষাল বললেন, 'তা তিনি জানতেন। এদেশের মুসলমান পণ্ডিতরা তাঁকে নাম দিয়েছেন "জবরদস্ত মৌলবী।" তারপর একটু অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'লোকটা মৌলবীই বটে। ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখে। ফার্সীতে একটা লিখেছে। আমার কাছে বোধ হয় এখনও আছে। কিন্তু ধর্মে আমার রুচি নেই। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাজ্জব কী বাৎ, লোকটা দেশের সবাইকে ইংরিজি শেখাতে চায়।'

'সে কি?'

'আশ্চর্য! আরবী ফার্সীর রস চেখেছে, শুনেছি ইবরানী সুরয়ানী ইস্তেক (হিব্রু, সিরিয়াক্) জানে—তার পর এই রুচি! ইংরেজ ব্যাটারা তো পায়খানা থেকে ফিরে জল পর্যন্ত—থাক্ গে। জানো, বাবাজী, এক ব্যাটা ইংরেজের সঙ্গে আমাকে একদিন নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাত-নাড়ানাড়ি করতে হয়েছিল। হাতে যেন এখনও গন্ধ লেগে আছে। বেসন দিয়ে কত মেজেছি, ঝামা দিয়ে তার চেয়েও বেশী ঘষেছি।'

বলে ডান হাতখানা অতি সন্তর্পণে নাকের ইঞ্চি তিনেক সামনে ধরে দু'বার শুঁকে বলে উঠলেন, 'তৌবা তৌবা! এখনও গন্ধ বেরুচ্ছে!'

গুল বাহাদুর সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আমিও পাচ্ছি। তা ঐ অপকর্ম করতে গেলেন কেন?'

'সাধে? ঐ করে তো সম্বন্ধীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আর পাঁচজনের চোখের আড়াল করলুম।' ঘোষাল চুপ করে গেলেন।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'তারপর?'

ঘোষাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উদাস সুরে বললেন, 'তারপর কে কোথায় যায় সে তো আল্লাই জানেন। কেউ যায় বেহেস্তে, কেউ যায় দোজখে, কেউ যায় বৈকুণ্ঠে, কেউ যায় কৈলাসে!'

'সে আবার কোথায়?'

'বাবাজী, ধরা পড়ে যাবে। বৈকুণ্ঠটা কোথায় সেটা অন্তত তোমার জানা উচিত।

বাবাজীরা মরে গেলে বৈকুণ্ঠ যায়—নামাবলীর কার্পেট পেতে তারি উপরে বসে। আরব্য রজনীতে যেরকম আছে। কিন্তু থাক ওসব। ধর্মে আমার রুচি নাই—তোমাকে তো বলেছি।'

অনেকক্ষণ পর গুল বাহাদুর শোধালেন, 'ইংরেজ মেরেছেন, ইংরেজ আপনাকে তালাশ করছে না?'

'তা করছে, কিন্তু আমি ইংরেজ মারলুম কখন?'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এই যে বললেন!'

'তাজ্জব বাৎ শোনালে! আমি বেটাকে নিয়ে গেলুম যেখানে তার বরাতে লেখা ছিল যাবার। তারপর আমাদের সেপাইরা তাদের কাজ করলে। আমি কি জল্লাদ?'

'আপনি তবে কি করতেন?'

'আমি? আমার কাজ ছিল তাপ্পা, রিপুকর্ম। আজ বন্দুক নেই, যোগাড় করো। কাল বারুদ নেই, ঠ্যালা সামলাও। পরশু খোরাক নেই, আমার নাভিশ্বাস। আরও কত কি? লুঠের মাল বখরা করা, গাঁয়ের লোককে মিথ্যে দিব্যি-দিলাশা দিয়ে তাতানো, চিঠি জাল করা—'

'সে আবার কি?'

'ইংরেজের গুপ্তচর আমাদের সেপাইদের ভিতর জাল চিঠি পাচার করলে, যেন সে-চিঠি কুমার সিং ইংরেজকে লিখেছেন আত্মসমর্পণ করে, অবশ্য তাঁর ধনপ্রাণ যেন রক্ষা হয় এই শর্তে। আমি তখন পাল্টা চিঠি জাল করাতুম, ইংরেজ আত্মসমর্পণ করেছে এই মর্মে সেটা চালিয়ে দিতুম আমাদের সেপাইদের ভিতর। কিন্তু ইংরেজ সেপাইদের ভিতর ভিতর এরকম জালিয়াতি আমরা করতে পারিনি অতখানি বাঢ়িয়া ইংরাজি লেখা জাল করনেওলা আমাদের ভিতর কেউ ছিল না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তাই বোধহয় রাজা রামমোহন আমাদের ইংরিজি শেখাতে চান।'

ঘোষাল গোস্‌সাভরে বললেন, 'কচু হবে ইংরিজি শিখে। যেন ইংরিজি চিঠি জাল করতে পারলেই আমরা গদর জিতে যেতুম। যেন কাঠবেরালির ধুলো না হলে—যাগ্ গে—ওসব কেচ্ছা তুমি জানো না।'

চাঁদ অনেকখানি ঢলে পড়েছে। বাউলদের গীতও ঝিমিয়ে এসেছে। নদীর জলের রুপোলি ঝিকিমিকি লোপ পেয়েছে, কিংবা সরে গিয়েছে। ওপার থেকে পাড়ি দিয়ে একটা দমকা হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস দুজনার ভিতর দিয়ে চলে গেল। কিংবা হয়তো গদরেরই দীর্ঘশ্বাস, হায় হায় আফসোস্।

গুল বাহাদুর বললেন, 'যাক্। তবু ভালো। আমি তো শুনেছিলুম, কুমার সিং সত্যি আত্মসমর্পণ করে ইংরাজকে চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো তাহলে জাল!'

ঘোষাল হেসে বললেন, 'সব-কটা জাল হতে যাবে কেন? কিছু সত্যিও ছিল।'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি?'

'নিশ্চয়। যখন দেখলুম, ইংরেজ চিঠি চালাচ্ছেই তখন আমরাও ইংরেজকে দু-চারখানা লিখে পাঠালুম। নানারকম ভুল খবর দিয়ে। নিছক ধাপ্পা মারার জন্য। ঝাঁসীও তাই করেছিলেন।'

'কিন্তু এতে করে যে পরে দেশের লোকের মনে ভুল ধারণা হল, কুমার সিং সত্যি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে ভুল ধারণা সরাবে কে?'

'দেখ বাবাজী, গদর জিতলে এ ভুল ধারণা থাকতো না। আর হারলে তো গাল খাবই। তখন কাজ ছিল লড়াই জেতা। তার জন্য যা প্রয়োজন তাই করেছি। হেরে গিয়েছি সেইটে হল সবচেয়ে বড় গাল। তার উপরই এ-বদনাম তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, "পকড়ে তলওয়ার দামনকো সম্‌হালে কোঈ"? তলোয়ার নিয়ে হামলা করার সময় রক্তের ছিটে পড়ার ভয়ে কেউ তো কুর্তার অঞ্চল সামলায় না—অর্থাৎ একবার মনস্থির করবার পর ছোটোখাটো চিন্তা করতে নেই।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সে তো বিল্‌কুল ঠিক। কিন্তু ইংরেজ আপনার সন্ধান পাবে কি না সেও কি ঐ পর্যায়ের?'

ঘোষাল বললেন, 'প্রায় তাই। কিন্তু আসলে কি জানো, বাবাজী, বেঁচে থাকার উপর আমি খুব বেশী দাম দিই নে। এই গদরে চলে গেল মানুষগুলো, আর বেঁচে রইল যারা, তাদের আমি দোষ দিই নে, কিন্তু তাদের নিয়ে আমি করবো কি? ঝড়ে মোটা আমগুলো ঝরে পড়ে সে তো জানা কথা। আমি নিজে অত্যন্ত সামান্য প্রাণী কিন্তু ঐ মহাজনদের সম্পর্কে এসে আমি কয়েক দিনের জন্য কি যে হয়ে গিয়েছিলুম তোমাকে বোঝাই কি প্রকারে? আমি যেন রোগা-পটকা হাড্ডিসার গঙ্গাযাত্রায় জ্যান্ত মড়া হয়ে যাচ্ছিলুম উদ্ধারণপুরের ঘাটে। আমার ঘাড়ে এসে করলে ভর এক উড়োনচণ্ডী দানো। আমি উঠলুম লম্ফ দিয়ে, মড়ার খাটিয়া ছেড়ে, আর তারপর সে কি তিড়িং বিড়িং ভূতের নৃত্য করলুম ক'দিন। তখন আমি সব জানি, সব পারি। ঐ আনন্দী ছোঁড়াটা তখন যদি আমাকে আবদার করতো, "দাদু, বেহেস্ত থেকে এনে দাও না আমাকে খুদাতালার কুর্সীখানা", আমি তা হলে একগাল হেসে বলতুম, "রঃ! ডাঁড়া! এনে দিচ্ছি, এ আর এমন কি চাইলি?" তারপর দিতুম এক আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ। স্বপ্নে যে-রকম মানুষ মিন-পাখনায় পায়ের কড়ে আঙ্গুলে অল্প একটু ভর দিলেই হুশ করে উড়ে গিয়ে ঠুকে যায় তার মাথা চাঁদের বুড়ীর চরকাতে।

'জানো বাবাজী, এ যেন স্বপ্নের মাঝে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়ে আল্লার পায়ের কাছে ফেরেশ্‌তা বনে যাওয়া। আর আমার চতুর্দিকে কুমার সিং আর তার সঙ্গী-সাথী। কী সব বাঘ, কী সব সিংহ! আমরা যেন সবাই অন্ধ-প্রদীপ। আপন আপন সেজে পলতের মতো পড়ে ঘুমুচ্ছিলুম! এল কুমার সিংয়ের দীপ্ত-দীক্ষা। তাঁর আলো আমাদের এক-একজনকে স্পর্শ করে, আর আমরা প্রদীপশিখার মত জ্বলে উঠি। আবার আমাদের শিখা জ্বালিয়ে দেয় অন্য প্রদীপ। তাই বলছিলুম, এ তো দীপ্ত-দীক্ষা—এ তো স্পর্শদীক্ষা নয়, সে তো সামান্য জিনিস। পরশপাথরের স্পর্শ লেগে লোহা হয় সোনা, কিন্তু সে সোনা তার পরশ দিয়ে অন্য লোহাকে সোনা করতে পারে না,—তাই তার নাম স্পর্শ-দীক্ষা, তার মূল্য আর কি?

'সে কী দেয়ালি জ্বালিয়েছিলুম আমরা!'

'আর আজ, অন্ধকার অন্ধকার—সব অন্ধকার!'

হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই, ঘোষাল দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মাথা গুঁজে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

মতো ইনি ওলাওঠার দেবী কিংবা বীবী। কিন্তু আর সব দেবী যখন হিন্দুর মৌরশী পাট্টা, তখন ইনিই বা মুসলমানী হয়ে বীবী খেতাব নিলেন কেন?

গুল বাহাদুর জানতেন না, বাঙলাদেশ তাজ্জব দেশ। ভাগ্যিস তিনি তখনও দখিন বাঙলায় যাননি। সেখানে তাহলে আলাপ পরিচয় হত জলের দেবতা বদর পীরের সঙ্গে, বড়মেঞা ওরফে বাঘের দেবতা গাজী পীরের সঙ্গে।

এই ঘোষালের সঙ্গেই আলাপ করে তিনি যত না শিখলেন তথ্য, তার চেয়েও বেশী প্রশ্ন। যথা—

এ দেশের খানদানীরাও কিছু কিছু তাহলে গদরে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন, সে কি শুধু বাঙলাদেশের বাইরে? দেশের ভিতর অন্য খানদানীদের মতিগতি তা হলে কি? তারা যদি ইংরেজকে এ-দেশ থেকে খেদাতে না চায় তবে তো কোনও কিছু করা অসম্ভব, কারণ তারা যদি নেতৃত্ব না নেয় তবে ডোম-চাঁড়ালেরা কি আপন হিম্মতে নয়া গদরের তাজা ঝাণ্ডা উঁচু করতে পারবে? তারপরের প্রশ্ন, এই খানদানী অর্থাৎ বামুন এবং চাঁড়ালদের ভিতর কি অন্য কোনও সম্প্রদায় নেই? দিল্লীতে যে রকম ব্রাহ্মণ আর বেনের মাঝখানে আছে ক্ষত্রিয়রা? আর দিল্লীর ব্রাহ্মণ আর এখানকার ঘোষাল ব্রাহ্মণেই বা মিল কোথায়? দিল্লীর বামুনরা তো করে স্রেফ পুরুতগিরি, এ বামুন তো একদম 'আগখুর্' অর্থাৎ আগুনগিলনেওলা। কিন্তু মারাঠী ব্রাহ্মণ, পেশওয়ারাও তো পুরুতগিরি করে না। তবে কি তারা হাতিয়ার নেয়, না শুধু আড়ালে বসে কল-কাঠি নাড়ে?

আনন্দীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে গুল বাহাদুর ভাবলেন, এসব জাত-বেজাত আর তাদের ফ্যাচাঙ-ফেউ শিখতেই তো যাবে একটা আস্ত জীবন। তা আর কি করা যায়; অন্য কোনও পন্থা যখন আর নেই। আরব্য উপন্যাসের জিনও তো বোতলের ভিতর বন্ধ হয়ে কাটিয়েছিল তিনশ' না চারশ' বছর। পরমাত্মার কৃপায় তবু তো তিনি মুক্ত—অন্তত বোতলের জিন্নির তুলনায়।

দূরের শালবনের ফাঁকে কে যেন ছোট্ট একটি আগুন জ্বালিয়েছে। না, সূর্যঠাকুর ঘুম ভেঙে চোখ কচলে কচলে লাল করে ফেলেছেন? আকাশে চাঁদের আলো কখন মিললো, সূর্যের আলো দেখা দিল তিনি লক্ষ্যই করেননি। পুব থেকে একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস এগিয়ে চলেছে পশ্চিমপানে দেবতার পায়ে পেন্নাম করতে। কিন্তু এ দেবতা বড়ই জাগ্রত বদমেজাজী পীর! ভক্তকে অভ্যর্থনা জানান ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে। পূর্ব-বাঙলা থেকে বেরিয়ে-আসা এই তীর্থযাত্রী পূরবিয়া-হাওয়াকে তিনি আদর করে গায়ে মাখেন না, উল্টে ছেড়ে দেন পচ্ছিমিয়া গরম বাতাস। আল্লাওয়ার্দী খানের আমলে মারাঠা দস্যুর মত তারা পশ্চিম দিগন্ত থেকে আসে ঝড়ের মত হু হু করে, ঘোড়ার খুরে বালি পাথর শুকনো পাতার হাজারো দ' জাগিয়ে দিয়ে। একেবারে আকাশজোড়া নিরন্ধ্র, তমসাঘন, সূর্যাচ্ছাদিত একচ্ছত্রাধিপত্য।

দানিশপুর গাঁ ডাইনে রেখে চিকনকালা যেতে হয়। সে গাঁয়ের বাইরে আসতে-না-আসতেই গাড়ির উপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল চৌষট্টি পবন মারাঠাদের চৌষট্টি হাজার হর্স-পাওয়ার নিয়ে।

সামাল সামাল বলতে-না-বলতেই, গোরু গাড়োয়ান, গুল বাহাদুর খান কারও কোনও খবরদারী হুঁশিয়ারীদের তোয়াক্কা না করে গাড়ি ঢুকলো দানিশপুর গাঁয়ের ভিতর। তারপর

বাঁ দিকে চক্কর খেয়ে শিমুল পলাশ মহুয়ার আড়ালের এক আঙ্গিনায় গিয়ে ছিটকে ফেলে দিলে আনন্দী, গুল বাহাদুর, গণি মিয়া মায় দুটো গোরুকে একে অন্যের ঘাড়ে। মায়ের সুপত্তুর যে রকম বস্তা বস্তা চাল ডাল নুন চিনি আঙ্গিনায় আছাড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে কয়, 'দেখো, মা, তোমার জন্যে কি এনেছি।' কোথায় লাগে এর কাছে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে বাড়ি এনে মাতা কুন্তীকে আনন্দ সংবাদ জানানো!

চতুর্দিকে আকাশ বাতাসে তখন লাল ধুলো-বালির ভূতের নৃত্য। ঝড়টা এমনি অসময়ে এবং অতর্কিতে এসে আক্রমণ করেছে যে ধূর্ত বায়সকুল পর্যন্ত আশ্রয় নেবার ফুর্সত পায়নি। সেই ঝড়ের তীব্র সিটির শব্দের ভিতরও ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠছে তাদের তীক্ষ্ণ মরণাহত আর্তরব।

গুল বাহাদুর সব-কিছু ভুলে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শাবাশ, শাবাশ! একেই বলে আক্রমণ; একেই বলে হামলা। বিলকুল বে-খবর এসে বে-এক্তেয়ার করে দিল দুশমনকে।'

গোরু দুটো গাড়ি থেকে খালাস করে আনন্দীকে কোলে করে আঙ্গিনার অন্য প্রান্তরে কুঁড়েঘরের দাওয়াতে উঠতেই গুল বাহাদুরের চোখে পড়ল আরেক ঝড়। ঝড়েরই বেগে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিনায় এল এক রমণী। শাড়ির এক অংশ কোমরে বাঁধা, দীর্ঘতর অংশ সোজা উঠে গেছে আকাশের শূন্যে, মাথার চুলও উঠেছে আকাশের দিকে তালগাছের সকলের উঁচু পাতাটার মতো ঢপ নিয়ে। তার বগলে একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা। এই লালচে অন্ধকারের ভিতরও গুল বাহাদুরের নজরে পড়লো ছাগল-বাচ্চাটার দুটো ভয়ার্ত চোখ। আর, আর তার পাশে, একে অন্য থেকে বেশ দূরে আরও দুটি লাল-কালো চোখ। মেয়েটি আসমান থেকে শাড়ি নামিয়ে বুক ঢাকার চেষ্টা না করে সোজা উঠলে ঘরের দাওয়ায়। ঝটাৎ করে শিকলি খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে এক লহমার তরে দরজা ফাঁক করে ধরলো। এহেন প্রলয় নৃত্যের ওক্তে 'আপ যাইয়ে', 'আপ বৈঠিয়ে' বলে কে? পেছন থেকে গণির বেধড়ক ধাক্কা খেয়ে গুল বাহাদুর পড়লেন মেয়েটার উপর। সে চোট না সামলাতে পেরে পড়ে যাচ্ছে দেখে তাকে জাবড়ে ধরলেন দু হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে। মেয়েটা 'আ মর মিনষে' ঐ ধরনের কি যেন একটা বললে। ইতিমধ্যে গণি মিয়া কোনও গতিকে দরজাতে হুড়কো দিয়ে ফেলেছে।

ভিতরে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু চালের সঙ্গে যেখানে মাটির দেয়াল লেগেছে তারই ফাঁক দিয়ে কেমন যেন একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছে—গাঁয়ে আগুন লাগলে রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে যে-রকম বাইরে আগুনের আভাস পাওয়া যায়, বিদ্যুৎ ঝলমল করে উঠলে সকলের মুখের উপর সোনালী আবীর মাখিয়ে দেয়।

একটা মোড়া ঠেলে দিয়ে রমণী বললে, 'বসো গোসাঁই।' গণি এক কোণে চ্যাটাইয়ের উপর বসেছে। আনন্দী গুল বাহাদুরের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ভীত নয়নে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে।

গুল বাহাদুর দিল্লী শহরে বিস্তর খাপসুরৎ রমণী দেখেছেন। খাঁটি তুর্কী মেয়ের ড্যাবডেবে চোখ, খানদানী পাঠান মেয়ের ধনুকের মত জোড়া ভুরু, নিকষ্যি কুলীন ইরাণী তন্বঙ্গীর দোলায়িত দেহসৌষ্ঠব, এমন কি প্রায় অমিশ্র আর্যকন্যা ব্রাহ্মণকুমারী সরল বুদ্ধিদীপ্তশান্তসৌন্দর্য তিনি বহুবার দেখেছেন, কিন্তু আজ যে রমণী তাঁর সামনে আধা

আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তার লাবণ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সৌন্দর্য ছ'শ বছরের মিশ্রণের সওগাত। এর গায়ের রঙ এদেশের কচি বাঁশপাতার সবুজ দিয়ে আরম্ভ, তাতে মিশে গিয়েছে পাঠান-মোগলের কিঞ্চিৎ তাঁবা-হলুদের রঙ। চুল ইরাণীদের মত কালো হয়ে গিয়ে যেন নীলের ঝিলিক পড়েছে। কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য তার আটসাঁট গড়নে—সাঁওতাল মেয়ে দেখে যেমন মনে হয় এর দেহ তৈরী হয়েছে গয়ার কালো পাথর দিয়ে। পেটে পিঠে কোনও জায়গায় এক চিমটি ফালতো চর্বি নেই। আলগোছে কোমরে জড়ানো এর শাড়ির আঁচল কোমরটিকে যা ক্ষীণ করে দিয়েছে দিল্লীর তন্বঙ্গী তার ইজের-বন্ধ কষে বাঁধলেও এ ক্ষীণ কটি পেত না।

প্রথম তরুণ বয়সে গুল বাহাদুর যখন সবে বুঝতে আরম্ভ করেছেন যুবতীর দেহে কি রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে, তখন তাঁর এক ইয়ার তাঁকে একখানা চিত্রিত ইউসুফ-জোলেখার বই দিয়েছিল। পাতার পর পাতা উল্টে সে বইয়ে তিনি দেখেছিলেন শিল্পী কি ভাবে প্রতি পাতায় জোলেখার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রতি ছত্র, প্রতি রঙ তাঁর অঙ্গে অঙ্গে তখন কি অপূর্ব শিহরণ এনে দিয়েছিল। রোমাঞ্চ-কলেবরে কাটিয়েছিলেন অর্ধেক যামিনী।

আজ ঠিক সেই রকম বিদ্যুতের প্রতিঝলক যেন মেয়েটির সৌন্দর্য পাতার পর পাতা খুলে তাঁর মুগ্ধ আঁখির সামনে তুলে ধরছিল। আর চতুর্দিকে তখন ঝঞ্ঝা-বাত্যার প্রলয় নর্তন। তারই মাঝখানে এই কমলিনীর ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিকাশের মন্দমধুর প্রস্ফুরণ।

কিন্তু আজ আর প্রথম তারুণ্যের সেই রোমাঞ্চ শিহরণ গুল বাহাদুরের দেহে মনে হিল্লোলিত হল না। আজ এই সৌন্দর্যের পট পরিবর্তন তিনি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলেন—শান্ত মনে, সমাহিত চিত্তে।

বিদ্যুতালোকে গুল বাহাদুরের চোখে চোখ পড়তে রমণী শুধালো, 'কি দেখছ গোসাঁই?'

অতিশয় অনাবশ্যক প্রশ্ন। কণ্ঠে লজ্জা দেবার কিংবা পাওয়ারও কোনো রেশ নেই। এমন সময় আকাশ থেকে কক্কড় করে নামলো শুকনো দেশের ভরাট অকাল বৃষ্টি। গুল বাহাদুরকে কোনও উত্তর দিতে হল না।

মেয়েটি মাটিতে বসে দু' হাতে হাঁটু জড়িয়ে গুল বাহাদুরের মুখের দিকে আবার তাকালো। চিবুক যে জোড় হাঁটুর উপর রাখবে তার যেন উপায় নেই। মাঝখানে সুবিপুল মৃন্ময় মর্ম-বিগ্রহ যুগল।

হঠাৎ রমণী দু' বাহু তুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে গুল বাহাদুরকে শুধালো, 'গোসাঁই, তোমার বয়স কত?'

যেন প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন। কিন্তু উত্তর না দিয়ে পাল্টে শুধালেন, 'কোন্ বয়স?'

রমণী হেসে উঠলো। বললো, 'সে আবার কি? বয়স আবার কত রকমের হয়?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'অনেক রকমের হয়। আমার বয়স তেইশ।' গদরের নৈরাশ্য এই নাতিদীর্ঘ তেইশকে যেন দীর্ঘ তেইশে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে।

এবারে রমণী খল খল করে হেসে উঠলো। 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, তোমার বয়স তেইশ। আমার-ই তো এক কুড়ি হয়!'

গুল বাহাদুর চমকে উঠলেন। এ মেয়ে কি মুসলমান? শুধালেন, 'তোমার নাম কি?'

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার যেমন অনেক রকমের বয়স, আমার তেমনি অনেক নাম। লোকে বলে "মিছার মা"।'

'সে আবার কি?'

'বুঝলে না? আমি সাচ্চা মা নই, তাই আমি মিছার মা।'

বৃষ্টি নেমেছে দেখে গণি মিয়া গাড়ি-গোরুর খবর নিতে বাইরে যাচ্ছিল। এতক্ষণ সে কোন কিছুতে কান দেয়নি। এবারে একটুখানি দাঁড়িয়ে গুল বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে যা-তা বলছে, বাবাজী। ওর নাম আসলে মিঠার মা।'

মিঠার মা গণির দিকে তাকিয়ে রাগত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁরে গণ্যা, আমি যা-তা বলি? আমি মিছার মা না তো কি? আল্লার কিরে কেটে ক' তো?'

গণি বাইরে যেতে যেতে বললে, 'তা তুই নিকে করে বাচ্চা বিয়োলেই পারিস।' গুল বাহাদুরকে বললে, 'আসলে ওর নাম মোতী।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, 'এ-নাম যে দিয়েছে সে আর যাই হোক্ মিছের বাপ নয়— সত্যি নামই দিয়েছে। কিন্তু এর জাত কি তার হদিস গুল বাহাদুর তখনও পেলেন না।

কিন্তু এক মুহূর্তেই পাওয়া গেল। তাও অনায়াসে।

আনন্দী বললে, 'দাদু, জল খাব।'

মোতী শুনতে পেয়েছে। ভাবখানা যেন শুনতে পায়নি।

গুল বাহাদুর বললেন, 'মিঠার মা, একে একটু পানি খেতে দাও।'

মোতীর মুখ শুকিয়ে গেল। একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, 'আমি যে মুসলমান।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি পানি দাও।'

মোতী চীনে মাটির বাটিতে করে আনন্দীকে জল দিলে। সঙ্গে দুটি বাতাসা। গুল বাহাদুরের কাছে এসে বললে, 'এ তো তোমার ছেলে নয়, ঠাকুর। কার ছেলের জাত মারছো?'

এই জাত মারামারিতে গুল বাহাদুর একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। বললেন, 'শিবু মোড়লের ছেলে। ও জাত—'

আনন্দের চোটে আনন্দীকে জড়িয়ে ধরে মোতী বললে, 'কোজ্জাব মা, তুই শিবুর ব্যাটা? তাই! কি খাবি বল্?'

মিঠার মা ভারী খুশি। অচেনাজন চেনা লোককে যখন চেনে তখন আর সে অচেনা নয়। আসলে তাও নয়—চেনা-অচেনার পার্থক্য মিঠার মা কখনও করেনি। মোতী খুশি হয়েছে, কথা কইবার মতো দুজনারই একজন চেনা লোক পাওয়া গেল বলে। গুল বাহাদুরকে বললে, 'ওর কথা আর তুলো না, গোসাঁই, ওর মত হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে এ মুল্লুকে দুটো ছিল না। ক' বছরের কথা? আমার সোয়ামী রেখেছে রোজা, জষ্ঠি মাসের গরমে। ইফতারের জন্য আমি করেছি শরবৎ। র র, থাম্ থাম্ বলতে না বলতে শিবু মেরে দিল বেবাক ঘটি। ওর আবার জাত। ওর জাত মারে কে?'

তারপর গুল বাহাদুরের প্রায় গা ঘেঁষে বসে ফিস্ ফিস্ করে বলতে আরম্ভ করলো, যেন কতই না লুকনো কথা, 'ওর জাত ছিল সোনা বাঁধানো। এক ঘটি তেঁতুলের শরবৎ ঢাললে তার জেল্লাই বাড়ে বই কমে না। আর আসলে ছিল, আমারই মত বদ্ধ পাগল। জানো আমার

বিয়ের দিনে এক জালা তাড়ি খেয়ে এসে জুড়ে দিল কান্না। আমার বাবা নাকি তাকে বলেছিল আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। সবাই হেসে গড়াগড়ি। শেষটায় আমার মামা বললে, "তা মোড়ল, বিয়ে করবে তো তোমার পাটরানীকে খবর দাও, তিনি এসে বাঁদী বরণ করে নিয়ে যাবেন!" যেই না শোনা অমনি শিবু জল। নেশা কেটে পানি হয়ে গেল। শিবুর বউ ছিল এ তল্লাটের খাণ্ডার। মারমুখী বঁটিদা। তারপর শিবু গলায় ঢোল ঝুলিয়ে শুরু করল নাচতে। পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে সেদিন যা হাসিয়েছিল। বিয়ের পর আকছারই আসতো আমাদের বাড়িতে। "কই গো নাগর" বলে আমার সোয়ামীর হাত থেকে হুঁকো কেড়ে নিয়ে একদমে দিত ছিলিম ফাটিয়ে। আসলে ও খেত বড়তামাক।'

গুল বাহাদুরের দুঃখ আরও বেড়ে গেল। এরকম একটা গুণরাজ খান চলে গেল! আর কেউ যেতে পারলো না?

মোতী আরও গলা নামিয়ে বললে, 'কিন্তু জানো ঠাকুর, আমার সোয়ামী চলে যাওয়ার পর একদিনও এ বাড়িতে আসেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। একদিন বাঁধের কাছে ধরা পড়ে গেল। তখন আমায় মনের কথা বললে। ওরা দুজনে নাকি কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে যাবার মতলব করেছিল। তারপর শিবু কোথায় উধাও হয়ে গেল। ফিরে এসে বেশী দিন বাঁচলো না। কিন্তু ওসব কথা আর কেউ জানে না।'

বাইরে আস্‌মান-ফাটা বরসাৎ নেমেছে, হাওয়ায় মাতামাতি বন্ধ হয়ে গিয়ে চাল দিয়ে জলের ধারা ঝালরের মত ঝুলে পড়ছে। গণি মিয়া দাওয়ায় বসে আছে গালে হাত দিয়ে। বাইরে জলের ধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মিঠার মা তার বড় ডাগর চোখে—শুকনো চোখে।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "লোকে যে আমায় পাগলী বলে, ভুল বলে না। তুমি পায়ের ধুলো দিয়েছ এ বাড়িতে, আর আমি একবার জিজ্ঞেসবাদও করছিনে, তোমার সেবার কি হবে?"

গুল বাহাদুর তাড়াতাড়ি বললেন, 'তার জন্যে তুমি চিন্তে করো না, মিঠের মা। গাড়িতে চিঁড়ে মুড়ি আছে। না হয় তুমিই কিছু দেবে।'

অবাক হয়ে মোতী শুধালে, 'তুমি জাত মানো না?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে গুল বাহাদুর বললেন, 'আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ।'

মোতী প্রথম একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বললো, 'বুঝেছি। খুউব যারা উঁচুতে উঠে যায়, তারা বোধ করি ওসব আর মানে না। আমার বাপের বাড়ির পাশের গাঁয়ে বামুনরা থাকতো। ভয়ঙ্কর-জাত-বামুন। আমার বাবা বলতো, তাদের কেউ কেউ নাকি জাত মানতো না! বাবার হাতে তামাক খেত।'

গুল বাহাদুরের জানবার ইচ্ছে হল এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা মোতী কোন্ চোখে দেখে। শুধালেন, 'এ জিনিসটে কি ভালো?'

মোতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কি জানি—ভালো, না মন্দ। যার যেমন খুশি। আমাদের পীর সাহেবও তাঁর বীবীর হাতে ছাড়া খান না। ভালোই করেন নিশ্চয়ই। তিনি যা জায়গা-বেজায়গায় নিত্যিনিত্যি আড়াই কুড়ি দাওয়াত পান, ওসবের সিকিটাক খেলেও দেখতে হত না। ঐ হোথায় বাসা বাঁধতে হত। সেখানে আবার বাবুর্চীখানা নেই।' বলে মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল।

গুল বাহাদুর বুঝতে না পেরে বললেন, 'কোথায়?'

ডান হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে, বাঁ হাতে খোলা দরজা দিয়ে কোথায় যেন দেখিয়ে দিলে। গুল বাহাদুর তবু বুঝলেন না।

'গোরস্তান, গো, গোরস্তান। ঐ যেখানে মিছার বাপও ঘুমুচ্ছে।'

গুল বাহাদুর মরমী, দরদী লোক নন—অন্তত এই তাঁর বিশ্বাস। তবু শুকনো মুখে বললেন, 'কেন তুমি এ দুঃখের কথা বার বার তুলছ মিঠার মা?'

মোতী যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। দু'হাত জুড়ে বললে, 'মাপ করো, গোসাঁই, কিন্তু দুঃখের কথা বললো কে? ও তো ওখানে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। আর যাবার সময় ও তো ভারি হাসি মুখে গিয়েছে। চোখ বুজলো, কিন্তু মুখের হাসিটুকু মিলালো না। জিজ্ঞেস করো না, এই গাঁয়ের পাঁচজনকে, যারা তাকে গোসল করালে কাফন পরালে।'

'থাক।'

'হ্যাঁ, থাক। দাঁড়াও, আনন্দীর গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে আসি।'

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

গুল বাহাদুর মাঝে মাঝে খোলা দরজা দিয়ে দেখছিলেন, জল ধরার কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে কি না। মোতী লক্ষ্য করে বললে, 'সে আশা ছেড়ে দাও আজ। জল ধরলেও বেরতে পারবে না। এ গাঁ ও গাঁর মাঝখানে যে খোয়াই তার ভিতর বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও জল যা তেড়ে বয় তাতে হাতী ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর কতশ' "দ"। একবার একটাতে মজে গেলে বিনা মেহন্নতে বেরিয়ে যাবে এক ঝটকায় ঐ দূরের অজয়ে, তবে জানটা আর সঙ্গে যাবে না। না, থাক্। ওসব কথা তুমি ভালোবাসো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। সামলে-সুমলে কথা বলতে হয়।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি তো কিছু খেলে না।'

'আমি তো দিনের বেলা খাই নে।'

'সে কি? তামাম বৎসর রোজা রাখো নাকি?'

'ঐ দুই ঈদের ছটা দিন বাদ দিয়ে। তবু দেখো তো গতরখানা।'

ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্বেও গুল বাহাদুর অনেকবার সীমা লঙ্ঘন করেছেন, তবু নতুন করে 'গতরখানা' দেখে খুশিই হলেন। কোনও প্রকারের সহানুভূতি জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বললেন, 'কার ওজন কতখানি তাই মাপবার জন্য ভগবান দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে স্বর্গে বসে থাকেন না।'

মোতী বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু আমাদের একটা মুর্শীদীয়া গীত আছে ঐ নিয়ে। শুনবে?' বলেই গুন গুন করে ধরলে—মিষ্টি গলায় কিন্তু কেমন যেন কান্না-ভর-ভর সুরে—

দীপ নাই শলিতা নাই,
জ্বলে শখের বাতি
কইয়ো গিয়া মুরশীদের ঠাঁই।
জ্বলে দিবা জ্বলে রাতি
কইয়ো গিয়া ও ভাই—

ঘুরে ফিরে, এখানে ধরে, ওখানে ছেড়ে, আবার নূতন করে ধরে মোতী অনেকক্ষণ

ধরে গানটি গাইল। সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ঝরঝর বারিধারা যে রকম সহজ পথে আকাশ থেকে নেমে আসে, এর গানও হৃদয়ের উৎস থেকে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। রসকষহীন গণি মিয়া পর্যন্ত সরে এসে চৌকাঠের কাছে বসেছে।

গুল বাহাদুর গানের পুরো অর্থ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু রস পেতে খুব যে অসুবিধে হল তা নয়। বাচ্চারা যে রকম গল্প শোনার সময় ভাষার দৈন্য কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিয়ে পুরো রসই পায়, নূতন ভাষা শেখার সময় বয়স্ক লোকও তাই করতে পারে, যদি যে ইতিমধ্যে কল্পনা-শক্তি হারিয়ে না ফেলে থাকে। 'জ্বলে শখের বাতি' বলার সময় মোতীর দেহ যেন আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আর 'দীপ নাই শলিতা নাই' গাইবার সময় মোতীর চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, গুল বাহাদুরও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন।

তবু বললেন, 'বুঝিয়ে বলো।'

'এতে আবার বোঝাবার কি আছে! গুরুকে খবর পাঠাচ্ছি, মহব্বৎ দরদের তেল শলতে নেই ভিতরে, তবু দেহের বাতি জ্বলছে। তা আবার খামোখা দিনের বেলাও জ্বলে। তাই তো তোমাকে বলছিলুম, "গতরটার পানে চেয়ে দেখো"।'

গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'দেশের প্রতি ভালোবাসা, আত্মোৎসর্গ করার তেল শলতে তৈরী করেই আমরা জ্বালিয়েছিলুম গদরের প্রদীপ। সে মিথ্যা, মায়া ফানী।'

কিন্তু মোতীর এই সুন্দর দেহ! এর ভিতর সুন্দর হিয়ার প্রদীপ নেই—অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বললেন, 'মোতী, সবই ভগবানের দান। তাচ্ছিল্য করতে নেই। রোজা ভালো জিনিস, কিন্তু তারও বাড়াবাড়ি করতে নেই। মীরাবাঈয়ের ভজন তুমি শুনেছ,

'নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জল-জন্তু আছে ঢের
কামিনী ত্যাজিলে হরি যদি মিলে
তবে হরি খোজাদের।'

মোতী গদগদ কণ্ঠে বললে, 'এ তো ভারী মধুর, গোসাঁই। আমি কখনও শুনিনি।'

যমুনার পারে রাজপুতানার এক বৈরাগী মীরার ভজন গাইত। গুল বাহাদুর আনমনে তার গান শুনেছেন, মাঝে-মধ্যে, কিন্তু সে গান যে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, তা তিনি নিজেই জানতেন না। ভক্তিরস, ভাবালুতা গুল বাহাদুর কখনও খুব নেকনজরে দেখেননি। বাড়াবাড়ির ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ তবে চলি, মিঠের মা। খোয়াইয়ের জলটা আমার দেখবার ইচ্ছে আছে। গণি আর আনন্দী রইল। কাল সকালে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়ো।'

মোতী বাধা দিল না। গোঁয়ারদের নিয়ে তার জীবনের কেটেছে অনেকখানি—তার বাপ-ভাইরা ছিল এক একটি দুঁদে গোঁয়ার।

শিমুলতলায় এসে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'আচ্ছা গোসাঁই, একটা কথার উত্তর দেবে? এই গণির স্বভাব-চরিত্র কি তা তুমি জানো না। সে আমার বাড়িতে থাকলে তোমার কোনও আপত্তি নেই। সে আমাকে নিয়ে যা-খুশি করুক। কিন্তু তুমি থাকলেই আস্‌মান মাথার উপর ভেঙে পড়ে। কেন বলো তো। ছোটজাতে ছোটজাতে যা-খুশি করুক—নয় কি?'

সত্যি বলতে কি, গুল বাহাদুর পরিস্থিতিটা এভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। কিন্তু মোতীর কথাগুলো এমনি সোজাসুজি তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মগজের উপর ঠনাঠন হাতুড়ী পিটিয়ে দিল যে তাঁকে চিন্তা করে কথাগুলো বুঝতে হল না। প্রথমটায় থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমায় সত্যি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি অতখানি চিন্তা করে এ-ব্যবস্থা করিনি। বোধ হয়, এ ব্যবস্থা আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি যে কারণটা দেখালে সেটাও হয়তো ঠিক, কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তবে বলবো, আমি ভদ্রলোক সাধারণ লোক সকলের সঙ্গে মিশেছি এবং এ-বাবদে আমি গণি মিয়াদের ঢের-ঢের বেশী বিশ্বাস করি। এদের হ্যাংলামো অনেক কম। গরীবের সুন্দরী মেয়েকে মোকায় পেলে "ভদ্রলোক"-এর মাথায় বদ-খেয়াল চাপবেই। ভদ্রলোকের মেয়ে হলেও তাই—তবে সেখানে একটু লাইয়ের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তাই দেখো, ভদ্রলোকের মেয়েকেও আমরা চাকর-বাকরের হেপাজতিতে রাখা পছন্দ করি।—আর—'

'থামলে কেন? বলো।' কঠিন গলা একটু মোলায়েম হয়েছে বলে মনে হল।

'আর গণি ভালো-মন্দ কিছু একটা করতে গেলে তাকে যে রকম ঠাস করে তুমি চড় মারতে পারবে, আমাকে কি—'

ধমক দিয়ে বললে, 'থাক্। কে কাকে চড় মারতো কে জানে!' বিকেল বেলার বৃষ্টিশেষের কনে-দেখার আলো সবটুকু মুখে মেখে এতক্ষণ-গোপনরাখা তার সবচেয়ে মিষ্টি গলায় বললে, 'তবে এসো ঠাকুর।'

* * *

জলের তোড় গুল বাহাদুর অতি উত্তমরূপেই দেখলেন। বাদশা মুহম্মদ তুগলুক যে রকম দিল্লীর জাহানপানা শহরে সাততলা মঞ্চের উপর বসে তাঁর হাজার হাজার সৈন্যস্রোত বয়ে যেতে দেখতেন অর্থাৎ একটা উঁচু ঢিপির উপর বসে জলের তোড়; স্রোতের দু' উঁচু উঁচু ঢিপির উপর রাগী ঢেউয়ের ছোবল তাবৎ বস্তুই দেখলেন, এবং তার চেয়ে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন, মোতীর—মিছরি মা'র কথা গল্প নয়। এর যেখানে হাঁটুজল সেখানেও দাঁড়ায় কার সাধ্য?

সন্ধ্যের সময় আবার বৃষ্টি নামলো। ষোড়শীর রাত কিন্তু মেঘে মেঘে সব অন্ধকার। সমস্ত রাতটা কাটাতে হল ঢিবির উপর।

অভিসম্পাত দিতে দিতে বললেন, 'মহাজনগণ বলেছেন, মেয়েদের বুদ্ধিতে চলো না। হক্ কথা। কিন্তু না চললে কি হয় তাও বেশ টেরটি পেলুম। ওদের কথা শুনলে বিপদ, না শুনলে আরও বিপদ। এ জাতটাই বজ্জাৎ।'

॥ ছয় ॥

কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে পাণ্ডোরা খুলে ফেললে কৌটাটি, আর অমনি তার থেকে পিল পিল করে বেরোতে লাগলে দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আরও কত কী—আর তারই চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়লো ভুবনময়! পাণ্ডোরা ভয়ে ভয়ে ভিরমি যাব-যাব করছে তখন সর্বশেষ বেরলো—আশা। তারই জোরে মানুষ সব দুঃখদৈন্য সয়।

আত্মহত্যার দৃঢ় দড়িতে নিজেকে না ঝুলিয়ে দিয়ে ঝুলতে থাকে সেই আশার ক্ষীণ সুতোটিতে।

সুলেমান যখন তাঁর স্বাধিকার-প্রমত্ত জিন্‌কে শাস্তি দিয়ে বোতলে পুরে, সমুদ্রে ফেলে দেন তখন তাকে পাণ্ডোরার শেষ দৌলতটি নিতে বাধা দেননি। সেই তাঁর চরম করুণা। জিন্নি যদি বোতলের ভিতর বন্দীদশার প্রথম প্রহরেই জানতে পেত তাকে ক'শ বছর ধরে বোতলের ভিতর প্রহর নয়—শতাব্দী গুনতে হবে, সে নিশ্চয়ই থ্রম্বসিসে মারা যেত।

গুল বাহাদুর যদি চিকনকালাতে আশ্রয় নেবার দিন জানতে পেতেন, তাঁকে ক'যুগ ওখানে কাটাতে হবে, তাহলে তিনি নামাবলীতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তেন। পাণ্ডোরার যে ক্ষীণ অংশটি নিয়ে তিনি নামাবলী গায়ে দিয়েছিলেন, সেটি ওঁরই মত এত জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে ওটিকে আর পরা চলে না।

কিন্তু
কেশের আড়ালে জৈছে
পর্বত লুকাইয়া রৈছে

ঠিক তেমনি তাঁর দিন-আনি-দিন-খাই-য়ের আড়ালে আশা-নিরাশা সবকিছুই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সেটা দিব্য যেন ক্লোরফর্ম কিংবা আফিঙের কাজ করে যাচ্ছিল। পরম ধার্মিকজনও যখন দিনযামিনী এটা-সেটার চিন্তায় মশগুল থেকে শেষের দিনের কথা সম্বন্ধে অচেতন হয়ে যেতে পারে, তখন সামান্য প্রাণী গুল বাহাদুর যে পলাশতলায় খাটিয়ার উপর শুয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবেন তার আর বিচিত্র কি?

কালটাও ছিল ধীরমন্থর। কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে তোড়জোড় করতেই লেগে যেত তিন মাস। বিয়ের আলাপ পাকাপাকি করতে নিদেন তিন বছর। এমন কি মরার সময় গঙ্গাযাত্রায় বেরিয়ে সেখানে দিনসাতেক না কাটালে মুরুব্বীরা রীতিমত বেজার হতেন। অত তাড়া কিসের রে বাপু? দু-পাঁচ দিন হরিনাম শুনাব, চন্দন বেটে ধীরেসুস্থে সর্বাঙ্গে হরিনাম ছাপা হবে, ইষ্টিকুটুম খবর পেয়ে ঘরসংসার গুছিয়ে-গাছিয়ে দেখা করতে আসবে, শুনতে পাবি কবে যাবি, ক'দিন আর আছিস তাই নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা হচ্ছে, বাজী ধরা হচ্ছে;—তা না, চললি হুট করে যেন ডাক পড়ার পূর্বেই হাড়-হাবাতে আপন হাতে আসন পেতে বসে গেল যজ্ঞির দাওয়াতে। কিংবা যেন বাসরঘরে পাঁচজনের সামনে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে ফেললি কনে বউয়ের ঘোমটাখানি। কিংবা তারও বেশী।

হিসেব করো দিকিনি গুল বাহাদুর, শান্ত মনে—শুদ্ধ-বুদ্ধ চিত্তে। ক'বছর হল? দশ, বিশ, ত্রিশ? পিছনের দিকে না সামনের দিকে? তুমি বসে আর তারা সামনে দিয়ে চলে গেল, না তুমি তাদের সঙ্গে ছুটে চলেছ, না পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছ? না তুমি কাজের মাঝখানে এমনি যোগসাধনার তুরীয় ভাব অবলম্বন করেছিলে যে কাল, না কাল কেন, হেন স্বয়ং মহাকালই ধূর্জটির জটার ভিতর প্রথম উর্বশীর মত বেশ খানিকটা নেচে কুঁদে, তারপর গঙ্গার মতন এদিক ওদিক পথ না পেয়ে বিষ্ণুর মতন উত্তম ডানলোপিলোর বিছানাতে অনন্ত শয়নে নেতিয়ে পড়েছেন?

কে জানে কি হয়? যেখানে বছরে একদিনও স্মরণ করতে হয় না আজ কোন্ তারিখ, সেখানে একটা বৎসরই একদিন। আর যেখানে দিনে বত্রিশবার স্মরণ করতে হয়, আজ অমুখ তারিখ, সেখানে একটা দিনই এক বৎসর। কে জানে সময় কোন্ দিক দিয়ে যায়?

দশ, বিশ, ত্রিশ বৎসর।

এই মোতীর সঙ্গেই আবার দেখা হতে লেগে গেল দেড় মাস।

সকাল থেকেই পূবের আকাশে মেঘ জমে উঠেছে—সাঁওতাল দেশের সাঁওতালী মেয়ের গায়ের রঙ মেখে। মেঘের পর মেঘ জমেই উঠছে। যেন আকাশের ভরা গেলাসে পর্জন্য এক এক ফোঁটা করে জল ঢালছেন আর দেখছেন, এইবার উছলে পড়ল কি না। ক্ষণে ক্ষণে কালো মেঘের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝলমলানি। যেন ঐ সাঁওতালনীরই শ্যামবদনে টগর-ফুলের সফেদ হাসি। কিংবা যদি ইন্দ্রপুরীতেই ফিরে যাই তবে মনে হবে, মেঘের কালো টানার উপর উর্বশী বিদ্যুতের রুপোর পোড়েন টানছেন, বাসররাতের কাঁচুলির কিংখাপ বুনতে। নাঃ! এ সব তুলনাই অতি কাঁচা। মোক্ষম তুলনাটির চড় বিশ্বসাহিত্যের গালের উপর মেরে দিয়ে গিয়েছেন রাজা শূদ্রক। বিদ্যুৎ যেন শ্যামাম্বু নীলকণ্ঠের গলা জড়িয়ে গৌরীর শুভ্রধবল বাহুলতা।

গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে

হায় রে শূদ্রক! একটু টেনে সামলে উপমাগুলো ছাড়লে না কেন হে পৃথ্বীরাজ, কাব্যসম্রাট? এ যুগের মধ্যমজনকেও যে একদিন রসসৃষ্টি করে নিষ্ক সঞ্চয় করতে হবে সেটা কি তিনি খেয়ালই করলেন না? রাজা হলেই কি এ রকম দান করতে হয়? তাই দেশের রাজা হাতিমতাই অন্নদান করে হয়েছিলেন অন্নরাজ, কিন্তু তিনিও তো বীচির ধান খাইয়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিরন্ন করে যাননি। উপমার বেলা শূদ্রক শেষে নবান্নের বীচিও যে খতম করে গেলেন।

তা যাক্। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-প্রেম, বিশেষ করে আসঙ্গলিপ্সা—এ জগৎ থেকে এখনও লোপ পায়নি।

গুল বাহাদুর দেখলেন, তেপান্তরী মাঠ যেখানে ফালি হয়ে বাঁ দিকে ঢুকেছে, তারই অপর প্রান্তে, মেঘের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে একটা উঁচু ঢিবির উপর ক্ষণিকের তরে দাঁড়ালে। মাঠ-ঘাট জনহীন। বৃষ্টি নামি-নামছি, নামি-নামছি করছে। এ অবেলায় লোকটার আহম্মুখী দেখে গুল বাহাদুর ভুরু কোঁচকালেন।

আধা আলো-অন্ধকারে বেলা কতখানি গড়িয়েছে ঠাহর হচ্ছে না। ঘরে ঢুকে গুল বাহাদুর আনন্দীকে শুধালেন, 'কি খাবে আনন্দী?' দিল্লীতে 'তুই' 'তু' শব্দটা প্রায় উঠে গিয়েছে।

আনন্দীর আটপৌরে পোশাকী একই মেনু। বললে, 'খিচুড়ি আর আলুর দম।' ঐ একটি মাত্র রান্না যার সঙ্গে দিল্লীর রান্নার কিঞ্চিত ঐক্যসখ্য আছে—গরমমশলার কৃপাতে—অবশ্য আনন্দীর অজান্তে। গুল বাহাদুর সাজ-সরঞ্জামের চতুরঙ্গ বাহিনী তোড়জোড় করে যোগাড় করতে লাগলেন। আনন্দী কখনও মায়ের আদর পায়নি। পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে বাপের ধাঁতানি। সেও এটা সেটা যোগান দিতে লাগল।

বৃষ্টি নামবার আগে আরও কিছুটা জল এনে রাখলে ভালো হয় ভেবে গুল বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দাওয়ার এক প্রান্তে খুঁটিতে হেলান দিয়ে মোতী বসে।

'তুমি!'

নিরুত্তর।

'কখন এসেছ? ডাকলে না কেন?'

দেওয়ালের থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললে, 'তুমি আমাকে ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরে চলে গেলে কেন?'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'তাজ্জব কী বাত! অতদূর থেকে আমি তোমাকে চিনবো কি করে? আমি ভাবলুম—'

'দত্যি, দানো, মামদো! তোমাদের কাছে সব মুসলমানই মামদো, না?'

গুল বাহাদুর বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, 'এ কী জ্বালা! হিন্দু নই, তবু হিন্দু অপরাধের হিস্যে আমাতেও অর্সায়?'

গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমাকে আমি বলিনি, আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ। চলো ভিতরে, ঐ দেখ বৃষ্টি আসছে।'

এবারে মারাঠা সৈন্যের অতর্কিতে আক্রমণ নয়। দূরদিগন্ত থেকে হেলেদুলে বিলম্বিত তালে এগিয়ে আসছে আকাশ-জোড়া পাতাল-ছোঁয়া শ্যামসুন্দর মেঘ-বৃষ্টি। এই রকম অগণিত করীযূথ সমাবৃত গাঙ্গেয় চমূ অগ্রসর হচ্ছে শুনেই আলেক্ষান্দর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমীচীন গণনা করেছিলেন।

এবারে মোতী খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিছুতেই থামতে চায় না। যেন পেটের ভিতর হামানদিস্তে দিয়ে কেউ পাথর কুটছে! সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে কাঁপন। গায়ের বসন যেন সে কাঁপন সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে চায়। কার যেন বিরহ-বেদনায় কনকবলয়ভ্রংশ, অর্থাৎ বাজু-বন্দ খোল খোল যাউত হয়েছিল, আজ হাসির হররায় এ রমণীর বসনাঞ্চলপ্রান্ত বিস্রস্ত। এবং স্মরণ রাখা কর্তব্য, গ্রামাঞ্চলে অঞ্চল প্রায়শ উপকণ্ঠিত থাকে না।

চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, 'ঠাকুর, তুমি মস্করা-ফিস্কিরি এক্কেবারে বুঝতে পারো না। ওদিকে কথা কও পাকা পাকা। তুমি একটি আস্ত মেড়া।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'আল্লা করুন, তুমি ঐ রকম মেড়াই থাকো।' আল্লার স্মরণে ডান-বাহু উঁচুতে তুলে আঁচল দিয়ে ঘোমটা টানলে। আজান শুনলে বাঙালী মুসলমান মেয়ে যে রকম করে থাকে।

ওদিকে তখন বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা গুল বাহাদুরের ধুলো-ভরা আঙ্গিনায় হরিন্নুটের বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

গুল বাহাদুর নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য গলা একটু শক্ত করে বললেন, 'ভিতরে চলো।'

মিঠের মা মিশ্রির মিঠা। শক্ত। বললে, 'জোর করে টেনে নিয়ে যাবে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে হাত দু'খানি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নাও।' এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে উঠি-উঠি ভাব। টান দিলেই সুড়সুড় করে ভিতরে চলে যাবে।

গুল বাহাদুর দ্বিধায় পড়লেন। কি আর করেন? সুরটি যতদূর পারেন মমতাময় করে বললেন, 'মেহেরবানি করো।' 'মেহেরবানি' কথাটার আমেজ উর্দু এবং বাঙলাতে এক নয়। সে-কথা না জেনেও আশা করলেন, মুসমানের মেয়ে সুরটি ধরতে পারবে।

মোতী গুনগুন করে গান ধরে ভিতরে গেল। বুঝলো গুল বাহাদুরের হার হয়েছে, কিন্তু এ-লোকটা নিজে যখন বুঝতে পারেনি যে তার হার হয়েছে, তখন সে জেতাতে কি আনন্দ? আর হেরে যাওয়ার দুঃখের ছাপ যদি তার মুখের উপর পড়তো তাহলেই কি

মোতী আনন্দ পেত?

এবারে গুল বাহাদুরকে শুনিয়ে একটু উঁচু গলায় গাইলে,

ও মুর্শীদ তোমার লগে নাই তো অভিমান
আইলে আও, যাইলে যাও, ঠেলে মারো টান
ও মুর্শীদ নাই তো অভিমান।
বাচ্চারে যে ঠ্যালা মারলে কান্দ্যা পড়ে মায়ের কোলে
যতো মারো বাঁচ্যা উঠে তত পরাণখান।
ও গুরু নাই তো অভিমান।
তুলাধুনা কর্‌য্যা, মৌলা, ফেলাও না ফের জান।
করো না খান্ খান্।
জানুক না জাহান্।
মস্তান ফকিরে কয় হেন আমার মনে লয়
গুরুর মনে হৈল ভয়, পায়ে দিল স্থান।
ও মুর্শীদ গেল অভিমান।

এবারে গুল বাহাদুরের গীতটি বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু খটকা লাগলো 'অভিমান' শব্দটি নিয়ে।

মোতী বললে, 'এতে আবার মুশকিল কোথায়? এই মনে করো আনন্দী যদি তোমার উপর রাগ করে খিচুড়ি আলুরদম না খেয়ে শুতে যায় তবে সে তোমার উপর অভিমান করল।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সে তো হল রাগ।'

মোতী বললে, 'তা নয়। যদি সে তখন তোমার ভাতে ছাই মিশিয়ে দেয় তবে হবে রাগ।'

এবারে গুল বাহাদুর অনেকখানি বুঝতে পেরে বললেন, 'ওঃ, তাই তুমি আমার উপর অভিমান করে বাইরে বসে ছিলে?'

মোতী উত্তর দিলে না।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'এ গীত তুমি কাকে শোনালে?'

মোতী নির্ভয়ে উত্তর দিলে, 'তোমাকে, মুর্শীদকে, আর কাকে?'

'তোমার মুর্শীদ কে?'

মোতী হেসে উঠলো। বললো, 'আজ দেখি, তুমি অনেক কথাই শুধচ্ছো। কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, আছে একজন। কিন্তু সে বড্ড বুড়ো। সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'ছিঃ, গুরুকে নিয়ে কি এ ধরনের মস্করা করতে আছে?'

মোতী বললে, 'মস্করা কিসের? এই তো আমার সব। আমার জান ভরে দেবে মহব্বৎ দিয়ে সে তো সব গীতেই আছে। আর আমার শরীরটা? সে বুঝি কিছু নয়? গুরু আমার সব আশা পূর্ণ করবে না?'

গুল বাহাদুর নিরাশ হয়ে বললেন, 'তুমি সব সময় যেন হেঁয়ালিতে কথা কও। তোমার আশা যদি পাপে ভরা হয় তবে সেটাও গুরু পূর্ণ করবেন নাকি?'

মোতী চিন্তা না করেই বললে, 'নিজেই জানি নে কি চাই। কখনও ইচ্ছে করে মা হয়ে ছেলে কোলে নিতে, কখনও বা স্বামী পেতে ইচ্ছে করে, আর কখনও মনে হয় দুচ্ছাই, এসব দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে একটি নাগর পেলে হয়। ঐ যে রকম তোমাদের রাধা ঠাকুরাণী কেষ্ট-মুরারিকে পেয়েছিলেন। রসের সায়রে সুবো-শাম ডুবে থাকবো। আমার শরীর ওর শরীরে মিশে যাবে।'

গুল বাহাদুর হাসিমুখে বললেন, 'যাক বাঁচালি। মনের কেষ্টকে দিলের হরি বানিয়ে পড়ে থাকা। কোন বদনাম হবে না।'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মোতী বললে, 'ছোঃ! বদনাম! ডপকী রাঁড়ী। নিকে করি নে। একলা পড়ে আছি। আমার বদনাম তো লেগেই আছে। নাগর নিলে তার আর বাড়বে কি? মড়ার গোরের উপর এক মণও মাটি শ' মণও মাটি। আমি তাকে সাঁজ-সকাল কোলে নিয়ে দাওয়ায় বসবো—হাটে যাবার পথের পাশে।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, মেয়েটা বদ্ধ পাগল। তারপর ভাবলেন, কিন্তু এরকম সাদা যার দিল তার আর ভাবনা কি? এর ভিতর বাহির দুইই সাফ। বললেন, 'এসব খেয়ালী পোলাও খেয়ে তুমি খুব সুখ পাও, না? কিন্তু যততত্র বলে বেড়িয়ো না।'

মিঠার মা সেদিকে খেয়াল না দিয়ে শুধালে, 'তোমার সম্বন্ধে বেবাক বাৎ আমার শুনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাবাজীদের তো ঘর-গেরস্তীর কথা শোধানো বারণ। তবে যদি অভয় দাও তয় একটি কথা শুধাই।'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করো। আমার কিচ্ছুটি লুকোবার নেই।' তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল গোঁফে চাড়া দেবার। কিন্তু গোঁফ তো আর নেই।

'তোমার বিয়ে-শাদী হয়নি?'

'না।'

'কারোতে মজোনি?'

'না। তবে লক্ষ্ণৌ থেকে একবার একটি বাঈজী এসেছিল। যেমন নাচতে পারতো, তেমনি গান জানতো, তেমনি ছিল চেহারাটি। তাকে বড় ভালো লেগেছিল।'

'তারপর কি হল?'

'কিছুই হল না। আমি অন্য কাজে জড়িয়ে পড়লুম। তারপর এখানে চলে এলুম।'

'ও। কোনও কেলেঙ্কারি করে ভেক নাওনি?'

বোষ্টমদের প্রতি গুল বাহাদুরের কোনও অহেতুক প্রেম ছিল না, কিন্তু তারা 'কেলেঙ্কারি' করলেই শুধু ভেক নেয়, এ ইঙ্গিতটা তাঁর ভালো লাগল না।

বললেন, 'কুল্লে বোষ্টমরা পাষণ্ড?'

'অত রাগো কেন? আমাদের মুসলমান পীরসায়েবদের দেখোনি? তাঁরা যে তাঁদের চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন?'

'সে আবার কি?'

'ঐ, আমার মতো গোটা দশেক খাপসুরৎ ডপকী ছুঁড়ির মধ্যিখানে বসে ভাবখানা করেন, "হেরো, হেরো, আগুন আমারে ছোঁয় না"।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি, তারপর বিস্তর ঘি গলে যায়।'

গুল বাহাদুর খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি অতশত বলছ-কইছ, শুনছ-শোনাচ্ছ কেন বলো তো? আসলে তোমার মতলবটা কি খুলে বলো তো?'

মোতী গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছিল। বললে, 'মতলব কিছুই নয় গোসাঁই। আমি ভেবেছিলুম, তুমি নষ্টামি করে বেরিয়ে এসেছো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার সঙ্গে নষ্টামি করে আমি নষ্ট হব। এই আমার শরীর, এই আমার দিল। ওগুলো যখন কোনও কাজেই লাগলো না, তখন না হয় ভেঙেই দেখি, কি হয়। তা আর হলো না। তুমি বড় সরল, বড় সাদা। তোমার সঙ্গে বনলো না।'

গুল বাহাদুর আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ওটা মিথ্যে কথা। তোমার সবই ভালো। আমি অনেক দেখেছি, আমি ঠিক ঠিক বলতে পারি। অবশ্য আমার সঙ্গে বনলো কিনা সে অন্য কথা।'

মোতী আপত্তি জানিয়ে বললে, 'আমার যদি সবই ভালো তবে তাই হোক ঠাকুর। এবারে তোমাকে শেষ প্রশ্ন শুধাই। তোমার সংসারে মন বসলো কেন, সেইটে আমায় বলো।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সংসারে আমার রত্তিভর অরুচি হয়নি, মোতী। আসলে আমি শিবুর মতো গদরের সেপাই। তোমার স্বামীর যা হওয়ার কথা ছিল। লড়াইয়ে হেরে গা-ঢাকা দিয়েছি। ভেক নিয়েছি যাতে করে দুশমন চিনতে না পারে—আমি মুসলমান।'

* * *

লেখকের নিবেদন :

এখানেই 'এক পুরুষ' শেষ।

বইখানা 'তিন পুরুষ'-এ সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুই যখন 'তিন পুরুষ' লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে 'যোগাযোগ' নাম দিলেন তখন যাঁর কৃপায় 'মূক বাচাল হয়' তাঁরই কৃপায় এস্থলে 'বাচাল মূক হল'।

কবিরাজ চেখফ

উত্তম গুরুর সদুপদেশ পেলেই যদি সার্থক লেখক সৃষ্টি হতেন তবে ইহ-সংসারে আমাদের আর কোনও দুর্ভাবনা থাকতো না। কারণ আমার বিশ্বাস, এতাবৎ বহুতর গুরু অপ্রচার পুস্তকে নানাবিধ সদুপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, এবং সদুপদেশতিয়াষী তরুণ সাহিত্যযশা-ভিলাষীরও অনটন এই বঙ্গদেশে নেই।

আমি সার্থক সাহিত্যিক নই, তবে কিছুটা লোকায়ত ('জনপ্রিয়' বললে বড্ড বেশি দম্ভভাষণ হয়ে যায়) বটি। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি সোল্লাসে বলেছিলেন, 'আপনার লেখা পড়লেই পাঁচকড়ি দের কথা আমার মনে আসে।'

আমি সাতিশয় শ্লাঘা অনুভব করেছিলুম। আমি জানি আপনারা পাঁচজন পাঁচকড়িকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। যদিও শুধোই, বুকে হাত দিয়ে উত্তর দিন তো, পনেরো বছর বয়সে পাঁচকড়ি পড়ে আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়-স্তম্ভন হয়নি? আপনার চৈতন্যকে এরকম

সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ একাগ্রমনা করতে পেরেছেন ক'জন লেখক? এবং স্বয়ং গীতা বলেন, চৈতন্যকে সর্বপ্রথম নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় একাগ্র করে তবে ধ্যানলোকে প্রবেশ করবে। স্বয়ং পতঞ্জলিও বলেন, ধ্যানের বিষয়বস্তু অবান্তর। তা সে যাক্। আসল কথা সে বয়সে পাঁচকড়ি আপনাকে এমনি একাগ্রমনা করে দিয়েছিলেন যে আপনি তখন দেশকালপাত্র ভুলে গিয়েছিলেন। এবং এটা যে আর্টের অন্যতম লক্ষণ সেটি সর্বজনবিদিত। তা হলে আজ আপনি পাঁচকড়ির নামে নাক সেঁটকান কেন? পাঁচকড়ি পড়ার পূর্বে সাত বছর বয়েসে আপনি রূপকথা পড়েছিলেন, আজ পড়েন না, কিন্তু তাই বলে তো আপনি ওর পানে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসেন না, কেন?

টলস্টয় বলেন, যে বই সর্বযুগে সর্ববয়সের লোক পড়ে আনন্দ পায় সেই বইই উত্তম বই। সে রকম বই ইহসংসারে অতিশয় বিরল। টলস্টয় মহাভারতের নাম করেছেন। আমরা সম্পূর্ণ একমত। (তিনি তাঁর নিজের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'র নিন্দা করেছেন। আমরা একমত নই)।

অতি অল্প লেখককেই টলস্টয় আর্টিস্ট বা সৃষ্টিকর্তা রূপে স্বীকার করেছেন। চেখফ তাঁদের একজন।[১] তাঁকে তিনি বলেছেন রিয়েল আর্টিস্ট—

পাঠক সেটি পরে সবিস্তর শুনতে পাবেন।

চেখফের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

প্রথম ছবি দেখি, রুশের এক গণ্ডগ্রামে ঘরের ছেলে চেখফ গাঁয়ের পাঁচজন মাতব্বরের চালচলন কথাবার্তার ভঙ্গির অনুকরণ করে বাড়ির পাঁচজনকে হাসাচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্লাসের সর্দার পড়ুয়াও বটে।

তার পরের ছবি দেখি মস্কোতে। গরীব পরিবারে। একটা ছোট্ট ঘরে মা কচুঘেঁচু রাঁধছেন, বাবা অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে আপন মনে গজ্ গজ্ করছেন, ভাইবোনেরা কিচিরমিচির করছে, আর মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র চেখফ—বয়স উনিশ—তারই এককোণে, হট্টগোল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, খস্ খস্ করে পাতার পর পাতা ফার্স লিখে যাচ্ছেন। তিনি জানেন, খুব ভালো করেই জানেন, রসিকতাগুলো কাঁচা, কিন্তু তার চেয়েও ভালো করেই জানেন, খবরের কাগজের গ্রাহক রামাশামা এ ধরনের রসিকতাই পছন্দ করে, সম্পাদক মশাইও সেই মালই চান। লেখা শেষ হল। রান্না তখনও শেষ হয়নি। চেখফ ছোট ভাইকে বললেন, লেখাটা নিয়ে যা তো অমুখ পত্রিকার আপিসে। দু'পাচ টাকা যদি দেয় তবে কিছু কাবাব-টাবাব কিনে আনিস। কচুঘেঁচু গেলার সুবিধে হবে।

এর পাঁচ বছর পর চেখফ মেডিকেল কলেজ পাস করলেন।

কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করা চেখফের আর হয়ে উঠলো না। ইতিমধ্যে রুশদেশ জেনে গিয়েছে, চেখফের সার্জিকাল ছুরির চেয়ে তাঁর কলমের ধার বেশী। তবু সরকার

---

১ টলস্টয় চেখফকে এত গভীর ভাবে ভালোবাসতেন যে একদিন টলস্টয়ের বাড়ি ইয়াসানা পলিয়ানাতে যখন তিনি আর গর্কি বসে গল্প করছেন তখন চেখফ বাগানের অন্য প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে টলস্টয় গর্কিকে বলেন, 'জানো গর্কি, চেখফ যদি মেয়েছেলে হত তবে আমি ওকে বিয়ে না করে থাকতে পারতুম না।' যাঁরা বর্তমান লেখকের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অপছন্দ করেন, তাঁরা বাকী প্রবন্ধ না পড়ে সোজা চেখফের দুলালী গল্পের অনুবাদে চলে যাবেন।

তাঁকে পাঠালেন সাখেলিন দ্বীপের কয়েদীদের সম্বন্ধে মেডিকেল তদন্ত করতে। সে রিপোর্ট তিনি এমনই বুকফাটানো জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন যে তারই ফলে সরকার কয়েদীদের জন্য বহু সুব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এ রিপোর্টখানা আমি কিছুতেই সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমার বড় বাসনা ছিল দেখবার, সাহিত্যিক যখন মেডিকেল রিপোর্ট লেখে তখন তার কলম কি ভাবে চালায়? সংযত করে? যাতে করে লোকে না ভাবে সাহিত্যিক তার হৃদয়-উচ্ছ্বাস দিয়ে তথ্যের দীনতা ঢাকতে চেয়েছে—কেসে পয়েন্ট না থাকলে উকীল যে রকম গরম লেকচার ঝাড়ে আর টেবিল থাবড়ায়। কিংবা তাঁর জোরদার কলম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে? কিংবা উভয়ের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে? রবীন্দ্রনাথ যখন সভ্যতার সংকট লিখেছিলেন তখন তাঁর লেখনে কতখানি রাষ্ট্রদর্শন আর কতখানি কবির তীব্র হৃদয়-বেদনার পরিপূর্ণ প্রকাশ!

তারপর একবার লেগে যায় রুশ দেশে জোর কলেরা। সেই এক বছর চেখফ ডাক্তারি করেন প্রাণপণ। ব্যস।

খাস পশ্চিমের লোক বয়েস হওয়ার পর বিয়ে-শাদী করে কস্মিনকালেও বাপ-মায়ের সঙ্গে বসবাস করে না। ভিন্ন সংসার পাতে। রুশদের বোধ হয় কিছুটা প্রাচ্যের আমেজ ধরে।

কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই চেখফ গ্রামাঞ্চলে কিঞ্চিৎ জমিজমা ও ছোট্ট একটি বসতবাড়ি কিনলেন। বাপ-মায়ের সঙ্গে সেখানে ছটি বৎসর চেখফ বড় আনন্দে কাটালেন। চেখফের সমগোত্রীয় আরেকজন অতিশয় দরদী লেখক, আলফঁস দোদেও ঠিক ঐরকমই মোটামুটি ঐ সময়েই অসুরের মত খেটে পয়সা রোজগার করে গরীব বাপ-মাকে গ্রাম থেকে এনে প্যারিসে আরামে রেখেছিলেন। জীবনের এই ছটি বৎসর চেখফের বড় শান্তি আর আনন্দের মধ্যে কাটে। এর পরই দেখা দিল তাঁর শরীরে ক্ষয়রোগের চিহ্ন এবং বাকি জীবনের অধিকাংশ তাঁকে কাটাতে হয় ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে, সমুদ্রপারে। চেখফের বয়স তখন একচল্লিশ। তাঁর ক্ষয়রোগের কথা জেনেশুনেও তাঁরই নাট্যের অসাধারণ সুন্দরী এক অভিনেত্রী তাঁকে বিয়ে করেন। তিন বৎসর পর খ্যাতির মধ্যগগনে চেখফ-ভাস্কর অস্ত গেল। দাম্পত্য জীবনে সুখ বলতে তাঁর স্ত্রী পেয়েছিলেন স্বামীকে সেবা করার আনন্দ। অভিনেত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কয়। তাই বলে নেওয়া ভালো, চেখফের স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বাকি জীবন নির্জনে অতিবাহিত করেন। মডার্ন গল্প উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় তাজ্জব মানবেন। চেখফের বিধবা তখন যুবতী। রুশে বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় তো নয়ই, যুবতী, বিধবা পুনরায় বিবাহ না করলে তাকে 'আহাম্মুখ' আখ্যা দেওয়া হয়। মা হওয়ার গৌরব থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করলেন। তিনি ত্যাগ ও প্রেমের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন। এ কথাটা বলতে হল চেখফ-চরিত্র বোঝাবার জন্য। তিনি নিশ্চয়ই এমনই গভীর প্রেম দিয়ে তাঁর স্ত্রীর জীবন উদ্দীপ্ত করে দিয়েছিলেন যে সেই দীপ্ত দীক্ষায় প্রজ্বলিত তাঁর প্রেম-প্রদীপ চেখফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হল না। তারই অনির্বাণ বহ্নিতে তাঁর ভবিষ্যতের পথ আলোকিত হয়ে রইল।

চেখফের জীবন সংক্ষিপ্ত ও আদৌ ঘটনাবহুল নহে। যে কটি ছবি আমাদের চোখের সামনে আসে সেগুলিই মধুর। শুধু শেষের চিত্রটি বড় করুণ। রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে আজীবন বিলাসে লালিতা এই যে অসাধারণ গুণবতী রমণী তাঁর স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কন্টিনেন্টের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যনিবাস থেকে স্বাস্থ্যনিবাস, এক ধন্বন্তরী

থেকে অন্য ধন্বন্তরীর পদপ্রান্তে পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করলেন, আপন হৃদয়াবেগ শান্ত মুখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, কত না বিনিদ্র যামিনী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কাটালে, অসীম ধৈর্যে মিশ্রিত অক্ষয় সেবায় ক্ষয়রোগীর প্রতিটি পীড়িত মুহূর্তের যন্ত্রণাভার লাঘব করলে—এ ছবিটি একাধিক রুশ লেখক এঁকেছেন।

টলস্টয়ের বৃদ্ধ বয়সে চেখফের তিরোধান তাঁর বুকে বড় বেজেছিল—চেখফকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গর্কি তখন লেখেন চেখফ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ইয়াসানা পলিয়ানাতে এই ত্রিমূর্তির আলোচনা, হৃদ্যতার আদান-প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোরম একাধিক প্রবন্ধ রুশ ভাষায় বেরিয়েছে। চেখফ স্বয়ং তাঁর 'নোটবুকে' কিছু কিছু লিখে গিয়েছেন। টলস্টয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। অবশ্য সে-শ্রদ্ধা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি টলস্টয়ের 'নীতিমূলক' (স্টরি উইথ এ মরাল) গল্পের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু রিয়েল আর্টিস্ট (টলস্টয়ের ভাষায়) তো বেশীদিন অন্যের পথে চলতে পারে না—তা সে পথ যতই শান বাঁধানো প্রশস্ত হক না কেন।

গর্কি তাঁর নাট্যরচনায় চেখফের অনুকরণ করেছেন। এস্থলে পাঠক-পাঠিকার স্মরণার্থে উল্লেখ করি,

টলস্টয়	: জন্ম	১৮২৮	মৃত্যু	১৯১০
চেখফ	: ,,	১৮৮৬	,,	১৯০৪
গর্কি	: ,,	১৮৬৮	,,	১৯৩৬

চেখফ আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আমি এক যুগ ধরে লিখে যেতে পারি। তাঁর প্রতিটি গল্পে টীকা লিখতে লিখতেই আমার বাকী জীবন কেটে যাবে। অথচ এই প্রবন্ধ শেষ করতে হবে, এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লিখছি সেটি ভুললেও চলবে না।

পূর্বেই বলেছি, বঙ্গসাহিত্যে আমি যশস্বী লেখক নই, কিন্তু পপুলার বটি। সেই কারণেই বোধ হয়, আমি কিছু অনুরোধ পেয়েছি, পত্র-লেখকদের জানাতে, কোন্ কোন্ লেখক পড়লে তাঁরা লাভবান হবেন। বিদায় নেবার প্রাক্কালে নিবেদন, ছোট গল্প দিয়েই সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করা প্রশস্ত এবং সম্মুখে চেখফের ফোটোগ্রাফ টাঙিয়ে নিয়ে। এমন কি যাঁরা পরবর্তীকালে উপন্যাস লিখবেন তাঁরাও চেখফ চেখে, শুঁকে, সর্বাঙ্গে মেখে উপকৃত হবেন। এ প্রবন্ধটি তাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা।

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, রুশ সাহিত্যে চেখফের অনুকরণ করেছেন অনেকেই কিন্তু 'টলস্টয়-ঘরানা', 'ডস্টয়েফস্কি ঘরানা'র মত 'চেখফ-ঘরানা' কখনও নির্মিত হয়নি। তার কারণ চেখফকে অনুকরণ করা অসম্ভব।

তবে সে উপদেশ দিচ্ছি কেন?

কারণ অসম্ভবের চেষ্টা করলেই সম্ভবটা হাতে আসে, সম্ভব হয়।

* * *

চেখফের আছে কি?

অদ্ভুত সহানুভূতি। সমবেদনা। সহানুভূতি সমবেদনা বললে কমই বলা হয়। মপাসাঁর 'বুল্ দ্য সুইফ্' ('চর্বির গোলা', 'এ বল অব্ ফ্যাট') যখন ঘোড়া-গাড়িতে ফিরে অঝোরে

কাঁদছে তখন মপাসাঁও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছেন, কিন্তু চেখফ যখন তাঁর কোচম্যানের দুঃখের কাহিনী বলেন তখন মনে হয় তিনি স্বয়ংই যেন সেই কোচম্যান।

গল্পটির প্লট এতই সরল যে কয়েক ছত্রে বলা যায়। এক ছ্যাকড়া গাড়ির কোচম্যান শহরে গাড়ি খাটায়, একমাত্র ছেলে থাকে গ্রামে। হঠাৎ খবর পেলে তার সে জোয়ান ছেলে মারা গিয়েছে। বুড়োর তিন কুলে কেউ নেই যাকে সে তার দুঃখের কাহিনী বলে। পেটের ধান্দায় বেরোতে হয়েছে গাড়ি নিয়ে। উঠেছে এক সোয়ারি। বুড়ো কোচম্যান আস্তে আস্তে আলাপচারী জমিয়ে যখন তার পুত্রাশেকের কাহিনী বলতে যাবে, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সোয়ারি ঘুমিয়ে পড়েছে। থামতে হল। তারপর উঠলেন এক জেনরেল। 'জলদি চলো, জলদি চলো' আর ধমকের চোটে সে তার কাহিনী আরম্ভ করেও শেষ করতে পারলো না। তারপর উঠল জনাতিনেক ছাত্র। তাদের হৈ-হল্লার মাঝখানে বুড়ো কোন পাত্তাই পেল না। তার পর উঠলেন আর এক ভদ্রলোক—ভারী দরদী। তাঁকে যখন দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদটা দেবে ঠিক তখনই তিনি বলে উঠলেন, 'থ্যাংক গড্। ঐ আমার বাড়ি। পৌঁছে গিয়েছি।' বলা হল না। রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে। বুড়ো বাড়ি ফিরল। ঘোড়াটাকে দানা দিয়ে ডলাই-মলাই করতে করতে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, 'তোকে কি আর আমি ভালো করে ডলাই-মলাই করতে পারি, বাছা। বুড়ো হাড়ে আর কি আমার তাগৎ আছে? থাকতো আমার ছেলে! তাকে তো তুই চিনিস নে। হ্যাঁ, তার ছিল গায়ে জোর। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। সে যদি থাকতো আজ, তবে বুঝিয়ে দিত ডলাই-মলাই কারে কয়।' ঘোড়াটা আপন খেয়ালে গর্‌গর্ করে নাক দিয়ে শব্দ ছাড়লো। কেমন যেন দরদ ভরা—অন্তত বুড়োর তাই মনে হল।

তখন—তখন? বুড়ো ঘোড়াটাকে তার শোকের কাহিনী বলে দিল।'[১]

যতবার গল্পটি পড়ি চোখে জল ভরে আসে—এখন আরও বেশী, কারণ আমার বয়েস ঐ কোচম্যানেরই কাছাকাছি...আর মনে হয়, কে বলে চেখফ ডাক্তার ছিলেন, কে বলে তিনি রূপসী অভিনেত্রী বিয়ে করেছিলেন, কে বলে তিনি টলস্টয়ের বন্ধু? তিনি নিশ্চয় ছিলেন ঐ কোচম্যান।

অনুকরণ করুন এই গল্পটির। কিংবা আরম্ভ করুন অন্যভাবে।

যেমন মনে করুন আপনার প্রিয়া সর্বাংশে আপনার চেয়ে গুণবান একটি 'লভার' পেয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন তার সঙ্গে। আপনি ঘন ঘন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' পড়ে হৃদয়বেদনায় মালিশ করছেন, কিন্তু কোনও ফায়দা ওৎরাচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল আপনার এক বান্ধবীর এক বান্ধবী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত আরেক ভদ্রলোকও আপনার বন্ধু। আপনি ভাবলেন, 'তাঁদের কাছে গিয়ে আমার দুঃখের কাহিনী কই।' দুজনেই বড় দরদী। দুজনাই আপনার আপসাআপসি সাতিশয় মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু হায়, শেষটায় দেখলেন, ওদের দুজনারই পাকা রায়, আপনাকে কলার খোসাটির মত রাস্তায় ফেলে দিয়ে আপনার প্রিয়া অতিশয় বিচক্ষণার কর্ম করেছেন!

এটা আপনি ব্যঙ্গ করে লিখতে পারেন, হাস্যরসে ভর্তি করে লিখতে পারেন, দু' ঘটি

---

১ গল্পটির প্লট আমার ঠিক ঠিক মনে নেই; তবে হরেদরে এই।

চোখের জল করুণ রসে ঢেলে বানিয়ে লিখতে পারেন, যৌনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দিয়েও লিখতে পারেন—কিন্তু আপনি চেখফ হবেন তখনই যখন পাঠক পড়ে মনে করবে এটি একান্ত আপনারই অভিজ্ঞতা। অথচ আপনার এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আদপেই হয়নি, আমার কাছে প্লটটি শুনে, এবং চেখফের কোচম্যানের গল্পটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন মাত্র।

এবারে টেকনিকাল দিক।

এখানে এসে সর্ব আলঙ্কারিকের ওয়াটারলু।

রস কি, এস্থলে কথাসাহিত্যে কি সে-বস্তু যা আমার মনে কলারসের সঞ্চার করে—সেখানে যদি বা কোনও গতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ বর্ণনা করা যায়, তবু করা যায় না রসসৃষ্টি হয় কোন্ উপাদানে, কোন্ প্রক্রিয়ায়!

কাজেই আমি সামান্য দুটি নির্দেশ দেব।

প্রথম বাকসংযম। 'সে বলে বিস্তর মিছা যে বলে বিস্তর'—বলেছেন ভারতচন্দ্র। এ-স্থলে 'সে রচে নিরস রস যে বলে বিস্তর।'

এখানে চীনা চিত্রকরদের কথা স্মরণে আনবেন। পাঁচটি আঁচড়ে আঁকা বাঁশের মগডালে একটি পাতা—আপনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন পাতাটি ফর ফর করছে। তিনটে আঁচড়ে আঁকা একটি উড়ন্ত হাঁস। আপনি দেখতে পেলেন যেন নীলাকাশে শরতের সাদা মেঘ—ভালো করে তাকানোই যায় না, চোখ ঝলসে দেয়।

তার অর্থ উড়ন্ত হাঁস আঁকার সময় চিত্রকর সম্পূর্ণ হাঁস আঁকেন না। ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় বিন্দু ও বক্ররেখা (পইন্ট কার্ভ) দিলে পাঠকের মন নিজেই বাকিটা এঁকে নেবে, পাঠকের চোখ নিজেই বাকিটা দেখে নেবে ঠিক সেই সেই জায়গায় চিত্রকর তুলি ছুঁইয়েছেন।

চেখফও ঠিক তাই করতেন। কয়েকটি পইন্ট ও কার্ভ—শব্দের মারফতে—এমনই ভাবে এঁকে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ ছবিটি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে। শুধু তাই নয়, এমনই সূক্ষ্ম দানাওলা ফিলমে তোলা ফটোগ্রাফ যে যার যেমন কল্পনার লেন্স্ সে তেমনি বিরাট আকারে সেটিকে এনলার্জ করতে পারে। কোচম্যান চেষ্টা করেছিল তিন না চার টাইপের সোয়ারির কাছে তার হৃদয়বেদনা প্রকাশ করার; আপনি দেখতে পাবেন যে তাবৎ মস্কো শহরের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দুয়ারে শির হেনে হেনে হতাশ হচ্ছে। আর সেই দরদী ঘোড়ার গর্‌র্‌র্ শব্দ যে শুধু জানতে পাবেন তাই নয়, শুনতে পাবেন সে যেন বহু আবেগ থেকেই কোচম্যানকে বলছে, 'কেন তুমি আজেবাজে লোকের কাছে এসব দুঃখের কথা বলতে যাও? কে বুঝবে তোমার হৃদয়বেদনা? সবাই আপন স্বার্থ নিয়ে মগ্ন। বলো আমাকে। হাল্কা হবে।' তারপর হয়তো আপন মনে বলছে, 'জানি তো সবই। কিন্তু হায় করি কি? এ যে ভগবানের মার।'

গুণীরা বলেন সর্বনিম্নে জড়জগৎ, তারপর তৃণজগৎ, তারপর পশুজগৎ—সর্বোচ্চে মানুষ। চেখফের গল্পটি পড়ার পর মত পালটাতে হয়।

এস্থলেই ক্ষান্ত হোক আমার অক্ষম লেখনীর ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এইবার পড়ুন চেখফের একটি গল্পের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদটি করেছেন আমারই অনুরোধে আমার সখা মৌলানা খাফী খান। 'যদ্দৃষ্টং' এবং 'প্রিয়াঙ্গী'র লেখক।

॥ দুলালী ॥

ওলেঙ্কা অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসেসর প্লেম্ইয়ান্নিকভের মেয়ে। সে ভাবনায় ডুবে বসেছিল উঠোনের সামনে ছোট্ট বারান্দাটিতে।

গরম, মাছিগুলো আঠার মত লেগে আছে, বিরক্ত করছে। একটু বাদেই যে সন্ধ্যে হবে সে কথা ভাবতে ভালোই লাগছে। পূব দিক থেকে ঘন কালো মেঘ এসে জমা হচ্ছে, সেই সঙ্গে থেকে থেকে ভিজে হাওয়ার আমেজ আসছে।

উঠোনের মধ্যিখানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কুকিন্। লোকটি থিয়েটারের ম্যানেজার, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এক বাগানে একটি আনন্দমেলার আসর জমায়—নাম 'তিভলি প্রমোদ উদ্যান'। থাকে ওলেঙ্কাদের বাড়ির একপাশে ভাড়া নিয়ে।

কুকিন্ হতাশ হয়ে বলল, "আবার! আবার এল বৃষ্টি! রোজ বৃষ্টি, রোজ, যেন আমাকে নাকাল করার জন্যেই নামে! গলায় দড়ি দিই না কেন? সর্বস্ব গেল। দিন দিন লোকসান আর লোকসান!"

দু হাত জুড়ে ওলেঙ্কার দিকে ফিরে কুকিন্ আবার বলতে লাগল, "এই তো জীবন আমাদের, ওল্গা সেম্ইয়নভ্না। দু চোখ ফেটে জল আসে। খেটে মরি, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করি, সারারাত জেগে ভাবি কী করে জিনিসটাকে উঁচুদরের করে তোলা যায়। হয় কী? এদিকে দেখ, লোকগুলোকে—আহাম্মুখ, বর্বর।

"আমি ওদের দেখাই সেরার সেরা ছোট ছোট অপেরা, কথা-ছাড়া শুধু ভঙ্গী দিয়ে বোঝানো নাটক, অপূর্ব অপূর্ব ভ্যারাইটি আর্টিস্ট। কিন্তু ওরা কি ও জিনিস চায়? বোঝে তার মর্ম? ওরা শুধু চায় হৈ-হুল্লোড়! ওদের দেখাতে হয় রদ্দি চীজ।

"আবার ইদিকে দেখ আবহাওয়াখানা! প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃষ্টি। ১০ই মে থেকে শুরু হল, চলছে রোজ, গোটা মে-জুন মাসটাই! দর্শকের দেখা নেই, অথচ বাগান-ভাড়াটা? সেটি ঠিক ধরে দিতে হয়। আর গাইয়ে-বাজিয়েদের মাইনেটা?"

পরদিন সন্ধ্যের দিকে আবার দেখা দিল মেঘ। হি হি করে হেসে উঠল কুকিন্। বললে, "এসো, এসো বৃষ্টি। দাও ভাসিয়ে আমার প্রমোদ উদ্যান। সব ডোবাও, তারপর আমাকেও ডোবাও। আমার ইহলোক পরলোক দুইই মজুক! মামলা করুক আমার আর্টিস্টরা আমার নামে, পাঠাক জেলে—সাইবীরিয়ার নির্বাসনে—ফাঁসিকাঠে! হাহা হাহাঃ।"

তার পর দিন আবার ঐ।

ওলেঙ্কা চিন্তিত মুখে, নীরবে কুকিনের কথাগুলি শুনত। মাঝে মাঝে তার চোখে জল এসে পড়ত। এত উতলা হয়ে উঠত তার মন কুকিনের দুর্ভাগ্যে যে শেষ অবধি সে ওর প্রেমেই পড়ে গেল।

কুকিন্ মানুষটি বেঁটে, রোগা। মুখখানা ফ্যাকাশে। চুল আঁচড়ে রগের ওপর টেনে নামানো। সরু গলায় কথা কয়, মুখ একপাশে বেঁকিয়ে। চেহারায় চিরকেলে নৈরাশ্যের ছাপ। তবু সে ওলেঙ্কার মনে গভীর এবং অকৃত্রিম একটি ভাব জাগিয়ে তুলল।

ওলেঙ্কা সর্বদাই কারও না কারও প্রেমে অভিভূত হয়ে থাকত। প্রথমে ছিল বাবা।

এখন তিনি রুগ্ণ; অন্ধকার একখানা ঘরে সারাদিন আরামকেদারায় বসে তাঁর দিন কাটে। শ্বাসকষ্টে কাতর।

তারপর সে ভালোবাসলো তার এক খুড়িমাকে। তিনি থাকতেন ব্রিয়ানস্কে, দু বছরে একবার করে আসতেন। তার আগে, যখন সে ইস্কুলে পড়ত, তখন তার প্রেমপাত্রী ছিল তার ফরাসী শিক্ষিকা।

ওলেঙ্কা মেয়েটি শান্ত, সহৃদয়—বড় ভালো স্বভাবের। চোখ দুটি ভীরু নিরীহ। নিটোল স্বাস্থ্য। তার টলটলে, লাল্‌চে গাল দুখানি, ধপধপে সাদা নরম তুলতুলে ঘাড়ের উপর ছোট্ট কালো তিলটি, আর সরল স্নিগ্ধ যে হাসিটি ফুটে উঠত তার মুখে খুশীর কোনও কথা শুনলেই, তা দেখে ছেলেরা ভাবত "মন্দ নয় তো মেয়েটি"। বেশ হাসতও। আর মেয়েরা তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ তার হাতখানি ধরে বলে উঠত, কথার মধ্যিখানে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে, "ও দুলালী!"

জন্ম থেকে যে বাড়িতে ওলেঙ্কার বাস, তার বাবার উইল অনুযায়ী সেটি তারই প্রাপ্য। বাড়িখানা ছিল শহরের একটু বাইরের দিকে। জিপ্‌সী রোডের উপর। প্রমোদ উদ্যান "তিভলি" থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে যখন সন্ধ্যেবেলায় বা রাত্রে বাজনা বাজত, বাজি ফুটত, ওলেঙ্কার মনে হত যেন যুদ্ধ বেধেছে কুকিনের সঙ্গে তার নিয়তির। কুকিন্‌ লড়ছে তার প্রধান শত্রু নিঃসাড় দর্শকগুলোর সঙ্গে। অমনি ওলেঙ্কার মন গলে যেত। ঘুমোতে ইচ্ছে করত না। ভোররাত্রে কুকিন্‌ যখন বাড়ি ফিরত, তখন ওলেঙ্কা তার শোবার ঘরের জানলায় আস্তে আস্তে টোকা দিত, আর পরদার ফাঁক দিয়ে শুধু তার মুখখানা আর কাঁধের একটুখানি দেখিয়ে তার দিকে চেয়ে হাসত, নরম হাসি।

কুকিন্‌ বিয়ের প্রস্তাব করল, বিয়ে হয়ে গেল। তারপর দেখল, বেশ ভালো করে, ওলেঙ্কার ঘাড়খানি আর তার সুন্দর মোটা-সোটা কাঁধ দুটি। দেখে বলে উঠল, "দুলালী।"

কুকিন্‌ খুশী হল, তবে তার বিয়ের দিন এবং রাত্রেও বৃষ্টি হল, তাই মুখের নিরাশ ভাবটা বদলালো না।

দুজনের বনে গেল বেশ। ওলেঙ্কা টিকিট বিক্রির দিকটা দেখত, হিসেব রাখত, মাইনে-পত্তর দিত। তার ছলাকলাবর্জিত হাসিটিতে কখনও টিকিটঘর, কখনও খাবার দোকানটি, কখনও রঙ্গমঞ্চের দুটি পাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

বন্ধুদের সে বলতে আরম্ভ করলে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য বস্তু হল নাট্যশালা—প্রকৃত আমোদ একমাত্র এরই মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। এর দ্বারাই মানুষ হয়ে উঠতে পারে ভদ্র এবং মানবতাবোধসম্পন্ন।

"কিন্তু লোকে কি তা বোঝে?" বলত ওলেঙ্কা! "ওরা চায় হৈ-হুল্লোড়। কাল আমরা দেখালাম 'উল্টোপাল্টা ফাউস্ট'—বক্সগুলোর প্রায় সব কটিই খালি রইল। কিন্তু যদি ভানিচ্‌কা আর আমি দেখাতাম ওঁচা একটা কিছু, দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত রঙ্গালয়। কাল ভানিচ্‌কা আর আমি দেখাচ্ছি 'নরকে অর্ফেউস্‌'—নিশ্চয়ই এসো কিন্তু।"

কুকিন্‌ থিয়েটার সম্বন্ধে অভিনেতাদের সম্বন্ধে যাই বলত ওলেঙ্কা তারই পুনরাবৃত্তি করত। কুকিনের মতই সেও দর্শকদের অজ্ঞতা এবং রসবোধের অভাবকে ঘৃণা করত।

মহড়ায় আসত ওলেঙ্কা, অভিনেতাদের ভুল শোধরাত, বাজিয়েদের গতিবিধির দিকে চোখ রাখত। খবরের কাগজে যদি খারাপ কিছু মন্তব্য করা হত তবে সে কেঁদে ফেলত, যেত সম্পাদকের কাছে, কৈফিয়ৎ চাইত।

অভিনেতারা তাকে ভালোবাসত, ডাকত "ভানিচ্‌কা" আর আমি, "দুলালী" বলে। ওলেঙ্কার ওদের জন্য কষ্ট হত, মাঝে মাঝে টাকা ধার দিত অল্প-স্বল্প, ঠকালে গোপনে চোখ মুছত, স্বামীর কাছে নালিশ করত না।

শীতের মরসুমেও ওদের গেল ভালোই। মিউনিসিপ্যালিটির থিয়েটারখানা ওরা ভাড়া নিল, নিয়ে অল্পদিনের মেয়াদে ভাড়া দিল উক্রাইন-দেশী একটা দলকে, এক জাদুকরকে, স্থানীয় একটি নাটুকে সঙ্ঘকে।

ওলেঙ্কা হয়ে উঠল আরও গোলগাল, মুখে ফুটল কায়েম একটা খুশীর জৌলুস, কুকিন্ হয়ে গেল আরও রোগা, মুখ হল আরও হল্‌দে। ভয়ানক লোকসানের বুলি তার মুখে লেগেই রইল, যদিও শীতের বাজারে ব্যবসা তার মোটেই খারাপ চলেনি।

কুকিন্ রাত্রে কাশে। ওলেঙ্কা ফলের রসের সঙ্গে ফুল মেড়ে তাকে খাওয়ায়, বুকে তেল মালিশ করে, নিজের নরম শালগুলো দিয়ে তার গা ঢাকে।

বলে, "কী মিষ্টি তুমি মণি।" চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, অন্তর থেকেই, "আমার সুন্দর, আমার বুকের ধন।"

শীতের শেষে কুকিন্ গেল মস্কো, নতুন একটা দল নিয়ে আসতে। ওলেঙ্কা কুকিন্ বিহনে ঘুমোতে পারে না। সারারাত জানালার ধারে বসে তারার দিকে চেয়ে থাকে। ঘরে মোরগ না থাকলে মুর্গী যেমন সারারাত অস্বস্তিতে কাটায়, জেগে থাকে, ওলেঙ্কারও তেমনি হয়।

মস্কোয় কুকিন্ আটকা পড়ে গেল। চিঠি দিল ওমাসে ইস্টারের আগেই সে ফিরবে। তিভলির কাজকর্ম বুঝিয়ে লিখল।

যে সময় কুকিনের ফেরার কথা সেই সময়েই একদিন, দিনটা সোমবার, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ দরজায় অলুক্ষণে রকমের একখানা ঘা পড়ল। সে কী আওয়াজ। যেন কেউ ঢাক পিটছে। দড়াম দড়াম দমাদ্দাম। রাঁধুনী মেয়েটা ঘুম-চোখে খালি পায়ে থৈ থৈ জল ভেঙে ছুটল বেড়ার দরজা খুলতে।

দরজার ওধার থেকে হেঁড়েগলায় কে বলল, "দরজাটা খোলো তো, তোমার নামে তার এসেছে।"

ওলেঙ্কা আগেও পেয়েছে টেলিগ্রাম তার স্বামীর কাছ থেকে, এবারে কেমন যেন সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। থর্-থর্ কাঁপা হাতে টেলিগ্রাম খুলে সে পড়ল :

"ইভান্ প্যেত্রোভিচ আজ হঠাৎ মারা গেল আগ্‌রা নির্দেশ সাপেক্ষ মঙ্গলবার শেষকৃত্য।"

ঠিক এই ছিল টেলিগ্রামে, "শেষকৃত্য" আর অবোধ্য কথাটা "আগ্‌রা"। টেলিগ্রামে সই নাটুকে দলের বড়কর্তার।

ওলেঙ্কা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমার মণি, ভানিচ্‌কা, মণি আমার, প্রিয়তম। কেন দেখা হলো আমাদের? কেন তোমায় জানলাম, ভালবাসলাম? তুমি তো ছেড়ে গেলে আমাকে, এখন তোমার দুঃখিনী ওলেঙ্কা কার পানে চাইবে?"

মঙ্গলবার কুকিন্‌কে ভাগান্‌কোভো গোরোস্থানে কবর দেওয়া হল। ওলেঙ্কা বাড়ি ফিরে এলো বুধবার, এসেই বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, এমন চেঁচিয়ে যে রাস্তা আর আশেপাশের বাড়ির উঠোন থেকে সে কান্না শোনা গেল।

পাড়াপড়শীরা ক্রুসের চিহ্ন এঁকে বুকে মাথায় কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল আর বলল, "বেচারী দুলালী, ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভ্‌না। আহা, দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে বাছার।"

তিন মাস বাদে একদিন গির্জা থেকে ফিরছে ওলেঙ্কা। শোকে দুঃখে জ্বর-জ্বর। ঘটনাচক্রে বাবাকায়েভ্‌ কাঠগোলার গোমস্তা ভাসিলি আন্দ্রেয়িচ্‌ পুস্তভালভ, সেও ফিরছিল গির্জা থেকে, তারই সঙ্গে হেঁটে এল। পুস্তভালভের মাথায় কেতাদুরস্ত সাদা টুপী, পরনে সাদা ওয়েস্টকোট—তার ওপর ঝুলছে সোনার ঘড়ি চেন। লোকটিকে দেখে মনে হয় না ব্যবসায়ী, দেখায় জমিদারের মতো।

সে বললে গম্ভীর সুরে, "যা কিছু ঘটে ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভ্‌না, সে সব ঘটে তাঁরই আদেশে।" স্বরে সমবেদনার রেশ। "প্রিয়জনদের কেউ যদি চলে যায়, তবে তার কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। বুক বেঁধে মাথা নত করে তা আমাদের মেনে নিতে হবে।"

ওলেঙ্কাকে বাড়ির দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে পুস্তভালভ বিদায় নিল। ওলেঙ্কা সারাদিন ধরে শুনল তার গম্ভীর গলার আওয়াজ। চোখ যখন জুড়ে এল, স্বপ্নে দেখল তার কালো দাড়ি। বড় ভালো লাগলো তাকে ওলেঙ্কার।

পুস্তভালভের মনে বোধ হয় ওলেঙ্কা একটা দাগ ধরিয়ে দিল, কারণ দুদিন না যেতেই একটি আধবয়সী মহিলা, যাকে ওলেঙ্কা প্রায় চেনেই না, এল তার সঙ্গে কফি খেতে, আর খেতে বসেই পুস্তভালভের গল্প জুড়ে দিল। বলল, অতি চমৎকার শক্তপোক্ত লোকটি, বিয়ের বয়সী যে কোনও মেয়ে ওকে বিয়ে করে সুখী হবে। তিন দিন বাদে পুস্তভালভ নিজেই এল। রইল বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক হবে, কথা বলল অল্পই, কিন্তু ওলেঙ্কা তার প্রেমে পড়ে গেল—এতদূর যে সারারাত তার ঘুম হল না, জ্বরের মত জ্বালায় জ্বলল, এবং সকাল হতে সেই আধবয়সী মহিলাটিকে ডেকে পাঠাল। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বিয়েও হয়ে গেল।

বিয়ের পর দুজনের বনিবনা খুব ভালো হল। নিয়মিত পুস্তভালভ কাঠগোলায় বসত দুপুরের খাওয়া অবধি, তারপর যেত কাজে বেরিয়ে, ওলেঙ্কা এসে বসত তার জায়গায়, আপিসে বসে সন্ধ্যে অবধি বিল তৈরী করত, আর অর্ডার মাফিক মাল চালান দিত।

খদ্দেরদের এবং পরিচিত লোকদের ওলেঙ্কা শোনাতো, "কাঠের দর ফী বচ্ছর শতকরা কুড়ি টাকা হিসেবে বাড়ে। আগে আমরা কাঠ নিতাম এখান থেকেই, কিন্তু এখন ভাসিচ্‌কাকে প্রতি বৎসর যেতে হয় মগিলেভ্‌ অঞ্চলে, কাঠের বন্দোবস্ত করতে। আর ভাড়া কী!" তাজ্জব হয়ে গাল হাত দিয়ে ওলেঙ্কা বলতো, "কী খরচা গাড়িভাড়ার!"

তার মনে হত সে কাঠের ব্যবসায় আছে যুগ যুগ ধরে; কাঠ জীবনের সর্বপ্রধান এবং সার বস্তু। গার্ডার, কড়ি, বরগা, তক্তা, বাটাম, বাক্সের কাঠ, ল্যাথ, পীস্‌ স্ল্যাব কথাগুলো তার কাছে বড় আদরের মনে হত, শুনে মনকেমন করত। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখত পাহাড়প্রমাণ বোর্ড আর তক্তা, অসংখ্য গাড়িভর্তি কাঠের গুঁড়ি সার বেঁধে কোন্‌ দূর দেশে যাত্রা করেছে, ৮ ইঞ্চি চওড়া ২৮ ফুট লম্বা কড়িকাঠের একটা দল খাড়া দাঁড়িয়ে ধেয়ে চলেছে কাঠগোলার দিকে, কড়িতে কড়িতে, গার্ডারে স্ল্যাবে ঠোকাঠুকি হচ্ছে, শুকনো

কাঠে কাঠে খটাখটির বোদা আওয়াজ হচ্ছে, সবাই পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, এর ওর ঘাড়ে চেপে স্তূপের মতো জমা হচ্ছে...

ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে ওলেঙ্কা। পুস্তভালভ আদর করে বলে, 'ওলেঙ্কা, কী হল দুলালী? মাথায় কাঁধে বুকে ক্রুসচিহ্ন ছোঁয়াও!"

যে ধারণাই তার স্বামীর হত ওলেঙ্কারও তাই হত। পুস্তভালভ যেই বলত ঘরে বড় গরম, অথবা ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছে, ওলেঙ্কারও মনে হত তাই। আমোদ-প্রমোদ পুস্তভালভের ভালো লাগত না, ছুটির দিন কাটাত বাড়ি বসে। ওলেঙ্কাও তাই করত।

বন্ধুবান্ধবেরা বলত, "তুমি সবটা সময় কাটাও বাড়িতে বা আপিসে। থিয়েটরে সার্কাসে যাওয়াও তো উচিত।"

মুরুব্বিয়ানার সুরে ওলেঙ্কা বলে, "ভাসিচ্‌কা, আর আমি থিয়েটরের ধার মড়াই না। আমরা খাটিয়ে লোক, ওসব ছ্যাবলামির দিকে আমাদের মন নেই! কী হয় ওসব থিয়েটর দিয়ে?"

প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আর ছুটির দিনে সকাল সকাল তারা গির্জায় যেত, পাশাপাশি হেঁটে ফিরত, দুজনেরই মুখে ফুটে থাকত উপাসনার আবেগ। দুজনেরই অঙ্গে লেগে থাকত মনোরম সুবাস। ওলেঙ্কার রেশমী পোশাক থেকে বেরোত একটা খুশী-খুশী খস্‌খস্‌ শব্দ।

বাড়িতে তাদের খাদ্য ছিল চা, মিষ্টি রুটি, আর রকম রকম জ্যাম। তারপর কিমার 'পাই'। রোজ দুপুরবেলা তাদের বাড়ির সামনের উঠোনে, গেটের বাইরে, রাস্তায়, সুরুয়ার ভুরভুরে গন্ধ ছড়াতো, ভেড়ার বা হাঁসের ঝলসানো মাংসের কিংবা উপবাসের দিনে মাছের। যে-ই যেত ওবাড়ির পাশ দিয়ে, তারই খিদে পেয়ে যেত।

আপিসে সামোভারে চায়ের জল সর্বদাই চড়ানো থাকত—খদ্দের এলে দেওয়া হত চায়ের সঙ্গে কড়াপাকের পিঠে।

সপ্তাহে একদিন করে তারা যেত স্নানাগারে, ফিরতো একসঙ্গে টকটকে রাঙাবরণ হয়ে।

ওলেঙ্কা বলত বন্ধুদের, "সত্যি, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সব দিক থেকে বেশ ভালোই আছি। যেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি ভাসিচ্‌কা আর আমি, তেমনি যদি সবাই থাকত তো বেশ হত!"

পুস্তভালভ যখন কাঠ কিনতে মগিলেভে যেত, ওলেঙ্কার ভীষণ মনকেমন করত। সারারাত সে জেগে কাটাত, কাঁদত।

মাঝে মাঝে স্মিরনিন্‌ তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। স্মিরনিন্‌ ছিল সৈন্যদলের পশু-চিকিৎসক। সে ওলেঙ্কারদেরই বাড়ির একপাশটা ভাড়া নিয়ে থাকত। তার অল্প বয়স। সে এসে গল্প-সল্প করত, তাস খেলত, ওলেঙ্কার মনটা ভুলে থাকত।

স্মিরনিনের নানা কথার মধ্যে ওলেঙ্কার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগত তার ঘরের খবর। স্মিরনিন্‌ বিবাহিত, আর একটি ছেলে আছে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে গেছে, কারণ পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম। বৌকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তবু মাস মাস টাকা পাঠায় চল্লিশ রুবল্‌, তার ছেলের খোরপোশ বাবদ। এসব শুনে ওলেঙ্কা মাথা নাড়ে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর জন্য বড় দুঃখ হয় তার মনে।

যাবার সময় ওলেঙ্কা স্মিরনন্‌কে মোমবাতি হাতে করে সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দেয়। বলে, "ভগবান করুন, তোমার যেন কোনও বিপদ-আপদ না হয়। তুমি যে রইলে এতটা সময় আমার সঙ্গে, তার জন্য ধন্যবাদ। স্বর্গের রাণী মেরী তোমাকে অটুট স্বাস্থ্যে রাখুন।"

তার স্বামীর যেমন চারিদিকে বিবেচনা করে গম্ভীরভাবে কথা কইবার ধরন, ওলেঙ্কা তারই অনুকরণ করে। ডাক্তার সিঁড়ির নিচেকার দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে, তখন ওলেঙ্কা তাকে ডেকে ফেরায়, আর বলে, "দেখ ভ্‌লাদিমির প্লাতোনিচ, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার মিটমাট করে ফেলাই উচিত; তাকে ক্ষমা করো, ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলেটি হয়তো সবই বোঝে।"

পুস্তভালভ যখন ফিরে এল, ওলেঙ্কা তাকে ঘোড়ার ডাক্তারের দুঃখময় জীবনের সমস্ত কাহিনী শোনাল—গলা খাটো করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মাথা নাড়ল। দুজনেই বলাবলি করতে লাগল ছেলেটির বিষয়ে। বলল, নিশ্চয়ই ছেলেটির বাবার জন্য মন-কেমন করে। তারপর দুজনেরই মনে যেন কেমন করে এলো একই কথা, তার দাঁড়ালো এসে গৃহবিগ্রহের সামনে। প্রার্থনা করলো মাটি অবধি নুয়ে, ভগবান যেন তাদের সন্তান দেন।

এমনিভাবে পুস্তভালভ পরিবার ছটি বছর কাটাল, পরম শান্তিতে, বিনা আড়ম্বরে, ভালোবেসে, পরস্পরের সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ বজায় রেখে। তারপর একদিন, শীতকালে, ভাসিলি, আন্দ্রেয়িচ্‌ আপিসে বসে গরম চা খাওয়ার পর মাথায় টুপি না এঁটে বেরিয়ে গেল কিছু কাঠ চালান দিতে। তার ঠাণ্ডা লেগে গেল, অসুখ করল। সব চেয়ে বড় বড় ডাক্তার তার চিকিৎসা করলেন, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারল না। চার মাস ভোগের পর পুস্তভালভ মারা গেল। ওলেঙ্কা আবার বিধবা হল।

স্বামীর গোর দিয়ে ওলেঙ্কা ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল, "কার কাছে যাব আমি, ওগো তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকব আমি অভাগী দুঃখিনী? ওগো তোমরা সবাই আমাকে দেখ'সে।"

কালো শোকবস্ত্র পরে ওলেঙ্কা চলাফেরা করে। মাথায় টুপি নেই, হাতে দস্তানা পরে না। চোখের জলের ধারার নকশায় তৈরি সাদা ঝালর অঙ্গে ধরে। বাইরে বেরোয় কদাচিৎ; যদিও বা যায় কোথাও তো সে গির্জায় কিংবা স্বামীর কবর দেখতে। বাড়িতে বাস করে যেন সন্ন্যাসিনী।

ছটি মাস কেটে যাবার পর সে বিধবার বেশ ছাড়ল। তার ঘরের জানলার খড়খড়ি উঠতে আরম্ভ করল। কখনো-সখনো তাকে বাজারের পথেও দেখা যেতে লাগল, সকালের দিকে রাঁধুনীর সঙ্গে। কি যে সে করে, বাড়িতে কি করে তার দিন কাটে তা নিশ্চয় করে কেউ জানল না, তবে আন্দাজ একটা করা গেল। দেখা যেত, ওলেঙ্কা বাগানে বসে চা খাচ্ছে ঘোড়ার-ডাক্তারটির সঙ্গে, ডাক্তার ওলেঙ্কাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। এসব দেখে লোকে অনুমান একটা করে নিত।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। ডাকঘরে ওলেঙ্কার একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাকে সে বললে, "আমাদের এই শহরে গোরু-ঘোড়ার কি হয় না হয় দেখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, তাই এত ব্যামো। প্রায়ই শোনা যায় দুধ খেয়ে মানুষের অসুখ করে, গোরু-ঘোড়ার ছোঁয়াচ লেগে এটা হয়, সেটা হয়। গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে, যেমন মানুষের জন্য, ঠিক তেমনি নজর রাখা উচিত।"

পশুর ডাক্তারটির মনে যা ধারণা ওলেঙ্কার বক্তব্যও তাই। সকল বিষয়েই ডাক্তারের যা মত তারও আজকাল সেই মত। স্পষ্টই দেখা গেল, কোন একটা আকর্ষণ বিনা ওলেঙ্কার একটি বৎসরও কাটে না। আর, এবারে সে নতুন করে খুঁজে পেয়েছে আনন্দ একেবারে তার নিজের বাড়িরই একপাশে।

মেয়েটি আর কেউ হলে তার নিন্দা হত, কিন্তু ওলেঙ্কার সম্বন্ধে কেউ কুকথা ভাবতে পারত না—সবটাই তার এত সহজ স্বাভাবিক। কি ডাক্তার কি সে—কেউই খুলে বলেনি যে আগে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল তা বদলেছে। বরং ওটা ওরা ঢেকে রাখতেই চেষ্টা করত, কিন্তু পারত না, কারণ ওলেঙ্কার কথা গোপন রাখার ক্ষমতা ছিল না।

যখন ডাক্তারের সহকর্মীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত, ওলেঙ্কা তাদের চা ঢেলে দিতে দিতে বা খাবার সময় তুলত জীবজন্তুর মড়কের কথা। কিংবা বলত পশুদের কোন ব্যায়রাম অথবা সরকারী কসাইখানার বিষয়। ডাক্তার বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। বন্ধুরা চলে যেতেই সে ওলেঙ্কার হাত চেপে ধরে ফোঁস করে উঠত, "বার বার তোমাকে মানা করেছি যা তুমি বোঝ না তা নিয়ে কথা না বলতে। আমরা পশু-চিকিৎসকেরা যখন আলাপ-আলোচনা করি, দয়া করে তুমি তার মধ্যে এসে পড়ো না। সত্যি ভারি রাগ হয়।"

ওলেঙ্কা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকাত, চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেসা করত, "তা হলে কী বিষয়ে কথা বলব, ভলদ্‌চ্‌কা?" তারপর জলভরা চোখে সে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরত, ডাক্তারকে দিব্যি দিত রাগ না করতে। তারপর দুজনেরই খোশমেজাজ ফিরে আসত।

এ আনন্দ বেশি দিন রইল না। ডাক্তার তার সৈন্যদলের সঙ্গে কোথায় গেল, একেবারের মতো। গোটা দলটাই বদলি হয়ে গেল দূর দেশে—হয়তো বা সাইবীরিয়াতেই। ওলেঙ্কা একা পড়ে গেল।

এবারে সে একেবারেই একলা পড়ে গেল। তার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তাঁর সেই আরামকেদারাটা পড়ে আছে চিলেকোঠায় গুদোমে, ধূলোয় ভর্তি, একটা পায়া ভাঙা। ওলেঙ্কা রোগা হয়ে গেল, তার চেহারায়ও আর সে শ্রী রইল না। রাস্তায় দেখা হলে আর তার দিকে কেউ আগের মত চাইত না, হাসত না। বোঝা গেল তার জীবনের সব চেয়ে ভালো দিনগুলো চলে গেল। সে দিন রইল পিছনে পড়ে, এখন যে জীবন শুরু হল তা আলাদা, অনিশ্চিত, তার কথা ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় বসে ওলেঙ্কা শুনত 'তিভলি'তে বাজনা বাজছে, বাজি ফুটছে, কিন্তু তা শুনে তার কোন কথাই মনে হত না। ফাঁকা উঠোনটার দিকে সে নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে থাকত, কোন কথা ভাবত না, চাইত না কিছুই। দিন ফুরিয়ে গেলে ওলেঙ্কা পড়ত, স্বপ্নে দেখত ফাঁকা উঠোনটা। খাওয়া-দাওয়া করত, যেন অনিচ্ছায়।

সব চেয়ে বড় আর বিশ্রী ব্যাপার হল যে তার আর কোন রকম মতামত রইল না। চোখে পড়ত নানা জিনিস, বুঝত কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু সম্বন্ধেই একটা মতামত তার মনে গড়ে উঠত না। কি নিয়ে কথা বলা যায় তাও সে বুঝত না।

কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার—মতামত না থাকা। ধরো দেখছ একটি বোতল অথবা বৃষ্টি, কিংবা দেখছ চাষী চলেছে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে, কিন্তু বোতল, বৃষ্টি বা চাষী কি নিমিত্ত, কী তাদের তাৎপর্য—কিছুই বলতে পারছ না, হাজার রুপিয়া কবুল করলেও নয়!

যখন তার কুকিন্ ছিল অথবা পুস্তভালভ কিংবা পরে তার কাছে থাকত পশুর ডাক্তারটি—তখন ওলেঙ্কা সব কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারত, যা চাও তারই সম্বন্ধে একটা মত দিতে পারত। কিন্তু এখন তার মনটা ফাঁকা উঠোনটার মতো। বড় কষ্টমাখা, বড় বিস্বাদ এ জীবন।

শহরটা একটু করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। খোলামেলা রাস্তা জিপ্‌সী রোড্ হয়ে উঠল শহুরে সড়ক। যেখানে ছিল তিভলির বাগানগুলো আর কাঠের গোলা, সেখানে বাড়ির সারির ফাঁকে ফাঁকে গুলিঘুঁজি গজিয়ে উঠল। কী তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময়!

ওলেঙ্কার বাড়িটা শ্রীহীন হয়ে পড়ল। ছাতে মরচে ধরল, কুঁড়েঘর এক পাশে ঝুলে পড়ল, সারা উঠোনটা ভরে গেল লম্বা ঘাস আর বিছুটির ঝোপে। ওলেঙ্কার নিজেরও বয়স হল, চেহারায় সে লাবণ্য আর রইল না।

গ্রীষ্মকালে সে বসত বারান্দাটায়, মন শূন্য, নিরানন্দ, বিরস। শীতে সে বসত জানলার ধারে, তাকিয়ে থাকত বরফের দিকে। কখনও বসন্তের বাতাসে অথবা হাওয়ায় ভেসে আসা গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে স্মৃতির বন্যা জেগে উঠত, তখন তার মন গলে যেত, চোখে জল ভরে আসত—কিন্তু তাও মুহূর্ত-স্থায়ী, সেটা চলে গেলেই আবার ফিরে আসত সেই শূন্যতা, জীবনের উদ্দেশ্যের সেই অনিশ্চয়তা।

কালো বেড়ালের বাচ্চা ব্রিস্কা তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াত, ঘড়র ঘড়র শব্দ করত, কিন্তু ওসব বেড়ালী আদরে ওলেঙ্কার মন সাড়া দিত না। ওর কি ঐটুকুই দরকার? সে চাইত এমন ভালোবাসা যা তার সমস্ত আত্মা, তার মনকে দখল করবে, মনে জন্ম দেবে ধারণার, জীবনে আনবে গতিমুখ, পড়ন্ত বয়সের রক্তে এনে দেবে উষ্ণতা।

কালো বেড়ালবাচ্চাটাকে ওলেঙ্কা তার কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলত, "যা এখান থেকে, যা! এখানে কী তোর? এখানে কিচ্ছু নেই।"

এমনি ভাবে চলত দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কোনও মত নেই, অমত নেই, আনন্দের ছিটেফোঁটা নেই। রাঁধুনী মাভ্‌রা যা বলত, ওলেঙ্কা তাই মেনে নিত।

একদিন জুলাই মাস, গরম পড়েছে, সন্ধ্যের দিকে, গরুগুলো যখন ঘরে ফিরছে সারা উঠোনে ধুলো উড়িয়ে—সেই সময় কে যেন আচম্‌কা দরজায় ঘা দিল। ওলেঙ্কা নিজেই গেল ফটক খুলতে, খুলে যা দেখল তাতে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল—দরজায় দাঁড়িয়ে পশুর ডাক্তার স্মিরনিন্। তার চুলে পাক ধরেছে, পরনে বেসামরিক পোশাক।

এক মুহূর্তে ওলেঙ্কার সব কথা মনে পড়ে গেল। সে নিজেকে সামলাতে পারল না, কেঁদে ফেলল। একটি কথাও না বলে সে স্মিরনিনের বুকে তার মাথা রাখল। এত ওলোট-পালোট হয়ে গেল তার মন যে, কখন যে স্মিরনিন্‌কে ঘরে নিয়ে গিয়ে সে তার সঙ্গে চা খেতে লাগল তা সে বুঝতেই পারল না।

আনন্দে সে কেঁপে উঠল, মুখে কথা ফুটল, "ওগো ভ্লাদিমির প্লাতনিচ্, কী জন্যে এলে এখানে?"

স্মিরনিন্ বলল, "আমি এসেছি এখানে থাকব বলে। সৈনিকের চাকরি আমার শেষ হয়েছে। এবারে এখানেই বসবাস করে নিজে রোজগার করবার চেষ্টা দেখব; তা ছাড়া ছেলেটিও বড় হল, তাকে উচ্চশিক্ষা দিতে হবে। আর জানো, স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলেছি।"

ওলেঙ্কা বললে, “কোথায় সে?”

“হোটেলে, আমার ছেলের সঙ্গে। আমি বেরিয়েছি একটা আস্তানা খুঁজতে। ভাড়া নেব।”

“সে কি কথা গো! আমার বাড়িটা নাও। ভাড়া! একটি পয়সা ভাড়া নেব না।” ওলেঙ্কার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কাঁদতে শুরু করলে। বলল, “তোমরা এখানে থাকো। আমার পক্ষে বাড়ির একটা ধারই যথেষ্ট। ওঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার!”

পরদিনই তারা ছাতে দু-এক পোঁচ রঙ আর দেওয়ালে চুনকাম করতে লেগে গেল। ওলেঙ্কা কোমরে হাত দিয়ে উঠোনটার চারিদিক ঘুরে কাজের খবরদারী করতে লাগল। সেই পুরনো দিনের হাসি আবার তার মুখে ফুটে উঠল। মনে হল যেন লম্বা একটানা ঘুমের পর তার শরীর তাজা হয়ে প্রাণ ফুটে উঠেছে।

পশুর ডাক্তারের স্ত্রী এল। রোগা মেয়েটি, সাদাসিদে ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে একটা খামখেয়ালী ভাব। সঙ্গে তার ছোট ছেলেটি, সাশা, বয়স প্রায় দশ, কিন্তু সে-আন্দাজে মাথায় খাটো। ফুলো ফুলো গালে টোল, উজ্জ্বল নীল চোখ। উঠোনে ঢুকেই সে বিড়ালটার পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল খিল খিল হাসি—খুশী মনের ফুর্তির।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, “মাসি, এটা কি তোমার বেড়াল? ওর যখন বাচ্চা হবে আমাকে দিও। মা ইঁদুর দেখে ভয়ানক ভয় পায়।”

ছেলেটির সঙ্গে ওলেঙ্কার গল্প শুরু হল। চা খাওয়াল সে ছেলেটিকে। হঠাৎ তার বুকটা ভরে উঠল। মধুর একটা ভারে তার বুক কনকন করতে লাগল—ছোট্ট ছেলেটি যেন তার নিজের।

সন্ধ্যেবেলায় সে যখন খাবারঘরে তার পড়া তৈরি করতে বসল, ওলেঙ্কা তার দিকে চেয়ে রইল। মন মুখ তার স্নেহমমতায় ভরে উঠল। সে বলতে লাগল, নিচু গলায়, “আমার দুলাল, আমার মানিক, কত বুদ্ধি তোমার—কী সুন্দর দেখতে তুমি!”

ছেলেটি জোরে জোরে পড়তে লাগল, বই দেখে, “দ্বীপ একটি ভূখণ্ড, সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত।”

ওলেঙ্কা পুনরাবৃত্তি করল, “দ্বীপ একটি ভূখণ্ড।”

বহুদিনের ফাঁকা মন থেকে একটা কথা না বলে সে আজ এই প্রথম একটি মত প্রকাশ করল যাতে তার বিশ্বাস আছে।

এইবারে তার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। রাত্রে খাবার সময় সে সাশার বাবা-মাকে শোনাতে লাগল যে, হাইস্কুলে ছেলেপিলেদের যা পড়ানো হয় তা কী রকম শক্ত। অবশ্য শুধু কারিগরীর কাজ শেখানোর চেয়ে উচ্চশিক্ষা ভালো, কারণ তার দ্বারা সমস্ত পথই খুলে যায়—চাও তুমি ডাক্তার হতে পারো...এঞ্জিনীয়ার হতে পারো...

সাশা হাইস্কুলেই যেতে শুরু করল। তার মা খারকভে তার বোনের বাড়ি গেল, গিয়ে আর ফিরল না। বাবা তার পশুর পাল দেখতে বেরোত, কখনও কখনও এক নাগাড়ে বাইরে থাকত। ওলেঙ্কার মনে হত সবাই সাশাকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ তাকে চায় না, না খেয়ে ছেলেটি মরে যাচ্ছে। ওকে সে সরিয়ে আনল নিজের পাশটিতে ছোট একটি কামরায়। সেখানেই তার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল।

ছ মাস হয়ে গেল। সাশা থাকে তার পাশেই। রোজ সকালে ওলেঙ্কা যায় সাশার ঘরে।

সাশা তখনও শুয়ে, গালের তলায় হাতটি রেখে গভীর ঘুমে অচেতন, নিঃশ্বাস নিঃশব্দে উঠছে পড়ছে। ওলেঙ্কার মনে কষ্ট হয় সাশার ঘুম ভাঙাতে। তবু বলে, আস্তে আস্তে, "সাশেনকা, উঠে পড়ো সোনা। ইস্কুলে যাবার সময় হল।"

সাশা ওঠে, পোশাক পরে প্রার্থনা সেরে খেতে বসে। খায় তিন গ্লাস চা, দুটো বড় কড়া কেক, মাখন-মাখানো আধখানা ছোট রুটি। ঘুম তখনও তার পুরোপুরি কাটেনি, তাই মেজাজটি তখনও ধাতস্থ হয়নি।

ওলেঙ্কা বলে, "সাশেনকা, গল্পটা তোমার কিন্তু ভালো তৈরী হয়নি।"

এমনভাবে চেয়ে থাকে সে তার দিকে, যেন ছেলেকে সে বিদায় দিচ্ছে দূর যাত্রার পথে।

"তোমার জন্য আমি ভেবে মরি। প্রাণপণ চেষ্টা করো সোনামণি, ভালো করে পড়াশুনো করো। মন দিয়ে মাস্টারদের কথা শুনো।"

সাশা বলে, "আঃ, আমাকে ছেড়ে দাও দিকি।'

তারপর হেঁটে রওনা হয় স্কুলে।

ছোট মূর্তিটি পথে চলেছে, মাথায় মস্ত একটা টুপি, কাঁধে একটা ঝুলি। ওলেঙ্কা নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়। ডাকে, "সাশেনকা—আ।"

সাশা যেই পিছন ফিরে তাকায় ওলেঙ্কা ওর হাতে গুঁজে দেয় একটি খেজুর বা কারামেলের একটি টুকরো।

স্কুলের গলি এসে পড়ে। সাশেনকার বিশ্রী লাগে, লম্বা মোটা-সোটা একটি মহিলা তার পিছু পিছু আসছেন, দেখে তার লজ্জা করে। পিছন ফিরে সে বলে, "মাসি, বাড়ি ফিরে যাও। এখন আমি একা যেতে পারব।"

ওলেঙ্কা থামে, কিন্তু তার চোখ সরে না। স্কুলে ঢোকার পথটিতে ছেলে পৌঁছে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সে তার দিকে তাকিয়েই থাকে। আঃ, কী ভালোই বাসে সে ছেলেটিকে। মায়ার ফাঁদে সে আগেও পড়েছে, কিন্তু কেউই তাকে এমন করে বাঁধতে পারেনি। আজ তার মায়ের মন জেগে ওঠে যত আনন্দে, যেমন করে তাঁর আত্মাটাকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমন কখনও হয়নি আগে। এই ছোট্ট ছেলেটি তার নিজের নয়, তবু তার গালের টোলটি, মাথার টুপিটার জন্য সে তার জীবন দিতে পারে, আনন্দে, মমতায়, জলভরা চোখে। কেন? কেন তা কে বলতে পারে?

সাশাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ওলেঙ্কা শান্ত মনে বাড়ি ফিরে যায়। মনভরা তার তৃপ্তি, প্রশান্তি, ভালোবাসা। গেল ছ মাসে বয়স যেন তার কমে গেছে, মুখে উজ্জ্বল আনন্দ। লোকে তাকে দেখে খুশী হয়, বলে, 'সুপ্রভাত গো ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভ্‌না, দুলালী, কেমন আছ দুলালী?"

সে বলে, "ইস্কুলে আজকাল এত শক্ত পড়া দেয়!" বাজারে ঘুরে কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে সে বলতে থাকে, "ঠাট্টা নয়। কাল প্রথম ঘণ্টায় ওকে পড়া দিয়েছে একটা গল্প মুখস্থ, লাতিন থেকে একটা তরজমা আর একটি সমস্যাপূরণ। ঐটুকু একটা ছেলের পক্ষে এটা বড্ড বাড়াবাড়ি, বাস্তবিকই।"

তারপর সে আরম্ভ করে মাস্টারদের কথা, পড়ার কথা, পাঠ্য বইগুলোর কথা—সাশা যা বলে ঠিক তাই বলে।

তিনটের সময় ওরা একসঙ্গে খায়। সন্ধ্যেবেলায়, মাস্টাররা যে বাড়ির পড়া দেন তা ওরা পড়ে একসঙ্গে, একই সঙ্গে কাঁদে। সাশাকে বিছানায় শুইয়ে ওলেঙ্কা প্রার্থনায় আর ক্রুসচিহ্ন আঁকায় অনেকক্ষণ লাগিয়ে দেয়। তারপর সে নিজে শুতে যায় আর স্বপ্ন দেখে সেই দূর, অস্পষ্ট ভবিষ্যতে, যখন সাশার পড়া শেষ হয়েছে, সে ডাক্তার বা এঞ্জিনীয়ার—তার মস্ত একটা বাড়ি, ঘোড়াগাড়ি। বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে...এই কথাই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাশে কালো বেড়ালটা শুয়ে আওয়াজ করে...ঘড়র...ঘড়ুর।

হঠাৎ দরজায় জোরে ঘা পড়ে। ওলেঙ্কার ঘুম ভেঙে যায়। ভয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। আধ মিনিট বাদে আবার ঘা।

ওলেঙ্কার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে ভাবে, "খারকভ্ থেকে এসেছে তার। সাশার মা তাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। হা ভগবান!"

সমস্ত আশাভরসা তার উবে যায়, মাথা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, মনে হয়, তার মত অভাগিনী জগতে আর কেউ নেই।

কিন্তু আরও এক মুহূর্ত কেটে যাবার পর সে কার যেন গলা শুনতে পায়; কিছু নয়, পশুর ডাক্তার ক্লাব থেকে ঘরে ফিরল।

ওলেঙ্কা মনে মনে বলে, "যাক। ধন্য ভগবান!" ক্রমে ক্রমে তার বুকের ওপর থেকে ভারটা সরে যায়। আশ্বস্ত হয়ে সে ফিরে যায় বিছানায়, আর সাশার কথা ভাবে। পাশের ঘরে ঘুমোয় সাশা আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে ঘুমের ঘোরে, "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা! এই, ওকি, মারামারি নয়!"

* * *

গল্পটি চেখফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। কেউ কেউ বলেন, দি বেস্ট্ শর্ট স্টরি অব চেখফ। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ গল্প।

কেন?

তারই টীকা করেছেন স্বয়ং টলস্টয়। এরকম একটা ঘটনা এই বাংলাদেশেই ঘটেছিল। প্রভাত মুখুয্যে একটা ছোট গল্প লিখেছিলেন। তার মূলে বক্তব্য ছিল, হিন্দুর 'নীচ' জাতির একটি ছেলে অপমানিত বোধ করে খ্রীষ্টান হবে বলে মনস্থির করলে। তখন দেখে, খ্রীষ্টানদের ভিতরও জাতিভেদ রয়েছে। নেটিভ খ্রীষ্টানদের জন্য আলাদা ক্লাব, এমন কি ধর্মমন্দির—চার্চ সেও আলাদা, এবং সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মৃত্যুর পরও জাতিভেদ যায় না : গোরার জন্য ভিন্ন গোরস্থান, নেটিভের ভিন্ন গোরস্থান। গল্পটা পড়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, সে যুগের ঋষিপ্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি সমালোচনা লেখেন—'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর।' হিন্দুর বর্ণাশ্রম সমস্যা নিয়ে এরকম প্রামাণিক প্রবন্ধ এর পূর্বে বা পরে কখনও লিখিত হয়নি। 'হরিজন' আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু বহু পূর্বে।

টলস্টয়ের টীকা পড়ে পাঠক বুঝবেন, আমরা সাধারণ-পাঠক, কত সহজেই গল্পটির মূল বক্তব্য মিস করে যেতে পারি। অনবদ্য এই টীকাটি।

টীকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর চেখফ সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানান তাঁর গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন টীকাটি পড়েন এবং প্রকাশকদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন সব সময়ই গল্পটির সঙ্গে টীকাটিও ছাপেন। ইটিও অনুবাদ করেছেন সখা খাফী খান।

দুলালী (“দুশেচকা”)র সমালোচনা
তলস্তয়

বাইব্‌লের গণনাপুস্তকে একটি গল্প আছে, তার অর্থ অতি গভীর। গল্পটিতে বলা হয়েছে, ইস্‌রাএলীরা যখন মোআবের রাজ্যসীমায় এসে উপস্থিত হল, মোআবীয়দের রাজা বালাক্ তখন নবী বালআমকে ডেকে পাঠালেন ইস্‌রাএলীদের অভিসম্পাত দেবার জন্য; কাজটি সেরে দিলে বালাক্ বালআমকে বহু পুরস্কার দেবেন। তার লোভে বালআম বালাকের কাছে গেলেন এবং তাকে নিয়ে উঠলেন পর্বতে। সেখানে একটি বেদী তৈরী করা হল, গোবৎস ও মেঘ উৎসর্গ করা হল অভিশাপের উদ্যোগে। বালাক্ রইল অভিশাপের প্রতীক্ষায়, কিন্তু বালআম ইস্‌রাএলের লোকদের অভিসম্পাত না দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

২৩ পরিচ্ছেদ ১১ চরণ : “বালাক্ বালআমকে কহিল, তুমি আমার প্রতি এই কি করিলা? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তাহাদিগকে সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করিলা।”

তাহাতে সে উত্তর করল, পরমেশ্বর আমার মুখে যা কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে?

১৩ : “পরে বালাক্ কহিল, আমি মিনতি করি, অন্যস্থানে আমার সহিত আসিয়া সেখানে থাকিয়া আমার নিমিত্ত তাহাদিগকে শাপ দেও।”

কিন্তু আবার শাপ না দিয়ে বালআম আশীর্বাদ করলেন। তৃতীয় বারেও তাই।

২৫ পরিচ্ছেদ ১০ম চরণ, তখন বালআমের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, সে আপনা হস্তে হস্তের আঘাত করিল এবং...বালআমকে কহিল, শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তিন বার সর্বতোভাবে তাহাদের আশীর্বাদ করিলা।

১১ : “অতএব তুমি এখন স্বস্থানে পলায়ন কর; আমি তোমাকে অতিশয় সম্মানিত করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু দেখ পরমেশ্বর তোমায় সম্মান পাইতে নিবৃত্ত করিলেন।”

তখন বালআম পুরস্কার লাভ না করেই প্রস্থান করলেন, কারণ তিনি বালাকের শত্রুদের অভিসম্পাতের পরিবর্তে দিলেন আশীর্বাদ।

বালআমের যা হয়েছিল প্রকৃত কবি ও রসস্রষ্টাদের প্রায়ই তা হয়। বালাকের পুরস্কার জনপ্রিয়তার লোভে কিংবা ভ্রান্ত ধারণার বশে কবি দেখে না যে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদূত, গাধাও যাকে দেখতে পায়।[১] চায় সে অভিশাপ দিতে, কিন্তু অহো! সে দেয় আশীর্বাণী।

---

১ বালাকের আমন্ত্রণে বালআম যখন যাত্রা শুরু করে তখন তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল য়িহুহের দূত। বালআম তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু যে গাধার পিঠে চড়ে সে আসছিল সে পেয়েছিল দেখতে—অনুবাদক।

ঠিক তাই হল খাঁটি কবি এবং রসস্রষ্টা চেখফের মনোহর এই ‘দুলালী'' গল্পটি লেখবার বেলায়।

লেখক নিশ্চিত চেয়েছিলেন কৃপার পাত্রী এই জীবটিকে উপহাস করতে। হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছিলেন দুলালীকে—যে প্রথমে কুকিনের দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধে তুলে নেয়, তারপর কাঠ কেনা-বেচার বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর পশুর ডাক্তারের আওতায় এসে গরু-মহিষের ব্যামোকেই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার বলে ঠিক করে আর শেষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ব্যাকরণের প্রশ্ন এবং মস্ত টুপি পরা ছোট্ট বাচ্চাটির ভালোমন্দ নিয়ে।

কুকিন্ পদবীটি উদ্ভট, তার অসুখ, যে টেলিগ্রামে তার মারা যাবার খবর জানানো হল তাও উদ্ভট, কাঠের ব্যাপারী আর খানদানী ঠাট পশুর ডাক্তার, এমন কি ছোট্ট ছেলেটি, সবাই, সবই উদ্ভট, কিন্তু দুলালী, তার অন্তর, যাকেই সে ভালবাসে তারই মধ্যে তার সমস্ত সত্তার নিবেদন—এ উদ্ভট নয়, অনির্বচনীয় পবিত্র।

আমার বিশ্বাস, ‘‘দুলালী'' গল্পটি লেখার সময়ে লেখকের—হৃদয়ের নয়—মনে ছিল একটি অস্পষ্ট মূর্তি, নব্য নারীর, স্বয়ং পুরুষের সমকক্ষ, মানসিক উৎকর্ষসম্পন্ন, শিক্ষিতা, সমাজহিতব্রতে স্বয়ং-নিযুক্ত দক্ষতায় পুরুষের তুল্য কিংবা আরও সুদক্ষ, নারীসমস্যা কথাটা যে তুলেছে এবং তোলে।

‘‘দুলালী'' লিখে লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন মেয়েদের কী হওয়া উচিত নয়। জনমত বালাক্-চেখফকে বলেছিল, দুর্বল, একান্ত অনুগত, অনুন্নত, পুরুষসেবায় নিয়োজিত স্ত্রীদের অভিশাপ দাও। চেখফ পর্বতে উঠলেন, বেদীর উপর গোবৎস এবং মেষ রেখে দেওয়া হল, কিন্তু যখন তাঁর মুখ খুলল, তখন যাদের শাপ দিতে এসেছিলেন তাদের তিনি শোনালেন আশীর্বচন।

অনবদ্য স্বচ্ছ পরিহাসের রসে লেখা অপরূপ এই গল্পটি : তবু, এর কোনও কোনও অংশ পড়তে গিয়ে আমি অন্তত আমার চোখের জল সামলাতে পারি নি। মন ভিজেছে—কুকিন্, যা কিছু নিয়ে কুকিন্ মেতে থাকে, কাঠ-ব্যবসায়ী, পশুর ডাক্তার এসবের প্রতি দুলালীর একান্ত অনুরাগ ও অভিনিবেশের বিবরণ পড়ে; আরও বেশী যখন সে একা, আর তার ভালোবাসার কেউ নেই—তখন তার যে যন্ত্রণা, তার বিবরণ আর সবার শেষে, নারীর মাতৃত্বের যে অনুভূতি তার নিজের জীবনে সে পায়নি তার সমস্ত শক্তি এবং অপরিসীম প্রেম যখন সে নিয়োগ করে ভবিষ্যতের মানব মস্ত বড় টুপি-পরা ইস্কুলের ছেলেটির মধ্যে, তার বিবরণ পড়ে।

লেখক মেয়েটিকে ভালোবাসালেন উদ্ভট এক কুকিন্‌কে, নগণ্য এক কাঠ-ব্যবসায়ীকে, কাঠখোট্টা এক পশুর ডাক্তারকে, কিন্তু প্রেমের পাত্র একটা কুক্‌িনই হোক আর একটি স্পিনোজা পাস্কাল বা শিলারই হোক, প্রেমাস্পদ ঘন ঘন বদলাক—যেমন দুলালীর বেলায়—অথবা চিরকাল একই থাক, প্রেম তাতে কিছু কম পবিত্র হয় না।

কিছুদিন আগে আমি ‘নোভোয়ে ভ্রেম্‌ইয়া' কাগজে নারী সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। প্রবন্ধটিতে লেখক নারীদের সম্বন্ধে অতি চতুর এবং বড় গভীর একটি মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘‘মেয়েরা আমাদের দেখাতে চেষ্টা করছে যে যা কিছু আমরা পুরুষেরা পারি, তারাও পারে। এ নিয়ে আমার বিবাদ নয়; আমরা মানতে রাজি

যে পুরুষেরা যা পারে মেয়েরাও তার সবই পারে, হয়তো পুরুষের চেয়ে ভালোই পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মেয়েরা যা পারে পুরুষদের কীর্তি তার ধারেকাছেও যেতে পারে না।"

ঠিক, কথাটি যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। এবং এটি যে শুধু শিশুর জন্মদান, লালন-পালন ও বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রেই সত্য তাই নয়। পুরুষ সেই সর্বাধিক উন্নত শ্রেষ্ঠ কার্যটি সাধন করতে পারে না যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের নিকটতম সন্নিধানে আসতে পারে—এই কীর্তি—প্রেম, প্রেমাস্পদে একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ। এটি শ্রেষ্ঠ নারী পেরেছে, পারে এবং পারবে—অতি উত্তমভাবে এবং সহজ স্বাভাবিক উপায়ে। কী হত এই জগতের যদি মেয়েদের এই ক্ষমতাটি না থাকতো এবং যদি এর প্রয়োগ তারা না করতো!

মেয়ে ডাক্তার, টেলিগ্রাফের কেরানী, নারী বৈজ্ঞানিক, মেয়ে উকীল, লেখিকা—এ সব না থাকলেও আমাদের চলতো, কিন্তু যারা মানুষের মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে ভালোবাসে এবং সেইটিকে অগোচরে তার মধ্যে সঞ্চালিত, উদ্বুদ্ধ করে তার সহায় হয়, সেই মা, সহায়িকা, সান্ত্বনাদাত্রী—তারা না থাকলে জীবনটা বিপরীত একটা ব্যবহার হয়ে উঠতো। যীশুখ্রীষ্টের কাছে কোনও মগ্‌দলীনি আসত না, সাধু ফ্রান্সিসের সঙ্গে ক্লারা থাকত না, ডিসেম্বরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের পত্নীরা সাইবীরিয়ায় যেত না, দুখবরদের স্ত্রীরা যে তাদের স্বামীদের সত্যের জন্য আত্মদানের পথ থেকে না সরিয়ে দিয়ে বরং সেই পথেই তাদের প্রবৃত্ত করেছিল, তাও হত না। থাকত না সেই হাজার হাজার অজানা মেয়েরা—নারীকুলশ্রেষ্ঠা এরা—অজ্ঞাতেরা চিরকালই যা হয়—যারা সান্ত্বনা দেয় মদ্যপ, দুর্বল, উচ্ছৃঙ্খল জনকে, প্রেমস্নিগ্ধ সান্ত্বনার প্রয়োজন যাদের সবার চেয়ে বেশী। এ প্রেম যাতেই প্রযুক্ত হোক্, কুকিনে বা খ্রীষ্টে, এইটেই নারীর প্রধান, মহীয়সী, অনন্যালভ্যা শক্তি।

কী প্রচণ্ড বোঝার ভুল, এই সব তথাকথিত নারীসমস্যা—যার কবলে পড়েছে শুধু মেয়ে নয়, পুরুষদেরও বেশীর ভাগ। অর্বাচীন যে কোনও ধারণার কবলে এরা পড়বেই।

"মেয়েদের মন চায় নিজেদের উন্নতি।" এর চেয়ে ন্যায় যুক্তিসঙ্গত কথা আর কী হতে পারে?

কিন্তু স্বভাবগুণে মেয়েদের কাজ পুরুষের কাজ থেকে ভিন্ন। অতএব মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এবং পুরুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এক হতে পারে না। মেনে নেওয়া যাক যে মেয়েদের আদর্শ কী তা আমরা জানি না। যাই হোক সেটা, এটা নিশ্চিত যে সেটা পুরুষের চরম উৎকর্ষের আদর্শ নয়। অথচ নারীজাতির পথকণ্টক এই শৌখীন নারী আন্দোলনের সমস্ত উদ্ভট কার্যকলাপের লক্ষ্য হচ্ছে ঐ পুরুষালী আদর্শে পৌঁছানো।

আমার মনে হয়, এই ভুল বোঝার প্রভাব চেখফের উপর পড়েছিল "দুলালী" লেখবার সময়।

বালআমের মতো তিনি চেয়েছিলেন অভিশাপ দিতে, কিন্তু কাব্যদেবতা তাঁকে নিষেধ করলেন, আদেশ দিলেন আশীর্বাদ করতে। আশীর্বাদই তিনি করলেন এবং অজ্ঞাতে এমন অপূর্ব প্রভামণ্ডিত করলেন এই মাধুরীময়ী প্রাণীটিকে যে সে চিরকালের মতো একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল—যে নিজে আনন্দ চায় এবং নিয়তি যাকেই তার সান্নিধ্যে আনে তাকেই আনন্দ দিতে চায়, এমন একটি নারী যে কী হতে পারে তার।

গল্পটি যে এত অপরূপ তার কারণ, এর পরিণতি পূর্বকল্পিত নয়।

আমি বাইসিকেল চালাতে শিখেছিলাম একটা হলঘরে। সেটা এত বড় যে তার মধ্যে একটা সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করতে পারে। অপর প্রান্তে একটি মহিলা শিখছিলেন বাইসিকেল চড়া। আমি ভাবলাম, হুঁশিয়ার থাকব, ওঁর উপর চোখ রাখলাম। চেয়ে থাকতে থাকতে ক্রমেই আমি ওঁর দিকে এগিয়ে পড়তে লাগলাম। উনি বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। তবু আমি গিয়ে পড়লাম ওঁর ঘাড়ের উপর, ধাক্কা মেরে বাইসিকেল থেকে তাঁকে ফেলে দিলাম—অর্থাৎ যা চেয়েছিলাম তার উল্টোটাই করে বসলাম—শুধু এই কারণে যে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মহিলাটির উপর।

চেখফেরও তাই হল, বিপরীত মুখে। উনি চেয়েছিলেন দুলালীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে, কিন্তু তাঁর কবির দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ থাকায় তিনি দিলেন তাকে তুলে।

এই টীকাটি পড়ার পর আর কার কি বলবার থাকে?

[চেখফ বলেছিলেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আমি আমার জীবনে আর কী আমরা করতে পারি!]

সত্যেন্দ্রনাথ যখন একদিন দেখলেন, কবিগুরু তাঁর একটি বাঙলা কবিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন (অর্থাৎ নিজের সৃজনীকর্ম মুলতুবী রেখে) তখন তাঁর হৃদয়ে কী শ্লাঘার উদয় হয়েছিল তার কি কল্পনাও আমরা করতে পারি।

ধন্য 'দুলালী'র প্রেম। তা সে যাকেই বাসুক না, যতবারই বাসুক না কেন। রমণীর এই প্রেমই তো জগৎকে শ্যামল করে রেখেছে।

কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। সহৃদয় পাঠক আমার দম্ভ ক্ষমা করবেন।

'দুলালী' যখন ভানিচ্‌কাকে ভালোবাসছে তখন যদি হঠাৎ ভাসিলিকে দেখে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে হৃদয়হীনার মত হৃদয় খান খান করে তার প্রেমকে পদদলিত করে (ইংরিজিতে যাকে বলে তাকে 'জিল্‌ট' করে) ভাসিলিকে বরণ করতো তখনও 'দুলালী'র সে-প্রেম ধন্য?

ঠাকুর-দেবতার কার্যকলাপ আমাদের সমালোচনার বাইরে। এই যে কেষ্টঠাকুর রাধাকে জিল্‌ট্ করে মথুরা গিয়ে একাধিক প্রণয় এবং শুধু তাই নয়, রাধার কানের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে বিয়ে করলেন, সেগুলোও ধন্য? অথচ আমাদের হৃদয় তো পড়ে রইল শ্রীরাধার রাঙা পায়ে। শত শত বৎসর ধরে এই বাঙলাদেশে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা আপন আপন বিরহবেদনা আপন আপন পদদলিত প্রেমের নিবিড়তম পীড়া তুলে দিলেন রাধার মুখে। তাই দিয়ে 'মাথুর' আর সেই জিনিসই পদাবলীর হৃদয়খণ্ড,—মেরুদণ্ড—যে নামেই তাকে ডাকা যাক। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা আমি পাইনি : শত শত বৎসর ধরে হাজার হাজার কবি (এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর নাকি প্রায় শ'তিনেক বিধর্মী মুসলমান কবি! ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, এই অভাগিনী জিলটেড

আন্তন চেখফ : 'The Darling and other short stories', রুশ কন্‌স্ট্যান্স গার্নেটের তরজমা, London, Chatto & Windus, 1918।

রাধার প্রেমে কী যাদুমন্ত্র লুকনো ছিল যে শত শত বিধর্মী কবিকেও তাঁর সামনে নতমস্তক হতে হল!) আপন আপন হৃদয়বেদনা—যার মূল্য বিশ্বাসঘাতক, প্রেমঘ্ন নিরতিশয় স্বার্থপর, নীচ দয়িত দিল না—নিজের মুখে প্রকাশ না করে সর্ব বৈভব নত নমস্কারে রেখে দিল পাগলিনী শ্রীরাধার অধরোষ্ঠে। তার হয়তো একমাত্র কারণ, উপনিষদ বলেছেন, 'তাকে ত্যাগ করে ভোগ করবে। শ্রীরাধা প্রেম দিয়ে আনন্দ পেতে চাননি, মাতৃত্বের বিগলিত মধুরিমা, যশোদার মতো বিশ্বজয়ী পুত্রের গৌরবও তিনি কামনা করেননি। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভোগ করলেন। এ ভোগ 'দুলালী'র ভোগ নয়। এ শচীপতি ইন্দ্রের ভোগ নয়, শ্মশানবাসী নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য। কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে পদদলিত প্রেমের উদাহরণ নেই। যাঁর জন্য তাঁর বিরহবেদনা তাঁর শত শত গানে প্রকাশ পেয়েছে তিনিও কবিকে ভালোবাসেন—তাঁর 'প্রেমের বেদনা'তে কবির 'মূল্য আছে'—শুধু তিনি চলে গেছেন দূরে রবিপ্রেম কখনও লাঞ্ছিত হয়নি। সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না।

কিন্তু এ তো একটা দিক। আমার মূল প্রশ্ন এখনও পাঠকের কাছে রইল, অতি ঘরোয়া ভাষায় শুধোই, এই যে আমাদের সোসাইটি লেডি, আজ মুখুয্যেকে জিল্ট্ করে কাল সেনকে, পরশু সেনকে জিল্ট্ করে ঘোষকে—তাঁর প্রত্যেক প্রেমের জয়ধ্বনি গাইবেন টলস্টয়?

সর্বশেষে পুনরায় বিস্ময় মানি চেখফের এই গল্পটির সামনে। বিস্ময় মানি টলস্টয়ের টীকার সম্মুখে। আমাদের মত জড় পাষাণ-হৃদয়কে বিগলিত করে বইয়ে দিল শত শত প্রশ্নধারায়।

৩রা জুলাই, ১৯৬৩

আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব"
অনুবাদকের টিপ্পনী

আন্তন চেখফের রচনায় রাশার যে-যুগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আমাদের জমিদার-যুগের প্রচুর মিল দেখতে পাই। সেই কারণেই বোধ হয় আমাদের শরৎচন্দ্র প্রচুর রাশান উপন্যাস, ছোট গল্প অতিশয় মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অসাধারণ শিল্পী, তাই তাঁর পরিণত বয়সের লেখাতে অন্যের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। তবে যদি কোন সাহিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকে, তবে সেটা রুশ সাহিত্য। তাঁর 'দত্তা'র সঙ্গে এ-নাটিকার কোন মিল নেই, কিন্তু দুটিতেই আছে একই জমিদারির আবহাওয়া।

চেখফ যে যুগের বর্ণনা দিয়েছেন সে সময় একই লোককে ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডাকত। যেমন এই নাটিকার নাম নাতালিয়া স্তেপানভনা চুবুকফ। অতি অল্প পরিচয়ে লোক তাকে ডাকবে মিস চুবুকফ বলে। যাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, তারা ডাকবে নাতালিয়া স্তেপানভনা। (স্তেপানভনা = স্তেপানের মেয়ে)। যাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তারা ডাকবে শুধু নাতালিয়া, এবং যারা নিতান্ত আপন জন তারা ডাকবে নাতাশা। এখনও বোধ হয় এই রীতিই প্রচলিত আছে, তবে যে স্থলে মিস চুবুকফ বলা হত আজ বোধ হয় সেখানে কমরেড চুবুকফ বা চুবুকভা বলা হয়।

পাত্র-পাত্রীগণ :

স্তেপান স্তেপানভিচ্ চুবুকফ—জমিদার।

নাতালিয়া (ডাকনাম নাতাশা) স্তেপানভ্না চুবুকফ—ঐ জমিদারের কন্যা; বয়স ২৫।

ইভান ভার্সিলিয়েভিচ্ লমফ—চুবুকফের প্রতিবেশী জমিদার, স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট লোক, কিন্তু সমস্তক্ষণ ভাবেন তিনি বড্ডই অসুস্থ (হাইপোক্রোন্‌ডিআক)।

ঘটনা চুবুকফের জমিদারীতে।

[চুবুকফের ড্রইংরুম। চুবুকফ এবং লমফ : ঈভনিং ড্রেস এবং সাদা দস্তানা পরে লমফের প্রবেশ]

চুম্বক : [লমফের দিকে এগিয়ে গিয়ে] এস, এস, বন্ধুবর! এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! কিন্তু বড় আনন্দ হল, বড়ই আনন্দ হল [হ্যান্ডশেক্]। সত্যি একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে, ভায়া। কি রকম আছো?

লমফ : ধন্যবাদ। আর আপনি কি রকম আছেন?

চুবুকফ : মোটামুটি আমাদের ভালোই যাচ্ছে, বাছা—তোমাদের প্রার্থনা আর-যা-সব-কি-সব তো রয়েছে। বসো, বসো। জানো, এরকম করে পুরনো দিনের প্রতিবেশীকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়? বড় খারাপ, বড্ডই খারাপ। কিন্তু বলো দিকিনি, এত সব ধড়াচুড়ো পরে কেন? পুরোপাক্কা ফুল ডিনার ড্রেস, হাতে দস্তানা আর-যা-সব-কি-সব? কারও সঙ্গে পোশাকী দেখা করতে যাচ্ছো নাকি, না অন্য কিছু ভায়া?

লমফ : আজ্ঞে না, শুধু আপনাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

চুবু : তবে ফুল ডিনার ড্রেস কেন ভায়া? মনে হচ্ছে তুমি যেন নববর্ষে পোশাকী মোলাকাৎ করতে এসেছ!

লমফ : ব্যাপারটা হচ্ছে (চুবুকফের হাত ধরে)...আমি কি না, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে, স্যার—শুধু আশা করছি আপনি বিরক্ত হবেন না। আপনার কাছ থেকে এর আগেও আমি সাহস করে কয়েকবার সাহায্য চেয়েছি এবং আপনিও, সব সময়েই, বলতে কি...কিন্তু মাফ করুন, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি একটুখানি জল খাই। [জলপান]

চুবু : [নেপথ্যে] টাকা ধার চাইতে এসেছে নিশ্চয়ই। দেব না। [লমফকে] কি হয়েছে, বলো না ভায়া।

লমফ : দেখুন স্যার...কিন্তু মাফ করুন, স্যার...আমার সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে...দেখতেই পাচ্ছেন...মানে কি না, আপনিই একমাত্র লোক যিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন, যদিও সত্যি বলতে কি, আমি এযাবৎ আপনার জন্য এমন কিছু করতে পারিনি যার জন্য আপনার কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি, সত্যি, আমার সে হক্ক আদপেই নেই...

চুবু : কী বিপদ! অত সুতো ছাড়ছ কেন ভায়া! বলেই ফেল না, কি হয়েছে বলো।

লমফ : বলছি, বলছি, এখ্খনি বলছি...ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আমি আপনার মেয়ে

নাতালিয়া স্তেপানভ্‌নাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

চুবু : (সোল্লাসে) ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! প্রাণের বন্ধু আমার! ফের বলো তো, কি বললে। আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাইনি।

লমফ : অতিশয় সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি...

চুবু : (বাধা দিয়ে) সোনার চাঁদ ছেলে! আমি যে কী খুশী হয়েছি, আর-যা-সব-কি-সব। নিশ্চয় নিশ্চয়, আর-যা-সব-কি-সব। [লমফকে আলিঙ্গন ও চুম্বন] ঠিক এই জিনিসটিই আমি বহুকাল ধরে চাইছিলুম [এক ফোঁটা চোখের জল] তোমাকে আমি চিরকালই আপন ছেলের মত স্নেহ করেছি। ভগবান তোমাদের হৃদয়ে একে অন্যের জন্য প্রেম দিন, তোমাদের মনের মিল হোক, আর-যা-সব-কি-সব। সত্যি বলতে কি, আমি সব সময়েই চেয়েছিলুম...কিন্তু আমি এখানে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছি কি? আমাকে কেউ যেন আনন্দের ডাণ্ডশ মেরেছে—আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না! আহা, আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে—আমি গিয়ে নাতাশাকে ডাকছি, আর-যা-সব-কি-সব—

লমফ : স্যার, উনি কি বলবেন আপনার মনে হয়? তিনি সম্মতি দেবেন, আশা করতে পারি?

চুবু : কি বললে? নাতাশা যদি রাজী নাও হতে পারে! অবাক করলে! আর তোমার চেহারাটাও চমৎকার নয়? ধরো বাজি, ও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর-যা-সব-কি-সব। আমি এখুনি তাকে বলছি গে।

[নিষ্ক্রমণ]

লমফ : [একা] আমার শীত-শীত করছে...আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, যেন পরীক্ষার হলে যাচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে, মন স্থির করা। বেশী দিন ধরে শুধু যদি ভাবতেই থাকো, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে শুধু আলোচনা করে, গড়িমসি গড়িমসি করতে থাকো, আর কোন এক আদর্শ রমণীর জন্য, কিংবা খাঁটি সত্য প্রেমের জন্য পথ চেয়ে থাকো, তবে তোমার কখ্‌খনো বিয়েই হবে না। উহুহুহু, কী শীত করছে আমার! নাতালিয়া স্তেপানভ্‌না সংসার চালায় চমৎকার, লেখাপড়ি করেছে আর দেখতেও খারাপ নয়...এর বেশী আমার কীই বা চাই? কিন্তু আমি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। মাথাটা তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। [জলপান] কিন্তু আমার আইবুড়ো হয়ে থাকা চলবে না। পয়লা কথা, আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় : আমাকে মেপেজুকে ছকে কাটা জীবন চালাতে হবে...আমার বুকের ব্যামো রয়েছে, ভিতরটা সর্বক্ষণ ধড়ফড়...আমি কত সহজেই রেগে কাঁই হয়ে যাই আর কত সহজেই উত্তেজনার চরমে পৌঁছে যাই...এই তো, এই এখ্‌খনি আমার ঠোঁট কাঁপছে আর ডান চোখের পাতাটা নাচছে...কিন্তু সব চেয়ে বিপদ হল আমার ঘুম নিয়ে। বিছানায় যেই শুয়েছি আর চোখ দুটো জুড়ে আসছে অমনি কি যেন কি একটা আমার বাঁ পাশটায় ছোরা মারে। এক্কেবারে ছোরা মারার মত! আর সেটা সরাসরি আমার কাঁধের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাথা অবধি পৌঁছে যায়...আমি খ্যাপার মত লাফ দিয়ে উঠি, খানিকটা পায়চারি করি, ফের শুয়ে পড়ি...কিন্তু যেই না আবার ঘুমে চোখের

পাতা জড়িয়ে এল আর অমনি আবার পাশের দিকটায় সেই ছোরার ঘা—আর ঐ একই ব্যাপার নিদেন কুড়িটি বার...

[নাতালিয়ার প্রবেশ]

নাতালিয়া : ও, আপনি! অথচ বাবা বললেন : যাও খদ্দের মাল নিতে এসেছে। কি রকম আছেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্?

লমফ : আপনি কি রকম, নাতালিয়া স্তেপানভ্না?

নাতালিয়া : কিছু মনে করবে না, আমার এপ্রন পড়া রয়েছে, ভদ্রদুরুস্ত জামাকাপড় পরিনি বলে। আমরা মটরশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছিলুম রোদ্দুরে শুকোবার জন্যে। এতদিন আমার সঙ্গে যে বড় দেখা করতে আসেননি? বসুন না...[দুজনেই বসলেন] দুপুরবেলা এখানে খাবেন?

লমফ : না। অনেক ধন্যবাদ। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : সিগারেট খাবেন না? এই তো দেশলাই...আজকের দিনটা চমৎকার, কিন্তু কাল এমনি জোর বৃষ্টি হল যে মজুররা সমস্ত দিন কিছুই করতে পারলো না। জানেন, আমরা কাল ক'গাদা খড় তুলতে পেরেছি? বিশ্বাস করবেন না, আমি সব খড় কাটিয়ে নিয়েছিলুম, আর এখন তো আমার প্রায় দুঃখ হচ্ছে—ভয় হচ্ছে, সব খড় পচে না যায়। হয়তো অপেক্ষা করলে ভালো হত। কিন্তু এসব কি? আমার মনে হচ্ছে আপনি ধড়াচুড়ো করেছেন। এ তো নতুন দেখলুম। আপনি কি বল্ নাচ কিংবা অন্য কিছু একটায় যাচ্ছেন? হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আপনি বদলে গেছেন—ভালো দেখাচ্ছে আগের চেয়ে।...কিন্তু, সত্যি, আপনি ধড়াচুড়ো পরেছেন কেন?

লমফ : [উত্তেজিত হয়ে] ব্যাপারটা কি জানেন, নাতালিয়া স্তেপানভ্না...আসলে কি জানেন, আমি মনস্থির করেছি, আপনাকে...মন দিয়ে শুনুন...আপনি নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন, হয়তো বা রাগ করবেন, কিন্তু আমি...[নেপথ্যে] আমি শীতে জমে গেলুম।

নাতালিয়া : কি বলুন তো! [একটু থেমে] বলুন।

লমফ : সংক্ষেপেই বলি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, শ্রীমতী নাতালিয়া স্তেপানভ্না, যে আমি বহুকাল ধরে আপনাদের পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি—ছেলেবয়েস থেকে, সত্যি বলতে কি। আমার যে পিসিমার কাছ থেকে, তিনি গত হলে পর তাঁর জমিদারী পেয়েছি, তিনি আর পিসেমশাই দুজনাই আমার পিতা এবং স্বর্গত মাতাকে গভীর সম্মানের চক্ষে দেখতেন। লমফ আর চুবুকফ পরিবারের বরাবরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এমন কি ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বলা চলে। তা ছাড়া, আপনি জানেন, আমার জমিদারী আপনাদের জমিদারীর একেবারে গা ঘেঁষে। আপনার হয়তো মনে পড়বে আমার ভলোভী মাঠ আপনাদের বার্চ বনের লাগাও।

নাতালিয়া : মাফ করবেন, কিন্তু এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার কথা কাটতে হল। আপনি যে বলেছেন, 'আমার' ভলোভী মাঠ...কিন্তু ওটা কি সত্যি আপনার?

লমফ : হ্যাঁ, আমার...

নাতালিয়া : তাই নাকি! এর পর আর কি চেয়ে বসবেন! ভলোভী মাঠ আমাদের, আপনার নয়।

লমফ : না। ওটা আমার, নাতালিয়া স্তেপানভ্না।

নাতালিয়া : এটা আমার কাছে নূতন খবর বলে ঠেকছে। ওটা আপনার হল কি করে?

লমফ : তার মানে আমি তো সেই ভলোভী মাঠের কথা বলছি যেটা আপনাদের বার্চ বন এবং পোড়া-বনের মাঝখানটায়...

নাতালিয়া : হ্যাঁ, সেইটের কথাই তো হচ্ছে...ওটা আমাদের।

লমফ : না, আপনি ভুল করেছেন নাতালিয়া স্তেপানভ্না, ওটা আমার।

নাতালিয়া : পাগলামি ছাড়ুন ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! ওটা কদিন ধরে আপনাদের হয়েছে?

লমফ : ক'দিন ধরে মানে? যতদিন ধরে আমার মনে পড়ে—ওটা তো চিরকালই আমাদের।

নাতালিয়া : আমাকে মাফ করতে হচ্ছে, আমি একমত হতে পারছি নে।

লমফ : কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই দলিলপত্রে জিনিসটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। একথা অবিশ্যি সত্য যে ভলোভী মাঠের স্বত্ব নিয়ে একসময় মতবিরোধ হয়েছিল কিন্তু এখন তো কুল্লে দুনিয়া জানে, ওটা আমার। তা নিয়ে তর্কাতর্কি করার এখন আর প্রয়োজন নাই। আপনাকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলছি—আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার প্রপিতামহের রায়তদের ঐ মাঠটা বিনা খাজনায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করতে দেন; তার বদলে ওরা তাঁর ইঁটের পাঁজা পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার প্রপিতামহের চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ওটা লাখেরাজ ভোগ করে করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে মনে করে ওটার স্বত্ব ওদেরই। কিন্তু দাসপ্রথা উঠে যাওয়ার পর যখন নূতন বন্দোবস্ত হল...

নাতালিয়া : আপনি যা বলছেন সেটা আদপেই ও রকম ধারা নয়। আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহ জানতেন যে তাঁদের জমিদারীর হদ্দ পোড়া-বন অবধি—কাজেই ভলোভী মাঠ আমাদের সম্পত্তির ভিতর পড়ল বইকি। তা হলে সেটা নিয়ে খামখা তর্ক করছেন কেন? আমি সত্যি আপনার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছি নে। হক কথা বলতে কি, আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

লমফ : আপনাকে আমি দলিল-দস্তাবেজ দেখাব নাতালিয়া স্তেপানভ্না!

নাতালিয়া : না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি মস্করা করছেন কিংবা আমাকে চটিয়ে মজা দেখছেন...বাস্তবিক, এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার। জমিটা প্রায় তিনশ বছর ধরে আমাদের স্বত্বে, আর আজ হঠাৎ একজন বলে উঠল, ওটা আমাদের নয়, মাফ করবেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমি আমার আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অবশ্য আমি ঐ জমিটার কোনও মূল্যই দিই নে। কত আর হবে—পনেরো একরটাক, তিনশ' রুবলের বেশী ওর দাম হবে না, কিন্তু ওটা নিয়ে এই নাহক অবিচার আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়। আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় অবিচার বরদাস্ত করতে পারি নে।

লমফ : আপনাকে মিনতি করছি, আমার সব কথা শুনুন। আপনার প্রপিতামহের চাষারা আমার পিসির ঠাকুরমার ইঁট পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়—একথা

আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আমার পিসির ঠাকুরমা তার বদলে ওদের অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে...

নাতালিয়া : ঠাকুদ্দা, ঠাকুমা, পিসি আমার মাথায় ওসব কিছুই ঢুকছে না। মাঠটা আমাদের, ব্যস!

লমফ : ওটা আমার!

নাতালিয়া : ওটা আমাদের! আপনি ঝাড়া দুদিন ধরে তর্ক করুন, যদি সাধ যায় পনেরোটা ধড়াচুড়ো সর্বাঙ্গে চড়ান, কিন্তু তবু ওটা আমাদেরই, আমাদেরই, আমাদেরই!...আপনার জিনিস আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা... আমি হারাতে চাই নে...আপনার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন।

লমফ : ও মাঠ আমি চাই নে, নাতালিয়া স্তেপানভ্না. কিন্তু এটা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের কথা। আপনি যদি চান তবে ওটা আমি আপনাকে উপহার দিতে পারি।

নাতালিয়া : কিন্তু ওটা যদি বিলিয়ে দিতে হয় তো সে হক্ক তো আমার—কারণ ওটা তো আমার জিনিস। আপনাকে খোলাখুলি বলছি, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমার কাছে সব-কিছু বড্ডই আজগুবী মনে হচ্ছে। এতদিন অবধি আমরা আপনাকে ভালো প্রতিবেশী বলেই মনে করেছি, আমাদের বন্ধুরূপেই আপনাকে গণ্য করেছি। গেল বছরে আমরা আপনাকে আমাদের গম-মাড়াইয়ের কলটা দিলুম; ফলে আমাদের আপন গম তুলতে তুলতে নভেম্বর হয়ে গেল। আর এখন আপনি আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার আরম্ভ করলেন যেন আমরা রাস্তার বেদে। আমাকে উপহার দিচ্ছেন আমার নিজের জমি! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এটা কি প্রতিবেশীর আচরণ? আমি বলবো, এটা রীতিমত বেয়াদবী—যদি শুনতে চান...

লমফ : আপনি বলতে চান, আমি তছরুপ করি! আমি কখনও অন্যের জিনিস চুরি করিনি, ম্যাডাম, আর কেউ এ কথা বললে আমি কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করবো না...[দ্রুতগতিতে জগের কাছে গমন ও জলপান] ভলোভী মাঠ আমার!

নাতালিয়া : কচু! ওটা আমাদের!

লমফ : ওটা আমার!

নাতালিয়া : ডাহা মিথ্যে! আপনাকে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আজই আমি আমার লোকজনকে ঐ মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাচ্ছি।

লমফ : কি বললেন?

নাতালিয়া : আমার লোকজন আজই ওখানে কাজ করবে।

লমফ : আমি ওদের লাথি মেরে খেদিয়ে দেব।

নাতালিয়া : আপনার সে মুরদ নেই।

নাতালিয়া : আপনার সে মুরদ নেই।

লমফ : [বুক আঁকড়ে ধরে] ভলোভী মাঠ আমার! এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না? আমার!

নাতালিয়া : দয়া করে চ্যাঁচাবেন না। আপন বাড়িতে বসে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু এখানে বাড়াবাড়ি করবেন না।

লমফ : আমার বুকের ভিতর যদি ওরকম মারাত্মক ব্যথা আর ধড়ফড়ানি না থাকতো, ম্যাডাম, রগ দুটো যদি দপদপ না করতো, আমি তা হলে আপনার সঙ্গে অন্য ভাবে কথা বলতুম। [চিৎকার করে] ভলোভী মাঠ আমার!

নাতালিয়া : আমাদের!

লমফ : আমার!

নাতালিয়া : আমাদের!

লমফ : আমার!

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবুকফ : ব্যাপার কি? তোমরা চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

নাতালিয়া : বাবা, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু বুঝিয়ে বলো না, ভলোভী মাঠ কার—ওঁর, না আমাদের!

চুবু : [লমফকে] মাঠটা আমাদের, বাবা।

লমফ : মাফ করবেন, স্যার; ওটা আপনাদের হল কি করে? আপনি অন্তত হক্কের বিচার করবেন। আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার ঠাকুরদার চাষাদের জমিটা কিছুদিনের জন্য লাখেরাজ ভোগ করতে দেন। চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সেটা ভোগ করে। ফলে আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস হয়ে যায় ওটা ওদেরই। কিন্তু পরে যখন নূতন বন্দোবস্ত হল...

চুবু : কিছু মনে করো না, বাবা...তুমি ভুলে যাচ্ছো যে ঐ জমিটার স্বত্ব আর-যা-সব-কি-সব নিয়ে ঝামেলা ছিল বলেই চাষারা তোমার ঠাকুরমাকে কোনও খাজনা দেয়নি, আর-য়া-সব-কি-সব...আর এখন গাঁয়ের কুকুরটা পর্যন্ত জানে যে ওটা আমাদের—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তুমি নিশ্চয়ই জরিপের ম্যাপগুলো দেখোনি!

লমফ : কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব, জমিটা আমার!

চুবু : সে, বাছা, তুমি পারবে না।

লমফ : নিশ্চয় পারবো।

চুবু : কিন্তু চ্যাঁচাচ্ছো কেন, লক্ষ্মীটি! চ্যাঁচালেই কি কোনও জিনিস প্রমাণ হয়? তোমার যা হক্কের মাল তা আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা ছাড়বার বাসনা আমার কণামাত্র নেই। ছাড়বো কেন? অবশ্য আখেরে যদি তাই দাঁড়ায়, অর্থাৎ তুমি যদি ঐ জমি নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া আরম্ভ করতে চাও, আর-যা-সব-কি-সব, তা হলে আমি বরঞ্চ আমার চাষাদের ঐ জমিটা বিলিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে না। এই হল পাকা কথা।

লমফ : আমি তো বুঝতে পারলুম না। পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার কি হক্ক আপনার?

চুবু : আমার কি হক্ক আছে না আছে সেটা স্থির করার ভার দয়া করে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আর শোনো, ছোকরা, আমি এরকম ধরনের কথা বলা, আর-যা-সব-কি-সব শুনতে অভ্যস্ত নই...আমার বয়েস তোমার ডবল, তবু তোমায় অনুরোধ করছি ওরকম মাথা গরম করে আর-যা-সব-কি-সব ওরকম ধারা আমার সঙ্গে কথা কয়ো না...

লমফ : না, আপনারা ভেবেছেন আমি একটা আস্ত গাড়ল আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন। আমার জমি বলছেন আপনাদের আর তারপর আশা করছেন আমি সুবোধ ছেলেটির মত শান্ত কণ্ঠে আর পাঁচজনের মত কথাবার্তা বলবো। ভালো প্রতিবেশী এরকম কথা বলে না, স্তেপান স্তেপানভিচ্ মশাই! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি পরের জমির বেদখলকারী!

চুবু : মানে? কি বললে?

নাতালিয়া : বাবা, এখ্‌খুনি মজুরদের মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাও।

চুবু : [লমফকে] আপনি আমাকে কি বলছিলেন, স্যর?

নাতালিয়া : ভলোভী মাঠ আমাদের আর ওটা আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না।

লমফ : সে আমরা দেখে নেব। আমি আদালতে সপ্রমাণ করে ছাড়ব ও মাঠ আমার।

চুবু : আদালতে? আপনি আদালতে যান না, স্যর, আর-যা-সব-কি-সব। যান না, যান। আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি—এতদিন ধরে শুধু অপেক্ষা করেছিলেন আদালতে যাবার জন্য, একটা মোকা পাওয়ার, আর-যা-সব-কি-সব। তুচ্ছ জিনিসি নিয়ে মাতামাতি করা—ঐ তো তোমাদের স্বভাব। তোমাদের পরিবারের সব কজনই মামলাবাজীতে ওস্তাদ! সব কটা।

লমফ : দয়া করে আমার পরিবারের লোককে অপমান করবেন না। লমফগুষ্টির সবাই ভদ্রসন্তান, আপনার কাকার মত তহবিল তছরূপের দায়ে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

চুবু : লমফ পরিবারের সব কটা বদ্ধ-পাগল!

নাতালিয়া : সব কটা—সাকুল্যে!

চুবু : তোমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঁড় মাতাল, আর তোমার ছোট মাসি নাতাসিয়া মিহাইলভনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা—এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যায়, আর-যা-সব-কি-সব।

লমফ : আর আপনার মা ছিলেন কুঁজো! [হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে] আমার বুকের সেই বেদনাটা চিলিক মারছে...সব রক্ত আমার মাথায় উঠে গেছে...হে ভগবান জল, জল!

চুবু : তোমার বাবা ছিলেন জুয়াড়ি আর পেটুকের হদ্দ।

নাতালিয়া : তোমার পিসি ছিলেন একটি সাক্ষাৎ নারদ—গাঁ উজাড় করলে ওঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার!

লমফ : আমার বাঁ পা-টা অবশ হয়ে গিয়েছে...আর আপনার পেটে জিলিপির প্যাঁচ...ও, আমার বুকটা গেল, আর সবাই জানে, নির্বাচনের আগে আপনি... আমার চোখের সামনে বিজলি খেলে যাচ্ছে...আমার টুপিটা গেল কোথায়?

নাতালিয়া : এসব ছোটলোকমি! ধাপ্পাবাজি! নোংরামিতে চূড়ান্ত!

চুবু : আর তুমি কুচুটে, ভণ্ড, ছোটলোক! হ্যাঁ, তা-ই।

লমফ : হ্যাট পেয়েছি...ও আমার বুকের ভিতরটা...কোন্ দিক দিয়ে বেরুবো? দরজাটা কোথায়? ও, আমি আর বাঁচবো না...আমার পা যে আর নড়ছে না।

[দরজা পর্যন্ত গমন]

চুবু : [লমফকে পিছন থেকে চেঁচিয়ে] আমার বাড়িতে আর কখ্খনো পা ফেলবে না।

নাতালিয়া : আদালতে যান! আমরাও দেখে নেব!

[টলতে টলতে লমফের প্রস্থান]

চুবু : জাহান্নমে যাক! [উত্তেজনার সঙ্গে পায়চারি]

নাতালিয়া : এ রকম একটা ছোটলোক দেখেছ কখনও? এর পরও লোকে বলে প্রতিবেশীর উপর ভরসা রাখতে!

চুবু : আস্ত একটা সং! বদমাইশ!

নাতালিয়া : পিচেশ! অন্যের জমি বেদখল করে উল্টে দেয় গালাগাল?

চুবু : সৃষ্টিছাড়া ব্যাটা চক্ষুশূল—জানো, ব্যাটার বেয়াদপী কতখানি? এখানে এসেছিল প্রস্তাব পাড়তে, আর-যা-সব-কি-সব! বিশ্বাস হয় তোমার? প্রস্তাব করতে?

নাতালিয়া : কিসের প্রস্তাব?

চুবু : হ্যাঁ, ভাবো দিকিনি, এসেছিল তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে!

নাতালিয়া : বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে? আমাকে বিয়ে করতে? আমাকে আগে বললে না কেন?

চুবু : তাই তো ধড়াচুড়ো করে এসেছিল! বাঁদর! খাটাশ!

নাতালিয়া : আমাকে বিয়ে করতে? বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে? ও! [চেআরে পতন—গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস। ওকে ডেকে নিয়ে এস। ও!—ডেকে নিয়ে এস।

চুবু : কাকে ডেকে নিয়ে আসবো!

নাতালিয়া : শিগগির করো, জলদি যাও। আমি যে ভিরমি যাব। ওকে ডেকে নিয়ে এস। [ছন্নের মত আর্তরব]

চুবু : কি বলছো! কি চাও তুমি? [দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে] এ কী অভিসম্পাত! আমি বন্দুকের গুলিতে মরব। আমি নিজের হাতে ফাঁস পরবো। সবাই মিলে আমার সর্বনাশ করেছে।

নাতালিয়া : আমি মরে যাচ্ছি। ওকে ডেকে নিয়ে এস।

চুবু : বাপ্‌স্‌! যাচ্ছি, যাচ্ছি। ও রকম হাউমাউ করো না। [ধাবমান]

নাতালিয়া : [একা, গুঙরে গুঙরে] আমরা কি করে বসেছি! ওগো, ওকে ডেকে নিয়ে এস, ফিরিয়ে নিয়ে এস।

চুবু : [দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন] এখ্খুনি আসছে ও—আর-যা-সব-কি-সব। জাহান্নমে যাক ব্যাটা। আখ্‌! তুমি ওর সঙ্গে নিজে কথা বলো; আমার দ্বারা হবে না, পষ্ট বলে দিলুম।

নাতালিয়া : [গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস!

চুবু : [চিৎকার করে] ও আসছে, আসছে, তোমায় বলছি তো। হে ভগবান, আইবুড়ো মেয়ের বাপ হওয়া কী গব্বযন্তনা! আমি আমার গলায় দা বসাব। হ্যাঁ, আলবৎ। আমি আমার গলাটা কেটে ফেলব। আমরা লোকটাকে গালাগাল দিয়েছি, অপমান করেছি, লাথি মেড়ে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি—আর এসবের মূলে তুমি—তুমিই করেছ এসব।

নাতালিয়া : না, তুমি।

চুবু : ও! এখন দোষ আমার! আর কি শুনতে হবে তারপর?

[লমফের প্রবেশ]

লমফ : [অবসন্ন] আমার বুক ভীষণ ধড়ফড় করছে...আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে...বাঁ পাশটায় অসহ্য যন্ত্রণা...

নাতালিয়া: আমাদের মাফ করুন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমরা ঝোঁকের মাথায়...আমার এখন মনে পড়ছে, ভলোভী মাঠ সত্যিই আপনার।

লমফ : আমার বুকটায় যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে...মাঠটা আমার...আমার দুটো চোখ করকর করছে...

নাতালিয়া : হ্যাঁ মাঠটা আপনার, আপনারই...বসুন [উভয়েরই উপবেশন] আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

লমফ : আমার কাছে এটা ন্যায়-অন্যায়ের কথা...জমিটার আমি কোনও মূল্য দিই নে, কিন্তু ন্যায়ের মূল্য আমি দিই...

নাতালিয়া : সত্যিই তো ন্যায়-অন্যায় বোধের কথা...ওসব বাদ দিন...অন্য কথা পাড়ুন।

লমফ : বিশেষত আমার কাছে যখন প্রমাণ রয়েছে। আমার পিসিমার ঠাকুরমা আপনার বাবার ঠাকুরদার চাষাদের...

নাতালিয়া : হয়েছে, হয়েছে, ওসব কথা তো হয়ে গিয়েছে...[স্বগত] কি করে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছি নে, [লমফকে] আপনি কি শিগগিরই শিকারে বেরুচ্ছেন?

লমফ : ভাবছি, নবান্নের পরই বন-মোরগ শিকারে বেরবো...মনে পড়ল, আপনি কি শুনেছেন, আমার কি মন্দ কপাল...আমার ট্রাইয়ার বেচারী—আপনি তো ওকে চেনেন—ওর পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : আহা, বেচারা! কি করে হল?

লমফ : আমি ঠিক জানি নে...বোধ হয় পায়ের থাবা মচকে গিয়েছে, কিংবা হয়তো অন্য কুকুর তাকে কামড়ে দিয়েছে...[দীর্ঘনিশ্বাস] আমার সবচেয়ে ভালো কুকুর, টাকার কথা না হয় বাদই দিলুম। জানেন, মিরনফকে একশ' পঁচিশ রুবল দিয়ে ওকে কিনি।

নাতালিয়া : বড্ড বেশি দিয়েছিলেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্।

লমফ : আমার তো মনে হয়, সস্তাতেই পেয়েছি। ওর মত কুকুর হয় না।

নাতালিয়া : বাবা তাঁর ফ্লাইয়ারের জন্য পঁচাশি রুবল দিয়েছিলেন। আর ফ্লাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

লমফ : ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো? কি যে বলছেন! [হাস্য] ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো!

নাতালিয়া : নিশ্চয়ই ভালো। অবশ্য স্বীকার করছি, ফ্লাইয়ার বাচ্চা—এখনও পুরো বয়েস হয়নি—কিন্তু যেমন বুদ্ধি তেমনি আর সব দিক দিয়ে। ভলচানিয়েৎস্কিরও এমন একটা কুকুর নেই।

লমফ : মাফ করতে হল, নাতালিয়া স্তেপানভ্না, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ও

থ্যাবড়া-মুখো, আর থ্যাবড়া-মুখো কুকুর কখ্খনো ভালো করে কামড়ে ধরতে পারে না।

নাতালিয়া : থ্যাবড়া-মুখো? এই প্রথম শুনলুম!

লমফ : আপনাকে পাকা কথা বলছি, ওর নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে ছোট।

নাতালিয়া : বটে? আপনি মেপে দেখেছেন নাকি?

লমফ : হ্যাঁ। শিকার তাড়া করতে অবশ্য সে ভালো, কিন্তু কামড়ে ধরার বেলা ওটাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না।

নাতালিয়া : প্রথমত, আমাদের ফ্লাইয়ার খানদানী কুকুর। হার্নেস আর চিজল ওর বাপ-মা। আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ে এমনই পাঁচমেশালি রঙ যে বলাই যায় না, ওটা কোন্ জাতের কুকুর। বিশ্রী চেহারা, বুড়ো-হাবড়া হয়ে গিয়েছে...

লমফ : ও বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু ওর বদলে আমি আপনাদের পাঁচটা ফ্লাইয়ারও নেব না—স্বপ্নেও না। ট্রাইয়ার যাকে বলে সত্যিকার কুকুর, আর ফ্লাইয়ার... কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করাটাই বেকুবি...আপনাদের ফ্লাইয়ারের মত কুকুর প্রত্যেক শিকারীরই গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। ওর জন্য পঁচিশ রুবল দিলেও বড্ড বেশী দেওয়া হয়।

নাতালিয়া : সব কথা প্রতিবাদ করার শয়তান আজ আপনার ঘাড়ে চেপেছে, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্। প্রথম আরম্ভ করলেন ভলোভী মাঠের উপর খামকা হক্ক বসিয়ে, আর এখন বলছেন, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের চেয়ে সরেস। কেউ কিছু বিশ্বাস করে না বললে আমার ভারী বিরক্তি বোধ হয়। যা বলেন, যা কন, আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ফ্লাইয়ার আপনার—কি যেন ওর নাম—ঐ বোকা ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণ ভালো। তা হলে খামকা উল্টোটা বলছেন কেন?

লমফ : আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নাতালিয়া স্তেপানভ্না, আপনি ভাবছেন আমি কানা কিংবা আহাম্মুখ। আপনি কি কিছুতেই বুঝবেন না যে আপনাদের ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো?

নাতালিয়া : মিথ্যে কথা।

লমফ : ওটা থ্যাবড়া-মুখো!

নাতালিয়া : [চিৎকার করে] মিথ্যে কথা!...

লমফ : আপনি চ্যাঁচাচ্ছেন কেন, ম্যাডাম?

নাতালিয়া : আপনি আবোল-তাবোল বকছেন কেন? পিত্তি একেবারে চটে যায়। ট্রাইয়ারকে গুলি করে মারার সময় হয়ে গিয়েছে আর আপনি ওটাকে ফ্লাইয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন!

লমফ : মাফ করবেন, আমি আর এ আলোচনা করতে পারবো না। আমার বুক ধড়ফড় করছে।

নাতালিয়া : আমি লক্ষ্য করেছি, যে শিকার সম্বন্ধে যত কম বোঝে সে-ই শিকার নিয়ে তর্কাতর্কি করে বেশী।

লমফ : মাদাম, দয়া করে চুপ করুন...আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।... [চিৎকার করে]

চুপ করুন।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন, ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে সরেস!

লমফ : শতগুণে নিরেস। ওর এত দিনে মরে যাওয়া উচিত ছিল—ঐ আপনাদের ফ্লাইয়ারের কথা বলছি। ও, আমার মাথাটা...আমার চোখ দুটো...আমার কাঁধটা...

নাতালিয়া : আর আপনাদের ঐ হাবা ট্রাইয়ারটা—আমাকে তার মৃত্যু-কামনা করতে হবে না; ওটা তো আধমরা হয়েই আছে।

লমফ : [কেঁদে কেঁদে] চুপ করুন। আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না।

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবু : এখন আবার কি?

নাতালিয়া ; আচ্ছা বাবা, তুমি খোলাখুলি বলো তো, ধর্ম সাক্ষী করে বলো তো—কোন্‌টা সরেস—আমাদের ফ্লাইয়ার, না ওঁর ট্রাইয়ার?

লমফ : স্তেপান স্তেপানভিচ্, স্যর, আপনার পায়ে পড়ছি, মাত্র একটি কথা আমাদের বলুন, ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো, কিংবা থ্যাবড়া-মুখো নয়? হ্যাঁ কি না?

চুবু : হলেই বা? যেন তাতে কিছু এসে যায়! যাই বল, যাই কও, ওর মত কুকুর তামাম জেলাতেও একটা নেই, আর-যা-সব-কি-সব।

লমফ : কিন্তু আমার ট্রাইয়ার ওর চেয়ে সরেস। নয় কি? ধর্ম সাক্ষী করে বলুন?

চুবু : ও রকম মাথা গরম করো না, বাছা আমার, বুঝিয়ে বলছি আমি...তোমার ট্রাইয়ারের বিস্তর সদগুণ আছে, কেউ অস্বীকার করবে না—জাতে ভালো, পাগুলো জোরদার, গড়ন চমৎকার, আর-যা-সব-কি-সব। কিন্তু হক্ কথা শুনতে চাও, বাছা, তবে বলি ওর দুটো মারাত্মক খুঁৎ আছে—সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে আর তার প্যাঁচা-নাক।

লমফ : মাফ করবেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে...কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি সেইটে দেখা যাক...আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, আমরা যখন মারুস্‌কিনের মাঠে শিকার করতে গিয়েছিলুম, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে সমানে ছুটেছিল, আর আপনাদের ফ্লাইয়ার নিদেনপক্ষে পাকি আধটি মাইল পিছনে পড়ে ছিল।

চুবু : কাউন্টের শিকারী তাকে চাবুক মেরেছিল বলে সে পিছিয়ে পড়ে।

লমফ : সেইটেই তার প্রাপ্য! আর সব কটা কুকুর খেঁকশিয়ালকে তাড়া লাগাচ্ছিল আর ট্রাইয়ার জ্বালাতন করতে লাগলো ভেড়াগুলোকে।

চুবু : বাজে কথা। শোনো বাছা, আমি বড্ড সহজে চটে যাই, তাই তোমায় অনুরোধ করছি, এ আলোচনাটা থাক। লোকটা ফ্লাইয়ারকে চাবুক মেরেছিল, কারণ মানুষের স্বভাব অন্যের কুকুরের প্রতি হিংসুটে হওয়া...হ্যাঁ, পরের কুকুরকে কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর আপনিও স্যর, ওর ব্যত্যয় নন। হ্যাঁ, যেই দেখলে আর কারও কুকুর তোমার ট্রাইয়ারের চেয়ে সরেস, ব্যস, অমনি জুড়ে

দিলে কিছু একটা...আর-যা-সব-কি-সব...দেখলে, আমার-সব মনে থাকে।

লমফ : আমারও।

চুবু : [ভেংচিয়ে] আমারও!

লমফ : বুক ধড়ফড় করছে...আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে...আমি কিছুই...

নাতালিয়া : [ভেংচিয়ে] বুক ধড়ফড় করছে! কী রকম শিকারী মশাই, আপনি? আপনার উচিত শিকারে না গিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে শুয়ে আরশুলা মারা। বুক ধড়ফড় করছে, হুঁঃ!

চুবু : হ্যাঁ, হক্ কথা বলতে কি, শিকারে-টিকারে বেরোনো আদপেই তোমার কম্ম নয়। বুকের ধড়ফড়ানি, আর-যা-সব-কি-সব, নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খাওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে বাড়িতে বসে থাকাই ভালো। অবশ্য তুমি যদি সত্যই শিকার করতে যেতে তাহলে কোনও কথা ছিল না, কিন্তু তুমি তো যাও নিছক তর্কাতর্কি করার জন্য, আর অন্য পাঁচজনের কুকুরগুলোর সামনে পড়ে তাদের বাধা দেবার জন্য, আর-যা-সব...আমি বড্ড সহজেই চটে যাই, কাজেই এ আলোচনা বন্ধ করাই ভালো। তুমি আদপেই শিকারী নও, ব্যস্!

লমফ : আর আপনি—আপনি বুঝি শিকারী? আপনি তো যান কাউন্টকে নিছক তেল মালিশ করার জন্য, আর পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোটালা পাকাবার জন্য...ওঃ! আমার বুকের ব্যথাটা! আসলে আপনি কুচুটে।

চুবু : কি? আমি—কুচুটে? [চিৎকার করে] চুপ করো।

লমফ : কুচুটে!

চুবু : ভেড়ে, বখা ছোকরা!

লমফ : বুড়ো-হাবড়া! ভণ্ড!

চুবু : চুপ করো, না হলে আমি একটা নোংরা বন্দুক দিয়ে তোমাকে তিতির মারার মতো গুলি করে মারবো। ফক্কিকার কোথাকার!

লমফ : দুনিয়াসুদ্ধ জানে—ও, ফের আমার হার্টটা!—আপনাকে আপনার স্ত্রী ঠ্যাঙাতো! আমার পা-টা...আমার মাথাটা...চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে!...আমি পড়ে যাব...আমি পড়ে যাচ্ছি...

চুবু : আর যে মাগী তোমার বাড়ি চালায় সে তোমাকে চেপে রেখেছে বুড়ো আঙুলের তলায়।

লমফ : ও, ও, ও! আমার হার্টটা ফেটে গিয়েছে। আমার কাঁধটা যে আর নেই...আমার কাঁধটা কোথায়?...আমি মরলুম। [আরাম-চেআরে পতন] ডাক্তার! (মূর্ছা)

চুবু : ভেড়ে! বকা! ফক্কিকার। আমি জোর পাচ্ছি নে। [জলপান] ভিরমি যাচ্ছি নাকি!

নাতালিয়া : শিকারী, হুঁ! ঘোড়ার উপর কি রকম বসতে হয়, তাই জানেন না আপনি! [পিতাকে] বাবা, কি হল ওর? বাবা! দেখ বাবা, [চিৎকার করে] ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! ইনি মরে গেছেন।

চুবু : আমি মূর্ছা যাচ্ছি...আমর দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাস, আমাকে বাতাস দাও!

নাতালিয়া : ইনি মারা গেছেন। [লমফের আস্তিন ধরে টানাটানি] ইভান ভাসিলিয়েভিচ্!

ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! আমরা কি করে বসলুম! ইনি মারা গেছেন। [আর্ম-চেআরে পতন] ডাক্তার! ডাক্তার! [ছন্নের মত কখনও ফোঁপানো, কখনও হাসি]

চুবু : ব্যাপার কি? কি হয়েছে? তুমি কি চাও?

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] মারা গেছেন...উনি মারা গেছেন।

চুবু : কে মারা গেছে? [লমফের দিকে তাকিয়ে] সত্যি ও মারা গেছে! হে ভগবান, জল জল! ডাক্তার! [লমফের ঠোঁটের কাছে এক গ্লাস জল ধরে] জল খাও! না, ও জল খাচ্ছে না...তাহলে মারাই গেছে, আর-যা-সব-কি-সব...হায়, হায়, আমার কী পোড়া কপাল! আমি আমার মগজের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলুম না কেন? এর অনেক আগেই আমার গলাটা কেটে ফেললুম না কেন? আমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? আমাকে একখানা ছোরা দাও। বন্দুক দাও। [লমফ একটু নড়লো] মনে হচ্ছে, সেরে উঠছে...একটু জল খাও তো, বাছা! হ্যাঁ, ঠিক...

লমফ : আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে...কুয়াশা না কি...আমি কোথায়?

চুবু : তুমি যত শিগগির পারো বিয়ে করে ফেলো আর জাহান্নামে যাও...ও রাজী আছে [দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে] ও রাজী আছে, আর-যা-সব-কি-সব, আমি তোমাদের আশীর্বাদ—আর-যা-সব—করছি। শুধু আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

লমফ : এ্যাঁ? কি? [দাঁড়িয়ে উঠে] কে?

চুবু : ও রাজী আছে। আবার কি হল?...চুমো খাও আর জাহান্নামে যাও!

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] উনি বেঁচে আছেন...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজী...

চুবু : এসো চুমো খাও, একজন আরেক জনকে।

লমফ : এ্যাঁ, কাকে? [নাতালিয়াকে চুম্বন] আমার কী আনন্দ! মাফ করবেন, ব্যাপারটা কি? ওঃ! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি...আমার হার্ট...বিদ্যুৎ...আমি কি সুখী, নাতালিয়া স্তেপানভ্না...[নাতালিয়ার হস্ত চুম্বন] আমার পা-টা যে অবশ হয়ে গেল...

নাতালিয়া : আমি...আমিও বড় সুখী...

চুবু : ওঃ! পিঠের থেকে কী বোঝাটাই না নামলো! আহ্!

নাতালিয়া : কিন্তু যাই বলো, তোমাকে এখন স্বীকার করতেই হবে, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের মত অত ভালো না।

লমফ : সে ভালো।

নাতালিয়া : সে খারাপ।

চুবু : এই লাও! পারিবারিক সুখ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে! শ্যাম্পেন নিয়ে আয়।

লমফ : সে সরেস!

নাতালিয়া : ওটা নিরেস, নিরেস, নিরেস!

চুবু : [চিৎকার করে দুজনার গলা চাপবার চেষ্টাতে] শ্যাম্পেন! শ্যাম্পেন নিয়ে আয়!

যবনিকা

শেষ চিন্তা

উল্‌টা-রথ

অবতরণিকা।

কত না কসরৎ, কত না তকলীফ বরদাস্ত করে কত চেষ্টা দিলুম, দেশে নাম কেনবার জন্য,—আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছন পানে তাকিয়ে দেখি সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল। পরের কথা বাদ দিন, নিতান্ত আত্মজনও আমার লেখা বই পড়ে না। গিন্নীকে—না, সে কথা থাক, তাঁর সঙ্গে ঘর করতে হয়, ওঁয়াকে চটিয়ে লাভ নেই। অথচ আমার জীবনে মাত্র একটি শখ ছিল, সাহিত্যিক হওয়ার। আপনাদের মনের বেদনা কি বলবো—তবে হ্যাঁ, আপনারাই হয়তো বুঝবেন, কারণ সিনেমায় দেখেছি, নায়িকা যখন 'হা নাথ, হা প্রাণেশ্বর, তুমি কোথায় গেলে?' বলে হন্যে-পারা স্ক্রীনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটোছুটি লাগান তখন আপনারা হাপুস-হুপুস করে অশ্রুবর্ষণ করেন (যে কারণে আমি হলের ভিতরেও রেনকোট্ খুলি নে), তাই আপনারা বুঝবেন।

যখন দেখি প্রখ্যাত সাহিত্যিক উচ্চাসনে বসে আছেন, তাঁর গলায় মালার পর মালা পরানো হচ্ছে, খাপসুরৎ মেয়েরা তাঁর অটোগ্রাফের জন্য হুদ্দমুদ্দ হচ্ছে, তাঁর জন্য ঘন ঘন বরফজল শরবৎ আসছে, সভা শেষে হয়তো আরও অনেক কিছু আসবে তখন আমার কলিজার ভিতর যেন ইঁদুর কুরকুর করে খেতে থাকে, আমার বুকের উপর যেন কেউ পুকুর খুঁড়তে আরম্ভ করে। সজল নয়নে বাড়ি ফিরি। পাছে গিন্নী অট্টহাস্য করে ওঠেন তাই দোরে খিল দিয়ে বইয়ের আলমারির সামনে এসে দাঁড়াই—তাকিয়ে থাকি আপন মনে আমার, বিশেষ করে আমার নিজের পয়সায় মরক্কো লেদারে বাঁধানো সোনার জলে আমার নাম ছাপানো আমার বইয়ের দিকে।

আমার মাত্র একজন বন্ধু—এ সংসারে। কিন্তু আর কিছু বলার পূর্বে আগেভাগেই বলে নিই, ইনিও আমার বই পড়েননি। তিনি এসে আমায় একদিন শুধোলেন, 'ব্রাদার, "আমিয়িলের জুর্নাল" পড়েছ?'

'সে আবার কি বস্তু? বই-ই হবে। না? তা সে কি আমার বই পড়েছে যে আমি তার বই পড়বো?'

'আহা চটো কেন? জল্লাদ যখন কারও গলা কাটে তখন তার মানে কি এই যে, সে লোকটা আগে জল্লাদের গলা কেটেছিল? অভিমান ছাড়ো। আমার কথা শোনো। এই আমিয়েল সায়েব প্রফেসর ছিলেন। তার বাড়া আর কিছু না। যশ প্রতিপত্তি তাঁর কিছুই হয়নি। নিঃসঙ্গ জীবনে নির্জনে তিনি লিখলেন তাঁর জুর্নাল।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'জুর্নাল-জুর্নাল করছো কেন? উচ্চারণ হবে "জার্নেল"। উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি বড্ডই পিটপিটে।'

বন্ধু বললেন, 'কী উৎপাত! ওটার উচ্চারণ ফরাসীতে "জুর্নাল"। এসেছে "ডায়ার্নাল" থেকে, সেটা এসেছে লাতিন "দিয়েস" থেকে—যেটা সংস্কৃতে "দিবস"। ফরাসীতে তাই "দিন দিন প্রতি দিন" নিয়ে যখন কোনও কথা ওঠে তখন ঐ "জুর্নাল"

শব্দ ব্যবহার হয়। তাই দৈনিক কাগজ ''জুর্নাল'', আবার প্রতিদিনের ঘটনা লিখে রাখলে সেটাও ''জুর্নাল'' অর্থাৎ ''ডাইরি''। ফার্সীতে ''দিন''কে বলে ''রোজ'', তাই প্রতিদিনের ঘটনার ''নাম'' যেখানে লেখা থাকে সেটা ''রোজনামচা''। আবার—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'হয়েছে, হয়েছে।'

'সেই আমিয়েল লিখলেন তাঁর জুর্নাল। মৃত্যুর পর সে-বই বেরোতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বসত শহর জিনীভাতে হয়ে গেলেন লেখক হিসেবে প্রখ্যাত। বছর কয়েকের ভিতর তামাম ইউরোপে। ইস্তেক তোমাদের রবি ঠাকুর সে বয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাই বলি কিনা, তুমি একখানা জুর্নাল লেখো।'

আমি শুধালুম, 'তুমি পড়বে?'

বন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাখানা বগলে চেপে বললেন, 'চললুম, ভাই। শুনলুম পাড়ার লাইব্রেরিতে পাঁচকড়ি দে'র কয়েকখানা অপ্রকাশিত উপন্যাস এসেছে। পড়তে হবে।'

ভালোই করলেন। না হলে হাতাহাতি হয়ে যেত।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, তার সেই মোস্ট সাজেশনের পর থেকে এই জুর্নালের চিন্তাটা কিছুতেই আমি আমার মগজ থেকে তাড়াতে পারছি নে। যে রকম অনেক সময় অতিশয় রদ্দি একটা গানের সুর মানুষকে দিবারাত্তির হন্ট করে। এমন কি ঘুম থেকে উঠে মনে হয় ঘুমুতে ঘুমুতেও ঐ সঙ্গে গুনগুন করেছি।

কিন্তু জুর্নাল লিখতে যাওয়ার মধ্যে একটা মস্ত অসুবিধে রয়েছে—আমার।

সংস্কৃতে শ্লোক আছে :—

শীতেহতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভং কুবলয়দৃশং যৌবনান্তে বিবাহম্।

শীতকাল গেলে শীত-বস্ত্র পরিধান
আহার গ্রহণ যবে দিন অবসান
রাত্রিকাল শেষ হলে প্রেম আলিঙ্গন!
বিবাহ করিতে সাধ যাইলে যৌবন!

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র)

একশ' বছর বয়সে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে অন্তর্জলি অবস্থায় সাততলা এমারৎ বানাবার জন্য কেউ টেন্ডার ডাকে না।

জুর্নাল লেখা আরম্ভ করতে হয় যৌবনে। তাহলে বহু বৎসর ধরে সেটা লেখা যায়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে পর পাঠক তার থেকে লেখকের জীবনক্রম-বিকাশ, তার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব পড়ে পরিতৃপ্ত হয়।

আজ যদি আমি জুর্নাল লিখতে আরম্ভ করি তবে আর লিখতে পাবো কটা দিন? তাই কবি বলেছেন, এ যে যৌবনান্তে বিবাহম্!

তাহলে উপায় কি?

তখন হঠাৎ একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

এক বেকার গেছে সায়েব বাড়িতে। কাচুমাচু হয়ে নিবেদন করলে, 'সায়েব, আপনার এখানে যে কি ভয়ে ভয়ে এসেছি, কী আর বলবো! এক পা এগিয়েছি কী তিন পা পেছিয়েছি!' সায়েব বললে, 'ইউ গাগা, তাহলে এখানে পৌঁছলে কি করে?' বেকারটি আদৌ গাগা—অর্থাৎ যে বদ্ধ পাগল শুধু 'গাগা' করে গোঙরায়—ছিল না। বরঞ্চ বলবো

হাজির-জবাব—অর্থাৎ সব জবাবই তার ঠোঁটে হাজির। বললে, 'হক কথা কয়েছেন, হুজুর। আমিও তাই মুখ করলুম আপন বাড়ির দিকে। এক পা এগুই তিন পা পেছোই। করে করে এই হেথা হুজুরের বাঙলোয় এসে পৌঁছে গেলুম।'

তাই যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জুর্নাল লেখার মত দীর্ঘ দিনের ম্যাদ যমরাজ আমায় দেবেন না তখন ঐ কেরানীর মত পিছন ফিরলে কি রকম হয়? অর্থাৎ বিগত দিনের জুর্নাল? সেই বা কি করে হয়? পোস্ট-ডেটেড চেক্ হয়, কিন্তু প্রি-ডেটেড দলিল করার নামই তো জাল। আজ আমি তো আর লিখতে পারি নে :—

> জন্মাষ্টমী ১৩১১
> আজ আমার জন্ম হল। মা তখন তাঁর বাপের বাড়িতে।
> হায়, আমাকে দেখবার কেউ ছিল না। কী হতভাগ্য আমি!

পুলিসে ধরবে না তো!

বিবেচনা করি আপনারা ক্লাসিক্স্ পড়েছেন—ঋগ্‌বেদ, মেঘনাদ, হ্-য-ব-র-ল ইত্যাদি। শেষোক্তখানাতে এক বুড়ো ত্রিশ না চল্লিশ হতে না হতেই বয়েসটা ঘুরিয়ে দিতো। তখন তার বয়স যেত 'কমতি'র—ফটকা বাজারে যাকে বলে 'মন্দি' বা 'বেয়া'র—দিকে। তখন তার বয়েস হত ত্রিশ, ঊনত্রিশ, আটাশ করে করে আট হয়ে গেলে ফের 'বাড়তি' বা 'তেজী'র দিকে চালিয়ে দিয়ে নয়, দশ, এগারো করে বয়েস বাড়াত।

কিন্তু এ কৌশল রপ্ত করার জন্য মুষ্টিযোগটা শিখি কার কাছ থেকে? হ্-য-ব-র-ল সৃষ্টিকর্তা ওপারে যাবার সময় তাঁর ব্যাটা বাবাজী সত্যজিৎকে কি এটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন? তাতেই বা কি? বাবাজী তো তারও আগে ওঁরই কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন, 'গেছোদাদা' হওয়ার পন্থাটি—আমি যদি তাঁর সন্ধানে যাই মতিহারি তখন তিনি ছিকেষ্টপুর। আমি ফিলাডেলফিয়ায় তো তিনি ভেরমন্টে। উঁহু, হল না।

ইরানের কবি অন্য মুষ্টিযোগ বাৎলেছেন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সে :

"আজ এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই।
জোয়ান হইব; এ জীবন তবে গোড়া হতে দোহরাই॥"
'শবী আগর আজ লবে ইয়ার বোসে এ তলবম
জওয়ান শওম জসেরো জিন্দেগী দু বারা কুনম্॥'

পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল ছুঁড়বে।

আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ তাহলে কি বলেন?—

'শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসাব একটানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।'

তারপর তিনি কি করবেন?

'জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরী হবে আমার খেলা—'

সর্বনাশ! এই বৃদ্ধ বয়সে যদি সক্কলের সামনে তাই করি তবে ডাঃ ঘোষ আমাকে রাঁচি পৌঁছিয়ে দেবেন।

মোদ্দা কথায় তা হলে ফিরে যাই। আমাকে খামাখা মেলা বকর বকর করাবেন না। অবশ্য আমার মা বলতেন, আমার দোষ নেই। আমাকে টিকা দেবার সময় ডাক্তার ছুরি আনেনি বলে একটা গ্রামোফোনের নীড্‌ল্‌ দিয়ে টিকা দিয়েছিল।

তাহলে একটা মাস চিন্তা করতে দিন। সামনে হোলি। গায়ে রঙ মাখাবো। মনেও।

ম্লিস্টলার অর্থ নিম উকীল। উকীলের কাছে যাবার পূর্বে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। সেটি হয় তো পূর্বেও কোনও-কোথাও উল্লেখ করেছি। তাই সেটি আবার বলছি। কারণ মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যা সে পূর্বেও একাধিকবার শুনেছে—নয়া কথা তার ভালো লাগে না। তাই দেখুন—এটাও আমি আরেকবার বলেছি—একই প্লট নিয়ে ক'গণ্ডা ফিলিম নিত্যি নিত্যি বেরুচ্ছে তার হিসেব রাখেন?

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই :

নরক আর স্বর্গের মধ্যিখানে মাত্র একটি পাঁচিলের ব্যবধান। নরক চালায় শয়তান, আর স্বর্গ চালান সিন্ট পীটার। পাদ্রীসায়েবের মুখে শোনা, তাঁরই হাতে থাকে স্বর্গদ্বারের সোনার চাবি।

পাঁচিলটি ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে দেখে পীটার একদিন শয়তানকে ডেকে বললেন, দেয়ালটা এজমালি। তাই এটার মেরামতি আমি করবো এক বছর, তুমি করবে আর বছর। আসলে তোমারই করা উচিত প্রতি বছর। কারণ তোমার দিকে সুবো-শাম জ্বলছে আগুনের পেল্লাই পেল্লাই চুলো। তারই চোটে দেয়াল হচ্ছে জখম। আর আমার দিকে সর্বক্ষণ বয় মন্দমধুর মলয় বাতাস। দেয়াল বিলকুল জখম হয় না।

বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, ইনি এ বছর আর উনি আর বছর দেয়াল মেরামত করবেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় শয়তান ঘাড় চুলকে বললে, 'দাদা, কিছু যদি মনে না করো, তবে এ বছরটায় তুমিই মেরামতিটা করাও। একটু অভাবে আছি।'

পীটার মাই ডিয়ার লোক। রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর এক বছর যায়, দু'বছর যায়, পাঁচ বছর যায়, দেয়াল পড়ো-পড়ো—শয়তানের সন্ধান নেই। পীটার রেজেস্ট্রি করে চিঠি লিখলেন। ফেরত এল। উপরে লেখা, 'মালিক না পাইয়া ফেরত।' পীটার তখন একাধিকবার শয়তানের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠ বেরলো—'কত্তা বাড়ি নেই।' পীটার বাড়ির সামনে 'লটকাইয়া শমন জারী' করলেন। কোনও ফায়দা ওৎরালো না।

এমন সময় পীটারের বরাৎজোরে হঠাৎ শয়তানের সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাৎ। শয়তান অবশ্য তড়িঘড়ি পাশের গলিতে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এঞ্জেলদের ডানা থাকে। ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে পার্ফেক্ট ল্যান্ডিং করে দাঁড়ালেন তার সামনে। খপ্‌ করে হাত ধরে বললেন, 'বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? দেয়াল মেরামতির কী হবে?'

শয়তান গাঁইগুঁই টালবাহানা আরম্ভ করলে। পীটার চেপে ধরলেন, 'পাকা কথা দিয়ে যাও।'

তখন শয়তান শেষ কথা বললে, 'কিছু মনে করো না ভাই, কিন্তু আমি আমার উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও পাকা কথা দিতে পারবো না।'

নিরাশ হয়ে পীটার শয়তানের হাত ছেড়ে দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাড়ি ফেরার মুখ করে বললেন, 'ঐখানেই তো তোর জোর। সব কটা নিয়ে বসে আছিস। আমার যে একটাও নেই।'

আমার উকিল অবশ্য নরকে যাবেন না। তিনি বলেন, 'নরক নেই, স্বর্গ আছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা! লোক হয় দুটোতেই বিশ্বাস করে, নয় একটাতেও না।'

উকিল বললেন, 'ঐখানেই তো ভুল। তোমরা দর্শনের কিছুই জানো না। বুঝিয়ে বলছি। স্বর্গ জিনিসটের কল্পনা আমি করতে পারি। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। তোমাদের পরশুরামই তো বলেছেন, ঝোপে-ঝাপে চপ কাটলেট ঝুলছে। পাড়ো আর খাও, খাও আর পাড়ো। হুরী-পরীদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করো, কেউ কিছু বলবে না। অতএব স্বর্গ আছে। কিন্তু এই পৃথিবীর চেয়ে বেদনাময় জায়গা আমি কল্পনাই করতে পারি নে। অতএব সেটা নেই। যে জিনিস আমি কল্পনাই করতে পারি নে সেটা থাকবে কি করে?'

যুক্তিটা আমার কাছে কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করতে গিয়ে মুনিঋষিরা যে-সব যুক্তি দেন তার চেয়ে অবশ্য বেশী ঘোলাটে নয়। কিন্তু সে-কথা থাক। ওটা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নয়। কথায় বলে, বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—আমার উকিলটি নরকে না গেলেও শয়তান তার বাঁ হাতের তেলোতে জল রেখে তাতে ডুবে আত্মহত্যা করবে না। বরঞ্চ একটা উকিলকে যদি কোনোগতিকে স্বর্গরাজ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে তা হলেই তো চিত্তির। ক্লাইভ তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না! এক ক্লাইভে যা করলে, তার ধকল আমরা এখনও কাটাচ্ছি। দ্যাখ তো না দ্যাখ, সেন্ট পীটারের পেটের ভাত চাল হয়ে যাবে, তন্দুরী মুর্গী ডানা গজিয়ে পেটের ভিতর ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করতে থাকবে।

আমার শিরঃপীড়া :—আমি যদি প্রি-ডেটেড চেক সই করি, অর্থাৎ শুঁটকিকে তাজা মাছ বলে পাচার করি, অর্থাৎ প্রাচীন দিনের ডায়ারি নবীন বলে চালাই তবে কি আমি ভেজালের ভিটকিলিমিতে ধরা পড়বো না?

উকিল পরম পরিতোষ সহকারে বললে, 'কিচ্ছু ভয় নেই। তবে যা লিখবে তার ন'আনার বেশী যেন সত্য কথা না হয়। মিথ্যে লিখতে হবে নিদেন সাত আনা। নূতন আইন।'

আমার মিথ্যে বলতে কণামাত্র আপত্তি নেই। লেখক মাত্রই মিথ্যেবাদী। এবং মিথ্যেবাদীকেও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, 'যে-লোক দুর্ভাগ্যক্রমে লেখক হওয়ার সুযোগ পেল না,—হতাশ-প্রেমিকের মত হতাশ-লেখক।' তবু অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি কথা?'

উকিল বললে, 'ক্যারেট্ কারে কয় জানো? ২৪ ক্যারেটে খাঁটি সোনা হয়। এখন আইন হয়েছে, চৌদ্দ ক্যারেটের বেশী সোনা দিয়ে গয়না গড়ানো চলবে না। বাকি দশ ক্যারেটের বদলে দিতে হবে খাদ।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি স্যাকরা যে আমাকে এ-আইন শোনাচ্ছেন!'

উকিল আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকালে। যেন আমি 'ফিয়ারলেস নাদিরা' বা কাননবালার চেয়েও খাপসুরৎ। নিজের চেহারার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল।

বললে—এবারে অতিশয় শান্তকণ্ঠে—'সোনা ভারতবাসীর চোখের মণি, জিগরের টুকরো, কলিজার খুন। তাই দিয়ে যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন সর্বত্রই এটা ছড়াবে। যাও, আর মেলা বকর বকর করো না। আর শোনো, তোমার মাথায় যা মগজ তা দিয়ে পুঁটি মাছেরও একটা টোপ হবে না। তুমি নির্ভয়ে লেখো। কেউ পড়বে না। তুমিও পড়বে না—অর্থাৎ ধরা পড়বে না।'

আঁতে ফের লাগল। তবে খুব বেশী না। আমার আঁতে গণ্ডারের চামড়ার লাইনিং।

তা সে যাক্ গে। আইন বাঁচিয়ে লিখব।

* * *

আমার শত্রু চতুর্দিকে। বরঞ্চ আমাকে 'অজাতশত্রু' না বলে 'অজাতমিত্র' বলা যেতে পারে। তারা যে আমার কী বদনাম করে বেড়াচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। না, ভুল বললুম। পাড়ার ছোঁড়াদের কাছে আছে। 'তৃষ্ণার্ত' ছাত্রদের বিয়ারদার সমিতিতে চাঁদা দিইনি বলে তারা সেগুলো জিগির বা স্লোগান রূপে ব্যবহার করে। মহরমের 'হায় হাসান, হায় হোসেন' রোদন রব এর তুলনায় অট্টহাস্য।

তারই একটা—আমি নাকি অতিশয় সুপুরুষ। আপনারা অবশ্য এ-কথা শুনে সরল চিত্তে শুধোবেন, 'এটা আবার কুৎসা হল কি প্রকারে?'

ঐ তো! ছোঁড়াদের পেটে কী এলেম তা তো আপনারা জানেন না। সূক্ষ্ম তালেবরদের দুষ্টবুদ্ধি। বেদে নাকি আছে, 'স নে বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্ত'—তার এক অর্থ নাকি, 'দেবতা শুভ বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সংযুক্ত করুন—এক করুন।' অশুভ বুদ্ধি যে আরও কত বেশী সংযুক্ত করে, ঋষি সেটা জানতেন না। কারণ আমাদের বঁড়শে ব্যালার বুদ্দু খানসামা লেনের ছোঁড়াদের ঐক্য তিনি দেখেন নি।

তাহলে আরও বুঝিয়ে বলি! রবীন্দ্রনাথের লেখাতে আছে, এক হাড়কিপ্টেকে শিক্ষা দেবার জন্য পাড়ার ছোঁড়ারা কাগজে মিথ্যে মিথ্যে ছাপিয়ে দেয়, তিনি নাকি অমুক চ্যারিটি ফাণ্ডে বিস্তর টাকা খয়রাৎ করেছেন। আর যাবে কোথা? চ্যারিটি না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনে চ্যারিটি ম্যাচের ভিড়।

হুবহু ঐ একই মতলব।

তখন স্থির করলুম, একটা ফটো তুলে এই 'উল্টো-রথে'র সঙ্গে ছাপিয়ে দেব। শুনলুম, কালীঘাটের কাছে 'ফোটো ফ্ল্যাসে'র নাকি বাসটিং বিজিনেস—ফেটে পড়ার উপক্রম। গিয়ে দেখলুম, কথাটা খাঁটি, ছাব্বিশ ক্যারেট খাঁটি। আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেন্স্ বার্স্ট্ করলো। আমার শ্যাটারিঙ সৌন্দর্য সইতে না পেরে।

সেই নব্বুই বছরের থুরথুরে ফারসী বুড়ীর কাছে বাজ পড়াতে তিনি ভিরমি যান। হুঁশ ফিরে এসে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'বাজের কি দোষ? আমি যে বড্ড বেশী এ্যাট্রাক্টিভ্।'

ফোটো হল না। অইল পেন্টিং-ওলা বলেন, 'কালো হলেও চলতো, তা সে যত মিশই হোক্ না। কিন্তু এ যে, বাবা, খাজা রঙ। কালো কালির উপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলপারা, না-সবুজ না-নীল না-কিচ্ছু। আমার প্যালেট লাটে।'

সেই থেকে ভাবছি কি করি?

তা হলে আবার একটা মাস ভাবতে দিন।

কিন্তু তাতেই বা কি? দশ ঘণ্টা বাতি জ্বালিয়ে রাখার পর সেটা নিভিয়ে দিলে ঘরে যে অন্ধকার, এক মিনিট জ্বালিয়ে রাখার পর নিভিয়ে দিলেও সেই অন্ধকার।

এক মাস চিন্তা করলেই বা কি, আর এক মিনিট চিন্তা করলেই বা কি?

ওঘাটে যেও না বেউলো

আমার 'উল্টা-রথ' তৈরী হচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন। পাকা লোক লাগিয়েছি। খাস মার্কিন। ওরা গ্রেতা গার্বো থেকে আরম্ভ করে ড্যুক্ অব উইনজার—আলকাপোনি থেকে শুরু করে আর্চবিশপ অব নটিংহাম সক্কলেরই কোরা কাপড় ধুয়ে কেচে মলমল করে তুলতে জানে। ওটা বেরোলে আর কেউ 'জীবনস্মৃতি' পড়বে না।

ইতিমধ্যে—ইতিমধ্যে কেন—বহুদিন ধরেই আমি বহু লোকের কাছ থেকে বহু পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। প্রেরকদের কেউ কেউ চান আমি যেন তাবৎ বস্তু পড়ে সেটি মেরামত করে দি। কেউ কেউ অল্পতেই সন্তুষ্ট। বলেন, আমার মতামত জানাতে। আর কেউ বা সরাসরি শুধান, সার্থক-সাহিত্য কি প্রকারে সৃষ্টি করতে হয়?

উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, রিপুকর্ম-মেরামতি করে যদি লেখক গড়া যেত তাহলে এই যে শান্তিনিকেতন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ সব কর্ম লেখক এবং শিক্ষক উভয়রূপেই করে গেলেন, এখান থেকে বেরিয়েছেন ক'টি সার্থক সাহিত্যিক? আমি তো একমাত্র প্রমথনাথ বিশীর নাম জানি। পক্ষান্তরে শরৎ চাটুয্যে তো কারও কাছ থেকে এক রত্তি সাহায্য পাননি। তাঁর মত সার্থক লেখক ক'জন? উত্তরে সবাই বলবেন, উনি এক্সেপশন—ব্যত্যয়। আমি বলবো, সার্থক সাহিত্যিক হওয়া মানেই ব্যত্যয়।

কিন্তু তৎপূর্বে প্রশ্ন, আপনি সাহিত্যিক হতে চান কেন?

টাকা রোজগার করতে? হয় না, তা এদেশে হয় না।

অনুসন্ধান করে দেখুন, এই বাঙলা দেশে ক'জন লোক একমাত্র কলমের জোরে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় আছেন। অধিকাংশই কোনও না-কোনও ধান্দায় নিযুক্ত থেকে মাসের শেষে পাকা মাইনে পান। লেখার আমদানি ঘুষের মত। কখন আসে কত আসে তার উপর কণামাত্র নির্ভর করা যায় না। ঘুষের টাকা থাকেও না।

অর্থাৎ কপালজোরে হয়তো মাসতিনেক আপনি প্রায় পাঁচশ' টাকা করে মাসে কামালেন—এর বেশী এদেশে আশা করবেন না—কিন্তু তার উপর নির্ভর করা চলবে না। পাঠকের মতিগতি কোন্ দিন কোন্ দিকে মোড় নেবে তার কোনও স্থিরতা নেই। আপনাকে তবু লিখে যেতে হবে, নূতন বই তৈরী করতে হবে, ঐ দিয়ে যদি ভাঁটার টান ঠেকাতে পারেন। ইতিমধ্যে আপনার পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতার 'মূলধন' নিয়ে লেখার 'ব্যবসা' আরম্ভ করেছিলেন সেটা তলানিতে এসে ঠেকেছে। নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন কি করে? বয়েস হয়ে গিয়েছে—বন্ধ প্রেমের হাট। লোটাকম্বল নিয়ে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন না—কোমরে বাত।

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস মনে পড়লো—সে বড় মজার।

ইয়োরোপে যে কোনও চিত্রকরের বাড়িতে নিত্য নূতন রমণী মডেল হয়ে আসছে। তারা বিবসনা হয়ে 'পোজ্' দেয়। কেউ কিচ্ছু বলে না। ওটা নাকি ওদের দরকার। চিত্রকরদের সবাই যে ভীষ্মদেব, শুকদেব ঠাকুর নন সে-কথাও সবাই জানে। বস্তুত কোনও চিত্রকর যদি একটুখানি শুকদেবীয় হন তবে তাঁর তাবৎ জীবনীকার সেটা চিৎকার করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিয়ে আমাদের কানে তালা লাগিয়ে দেন। বাদবাকিদের কেউ গাল-মন্দ করে না। ঐ যে বললুম, ওটা নাকি ওদের দরকার।

এদেশে গুরুমহারাজদের এ-অধিকার আছে। ভৈরবী, নর্মসখীরূপে এঁরা গুরুমহা-রাজদের সাধন-সঙ্গিনী হন। এ প্রথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত।

কিন্তু যদি ইয়োরোপের পাদ্রীসাহেব ভৈরবী ধরেন তবে তাঁকে তিনদিনও সমাজে টিকতে হবে না। এদেশের গেরস্তপাড়ায় কোনও আর্টিস্টকে মডেলসহ বাস করতে দেবে না।

আমি কোনও ব্যবস্থার নিন্দা বা প্রশংসা করছি নে। সাহিত্যিক হিসেবে সে অধিকার আমার নেই। এর বিচার করবে সমাজ। সমাজ গুরু চায়, চিত্রকর চায়, সাহিত্যিক চায়। সমাজই স্থির করবে, কার কোন্‌টাতে অধিকার। সমাজ ভুলও করে। সোক্রোতেসকে বিষ, খৃষ্টকে ক্রুশ দেয়।

এটা কিছু নূতন কথা নয়। সামান্য একটি আলাদা উদাহরণ দি। বৈজ্ঞানিকদের সাধ্যি নেই জাহাজ জাহাজ টাকা যোগাড় করে এটম বম বানাবার। মার্কিন সমাজের সর্বপ্রধান মুখপাত্র রোজোভেল্ট দেশের টাকা বৈজ্ঞানিকদের পায়ে ঢেলে দিয়ে বললেন, ওটা আমার চাই। বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করে দিলেন। ওটা জাপানে ফেলা হবে কিনা, সেটা স্থির করলেন ট্রুমান—বৈজ্ঞানিকদের হাতে সে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করার ভার দেওয়া হয়নি। তাঁদের মতামত চাওয়া হয়েছিল মাত্র। এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন, বৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশই বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

দার্শনিকদের বেলাও তাই। কেউ হয়তো প্রামাণিক বই লিখে প্রমাণ করলেন, ঈশ্বর নেই। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি সে বই ইস্কুলে ইস্কুলে কলেজে কলেজে পড়ান! সেটা স্থির করবে সমাজ। কিংবা মনে করুন, বুদ্ধদেব বলেছেন ঈশ্বর নেই। সেটা সিংহল, বর্মার ইস্কুলে পড়ানো হয়। এদেশে পড়াতে গেলে সমাজ আপত্তি করবে।

কিংবা এই ফিল্মের কথাই নিন। প্রডুসার ডিরেক্টর দর্শক তো স্থির করেন না, কোন্ ফিল্ম দেখানো চলবে আর কোন্‌টা চলবে না। স্থির করে সমাজ—সেন্সার বোর্ডের মারফতে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক। আপনি কেন সাহিত্যিক হতে চান, সেই কথায় ফিরে যাই।

তা হলে কি আপনি সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সঞ্চয় করতে চান?

প্রতিপত্তি হবে না। সে-কথা গোড়া থেকেই বলে রাখি।

আমি সামান্য লেখক। 'দেশে-বিদেশে' বইখানা প্রাইজ পেয়েছে। আমি তাই নিয়ে গর্ব করছি নে, ঈশ্বর আমার সাক্ষী। নিতান্ত এই প্রতিপত্তির কথা উঠলো বলে সে-কথাটা বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আমার বন্ধুবান্ধব এবং আপনাদের মত সহৃদয় পাঠক কেউ কেউ বলেন, 'কাবুলে তো ছিলে মাত্র দু বছর। তবু বইখানা মন্দ হয়নি। জর্মনিতে তো ছিলে অনেক বেশী। সে-দেশ সম্বন্ধে ঐ রকম একখানা বই লেখ না কেন?' আমি ভাবলুম,

প্রস্তাবটা খুব মন্দ নয়। মোটামুটি একটা খসড়াও তৈরী করলুম। কিন্তু বিপদ হল হিটলারকে নিয়ে। বিপদ হল ১৯৩৯-৪৪-এর যুদ্ধ নিয়ে। আমি ১৯৩৮-এর পর সেখানে আর যাইনি। আর আজ হিটলার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাদ দিয়ে জর্মনি সম্বন্ধে লেখা, এ যেন মুরারজী দেশাইকে বাদ দিয়ে চৌদ্দ ক্যারেট গোল্ডের কথা লেখা।

তাই মনে করলুম, আরেকবার না হয় হয়েই আসি। কুড়ি বছরের বেশী হতে চললো, বিদেশ যাইনি। হার্টও ট্রাবল দিচ্ছে। জর্মন ডাক্তাররা যদি কিছু একটা ভাল ব্যবস্থা করে দেয়। পাবলিশারদের বললুম, কিছু টাকা আগাম দিতে। যাঁদের অনুরোধ করলুম তাঁরা সোল্লাসে টাকা পাঠালেন—এঁরা সজ্জন।

এবারে ফরেন্ এক্স্‌চেঞ্জ বা বিদেশী মুদ্রার পালা।

উত্তর এল, ফেলেট্ 'নো'—তিন না চার লাইনে, ঠিক মনে নেই।

কোথায় রইল প্রতিপত্তি? কোথায় রইল খ্যাতির মূল্য? আমি যেতে চাইছিলুম নিজের টাকায়—সরকারের টাকায় নয়। বলুন তো, ক'জন বাঙালী লেখক নিজের টাকায় (অবশ্য সেই আগাম টাকা নেওয়ার ফলে নির্ভর করতে হবে আমার চাকরির মাইনের উপর) বিদেশ যেতে পারে? যে পারলো সেও সুযোগ পেল না।

পাঠক ভাববেন না, আমি কর্তৃপক্ষকে দোষ দিচ্ছি। মোটেই না। তাঁরা তো আমার দুশমন নন। তাঁরা যা ন্যায্য মনে করেছেন তাই করেছেন।

আমি বলতে চাই, কোথায় রইল লেখকের প্রতিপত্তি! আমি চেয়েছিলুম, কুল্লে দু হাজার টাকার বিদেশী মুদ্রা। আমার প্রতিপত্তির মূল্য তা হলে দু-হাজার টাকাও নয়। অবশ্য এতে আমার দুঃখিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁর শিষ্য জুডাস্ ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে!

ঈষৎ অবান্তর হলেও বলি, তবু আমি গিয়েছিলুম। জানেন তো, নেড়ের গোঁ। পকেটে ছিল পঞ্চাশ না ষাটটি জর্মন মুদ্রা। সেখানে চললো কি করে? ওঃ! সেখানে আমার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে। তবে কি জর্মনরা খুব বাঙলা বই পড়ে? মোটেই না। তবে? আমার প্রতিপত্তি অন্য বাবদে—এবং সেটা এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর। ধরে নিন, আমি সার্কাসের দড়ির উপর নাচতে পারি—না, সেটা বিশ্বাস হল না, আমার কোমরে বাত বলে?—তা হলে ধরুন, আমি হস্তনের পঞ্জাকে হস্তনের গোলাম বানাতে পারি!

এই তো গেল প্রতিপত্তির কথা। এবারে খ্যাতি। আমার খ্যাতি অত্যল্প, তাই আমার কথা তুলবো না। আমার ইয়ার পাহাড়ী সান্যালের (ওঃ! বলতে গর্বে বুকটা কি রকম ফুলে উঠেছে!) খ্যাতি সম্বন্ধে তো আপনাদের কোনও সন্দেহ নেই। তাকে গিয়ে শুধোন, সে কি আরামে আছে। অত্যন্ত গোবেচারী লোক—অন্তত আমার যদ্দুর জানা—দুটি পয়সা কামিয়ে, কোনও ভালো হোটেলে ইয়ার বক্সীসহ একটুখানি মুর্গী-কারি খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে—তার পানের ঝাঁপিটি দেখেছেন তো—বাড়ি যাবে। শুধোন গিয়ে তাকে, হোটেলে বসা মাত্রই আকছারই তার কি অবস্থা হয়।

অটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, গুষ্টির পিণ্ডিগ্রাফ কি চায় না লোকে তার কাছ থেকে! গোড়ায় আমি জানতুম না। আমার এক ভাগ্নের জন্য চাইলুম অটোগ্রাফ। সে যা করুণ নয়নে তাকালে—ভাবখানা 'এট্ টু ব্রুটি'!—যে আমার দয়া হল। তাড়াতাড়ি বললুম, না, না থাক।

বেশ কিছুদিন তাকে দেখিনি। তার কারণ অবশ্য, আমার নিবাস মফস্বলে। শহরে গিয়েছি। রেস্ত কম। তাই বসেছি তন্দুরী মুর্গীর হোটেলে একলা-একলা। মুর্গীটা খেয়ে প্রায় শেষ করেছি এমন সময় গলকম্বল মানমুনিয়া দাড়ি সমেত সমুখে দাঁড়ালেন এক মহারাজ। আমার মুখে বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। লোকটাও রস্টিক,—হোটেলে এত টেবিল খালি থাকতে আমার সামনের চেয়ারখানায় ধপ করে বসে পড়বেন কেন?

শুধোলে, কেমন আছ ভাই?'

আরে! এ যে পাহাড়ী। দাড়ি-ফাড়ি নিয়ে এ্যাদ্দিন বাদে খাঁটি পাহাড়ী বনলে। বললুম, 'খুলে কও।'

কাতর কণ্ঠে বললে, 'আর কি উপায়, বলো!'

আমি দরদী গলায় বললুম, 'বড্ড পাওনাদার লেগেছে বুঝি?'

পাহাড়ী খাসা উর্দু বলে। সেও বলে বেড়ায়, আমি ভালো উর্দু বলতে পারি। এই করে আমার নিজের জন্য বেশ একটা সুনাম কিনে ফেলেছি।

পাহাড়ী বললে, 'তওবা, তওবা। ওয়াস্তাগ্ ফিরুল্লা। পাওনাদার হলেও না হয় বুঝতুম। আর সে কি আমার নেই? এন্তের। কিন্তু তারা ভদ্রলোক। খাবার সময় উৎপাত করে না।'

বুঝলুম, মামেলা ঝামেলাময়। বললুম, 'তা তুমি এক কাজ করো না কেন? এডমায়া-রারদের কেউ ধরলে বলো না কেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মিলটা ধরেছেন ঠিকই। তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তার ছোট ভাই, আমার নাম জংলী সান্যাল"। দাড়িটাই অবশ্য 'জংগলী'র ইন্সপিরিশন জুটিয়েছিল।

ঠাণ্ডী সাঁস লেকর—অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—পাহাড়ী ফরাসীতে বললে, 'সা না ভা পা, শের—না, ডিয়ার সে হয় না।'

আমি বললুম, 'কেন? তুমি কি আডোনিসের মত খাবসুরৎ।'

তেড়ে বললে, 'কামাল কীয়া, ইয়ার। নামে কি আপত্তি? তা নয়। একবার তাই করেছিলুম। ফল কি হল, শোনো। এই হোটেলেই, হ্যাঁ, এই হোটেলেই একদিন বসে আছি, একলা। এমন সময় কে এক অচেনা লোক এসে শুধালে, "আপনি কি পাহাড়ী সান্যাল?" আমিও তোমারই মত—গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক—এক গাল হেসে বললুম, "আজ্ঞে, মিলটা ধরেছেন, ঠিকই, তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তাঁর ছোট ভাই।" লোকটা খানিকক্ষণ ইতিউতি করে বললে, "কি করি বলুন তো! ম্যানেজারবাবু আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন তিনশ' টাকা দিয়ে যেতে। তাঁকে পাই কোথায়?" তারপর আমি তাকে যতই বোঝাই আমিই পাহাড়ী সান্যাল, সে আর মানতে চায় না।'

আমি ভেবে বললুম, 'তা তো বটেই। আমিই সে অবস্থায় মানতুম না।'

সোৎসাহে বললে, 'ইয়েহ্।' তারপর আরও ঠাণ্ডী সাঁস লেকর বললে, 'ভাই, সে টাকাটা আর কখনও পাইনি। ম্যানেজার লোকটা ছিল ভালো। অন্তত আমার টাকাটা শোধ করে লাটে উঠতে চেয়েছিল—আমি কি আর জানি। পরদিন সেখানে গিয়ে দেখি সব ফর্সা।'

হ্যাঁ! একটা কথা বলতে ভুলে গেলুম। আমার মুর্গীর বিলটা পাহাড়ীই দিয়েছিল। কিন্তু এটা বলে কি পাহাড়ীর দুশমনী করলুম না? এ যাবৎ তো লোকে শুধু অটোগ্রাফ চাইত, এখন যদি—?

আরেকটি কথা। আমাদের এত দোস্তী কেন? সে আমার বই পড়ে না, আমি তার অভিনয় দেখি না। একেবারে খাঁটি হল না কথাটা। আমি 'বড়দিদি' দেখেছি—সে বোধ হয় 'দেশে-বিদেশে'র পাঁচ পাতা পড়েছে।

পাঠক সর্বশেষে অবশ্য শুধোবেন, আমি এত বাখানিয়া আপনাদের সাহিত্যিক হতে বারণ করছি কেন। তার কারণ সোজা। আমার বিশ্বাস একমাত্র জিনিয়াসরাই আমার লেখা পড়ে। অর্থাৎ আপনারা। বাজারে নামলে আমার রুটি মারা যাবে বলে।

আচ্ছা, আমার কথা ছাড়ুন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র কি বলেছেন,

অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥

ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
বাঁদরীর মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে॥

(লেখকের অনুবাদ)

পেটের জন্যই হোক, আর খ্যাতির জন্যই হোক, সরস্বতীকে বানরের মত নাচাবেন না। আপনারা বলবেন, 'এটা তো বড় সিরিয়াস কথা হয়ে গেল। সে-ই তো চেষ্টা করছি গত চৌদ্দ বছর ধরে। সিরিয়াস কথা হেসে হেসে বলার।

কিন্তু পারলুম কই? এখন আবার বৃদ্ধ বয়সে ধাতই বা যায় কি করে?

উম্র সারী তো কটী ইশকে বুতাঁ মে, মোমিন!
আখেরী ওয়ক্ত মেঁ ক্যা খাক মুসলমাঁ হোংগে?

'সমস্ত জীবন তো কাটালে মিথ্যা প্রতিমার প্রেমে,
হে মে মিন!
এই শেষ সময়ে আর কি ছাই মুসলমান হব?'

বরঞ্চ লেখা বন্ধ করাই ভালো। উৎসও শুকিয়ে এসেছে।

সুখী হবার পন্থা

সুখী হবার পন্থা? সর্বনাশ! সে পন্থাটা এ অধমের যদি জানাই থাকতো তবে—যাক্ গে। ইতিমধ্যে একটা গল্প মনে পড়লো। এক ছোকরার বিয়ে করার বড় শখ। কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না। ওদের পরিবারে একমাত্র শ্রীহনুমানের পুজো হয়—অন্য কোনও দেবতা সেখানে কল্কে পান না—তাই ত্রিসন্ধ্যা তাঁরই পুজো করে আর কাকুতি-মিনতি করে, 'হে ঠাকুর, আমার একটি বউ জুটিয়ে দাও।' ওদিকে এরকম ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে হনুমানের পিত্তি চটে গিয়েছে। শেষটায় একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'ওরে বুদ্ধু, বউ যদি জোটাতে পারতুম, তবে আমি নিজে বিয়ে না করে confirmed bachelor হয়ে রইলুম কেন?'

তাই বলছিলুম, সুখী হবার পন্থাটা যদি আমার জানাই থাকতো তবে আমি এই টক্ দিতে যাব কেন? স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমি যে টক্ দিচ্ছি সেটা হয় আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য, নয় অর্থাগমের জন্য, কিংবা উভয়তঃ। আপনাদের আনন্দ দেবার ইচ্ছাটা তৃষ্ণা বিশেষ এবং বুদ্ধদেব সেটাকে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা বলেছেন, এবং এই তন্‌হা থেকেই সর্ব দুঃখের উৎপত্তি। এই তন্‌হাজনিত দুঃখ নিবারণই সুখ। আমাদের শাস্ত্রেও আছে, 'ভারাদ্যপগমে সুখীসংবৃতোহহমিতিবৎ, দুঃখাভাবনে সুখিত্বপ্রত্যয়াৎ।' বাংলা কথায়, আমার ঘাড়ে বোঝা ছিল, সেটা নেবে যেতেই বললুম, আহা কি আরাম, এসো ক্ষুদিরাম : আহা কী সুখ, ঘুচে গেছে দুখ। অর্থাৎ দুঃখের অভাবই সুখ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই পরদুঃখকাতর ফরাসী গুণী ভলতের এক অন্ধ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন, Nous avons un grand sujet a traitor : it sagit de bonheur on du monis d'etre le moins malheureux qu'on peut dans ce monde.

আমাদের আলোচনার বস্তু বিপুলাকার এবং মহত্ত্বপূর্ণ : প্রশ্ন এই, 'সুখী হওয়া যায় কিসে, অন্ততপক্ষে এ সংসারে অল্পতর দুঃখী হওয়া যায় কি প্রকারে?'

এটাকে আরও সোজা করে বলি। এক ক্ষ্যাপা ক্রমাগত মাথায় হাতুড়ি ঠুকছে। আমি শুধালুম, 'ওরে পাগল, মাথায় হাতুড়ি ঠুকছিস কেন?' এক গাল হেসে বললে, 'যখন ঠুকি না, তখন কী আরাম!' সেই সংস্কৃত প্রবচনেই ফিরে এলুম, 'ঘাড়ের বোঝা নেবে যাওয়াতে কী আরাম!' মহাকবি হাইনেকে আমি বড্ডই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এস্থলে তিনি যেটা বলেছেন, সেটা আমাদের পাগলের হাতুড়ি পেটার চেয়ে অনেক ফিকে। তিনি বলেছেন, 'কড়া ঠাণ্ডার রাতদুপুরে লেপের তলা থেকে পা বের করতে বেজায় শীত লাগলো। ফের পা দু'খানা ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, 'আঃ, কী সুখ!'

কিন্তু এরকম নেতিবাচক সুখ—অর্থাৎ দুঃখের অভাবে সুখ—এটাতে সবাই সন্তুষ্ট নন্। তাই অনেকেই সুখ বলতে কি বোঝেন সেটা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। সর্বপ্রথমই অবশ্য মনে পড়ে ওমর খৈয়াম। কান্তি ঘোষ অনুবাদ করেছেন,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়া
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর।

শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু অনুবাদটা আক্ষরিক নয়। বরঞ্চ সত্যেন দত্তের

সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ, আমার
তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

ফিট্‌জিরাল্ডেও তাই আছে

Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow!

কান্তিবাবুর 'বিজন ছায়া' নয়, উল্টে বলা হয়েছে, মরুপ্রান্তরেও তুমি, সখী, যদি থাকো তবে সেই স্বর্গ।

• এইবারে মূল ফার্সীটা শুনুন :

গর দস্ত্ দহদ্ খগজ-ই গন্দুমে নানী—
ওয়াজ ময় দোমনীজ গোসফন্দি রানী—
ওয়া আনাগেহ মন্ ওয়া তো নিশস্‌তে দর ওয়ারানী
এ্যায়শী বুদ আন না হদ্দ-ই-হর সুলতানী—

ফার্সী ফিরিস্তিতে খৈয়াম চেয়েছেন, 'ভালো গমের উত্তম রুটি; দুই মণ মদ ধরে এরকম একটি পাত্রভরা মদ্য—হ্যাঁ বিশ্বাস করুন, ফার্সীতেই আছে 'দো মণী' এবং যে ফিট্‌জিরাল্ড নিতান্ত গদ্যময় ভেবে অনুবাদ করেননি—আছে 'একখানা আস্ত দুম্বার ঠ্যাং।' এবং সর্বশেষে বলেছেন, 'তখন যা সুখ, সেটা কদাচ কখনও কোনও সুলতানের ভাগ্যে জোটে কিনা সন্দেহ।'

এগুলো আমাদের জানা নয়। কারণ আমাদেরই মহর্ষি চার্বাক সুখী হওয়ার নির্ঘণ্ট আরও সস্তায় সেরেছেন, তিনি বলেছেন,

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ!

অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাও। ফেরত তো দিতে হবে না, কারণ এ দেহ ভস্মীভূত হবে, পুনর্জন্ম তাই হতে পারে না, পুনরাগমনং কুতঃ? এখানে কিন্তু খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। খৈয়াম বার বার বলেছেন, পরের মনে কষ্ট দিয়ে সুখী হওয়া যায় না।

কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন—যদিও আমি আদপেই চিন্তাশীল নই এবং আমি খৈয়ামের ফিরিস্তিতেই সুখী—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, এ আবার কি সুখ? লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, 'আমি যে-সে সুখ চাই নে।'

সামান্য একটি মেয়েছেলে। বহু যুগ পূর্বে তাঁর স্বামী যখন তাঁকে বিস্তর ধন-দৌলত দিয়ে বনে যেতে চাইলেন তখন তিনি তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, 'যেনা হং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্!' যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, পাব না, সে দিয়ে আমার কি হবে?

দেখুন দিকি, মেয়েছেলের কী বায়নাক্কা! সুখ পেয়েও সুখী হতে চায় না—অথচ দেখুন চীনেরা কী সুবুদ্ধিমান। লিং য়ুটাঙ বলেছেন, 'রাত্রের অন্ধকারে ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে আছি। চতুর্দিকে আমার মহামূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। হঠাৎ শুনি একটা ইঁদুর কুট্‌কুট্ করে সেগুলো কাটছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় শুনি, আমার বেড়ালটা হুঙ্কার দিয়ে ম্যাও করে উঠেছে—আহ্—কী সুখ।'

কিন্তু না,—ভারতবর্ষ অমৃত চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ।' আনন্দটা তবে কি? অমৃত। চণ্ডীদাসও বলেছেন, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' এবং সুখের পরও শ্রীরাধা চেয়েছিলেন অমৃত, অমিয়া, তাই 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

অমৃতের অত্যুত্তম বর্ণনা পেয়েছি আমি একটি শ্লোকে।

কেচিদ্ বদন্তি অমৃতোস্তি সুরালয়েষু,
কেচিদ্ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু,
ব্রুমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা,
জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডে॥

আহা-হা! কেউ কেউ বলেন অমৃত আছে সুরালয়ে—মদের দোকানে। কেউ কেউ বলেন, না, অমৃত বনিতার অধর-পল্লবে। আর আমরা—আসলে 'আমি' এখানে সম্মানার্থে বহুবচন আমরা, কারণ আমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি—সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা—আমরা বলি জম্বীরনীর পূরিত—অর্থাৎ নেবু, জম্বীর, জামীর—সিলেটিতে—নেবু—নেবুর রসে পূরিত—ভর্তি—মৎস্যখণ্ডে! সোজা বাংলায় মাছের উপর কষে ঠেসে নেবুর রস—সেই অমৃত।

এ কবি শুধু কবি নন্—মহর্ষি, দিব্যদ্রষ্টা—কী করে সেই যুগেই জানলেন, বাঙলাদেশে এমন দিন আসবে যেদিন শুধু লক্ষপতিরাই শ্বশুরবাড়ি এলে মাছ কিনবেন। আর ইতরজনা—আমরা মাছের কাঁটাটি পর্যন্ত পাবো না, সধবার একাদশী ভাঙবার জন্যে!

আরেকটি কথা। কালিদাস ভবভূতি পড়ে আমেজ করতে পারি নে, এঁরা কোন্ প্রদেশের লোক। কিন্তু যে গুণী জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডকে অমৃত বলে সে নিশ্চয়ই বাঙালী। মাছের তত্ত্ব কি বিহারী, মারওয়াড়ী, গুজরাতি ব্রাদাররা জানেন?

সুখ বলুন, আনন্দ বলুন, অমৃত বলুন, সেটা পাবো কোথায়? একটি মাত্র পথ নির্দেশ করি।

মহাকবি গ্যোটে বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো?
সুখ তো আছে হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে,
সুখ সে তো রয় সদা কাছে কাছে।

Willst du immer weiter schweifen
Sieh, das Gute lieght so nah,
Lerne nur das Gluck ergreifen,
Denn das Gluck ist immer da!

আর আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী লালন ফকীর বলেছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর!

বিষের বিষ

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা, ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোরবেলা থেকে ক্যাটক্যাট্ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে', 'ড্যাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশবার শুনতে হয় না। আর গয়নাগাঁটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই। আগা আহমদ দিনমজুর; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের দশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেল-তেলে আচার!

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ওঁয়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তারপর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকালবেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতাপাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা-ম্যাজম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে!'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা-গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। তার পর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীরমুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউ তো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয়নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশমনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্ গে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখে পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরও পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহমদ দেখে—বাপ রে বাপ, এ্যাব্বড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর গোখরো সাপ! সে তখনো চেচাঁচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও, 'আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, 'তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে এত ভয় কিসের?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধাত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কি বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মদ্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনও সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরোবার কোনও পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল-চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন্ ওঝা? ওসব পাগলামি রাখ। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনও কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে

অনেক করে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, 'গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজ পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এন্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম?
সাপের দ্বারা ভালো কাম?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে-না-যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবনমরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা-মনসার বাপ।

প্রথমটা তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হদ্দ হল এখন ফার্সী পড়ে আগা! কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকা মাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল-নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ-দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই; সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তাঁর বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দুবেলা প্রাণভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসীবাঁদী। ওদের তম্বিতম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন্ সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা,
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে অতি লোভ ভালো না,—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-

বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমনধারা কখনও হয়!'

আগাকে জোর করে পাল্কিতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাঁই বড্ড বেড়েছে—না? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্ গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচশ' ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে! স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ্ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী, রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির্!' সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখন দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহরদারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়াল-নন্দিনী অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ!'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুনতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলেছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো,—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি। তুমি আমার—'

'বাপ রে, মা রে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবনযাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে, নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাইতে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার "মরাল" কি, বলো তো?'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমণী যে কি রকম খাণ্ডারনী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে "মরাল" থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার "মরাল"-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য "মরাল"-টা গভীর :—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনও কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তারপরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।'

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ?'

রাজহংসের মরণগীতি

॥ এক ॥

জর্মনির চরম শত্রু ফ্রান্সের একাধিক লেখক সবিস্ময়ে স্বীকার করেছেন যে, এমন দিন আসবে, যেদিন রণবিদ্যার চর্চাশীল ব্যক্তি মাত্রেই যে রকম ফ্রিডরিক দি গ্রেট ও নেপোলিয়ানের রণকলা অক্ষরে অক্ষরে অধ্যয়ন করে থাকেন ঠিক তেমনি হিটলারের রণকলাও অধ্যয়ন করবেন।

আমরা রণচর্চা করি না; তৎসত্ত্বেও আমাদের মনেও এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন, যে হিটলার দুবৎসরের ভিতর ইংলিশ চ্যানেল থেকে প্রায় মস্কো অবধি রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি যখন তিন বৎসরের ভিতর তাঁর মাটির তলার আশ্রয় ('বুংকার') থেকে খবর পেলেন যে, বিজয়ী রুশ-সেনা সে আশ্রয় থেকে মাত্র পঁচিশ গজ দূরে, আর চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরই, রক্তলোলুপ কেশরীর মত তাঁর বুংকারে এসে প্রবেশ করবে, তখন তাঁর মনে কি চিন্তার উদয় হয়েছিল? সঞ্জয় যখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিলেন যে, দুর্যোধনের পরাজয় ঘটেছে, তখন তাঁর ব্যালাডের (আমার বিশ্বাস, চারণদের মুখে গীত এই ব্যালাডকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে মহাভারত রচিত হয়) ধুয়ো ছিল, 'যখন অমুকটা ঘটল, তখন আমরা জয়াশা করিনি, যখন তমুকটা ঘটল, তখনও আমরা জয়াশা করিনি',—এবং মূল ধুয়ো ছিল, 'আমরা জয়াশা করিনি তখনও আমরা জয়াশা করিনি।' হিটলারের বেলাও কি তাই ঘটেছিল? কারণ তাঁর পরাজয়ও তো

একদিনে হয়নি—তিনি কি দিনে দিনে বুঝতে পেরেছিলেন, 'এখন আর জয়াশা নেই', 'এখন আর জয়াশা নেই', না তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুরাশা পোষণ করে কোন অলৌকিক পরিবর্তনের আশা করেছিলেন?—দুর্যোধন যেরকম উরুভঙ্গের পরও জয়াশা করে অশ্বত্থামাকে পঞ্চপাণ্ডবের গোপন নিধনের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

আরও ছোটখাটো কত প্রশ্নই না মনে উদয় হয়।

যেমন মনে করুন, হিটলার যখন পোল্যান্ড থেকে ফ্রান্স, ওদিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম জয় করে ফেলেছেন, বাঙলা কথায় একমাত্র রুশ চাড়া এমন কোনও শক্তি ইউরোপে আর নেই যে তার মোকাবেলা করতে পারে এবং পরাজিত ইংলন্ড আপন দ্বীপে ফিরে গিয়ে এমনি ক্লান্ত যে, জখমগুলো পর্যন্ত চাটতে পারছে না, তখন হিটলার ইংলন্ড অভিযানে বেরোলেন না কেন? স্বয়ং চার্চিল স্বীকার করেছেন, তখন হিটলার সে অভিযান করলে ইংলন্ড অনায়াসে জয় করতে পারতেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন বহু ঐতিহাসিক, বহু জঙ্গীলাট, বহু কূটনীতিবিদ্, এমন কি হিটলারের বহু সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁর সেনাপতিরা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে হাজার হাজার না হোক, শত শত পুস্তক লিখেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে তবু কৌতূহল জাগে, স্বয়ং হিটলার কি ভেবেছিলেন? অবশ্য তাঁর উত্তরই যে শুদ্ধ হবে, এমন কোনও কথা নেই। আমাদের বন্ধুবান্ধব যখন পরীক্ষায় ফেল করবার পর দফে দফে ফেল মারার কারণ দর্শায়, তখন আমাদেরই দু-একজনা তার অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রকৃত কারণ দর্শিয়ে দেয়, আর তখন আমরা অনেক স্থলেই ওদেরই বিশ্বাস করি বেশী—সর্বস্থলে না হোক, অনেক স্থলেই 'স্পেকটেটর সীজ মোর অব দি গেম।'

তবু মনে বড়ই কৌতূহল হয়, নেপোলিয়ন কি ভেবেছিলেন, হিটলার কি ভেবেছিলেন?

অধুনা তারই খানিকটে উত্তর মিলেছে।

১৯৪১-৪২-এর শীতে হিটলার গৌরবের মধ্যগগনে। ফ্রান্স পদানত—তিনি মস্কো লেলিনগ্রাদের দরজায় সদম্ভে ধাক্কা দিচ্ছেন। আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হিটলার তখন লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার পর সমবেত ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন—জর্মন মনের উপর বহিরাগত খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেহেরু না সুভাষ, বর্ণসঙ্করের কুফল, কুকুর মনিবের খাটের নিচে শোবে না অন্য কোথাও,—বস্তুত আকাশ-পাতালে হেন বস্তু নেই, যা নিয়ে তিনি তখন আলোচনা করেননি। 'আলোচনা' বলে ভুল করলুম—আসলে ইয়ার-দোস্ত দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে না করতেই হিটলারের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতো। এ যেন নব গীতা—শুধু আমাদের গীতাতে প্রশ্ন করেন একা অর্জুন, এখানে অর্জুন একাধিক।

হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরমান তখন হিটলারের অনুমতি নিয়ে ঘরের এক কোণে স্টেনো রাখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর টাইপ করা কাগজের উপর তখন বরমান তাঁর মন্তব্য ও মেরামতি করে দিলে পর শেষ সরকারী কপি তৈরি হত।

হিটলার যুদ্ধে জয়ী হলে পর এগুলো কি ভাবে প্রকাশিত হত, আদৌ প্রকাশিত হত কি না, সেকথা বলা কঠিন। যুদ্ধের পর যখন চতুর্দিকে লুঠতরাজ, তখন এ-হাত সে-হাত ঘুরে শেষটায় সে পাণ্ডুলিপি প্রথম জর্মানে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদে—

"হিটলারজ টেবিল-টক্" নামে প্রকাশিত হয়। প্রায় সাতশ' পাতার বই।

হিটলার 'মাইন কাম্‌ফ' কিংবা বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন বিশ্বজনের সম্মুখে সরকারীভাবে, কিন্তু এই টেবিল-টক্ ঘরোয়া। এতে হিটলার-মনের অন্য একটা দিক দেখতে পাওয়া যায়।

হিটলারের অনুচরবর্গ বলেন, যখন পরাজয় আরম্ভ হল, তখন হিটলার যে-কোনও কারণেই হোক তাঁর জেনারেল, কর্নেল, ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে খানা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে খেতে লাগলেন, নিরামিষ রান্নায় সিদ্ধহস্তা তাঁর পাচিকা এবং তাঁর মহিলা-টাইপিস্টদের সঙ্গে। তাই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত 'টেবিল-টক্' প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই হিটলারের কাছে না হোক তাঁর শত্রু-মিত্র বহুজনের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আর জয়াশা নেই। তাঁর সেক্রেটারি বরমান অন্তত সে-সম্ভাবনাটার আতঙ্ক ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন। খুব সম্ভব, তাঁরই অনুরোধে হিটলার ফের 'টেবিল-টক্' দিলেন। কিন্তু এগুলোকে আর 'টক্' বলা চলে না। তাঁর শেষ বাণী, তাঁর শেষ 'টেস্টামেন্ট' বললেই ভালো বলা হয়।

এগুলোও এ-হাত সে-হাত ঘুরে ঘুরে প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্রান্সে ১৯৫৯-এ; ইংরিজিতে ১৯৬১-তে। এ-দেশে এসে পৌঁচেছে দিন কয়েক হল।

চটি বই, কিন্তু তা হলেও এর ভিতর মানব-মনের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব, জয়াশা নিরাশা এবং সর্বশেষে আর্তকণ্ঠে বিশ্বজনের প্রতি অভিসম্পাতসহ ভবিষ্যদ্বাণী—এ সবই রয়েছে কর্কশ হতে কর্কশতর ভাষায়।

তবে একথা ঠিক, আর কিছু না হোক, তাঁর ভবিষ্যদ্বাবাণীগুলো প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলছে।[1]

॥ দুই ॥

প্রথম প্রশ্ন ফ্রান্সের পরাজয়ের পর হিটলার সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ড আক্রমণ করলেন না কেন? পূর্বেই বলেছি, এ বিষয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন : এবারে হিটলারের মুখে শুনুন :

'জুলাইয়ের (১৯৪০) শেষের দিকে, অর্থাৎ ফ্রান্সের পরাজয়ের এক মাস পরে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, শান্তি আবার আমাদের মুঠোর বাইরে চলে গেল। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে শরৎ-হেমন্তের ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্বে আমরা ব্রিটেন অভিযান করতে পারবো না, কারণ আকাশযুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারিনি। তার সরল অর্থ আমরা ভবিষ্যতেও আর কখনও ব্রিটেন অভিযানে সক্ষম হব না।'

(টীকা: হিটলার এবং গ্যোরিঙের চাল ছিল, ইংলন্ডের উপর বেধড়ক বোমা বর্ষণ করলে ইংলিশ জঙ্গী বিমান আকাশে উঠবে জর্মন বিমারু বিমান নিধন করবার জন্য। তখন সেগুলোকেও বিনাশ করা হবে। ফলে আকাশে ইংলন্ডের আর কোনও আধিপত্য থাকবে না বলে তখন সহজেই সমুদ্রপথে ব্রিটেন অভিযান সম্ভবপর হবে। ইংরেজ এই

---

1. The Testament of Adolf Hitler, (February-April 1945, The Hitler Borman Documents, Cassell, London, pp. 115).

চালটি বুঝতে পেরে, বরঞ্চ বেধড়ক বোমার মার খেল, কিন্তু জঙ্গী বিমান আকাশে তুললো অত্যল্পই—বাকিগুলো বাঁচিয়ে রাখলো হিটলারের সমুদ্র অভিযানের জাহাজগুলোকে ঘায়েল করার জন্য।)

হিটলার পুনরায় অন্যত্র বলেছেন,

'ইংলন্ড-অভিযান ও ফলে যুদ্ধ শেষ করে শান্তি স্থাপনের আশা ত্যাগ করেছিলুম। কারণ ইংলন্ডের মূর্খ নেতারা কিছুতেই ইয়োরোপে আমাদের একছত্রাধিপত্য স্বীকার করে নিত না—যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে আমাদের সঙ্গে বৈরীভাবাপন্ন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রও (অর্থাৎ রুশ) বেঁচে থাকতো। যুদ্ধের তা হলে শেষই হত না—চলতেই থাকতো। এবং ইংরেজের পিছনে মার্কিন এসে জুটে তার কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে তুলতো। মার্কিনের আবার যুদ্ধ করার জন্য সব বলই প্রচুর, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তারাও আমাদেরই মত প্রচুর এগিয়ে যেত; ইংলন্ড থেকে কন্টিনেন্ট দূরে নয় (অর্থাৎ মার্কিন-ইংরেজ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তারাও কন্টিনেন্টে নেমে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে)—এ সমস্ত কারণে আমাদের পক্ষে ইংলন্ড অভিযান করে এক সুদীর্ঘ কালব্যাপী লড়াইয়ের দয়ে মজে যাওয়া মোটেই সমীচীন হত না। কারণ স্পষ্ট দেখতে পারছো, সময়—কাল, ক্রমেই আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সাহায্য করে যেত বেশী। ইংলন্ডের শেষ আশা ছিল রুশ—কারণ রুশ আমাদেরই মত শক্তিশালী—এবং তাকে খাড়া করানো আমাদের বিরুদ্ধে। এই রুশকে ঘায়েল করতে পারলেই ইংরেজ বুঝতো যে তার আর আশা নেই, এবারে সন্ধি করতেই হবে।'

হিটলার এস্থলে পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন, কেন ইংলন্ড আক্রমণ না করে তিনি রুশ আক্রমণ করেন।

এ যুক্তিগুলো কতখানি বাস্তব তার বিচার রণ-পণ্ডিতেরা করবেন। ঈষৎ অবান্তর হলেও অন্য একটি যুক্তির কথা এস্থলে উল্লেখ করি, কারণ সেটি জানা থাকলে ভারতের ইতিহাস বুঝতে অনেকখানি সুবিধা হয়।

একাধিক রণ-পণ্ডিত বলেছেন, হিটলার এমন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার সঙ্গে সমুদ্র ও সমুদ্রাভিযানের যোগসূত্র বা ঐতিহ্য ছিল না। অস্ট্রিয়াকে ইংরেজ, স্পানীয় বা আরবের মত ম্যারিটিম নেশন বলা চলে না। তাই ইংলন্ড অভিযানের সব-কিছু তৈরী করেও[১] হিটলার শেষ মুহূর্তে কিন্তু-কিন্তু করে থেমে গেলেন।

অর্থাৎ জলাতঙ্ক না থাকলেও হিটলারের সমুদ্রাতঙ্ক ছিল—অন্তত সমুদ্র-প্রীতি যে ছিল না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য মানতে হবে এইটেই সর্বপ্রধান কারণ নয়।

পাঠান মোগল বংশের রাজাদেরও হিটলারের অবস্থা ছিল। এঁরা এসেছিলেন ল্যান্ড-লক্‌ট দেশ থেকে। সমুদ্রের সঙ্গে তাঁদের কণামাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমার যতদূর জানা

---

১ যাঁরা হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্‌মানের বই 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' পড়েছেন তাঁরাই জানেন, ইংলন্ড অভিযানের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর কথা ছিল, এক বিশেষ সন্ধ্যায় রাত দশটায় হিটলার অভিযান আরম্ভের ফাইনাল অর্ডার দেবেন। হিটলার হফ্‌মান ও অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে রাত বারোটা অবধি গালগল্প করে শুতে গেলেন। কোন অর্ডারই দিলেন না। অভিযান নাকচ হল।

আছে, মোগলদের ভিতর প্রথম আকবরই গুজরাত জয় করে চাক্ষুষ সমুদ্রদর্শন করেন। 'আকবর-নামার' ইংরিজী অনুবাদক সেই সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সমুদ্র আকবরের মনে কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। তাও আকবর প্রভৃতি বাদশারা যদি সমুদ্রপারে কিংবা অদূরে রাজধানী করতেন তা হলেও না হয় কিছুটা হত। তাঁরা থাকতেন আগ্রা-দিল্লীতে যেখানে সমুদ্রের লোনা হাওয়া পর্যন্ত পৌঁছয় না।

ফলে এদের বিপুল ঐশ্বর্য জনবল থাকা সত্ত্বেও আমাদের নৌবহর তৈরী হল না।

হোয়াট এ ট্র্যাজেডি! এঁরা যদি নৌবহর তৈরী করতেন, তবে পর্তুগীজ ইংরেজ এদেশে যে এক রত্তি পাত্তা পেত না তাই নয়, আমাদের পণ্যসম্ভার আমাদের জাহাজে করে দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত। আজ আমরা মার্কিন ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতুম। এবং পরম পরিতাপের বিষয়, আজও আমাদের মন সমুদ্র-সচেতন নয়—রাজধানী সেই দিল্লীতে যে।

অথচ আমরা সবাই জানি, সমুদ্র-যাত্রায় ভারতের খ্যাতি একদা ছিল।

সে দীর্ঘ কাহিনী তুলবো না। মহাভারতের মাত্র সামান্য একটি কথার উল্লেখ করি। শান্তিপর্বে ভীষ্ম রাজ্যচর্চা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার জন্য প্রজাপতিকৃত লক্ষ অধ্যায়যুক্ত এক বিরাট শাস্ত্রের উল্লেখ করে বলেছেন, "ঐ বিরাট শাস্ত্রে...নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নৌকার পথরোধ...সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে (শান্তিপর্ব)।" অর্থাৎ কয়েক বৎসর পরে অ্যান্টনি ইড্‌ন সুয়েজ কানালের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে যে-ভাবে খালের মুখ বন্ধ করলেন! এ সংসারে নূতন কিছুই নয়।

নৌবহর বাবদে ভারতের তখনই সর্বশক্তি গেছে যখনই কেন্দ্রীয় সরকার নৌশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কারণ তখন তাঁরা বাঙলা এবং গুজরাত প্রদেশকে নৌবহর তৈরী করার জন্য অর্থ দিতেন না—এর মূল্য জানেন না বলে, সেকথা পূর্বেই বলেছি। অথচ ঐ সময়ে, যেমন মনে পড়ে তীমুর-অভিযানের পর আকবর-জাহাঙ্গীর পর্যন্ত বাঙলা গুজরাত স্বাধীন। নৌবহরের মূল্য জানেন বলে গুজরাতের স্বাধীন সুলতান মাহমুদ বেগড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ সুলতান বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সকলেই নৌবহর রেখেছেন এবং একাধিকবার নৌসংগ্রামে পর্তুগীজদের বেধড়ক মার মেরেছেন। গুজরাতের শেষ স্বাধীন বাদশা বাহাদুর শাহ মারা যান, তিনি যখন হুমায়ুন এবং শের শা'র ভয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে তাদের জাহাজে যান। পর্তুগীজদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন—পর্তুগীজরা বৈঠার ঘায়ে তাঁকে খুন করে।

বাঙলাও যখন স্বাধীন তখন পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়েছে। যদিও তারা সুন্দরবন অঞ্চল ছারখার করেছে, তবু বাঙলায় গোয়া দমন দিউ-এর মত রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি।

আকবর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাংলা-গুজরাত আর্তকণ্ঠে বার বার চিৎকার করে কেন্দ্রের হুজুরদের জানিয়েছে, পর্তুগীজরা সর্বনাশ করছে। আমাদের পণ্যসম্ভার হারমাদদের ভয়ে বিদেশে রপ্তানি হতে পারছে না। বাধ্য হয়ে জলের দরে পর্তুগীজদের বেচে দিতে হচ্ছে। আমরা যখন স্বাধীন ছিলুম তখন আমাদের আপন টাকা দিয়ে নৌবহর গড়েছি। এখন কুল্লে টাকা চলে যায় কেন্দ্রে। দয়া করে টাকা দিন, নৌবহর গড়ি।

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! হুজুররা হিটলারের চেয়ে অধম ল্যান্ড লক্‌ট্‌ দেশের লোক, এবং এখন থাকেন দিল্লীতে। নৌবহরের মূল্য কি বুঝবেন?

ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি। আজও যদি কেন্দ্রে বাঙলাদেশকে বাণিজ্য-নৌবহর তৈরী করবার জন্য বিশেষ মোটা টাকা না দেয়, তবে বুঝব ইতিহাস বৃথাই পড়ছি।

১৯৪১।

॥ তিন ॥

হিটলার আত্মহত্যা করার এক মাস পূর্ব পর্যন্ত বার বার করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি চাইনি, আমি চাইনি, আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলুম জর্মনির জন্য তার বেঁচে থাকার মত (লেবেন্‌স্‌রাউম) 'দুই বিঘে জমি'। জমিটা আসবে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড ও উক্রানিয়া থেকে। তাতে ইংলন্ডের কি, ফ্রান্সেরই বা কি? আমি তো ফ্রান্স কিংবা তার উপনিবেশে হাত দিতে চাইনি। ইংরেজকেও শতবার বলেছি, তার বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিও কণামাত্র লোভ আমার নেই। রুশরা বর্বর, তারা বিশ্বশান্তির শত্রু। তারা পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নিতে পারলে তার শক্তিক্ষয় হয়ে যাওয়ায় সে বিশ্বশান্তি নষ্ট করতে পারবে না; জর্মনরাও খেয়ে-পরে বাঁচবে, ফ্রান্সের উপনিবেশ বা ব্রিটেনের বিশ্বরাজ্যের দিকে হ্যাংলার মত তাকাবে না।

কিন্তু ফরাসী-ইংরেজ চায় না, আমরা খেয়ে-পরে বাঁচি। তারা বোঝে না, রুশ বিশ্বশান্তির কত বড় দুশমন। তাই যুদ্ধ করলো তারা। আমি যুদ্ধ করিনি।

এবং এই ফ্রান্স, ব্রিটন ও মার্কিনের পিছনে রয়েছে বিশ্ব ইহুদি সম্প্রদায়। আমি যেদিন (জানুয়ারি ১৯৩৩) জর্মনির কর্ণধার হলুম সেদিন থেকেই ইহুদিরা আমার ও জর্মনির বিনাশ চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলো। আমিও তাদের একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলুম, তারা যদি জর্মনকে নিধন করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আহ্বান করে তবে আমি তাদের সমূলে নির্মূল করবো। বেদরদ হৃদয়ে। মানুষ যেরকম ছারপোকা মারার সময় দয়া-মৈত্রীব কথা ভাবে না।

(ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় গ্যোরিঙ, কাইটেল, রিবেনট্রপ ও অধুনা আইসম্যান যখন বলেন ইহুদি-নিধন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বয়ং হিটলার সম্পূর্ণ স্বাধীন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তখন তাঁরা কণামাত্র অতিরঞ্জন করেননি।)

যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে হিটলারের এইটেই মোটামুটি বক্তব্য।

দুনিয়ার কুল্লে অশান্তি, বিশ্ব-জোড়া লড়াই এ সব-কিছুর জন্য একমাত্র ইহুদি সম্প্রদায়ই দায়ী—এ কথা একমাত্র গোঁড়া নাৎসি ভিন্ন কেউ স্বীকার করবে না, (অবশ্য আরবরা প্যালেস্টাইন হারিয়ে যাওয়ার ফলে করতে পারে, কিন্তু তাদের সরকারও ইহুদিদের আপন ভিন্ন ভিন্ন আরব রাষ্ট্র থেকে ব্যাপকভাবে তাড়াবার চেষ্টা করেনি—নিধন করার তো কথাই ওঠে না) কিন্তু আমাদের মনে তবু প্রশ্ন জাগে, সত্যই ইহুদিরা কতখানি শক্তি ধরে, বিশ্বযুদ্ধের জন্য তারা কতখানি দায়ী? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-এর সদুত্তর কেউ কখনও পাবে না—উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি সুদ্ধমাত্র টাকার জোরে প্যালেস্টাইনের মত একটা রাজ্যস্থাপনা করা ইহুদি ভিন্ন আর কেউ কখনও করতে পারেনি।

এখানে আরেকটি অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যাপারের উল্লেখ করি।

সকলেরই বিশ্বাস. ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিকে ফরাসী-ইংরেজ যখন অকাতরচিত্তে

চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশবিশেষ হিটলারের হাতে তুলে দেন, তখন এদের মান-মর্যাদা উচ্ছন্ন যায়, এবং হিটলারের পরিপূর্ণ বিজয় ও বিশ্বজোড়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এই জয়ে গোটা জর্মনির জনসাধারণ তখন এমনি উল্লসিত, হিটলারের জয়গানে এমনি মুখরিত যে জর্মনির ভিতরে যেসব জর্মন হিটলারের পতনের গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন তাঁরা পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তাঁদের চক্রান্ত কিছুদিনের জন্য মুলতুবী রাখেন।

এই ম্যুনিক-ব্যাপারে হিটলারের মত কি?

তিনি খাপ্পা হয়ে বলেছেন :

'সেই কট্টর ক্যাপিটালিস্ট বুর্জুয়া চেম্বারলিন যখন তার ভণ্ডামির ছাতাখানা নিয়ে সর্ব তকলীফ বরদাস্ত করে সেই সুদূর বের্গহফে (হিটলারের নিবাস) হিটলারের মত হঠাৎ-নবাবের (আপস্টার্ট) সঙ্গে পরামর্শ করতে এল, তখন সে বিলক্ষণ জানতো যে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ চালানো। আমার সন্দেহ মোচনের জন্য সে তখন যা খুশি তাই বলবার জন্য তৈরী। বের্গহফে আসার তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কোনও গতিকে সময় পাওয়া (অর্থাৎ যুদ্ধটা মুলতুবী করা)। আমাদের তখন উচিত ছিল ১৯৩৮-এই যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়া। কিন্তু তারা (চেম্বারলেন সম্প্রদায়)—সেই নির্বীর্য কাপুরুষের দল—আমরা তখন যা চাইলুম তাই দিতে লাগলো। এ অবস্থায় গায়ে পড়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় কি প্রকারে (অর্থাৎ জর্মনির জনসাধারণ বলতো ইংরেজ ফরাসী যখন আমাদের সব খাঁই-ই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন আমরা খামকা লড়াই করতে যাব কেন)? তাই আমরা ম্যুনিকে অতি সহজ ও দ্রুত লড়াই জেতার সুযোগ হারালুম। যদিও আমরা তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম না, তবু শত্রুর চেয়ে বেশী প্রস্তুতি আমাদের ছিল। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরেই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততম সময় ছিল।'

মুস্‌সোলীনির মধ্যস্থতায় যে ম্যুনিকপর্ব সমাধান হয়েছিল সে কথার উল্লেখ হিটলার করেননি। এস্থলে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য—১৯৩৯-এ হিটলার পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে বলেন, 'আশা করি এবারে আবার হঠাৎ কোনও বদমায়েশ (শুয়াইন-হুন্ট) ম্যুনিকের মত শেষ মুহূর্তে এসে সব-কিছু না ভণ্ডুল করে দেয়।'

এবারে শেষ প্রশ্ন।

যুদ্ধ হারার জন্য তিনি কাকে দায়ী করলেন?

ইতিপূর্বেই আমাদের জানা ছিল, ন্যুরেনবের্গের মকদ্দমার সময় যে-সব দলিল-পত্র পেশ করা হয় তাতে হিটলারের উইলটিও ছিল। এ উইলের সত্যতা সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র কেউই কোনও প্রকারের সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এটি তিনি তৈরী করেন আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। জর্মনির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এটি লিখিত।

এ উইলে হিটলার নৌসেনার প্রশংসা করেছেন (বস্তুত তিনি মৃত্যুর পূর্বে নৌবহরের বড় কর্তাকেই তাঁর পদে বসিয়ে যাবার জন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এবং সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন নাকি বড় কর্তা স্বয়ং) যে বিমান বহরের অকৃতকার্যতার জন্য অন্তত অংশত তাঁকে পরাজয় মানতে হল তারও প্রশংসা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন তাঁর 'ব্লিৎসক্রীগ' করনেওলা ল্যান্ড-আর্মির জেনারেল ফীল্ড্-মার্শালদের। সাধারণ সৈনিকের উচ্চ প্রশংসা তিনি করেছেন, কিন্তু তাঁর সর্ব ক্রোধ আর্মি আপিসারদের উপর।

তারাই তাঁর সর্বনাশ করেছে। তারা তাঁর হুকুম অমান্য করেছে। তারা প্রতিক্ষণে পরাজয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পদে পদে সপ্রমাণ করেছে, তারা যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লড়ছে। অর্থাৎ নূতন যুগে নূতন লড়াইয়ে যে নূতন কায়দায় লড়তে হবে সেটা তারা আদপেই বুঝতে পারেনি।

হিটলারের যদি সুকুমার রায় পড়া থাকতো তবে নিশ্চয়ই বলতেন, এ যেন 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!' সোজা বাংলায়, জাঁদরেলরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছেন!

তা হলে প্রশ্ন : পোলান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে সম্পূর্ণ জয় করে মস্কোর চৌকাট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল কারা? ওই জেনারেলরাই তো!

তবে?

১৯৫১।

হিটলার

এই গত রবিবারের 'আনন্দবাজারে'ই দেখি, আমাদের শিবুদা হিটলারকে নিয়ে একখানা 'পান্' ছেড়েছেন। 'হের হিটলার নাকি নিজের গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশে বহাল তবিয়েতে আর্জেন্টিনায় বিরাজ করছেন।' এর উপর শিবুদার 'পান্'—'তাঁর গোঁ গেছে, এখন গোঁফও গেল।'[১]

আমি কিন্তু পান্টার দিকে নজর দিচ্ছি না। আমার নজর ঐ তত্ত্ব কথাটির দিকে যে হিটলার এখনও বেঁচে আছেন।

সত্যি নাকি?

আমি এবার জর্মনিতে বেশী লোককে এ প্রশ্ন শুধোইনি। তার কারণ আমি নিজে যখন নিঃসংশয় যে হিটলার বেঁচে নেই তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার লাভ কি? যে দু-একজনকে শুধিয়েছিলাম তারাও নিঃসংশয়—বেঁচে নেই।

তা হলে প্রশ্ন, তিনি যে বেঁচে আছেন এ-গুজবের উৎপত্তি কোথায়?

হিটলার মারা যাওয়ার মাস তিনেক পর বার্লিনের কাছে শহর পৎসদামে মিত্রশক্তির এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নাকি স্তালিন বলেন, তাঁর বিশ্বাস, হিটলার মারা যাননি, গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। এর কিছুদিন পর রাশান এনসাইক্লোপীডিয়ার নূতন সংস্করণের প্রকাশ

---

১ হিটলার গোঁফ কামালেই যে তাঁর পক্ষে সেইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ এই নিয়ে ১৯৩৩-৩৪ই একটি কাঁচা রসিকতা চালু ছিল। একদা হিটলার গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস ও র্যোম ছদ্মবেশে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঠাহর করার জন্য বেরোলেন। হিটলার গোঁফ কামালেন, গ্যোরিঙ সিভিল ড্রেস পরলেন, গ্যোবেলস কথা বন্ধ করে দিলেন ও র্যোম একটি প্রিয়দর্শন তরুণী সঙ্গে নিলেন। এস্থলে বলে দেওয়া প্রয়োজন গ্যোরিঙ বড্ড বেশী য়ুনিফর্ম ভালোবাসতেন, গ্যোবেলস প্রপাগান্ডা চীফ বলে সমস্তক্ষণ বকর বকর করতেন আর র্যোম সমরতিগামী অর্থাৎ হোমোসেকসুয়েল ছিলেন।

হয় এবং তাতে বলা হয়, হিটলার অদৃশ্য হয়েছেন—তিনি যে মারা গেছেন এ-কথা রুশ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে অস্বীকার করলেন। ইতিপূর্বে দুনিয়ার সর্বত্র কত রকমের যে গুজব রটল তার ইয়ত্তা নেই। আর্জেন্টাইন সউদী আরব কোনও জায়গাই বাদ পড়লো না, যেখানে হিটলার নেই। এমন কি এক কাষ্ঠরসিক প্রকাশ করলেন, তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাঝখানে বিরাজ করছেন! সে যুগে স্পুটনিক জাতীয় কোনও কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। না হলে হয়তো বলা হত, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করছেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চন্দ্রের লাতিন নাম লুনারিস—যা থেকে লুনাটিক—উন্মাদ শব্দটা এসেছে এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন যে পরাজয়ের চরম অবস্থায় হিটলার নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—তবে বদ্ধ উন্মাদ নয়, মুক্ত উন্মাদ। তাই আপন আদি বাসভূমে চলে গেছেন।

তা সে যাই হোক, ইংরেজ ভাবলে, হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে না এক নূতন লীজেন্ড সৃষ্টি হয়—১৯১৮ সালে জর্মনিতে যে-রকম এক লীজেন্ড চালু হয় যে জর্মন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে হারেনি, ঘরশত্রু বিভীষণ (অর্থাৎ ইহুদি, সোশাল ডেমোক্রেট, কম্যুনিস্ট—যার যাকে অপছন্দ) যদি তার 'পিছন থেকে পিঠে ছোরা' না মারতো। হিটলার স্বয়ং এ লীজেন্ডের প্রচুরতম 'সদ্ব্যবহার' করেন। ইংরেজের তাই ভয় হল, হিটলারকে কেন্দ্র করে নয়া এক লীজেন্ড যেন সৃষ্ট না হয় যার জোরে এক নব-নাৎসি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। অতএব উত্তমরূপে তদন্ত করা হোক, হিটলার বেঁচে আছে কি নেই।

এ কাজের ভার এক অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। ট্রেভার রোপার সাহেব খুব সম্ভব অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।

দীর্ঘদিন ধরে অতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তদন্ত চালান। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাঠক পাবেন তাঁর লেখা 'লাস্ট ডেজ অব হিটলার' পুস্তকে। অতি উপাদেয় সে পুস্তক। এক দিক দিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিকের মত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি সাক্ষীর বক্তব্য তিনি যাচাই করেছেন অতিশয় সন্তর্পণে, অন্য দিক দিয়ে তিনি সে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টের মত সরল ভাষায়, মনোরম শৈলীতে। পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে কি করে উৎকণ্ঠিত উদ্‌গ্রীব অবস্থায় পৌঁছিয়ে সর্বশেষে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাপ্তিতে রসসৃষ্টি করতে হয়, ঐতিহাসিক হয়েও ট্রেভার রোপার এই কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত এরকম রোমাঞ্চকর পুস্তক আমার জীবন অল্পই পড়েছি।

কোনও কোনও অরসিক অবশ্য বলেছেন, বইখানা লুরিড, অর্থাৎ রগরগে, কিংবা বলতে পারেন, পুস্তকে বীভৎস রসের প্রাধান্য। এটা অবশ্য রুচির কথা; তবে আমার বিশ্বাস, বিষয়বস্তু নিজের থেকেই তার রসরূপ নির্ণয় করে। প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট সে-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। সে যেন নিতান্ত মিডিয়াম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রানী চন্দ যেভাবে ঘরোয়া লিখেছেন। এস্থলে অবশ্য অবণ ঠাকুরের স্থলে ঘটনা-প্রবাহই তার রসরূপ নির্ণয় করে দিয়েছে।

তৎসত্ত্বেও বহুতর লোক বিশ্বাস করতে নারাজ হলেন যে, হিটলার গত হয়েছেন। এঁরা যে সব আপত্তি তুললেন, ট্রেভার রোপার তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলোকে দফে দফে হালুয়া করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করতেও জানেন। তাঁর বক্তব্য অনেকটা এই : শীতকালে যখন য়ুরোপের লোক গরম জায়গায় যেতে চায় তখন দেখা হয়ে গেল

যাঁরা—এঁদের অধিকাংশই খবরের কাগজের রিপোর্টার—ট্রেভার রোপারের রায়ে সায় দিচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন হিটলারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আর্জেন্টিনায়, এবং গ্রীষ্মকালে বলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (গ্রীষ্মে শীতল, মনোরম) সুইটজারল্যান্ডে! ট্রেভার রোপার বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিত করেছেন,—অতএব পত্রিকার পয়সায় শীতে গরম জায়গা এবং গরমে শীত জায়গায় দিব্য কয়েকটা দিন পরমানন্দে কেটে গেল।

তবে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বইখানাকে কেউ সিরিয়াসলি চ্যালেঞ্জ করেননি। এবং ট্রেভার রোপার তাঁর সর্বশেষ শিরোপা পেলেন রাশার কাছ থেকে। হালে রাশান এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার যে নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে হিটলার মৃত।

শুধু এই বই নয়, হিটলারের সঙ্গে যাঁরা তাঁর 'বুংকারে' (বোমারু বিমানের বোমা থেকে আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ভূগর্ভস্থ আশ্রয়গৃহ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন তাঁদের জীবিতজন মাত্রই পরবর্তীকালে বই লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন অথবা খবরের কাগজে মাসিক প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এঁদের সকলে মিলে একজোট হয়ে হিটলারের মৃত্যুর একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে নানা ঘড়েল পুলিস, রিপোর্টার ইত্যাদির ক্রস এগজামিনেশনে পাস করে এখনও সেটা আঁকড়ে ধরে আছেন—এটা অবিশ্বাস্য। আরও নানাবিধ আছে এবং ট্রেভার রোপার সেগুলো সবিস্তার আলোচনা করছেন। হালে শায়রার (Shirer) নামক একজন মার্কিন কর্তৃক লিখিত হিটলারের রাজত্ব সম্বন্ধে বিরাট একখানা বই বেরিয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার জর্মন অনুবাদও হয়ে গিয়েছে। বইখানা মোটের উপর ভালোই। কিন্তু ওভার-সিম্‌প্লিফিকেশনের দোষে দুষ্ট। শায়রার ও হিটলারের অন্যান্য জীবনী-লেখকগণও ঐক্যনাদে স্বীকার করেন, হিটলার মৃত।

কিন্তু হিটলার জীবিত না মৃত সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই, জর্মন জনগণ হিটলার সম্বন্ধে কি ভাবে, আবার যদি অন্য রঙ ধরে আরেক হিট্‌লার দেখা দেন তবে সে তার অধুনালব্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্জন করে পুনরায় গড্ডলিকাস্রোত বওয়াবে কিনা? এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সে যে এক বিরাট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেল সে সম্বন্ধে তার মতামত কি?

যাদের বয়েস পঁচিশ-ত্রিশের চেয়ে কম তাদের জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই, কারণ যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের কারও কারও কিছুটা মনে আছে বটে, কিন্তু হিটলারের চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি আপন বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মত বয়েস তাদের তখনও হয়নি। যাদের বয়েস তাদের চেয়ে বেশী তারা একদম চুপ; কোনও কিছু বলতে চায় না। এরা যে ভয়ে মুখ খোলে না তা নয়, কারণ আমি যাদের চিনি তাদের অধিকাংশই ছিলেন সোশাল ডিমোক্রেট, কিংবা ক্যাথলিক সেন্টার (আজ আডেনাওয়ার যার দলপতি) এবং হিট্‌লার-বৈরী। ১৯৩৭/৩৮-এ বরঞ্চ এঁরা ফিসফিস করে আমার কানে কানে হিটলার-রাজ্যের তীব্রতম নিন্দা করেছেন। কিন্তু আজ আর কোনও জর্মনই অতীত নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। এ যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে, এটাকে নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ কি?

আমার কোনও পাঁড় নাৎসি বন্ধু ছিল না, একজন মোলায়েম নাৎসির সঙ্গে বেশ কিছুটা হৃদ্যতা হয়েছিল। তার সন্ধান পেলুম না। তার আমার দুজনার অন্য এক বন্ধু বললে—খুব সম্ভব মারা গিয়েছে।

তবু আমি প্রাচীন পরিচয়ের একাধিক জর্মন মিলিত হলে কথার মোড় ঐদিকে ঘোরাতুম। তাতে কোন লাভ হত না। পাঁচ মিনিটের ভিতর সবাই যুদ্ধ বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করত। তাতে আর যা হোক, হিটলার দর্শনের উপর নূতন কোনও আলোকপাত হত না।

একদা যারা কট্টর নাৎসি ছিল তাদের বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই নাৎসিবাদ ত্যাগ করেছে কিন্তু বেশ কিছু নাৎসি এখনও গোপনে ঘাপটি মেরে বসে আছে চিন্তার জগতে : বাইরে অবশ্য আর পাঁচজনের মত তারাও দরকার হলে হিটলারের নিন্দা করে, কারণ নাৎসি-উইচ-হান্টিং অর্থাৎ ডি-নাৎসিফিকেশন এখনও শেষ হয়নি (এই তো মাস তিনেক পূর্বে ইয়োরোপ-বিখ্যাত এক শহরপ্ল্যানার জর্মনকে ধরা হয়েছে—সে নাকি ১৯৪৫ সালে প্রায় ত্রিশজন ইটালিয়ান মজুরকে গুলি করে মারার আদেশ দেয়)।[১] এরা পুনরায় এক নূতন হিটলারের পিছনে জড়ো হবে সে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, গুরুবাদ জিনিসটা একবার শিকড় গাড়লে সমূলে সম্পূর্ণ বিনাশ পায় না—হিটলারকে জর্মনি যেভাবে পূজা করেছে, আমাদের চরম কর্তাভজারাও এতখানি করেনি।

উপস্থিত এদের কথাও কেউ শুনবে না—অবশ্য সাহস তাদের এখনও হয়নি, হতে হতে বেশ কিছুদিন লাগবে। কারণ জর্মনি এখনও অবসন্ন। রাজনৈতিক উত্তেজনা তার যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নব-হিটলার

আত্তিলা, চেঙ্গিস, নাদির যখন রক্তের বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়েছেন তখন অসহায় মানবসন্তান কাতরকণ্ঠে রুদ্রকে স্মরণ করে তাঁর দক্ষিণ মুখের কামনা করেছে, কিংবা হয়তো ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়েছে। কিন্তু সাহস করে এ আশা করতে পারেনি, ভবিষ্যতের আত্তিলা-নাদিরকে ঠেকানো যায় কি প্রকারে?

আজ কিন্তু মানুষের চিন্তা, এমন কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে আবার যেন আরেকটা হিটলার দেখা না দিতে পারে? কারণ এই 'সুসভ্য' বিংশ শতাব্দীতে হিটলার যে রক্তপাত করে গেলেন, তার সামনে খুব সম্ভব চেঙ্গিস নাদির হার মানেন। তাই আমি

---

১ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্মনিতে একটি কেন্দ্রীয় বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একমাত্র কাজ পাঁড় নাৎসিদের ধরে সাজা দেওয়া। এর পূর্বে জর্মনির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেখানকার সাধারণ বিচারালয়ে এদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলতো। এদের প্রধান অসুবিধা : যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে থেকেই ঘড়েল নাৎসিরা 'খাঁটি', 'অকৃত্রিম' সরকারী পাসপোর্ট জাল নামে তৈরী করিয়ে নেয়। এবং এখন আপন বাসভূমি থেকে—জর্মনিতেই গা-ঢাকা দিয়ে বসবাস করছে। দ্বিতীয় অসুবিধা : একাধিক পরদেশী রাষ্ট্র তাদের দেশে আশ্রয়প্রাপ্ত নাৎসিদের ধরে ধরে জর্মনিকে ফেরত দেয় না।

হালে জর্মনির বেতার কেন্দ্রের প্রশ্নে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চীফ জাস্টিস বলেন, এই প্রতিষ্ঠান কবে গুটনো হবে তার স্থিরতা নেই।

যে হিটলার নিয়ে আলোচনা করি সেটা কিছু একাডেমিক ইন্‌ট্রেসট্ নয়—অর্থাৎ 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান,'[১]—সমস্যাটা শত লক্ষ্য নিরীহ মানুষের জীবনমরণ নিয়ে!

হিটলারকে আমি যে বিশেষ করে বেছে নিয়েছি তার দুটি কারণ আছে। প্রথমত তিনি এমন সব কীর্তিকর্ম করে গেছেন যা আত্তিলা চেঙ্গিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বোধ হয় রুদ্রের 'নবমাবতার' হিটলারের পর 'দশমাবতার' চীনের গোকুলে বাড়ছেন—নেফার সংবাদ থেকে আমার এই অনুমানটি হয়েছে।) এখানে সামান্য একটি উদাহরণ দি। পাঠককে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—অপরাধ নেবেন না—এটা অন্ধের অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান নয়। চেঙ্গিস-নাদির যখন কোনও শহর দখল করে পাইকারী কচু-কাটার হুকুম দিতেন তখন দেখা যেত তাঁদের সৈন্যরা তলোয়ার দিয়ে যুবা-বৃদ্ধ-শিশুর গলা কেটে কেটে শেষটায় হয়রান হয়ে গিয়ে ক্ষান্ত দিত, শুধু তাই নয়, যুদ্ধের উত্তেজনাহীন আপন-জীবনমরণ-সমস্যাবিহীন এরকম একটানা কচুকাটা কেটে কেটে তাদের এক অদ্ভুত মানসিক অবসাদ দেখা যেত, যার ফলে নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু—পিপাসারও তো একটা সীমা আছে—বর্বরও নিস্তেজ হয়ে যেত। এ তত্ত্বটি বুঝতে হিটলারের বেশী সময় লাগেনি। হিটলার, হিমলার, হাইড্রিষ...আইস্‌ম্যান[২] গোড়ার থেকে লক্ষ্য করলেন যদিও বাছাই বাছাই ব্ল্যাক-কোট পল্টনের পর-পীড়ন-উল্লাসী (স্যাডিস্ট)-দের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল বালবৃদ্ধবনিতা ইহুদিদের গুলি করে মারার—তারাও শেষ পর্যন্ত মানসিক অবসাদের স্নায়বিক জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়! তখন হিটলার হিমলার বের করলেন এক নয়া কল—যে কল চেঙ্গিস-নাদিরের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না, কারণ সে যুগে বিজ্ঞান তার বাল্যাবস্থায়। বিরাট একখানা এ্যারটাইট ঘরে ইহুদিদের ঢুকিয়ে দিয়ে ছাতের উপর থেকে ভেন্টিলেটারপনা ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট একটিন বিষে-ঠাসা গ্যাস ফেলে দেওয়া হত—দশ মিনিটেই ঘরের সব-কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা। এতে করে যে গ্যাসের টিনটা ফেলল তার কোনও মারাত্মক স্নায়বিক 'ঝামেলা' হওয়ার কথা নয়।

হালে আইস্‌ম্যান সম্বন্ধে একখানা বাঙলা বই পড়েছিলুম। তাতে লেখক বলেছেন, পাঁচ লক্ষ ইহুদির প্রাণহরণের হিটলার সম্প্রদায় দায়ী। পাঁচ লাখ নয়, হবে পঞ্চাশ লাখ। ফাইভ মিলিয়ন পাঁচ লাখ নয়। হয়তো লেখক আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন, পঞ্চাশ লাখ কি করে হয়—এত অসংখ্য লোক মেরে ফেলা অসম্ভব—পাঁচ লাখই হবে। আমরাও আশ্চর্য হই। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। একাধিক সহানুভূতিশীল এবং একাধিক

---

১ আমার শব্দগুলো ঠিক মনে নেই তবে শোপেনহাওয়ার দর্শনচর্চার বর্ণনা দিতে গিয়ে বোধ হয় মোটামুটি এই বলেছেন :

The search of a blind man in a dark night for a black cat—which is not there.

২ পাঠক ভাববেন না, পরবর্তী যুগে ইহুদিরা আর কাউকে না পেয়ে চুনোপুঁটি আইস্‌ম্যানকে বলির পাঁঠা (স্কেপ-গোট্) বানিয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করেছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে যখন আইস্‌ম্যান দক্ষিণ আমেরিকায় অজ্ঞাতবাসে তখন জর্মন এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার ইহুদি অনুচ্ছেদে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থকর্তাগণ অবশ্য যদি জানতেন যে আইস্‌ম্যান তখনও জীবিত তা হলে হয়তো নামটা উল্লেখ করার আগে আরেকবার চিন্তা করে নিতেন।

নিরপেক্ষ জন বহু গবেষণার পর যে-সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার থেকে দেখা যায়, আমেরিকার প্রকাশিত হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার, প্যারিসের হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার, লন্ডনের হিসেবে চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। অন্য আরেক হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার। নাৎসিরা যে-সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি সেগুলো ন্যুরনবের্গের মকদ্দমায় মিত্রপক্ষ পেশ করেন। সেগুলো থেকে অনায়াসে চল্লিশ লক্ষের হিসেবে পৌঁছনো যায় (আত্মহত্যা, অনাচার ও অকালরোগে যারা মরেছে তাদের হিসেব এতে বা অন্যান্য হিসেবে ধরা হয়নি)।

তাই আমি হিটলারকেই বেছে নিয়েছি। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন—এই বিরাট নরমেধ যজ্ঞ কি আবার অনুষ্ঠিত হতে পারে? কিংবা বিরাটতর?—এটম বমে যখন হাত বাড়ন্ত নয়? সে সম্ভাবনা যদি থাকে তবে আগেভাগে সময় থাকতে এমন কোনও এক কিংবা একাধিক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে কি গ্রহণ করা যায়?

চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি, আরেক হিটলার খাড়া হয়ে উঠেছেন। এবং ইনি হিটলারেরও বাড়া। হিটলার মেরেছেন প্রধানত ইহুদিদের এবং শেষের দিকে যুদ্ধে পরাজয়ের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে হন্যে হয়ে গিয়ে জর্মন জাতকে—১৩/১৪ বছরের বালকরাও বাদ যায়নি—পাঠিয়েছেন রণক্ষেত্রে, জয়ের আশা যখন সমূলে নির্মূল হয়ে গিয়েছে তখনও। আর এক চৈনিক নব হিটলার গোড়ার থেকেই পাঠাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ চীনা যুবককে লস্ অব ম্যান পাওয়ারের কোন চিন্তা বিবেচনা না করে। আমাদের অফিসাররাই বলেছেন, ওরা নেমে আসে একেবারে পিঁপড়ের মত। অফটার অল্ হাউ মেনি আর ইউ গোয়িং টু কিল্, হাউ মেনি ক্যান ইউ কিল্! আমি শুনেছি কোরিয়াতেও চীনেরা এইভাবে নেমে এসেছিল। শুনেছি প্রথম সারির হাতে বন্দুক থাকে, দ্বিতীয় সারির হাতে তাও না। শত্রুপক্ষ প্রথম সারিকে কচুকাটা (মো ডাউন—আমি শব্দার্থে 'কচুকাটা' বলছি, কারণ এদের ফ্রন্ট লাইনে পাঠানো হয়েছে, শুধু বন্দুক দিয়ে মেশিনগানের মোকাবেলা করতে, তাতে করে সামান্য একটি ঘাঁটি দখল করতে কত হাজার আপন সৈন্য অযথা মারা গেল বিলকুল তার কোনও পরওয়া না করে) করে ফেললে দ্বিতীয় সারি সেই সব বন্দুক তুলে নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কচুকাটা হয়। কোরিয়াতে নাকি একটা সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে শ'তিনেক মার্কিন সেপাই—এখানেও মেশিনগান বনাম রাইফেল—চীনাদের কচুকাটা করতে করতে শেষটায় তাদের প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে চললে কমান্ডার আদেশ দেন, ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছনে হটে যেতে। অর্থাৎ যেখানে লস্ অব ম্যানপাওয়ার সম্বন্ধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুযুধান নব-হিটলার অগ্রসর হতে চান সেখানে তাঁর উপস্থিত জয় হবে, কিন্তু আখেরে সমূলস্ত বিনশ্যতি—কিন্তু অগণিত আপনজন ও বিস্তর পরজনকে মৃত্যু, অনাহার, মহামারীর কবলে তুলে ধরে ও বহু বহু গৃহে শোকের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়ে।

হিটলারের একাধিক সেনানায়ক শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর বলেন, 'যেদিন আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলুম, লস্ অব জর্মন মেনপাওয়ার হিটলার আর হিসেবে নেন না, সেদিন থেকেই আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা আরম্ভ করি।' স্তালিনগ্রাদে পাউলুস তাই করেছিলেন—যদিও হিটলারের কড়া হুকুম ছিল কচুকাটা হয়ে মরার। স্পেব কলকারখানা, পুল ধ্বংস করতে নারাজ হয়েছিলেন ও মোডেলের মত একাধিক সেনানায়ক আত্মহত্যা বরণ করেন।

মৃত্যুর আটাশদিন পূর্বে হিটলার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। চীন যে একদিন মারমূর্তি ধারণ করবে সেটা তিনি জানতেন। তবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এ তত্ত্বটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি বলেছিলেন—From the point of view of both justice and history they (চীনারা) will have exactly the same arguments, or lack of arguments to support their invasion of the American continent as had the Europeans in the sixteenth century. Their vast and undernourished masses will confer on them the sole right that history recognizes—the right of starving people to assuage their hunger provided always that their claim is well-backed by force.

হিটলারের এই শেষ ভবিষ্যদ্বাণী। এরপর তিনি কিছু বলে থাকলে সেটা আমাদের কাছে পৌঁছয়নি।

হিটলারের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। তিনি মনে করেছিলেন, রুশ এবং মার্কিনে লড়াই লাগবে। ফলে আমেরিকা ছারখার হবে। তখন চীনারা সে দেশ দখল করবে। সেই দখল করার ভিতর অন্যায় বা অধর্ম কিছু নেই। কারণ ইতিহাস মাত্র একটি সত্য স্বীকার করে—ক্ষুধিত পঙ্গপালের মত যে জনসমাজ কাতর সে যত্রতত্র বেদখলী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করার হক্ক ধরে।

অর্থাৎ হিটলারের মতে ইতিহাস ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে না। আমরা করি। শাস্ত্রে আছে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মঙ্গল দেখা যায়, শত্রু (সপত্ন = প্রতিদ্বন্দ্বী, সপত্নী এরই স্ত্রীলিঙ্গ এবং বাঙলায় চলিত) পরাজিত হয়, কিন্তু সমূলে বিনাশ পেতে হয়।

এই তত্ত্বকথাটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত—আ পস্তেরিয়োরি—এবং অভিজ্ঞতা থেকে নীতিসূত্র বের করা ইতিহাসের কর্ম, অথবা ইতিহাসের দর্শন (ফিলজফি অব হিস্ট্রী) এটি করে।

হিটলার ফ্রান্স হল্যান্ড ইত্যাদি এমন কি রুশের বহুলাংশ জয় করতে ভদ্র, মঙ্গল দেখেছিলেন, সপত্নগণকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু বিনাশ যখন এল তখন সেটা সর্বস্ব সমূলে উৎপাটন করলো।

এর আরেকটি গৌণ অর্থ আছে। আমরা যে ছোটখাটো পাপ-অবিচার করে থাকি তার জন্য এই পৃথিবীতেই অল্পস্বল্প সাজা পাই—কারণ আমরা হিটলার কিংবা লাই সায়েবের মত ডাঙর প্রাণী নই। আমাদের বিনাশ সমূলে হয় না। কিন্তু ওদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আদ্যন্ত গৌরবময় নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুধার তাড়নায় বা অন্য কোনও কারণেই স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে পররাজ্য আক্রমণ করিনি।

বড়া হিটলার, ছোটা হিটলারের ডরাবার কারণ নেই।

কিন্তু বারুদ শুকনো রাখতে হবে।

শাঁসালো জর্মনি

এ রকম ধন-দৌলতের ছড়াছড়ি আমি এ-জীবনে কখনও দেখিনি।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে ইয়োরোপ যাওয়া-আসা করছি। সব-কিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে, ধনদৌলত এবং তার বণ্টন-ব্যবস্থা সুইটজারল্যান্ডেই সব চেয়ে ভালো। ১৯২৯/৩০ সালের কথাই ধরুন। ইংলন্ডের তখন প্রচুর কলনি, বিস্তর দৌলত বিদেশ থেকে আসছে। সুইটজারল্যান্ডের কলনি নেই; সে পয়সা কামায় মালপত্র রপ্তানি করে। কিন্তু ইংলন্ড বেশী ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার সে ধনের অনেকখানি চলে যায় গুটিকয়েক পরিবারের হাতে, কিন্তু সুইটজারল্যান্ডে সে ধনের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় অনেক বেশী ধর্মানুমোদিতরূপে। সে-দেশেও লক্ষপতি কোটিপতি আছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ ধনের হিস্যা পায় আপামর জনসাধারণ।

ফ্রান্স খুব ধনী দেশ নয়। কিন্তু সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত দেশ।

আর জর্মনি যেন জুয়াড়ীর দেশ। কখনও তার সামনে হুদোহুদো টাকা আর কখনও সে লাটে উঠি-উঠি করছে। কখনও রেস্তোরাঁকাবারে গমগম করছে, কখনও রাস্তায় রাস্তায় মেয়ে-মদ্দ কাজের সন্ধানে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমনই যখন তার দুর্দিন প্রায় চরমে, তখন, ১৯২৯ সালে, প্রথম আমি জর্মনি যাই। তার দুরবস্থা চোখে পড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করলুম যে, এরা একদিন রীতিমত ধনী ছিল। ঘরের আসবাবপত্র সেই প্রাচীন দিনের খানদানী মজবুত চালে তৈরী এবং রুচিসঙ্গত। ওয়ালপেপার পর্দা, টেবলক্লথ পুরানো হয়ে এসেছে বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় এগুলো দামী এবং একদা এরা বিদেশীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। ১৯২৯-এ কিন্তু রিপুকর্মের পালা।

আর ১৯৬২তে দেখি—দাঁড়ান একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বাঙলায় যখন বলি, 'অমুক কাকের ছানা কিনেছে'—তার অর্থ সে দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। জর্মনে বলা হয়, সে জানালা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।

এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সম্বন্ধে নানা রকমের আহাম্মুখের কেচ্ছা শুনতে পাওয়া যায়। জর্মন ভাষাভাষী দেশগুলোতে আহাম্মুখের রাজার নাম পল্‌ডি।

ল্যান্ডলেডির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পল্‌ডি দেখে এক দুদিনের চ্যাংড়া ছোকরা জব্বর দামী একখানা স্পোর্টস মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে। পল্‌ডি শুধোলে, 'কে ও?' ল্যান্ডলেডি বললে, 'রেখে দিন ওর কথা। বাপ মরেছে। ছোকরা দেদার টাকা পেয়েছে। এখন জানলা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।'

পল্‌ডি বেজায় উত্তেজিত হয়ে বার বার শুধোয়, 'কোথায় থাকে সে? ঠিকানা কি?'

এবারে জর্মন গিয়ে দেখি, সবাই জানলা দিয়ে টাকা ছুঁড়ছে। কুড়োবার লোক নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট, জর্মনির কুত্রাচ কোনো রেল স্টেশনে আর পোর্টার, মুটে নামক নিরতিশয় প্রয়োজনীয় প্রাণীটি নেই। আমারই চোখের সামনে আমারই আড়াই-মণী ইয়া লাস ভাতিজা নামল এক ঢাউস সুটকেস নিয়ে। মুটে নদারদ্। ওপারে যেতে হবে

ওভারব্রিজের উপর দিয়ে। বাবাজী সুটকেস টানছে আর বলছে, 'দুটো সুটকেসে ভাগাভাগি করে নিয়ে এলে তবু না হয় ব্যালান্স্‌ড হয়ে চলতে পারতুম।' বাবাজী ওপারে যখন পৌঁছলেন তখন পিঠের ঘাম কোটের বাইরে চলে এসেছে—হামবুর্গে সে সন্ধ্যায় টেম্পারেচার ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। ধকল কাটাতে বাবাজীকে খেতে হয়েছিল তিন লিটার বিয়ার। অবশ্য জর্মনিতে বিয়ার সস্তা।

আর দাসী-চাকরাণী? তবে শুনুন।

সবসুদ্ধ আটটি পরিবারে ডিনার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ খেয়েছি—কারও বাড়িতে দাসী দূরে থাক, একটি হেলপিং হ্যান্ডও দেখতে পাইনি। কেন নেই, সেই প্রশ্ন শুধোলে পর আমার অধ্যাপকের বিধবা বললেন, মেড্? তা রাখা যায় বই কি। চার শ পাঁচ শ টাকা মাইনে। তাঁকে একখানা ঘর দিতে হবে—রেডিয়োটা অবশ্য তিনি নিজেই আনবেন। সিনেমায় ক'দিন যাবেন, ছুটি ক'দিন দিতেই হবে সেটাও আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া হবে, পাকাপোক্ত। তারপর তিনি নেমে এলেন ঘরের কাজে—নখে ঝাঁ-চকচকে নেলপালিশ, এইমাত্র লাগানো হয়েছে, এখনও পেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। তাই কাজ করেন অতি সন্তর্পণে, পাছে বার্নিশে জখম লাগে। খানিকক্ষণ বাদে দেখবে তিনি নেই। বীবী আপন কামরায় গেছেন সিগারেট খেতে। সেটা দিনে ক'বার হয়, না হয়, সে তোমার কপাল! তার উপর মোটা দড় কাজ তিনি করবেন না—যেমন মনে করো জানালার শার্সিগুলো জল দিয়ে ধুয়ে পোঁছা। তার জন্যে সপ্তাহে একবার করে তোমাকে অন্য লোক আনতে হবে। কি হবে অত সব বয়নাক্কার ভিতর গিয়ে!

* * *

ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধোলুম, 'ওটা কি হে?' দেখি হামবুর্গের মত শহরে—যেখানে কিনা প্রতি ইঞ্চি জমি মহামূল্যবান—সেখানে এক জায়গায় হাজারখানেক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বললে, 'সেকেন্ড-হ্যান্ড কার্। একটা কিনবেন? মাত্র হাজার থেকে আরম্ভ। গত বছর, জোর আগের বছরের মডেল। টিপ্‌টিপ্ কন্ডিশন। ট্যাঙ্ক পেট্রলে ভর্তি। দুটি কথা কইবেন সাঁ করে তেড়ে হেঁকে বেরিয়ে যাবেন।'

বলতে না বলতে সে ঢুকে গেছে ঐ মোটরের মেলায়। ওর কথা ঠিক। গাড়িগুলো যেন কাল-পরশু কেনা। আমি শুধোলুম, 'তা গাড়িগুলো এই খোলা-মেলায় জলঝড় খাচ্ছে?'

বললে, 'ঐ তো, স্যর, রগড়। হামবুর্গে গাড়ি পাবেন সহজে—গারাজ পাবেন খুব যদি কপালের জোর থাকে।' তারপর শুধোলে, 'আপনার দেশে হাল কি রকম?'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশের অনেক লোক পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে।' —পূর্ব-জন্মটা কি চীজ্ সেটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হল। শেষ করলুম এই বলে, 'সেই পূর্ব-জন্মে যদি অশেষ পুণ্য করে থাকো, তবে এ-জন্মে তোমার কপালে মোটর থাকলে থাকতেও পারে। মোটরই যখন নেই তখন গারাজের তো কথাই ওঠে না।'

পরের ঘটনা, কিন্তু এই সুবাদে বলে ফেলি। এর কিছুদিন পর গিয়েছি সেই বন্ শহরে যেখানে ছাত্রজীবনের কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, সামনে অগুনতি মোটর। আমার সতীর্থ—এখন নামজাদা প্লিস্টার—সঙ্গে ছিল। শুধোলুম, পরবটরব আছে নাকি রে? হ্যার আডেনাওয়ার এলেন নাকি? তিনি না কাছে-

পিঠে কোথায় যেন থাকেন?

শুধোল, 'কেন?'

'ঐ যে অত মটোর গাড়ি।'

'সে তো স্টুডেন্টদের।'

বলে কি! ত্রিশ-বত্রিশ বছর পূর্বে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ'তিনেক অধ্যাপকদের ক'জনার মোটর গাড়ি আছে আমরা আঙুলে বলতে পারতুম। আর আজ!

হামবুর্গে ফিরে যাই।

আমার এক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন আমার চেয়ে বছর পনেরো বড়। তিনি যুদ্ধের পর গত হন। উঠেছিলুম তাঁরই বিধবার বাড়িতে। তাঁরই এক মেয়ে কথায় কথায় বললে, 'জানেন, আজকাল এ দেশে অনেক ছেলেমেয়ে স্টুডেন্ট থাকাকালীনই বিয়ে করে ফেলে। কর্তাগিন্নী চললেন মোটর হাঁকিয়ে কলেজে—যেমন মনে করুন মেডিকেল কলেজ। পিছনের সীটে একটি বাচ্চা, কোলে আরেকটি। কলেজে পৌঁছে ছোটটি রাখলেন ধাইয়ের জিম্মায়, অর্থাৎ ক্রেশে। বড়টা গেল বাগানে খেলতে।'

ওদের খেলার জন্য নাকি স্পেশাল বাগান আছে। সত্যি আছে কিনা সেটা আমি চেক্ আপ্ করার সুযোগ পাইনি। তবে এ-কথা সত্য, এখন বেশ-কিছু ছেলেমেয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই বিয়ে করে।

বললুম, 'আগে তো এরকম ছিল না, এখনই বা হল কি করে?'

বললে, 'আগে বাপ-মায়ের এত টাকা ছিল কোথায় যে ছেলেকে বলবে ''তুই বিয়ে কর্। নাতি পোষার পয়সা আমার আছে।'' আমিও বলি, সেই যখন বিয়ে করবেই একদিন তখন শুকিয়ে শুকিয়ে পুঁইডাঁটাটি হয়ে যাবার কি প্রয়োজন?'

আমার মনে পড়ল এক বিয়েতে স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী একটা জোয়ান ছোকরাকে বললেন, 'দেখ দিকিনি, ছেলেটা কি রকম বুদ্ধিমানের মত বিয়ে করে ফেলল। তোরা যে পিত্তি না চটিয়ে খেতে পারিস্ নে।'

কিন্তু এস্থলে বলে রাখা ভালো, জর্মনিতে কোনও ছেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাপের সঙ্গে থাকে না—ভিন্ন বাসা বাঁধে।

অতএব বাপ দুটো সংসার পুষবে। এস্তের টাকা না থাকলে পারে কেডা?

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবে কি এই ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহে আমরা পৌঁচেছিলুম এই পদ্ধতিতেই—ধাপে ধাপে! কারণ জানি, অতি প্রাচীন যুগে এদেশে বাল্যবিবাহ ছিল না। তারপর বোধ হয় হঠাৎ একদিন ধনদৌলত বেড়ে যায়—আজ যে-রকম জর্মনিতে। তখন আমরাও ছেলেছোকরাদের বিয়ে দিতে লাগলুম, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার পূর্বেই। আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে করে গৌরীদান!

এ পৃথিবীতে নূতন কিছুই নেই।

দশের মুখ খুদার তবল

ইংরেজ খায় জব্বর একখানা ব্রেকফাস্ট। শুধু তাই নয়, অনেক ইংরেজ ঘুম থেকে উঠে বেড-টীর সঙ্গে খায় একটি কলা কিংবা আপেল এবং একখানা বিস্কুট।

তারপর ব্রেকফাস্ট। দীর্ঘ সে ভোজন; আমি সংক্ষেপে সারি। যদি সে ইংরেজ ঈষৎ মার্কিন-ঘেঁষা হয়, তবে সে আরম্ভ করবে গ্রেপ ফ্রুট দিয়ে। তারপর খাবে পরিজ কিংবা কর্নফ্লেক, মেশাবে এক জগ্ দুধের সঙ্গে, কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে দেবে চাকতি-চাকতি কলা এবং চিনি। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে তবলা বাদ্য, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে টোস্ট-মাখন খাওয়া। শেষ সময় পর্যন্ত এই তবলা বাদ্য বন্ধ হবে না। তারপর ভোজন-রসিক খাবেন কিপারস (মাছ) ভাজা—অনেকটা লোনা ইলিশের ফালির মত—তারপর খাবেন এ্যাব্বড়া এ্যাব্বড়া দুটো আণ্ডা ফ্রাই (আকারে এ-দেশী চারটে ডিমের সাইজ) তৎসহযোগে বেকন—আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, টোস্ট-মাখনের তবলা কখনও বন্ধ হবে না—এবং এর পর টেনে আনবে মার্মলেডের বোতল। খাবে নিদেন আরও খানচারেক টোস্ট ঐ মার্মলেড সহ। এবং চা কিংবা কফি তো আছেই। বাপ্‌স!

ফরাসী-জর্মন ব্রেকফাস্টে খায় যৎসামান্য রুটি মাখন আর কফি। খানদানী ফরাসী মাখনও খায় না—বলে, ফরাসী রুটির যে আপন উত্তম সোয়াদ আছে সেটা মাখনের স্পর্শে বরবাদ হয়ে যায়।

লাঞ্চের বেলা ইংরেজ খায় যৎকিঞ্চিৎ। ফরাসী-জর্মন করে গুরুভোজন।

রাত্রিবেলা ইংরেজ করে গুরুভোজন। জর্মন খায় অত্যল্প। রুটির সঙ্গে সসিজ, কিংবা চীজ এবং ফিকে পানসে চা। যা সব খাবে সাকুল্যে মালই ঠাণ্ডা, শুধু চা-টাই গরম।

এবারে গিয়ে দেখি হইহই রইহই কাণ্ড ডিনারের বেলায়ও। অবশ্য সবকিছুই ঠাণ্ডা খাওয়ার ঐতিহ্য সে এখনো ছাড়েনি।

এবারে দেখি পাঁচ রকমের সসিজ, তিন রকমের চীজ এবং ট্যুবের খাদ্যের ছড়াছড়ি। আমরা যে রকম ট্যুব থেকে টুথপেস্ট বের করি, এরা তেমনি বের করতে থাকে কোনও ট্যুব থেকে মাস্টার্ড, কোনওটা থেকে টমাটো সস, কোনওটা থেকে মাছের পেস্ট। শুনেছি, দেখিনি, মাংসের পেস্ট ভর্তি ট্যুবও হয়। কোনও জিনিসের অভাব নেই। দামের পরোয়া করো না, যত পার খাও।

রাস্তায়ও দেখি, আগে যে রাস্তায় ছিল একখানা খাদ্যদ্রব্যের দোকান (লেবেন্‌স্ মিটেল গেশেফ্‌ট্—কলোনিয়াল ভারেন) এখন সেখানে চারখানা। কারও বাড়িতে যাওয়া মাত্রই সে কোনও কথা না বলেই বের করে উত্তম রাইন মজেল (হক্ রেনিশ) তাজা বিয়ার —ইস্তেক স্কচ্ হুইস্কি, মার্কিন সিগারেট।

বড় আনন্দ হল এসব দেখে—খাক না বেচারীরা প্রাণভরে। এই সে সেভন ডেজ ওয়াণ্ডার—তিনদিনের ভেল্কিবাজি—এ যে কখন বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। অতএব খাও-দাও ফুর্তি করো। হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়।

এ তত্ত্বটি জর্মনরাও বিলক্ষণ জানে।

হামবুর্গে আমি যে পাড়ায় থাকতুম সেটা শহরতলীতে। অন্যত্র যেমন, এখানেও পাড়ার 'পাব'টি ঐ অঞ্চলের সামাজিক কেন্দ্রভূমি। দেশের লোকে কি ভাবে, কি বলে, পাবে না গিয়ে জানার উপায় নেই। গুণীজ্ঞানীরা কি ভাবেন, সেটা জানা যায় অনায়াসে—বই, খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু পাবের গাহকরা গুণী-জ্ঞানী নয়; তারা বই লেখে না, লেকচার ঝাড়ে না। অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড।

এখানে কায়দাম ফিক একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। পাশের লোকটির সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিলুম।

বললুম, 'যুদ্ধের পর ঠিক এই যে প্রথম এলুম তা নয়। বছর দুই পূর্বে এসেছিলুম মাত্র দুদিনের তরে। কোনও একটা পাবে যাবার ফুরসৎ পর্যন্ত হয় নি। এবারে তার শোধ নেব।'

শুধোল, 'কিরকম লাগছে পরিবর্তনটা?'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য! এত ধন-দৌলত যে কোনও জাতের হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

লোকটি হেসে বললে, 'তা তোমরাও তো এককালে খুব ধনী ছিলে। সেদিন আমি খবরের কাগজে একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখছিলুম তোমাদের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মার্কিন টুরিস্ট তার স্ত্রীকে বলছে, ফ্যান্সি! এসব জিনিস তারা এমেরিকান "এড্" ছাড়াই তৈরী করেছিল।'

আমি বললুম, 'রাজরাজড়া ধনী ছিলেন নিশ্চয়ই—আজ যেরকম সউদী আরব, কুয়েৎ, বাহরেনে শেখরা জলের মত টাকা ওড়ায়—কিন্তু আর পাঁচজনের সচ্ছলতা কি রকম ছিল অতখানি আমি জানি নে।'

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। দেখি এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বিয়ারের গেলাস, পরনে মোটামুটি ভালো স্যুটই, তবে ফিটফাট বলা চলে না। ফিসফিস করে যেভাবে কথা আরম্ভ করলে তাতে মনে হল, এখনও বুঝি নাৎসি যুগের গেস্তাপো গোয়েন্দার বিভীষিকা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নাঃ, আমারই ভুল। হামবুর্গে যখন বেধড়ক বোমা ফেলে তখন কি জানি কি করে তার গলার সুর বদলে যায়। এ তত্ত্বটা জানা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ফিসফিসিনিতে বলা কথাগুলো কেমন যেন উচাটন মন্ত্রে উচ্চারিত নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হচ্ছিল।

ডান হাত তুলে ধরে গেলাস দিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে শুধোলে, 'কি দেখছ?'

আমি বললুম, 'এন্তের মোটর গাড়ি।'

আবার সেই ফিসফিস। বললে, 'এদের কজন সত্যি সত্যি মোটর পুষতে পারে জানো? শতেকে গোটেক। তোমার দেশের কথা বলছিলে না, রাজরাজড়ারা ধনী ছিল বাদবাকিদের কথা বলতে পারছো না। এখানেও তাই। এই যে মোটর দাবড়ে বেড়াচ্ছেন বাবুরা, এঁদের ক'জন মোটরের পুরো দাম শোধ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি, সব ইন্স্টল্মেন্টের ব্যাপার। জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনসে—দে আর লিভিং বিঅন্ড দেয়ার মীনস্—আনে সিকি, ওড়ায় টাকা।'

আমি বললুম, 'সেকথা বললে চলবে কেন? কট্টর অবজেকটিভ বিচারেও বলা যায়, তোমাদের ধনদৌলত বিস্তর বেড়েছে।'

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কে বলেছে ধনদৌলত বাড়েনি। বেড়েছে নিশ্চয়ই। আলবৎ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, যা বেড়েছে তার তুলনায় খরচ করছে অনেক বেশী। এবং দ্বিতীয় কথা, এ ধনদৌলতের পাকা ভিত নেই। ১৯১২-১৯১৪-এ আমাদের যে ধনদৌলত ছিল তার ছিল পাকা বুনিয়াদ।'

আমি বললুম, 'তাতেই বা কি ফায়দা হল? ইনফ্লেশন এসে সে পাকা বুনিয়াদও তো ঝুরঝুরে করে দিয়ে চলে গেল।'

বুড়ো শুধু মাথা নাড়ে আর বার বার বলে, 'জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে, ঔী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

বুড়ো আমাদের ছেড়ে বারের দিকে এগোলো খালি গেলাস পূর্ণ করার জন্য।

আমি যার সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করেছিলুম, সে এতক্ষণ হাঁ-না কিছুই বলে নি। এবারে নিজের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়োর কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে তুমি যে এই ইনফ্লেশনের কথা তুললে না, সেইটেই হচ্ছে আসল ভয়। ইনফ্লেশনের বন্যা এসে একদিন সব-কিছু ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায়, তারই ভয়ে সবাই টাকা খরচ করছে দু'হাতে। এমন কি যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি সেটাও ওড়াচ্ছে।'

আমি বললুম, 'যে কড়ি এখনও কামানো হয়নি, সেটা ওড়াবে কি করে?' তারপর বললুম, 'ওঃ! বুঝেছি! ধার করে!'

বললে, 'ঠিক ধার করে নয়। কারণ ধার করলে সে পয়সা একদিন না একদিন ফেরত দিতে হয়। না দিলে পাওনাদার বাড়ি ক্রোক করে। কিন্তু ইন্‌স্টল্‌মেন্টের কেনা জিনিসে সে ভয়ও নেই। বড় জোর যে জিনিসটা কিনেছে সেটা ফেরত নিয়ে যাবে।'

ইতিমধ্যেই সেই ফিসফিস-গলা বুড়ো ফিরে এসেছে। বললে, 'টাকা ধার পর্যন্ত নেওয়া যায়। আমি রোক্কা টাকার কথা বলছি, ইন্‌স্টল্‌মেন্টের কথা হচ্ছে না। টাকা শোধ না দিলে যদি ক্রেক করতে আসে, তবে লাটে তুলবে কি? বাড়ির তাবৎ জিনিসই তো ইন্‌স্টল্‌মেন্টে কেনা। সেগুলো তো ক্রোক করা যায় না।'

আমি বুড়োকে বললুম, 'আপনি সব-কিছু বড্ড বেশী কালো চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন।'

বুড়ো বললে, 'আমি কি একা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী আডেনাওয়ারও তো ঐ পরশু দিন দেশের লোককে সাবধান করে দিয়েছেন, "এ সুদিন বেশীদিন থাকবে না। হুঁশিয়ার, সাবধান!" পড়োনি কাগজে?'

আমি বললুম, 'অতশত বুঝি নে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবাই খাসা ফুর্তিতে আছে। ঐটেই হল বড় কথা।' তারপর যার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম, তাকে শুধোলুম, 'তোমাদের শহরের মধ্যিখানে যে হাজার খানেক সেকেন্ড-হ্যান্ড কার ফর সেল্ দেখলুম, সেগুলো কি ইন্‌স্টল্‌মেন্টে কেনা ছিল, আর কিস্তি খেলাপ করেছে বলে বাজেয়াপ্ত হয়ে ঐখানে গিয়ে পৌঁছেছে?'

বললে, 'নিশ্চয়ই তার একটা বড় অংশ।' বুড়ো আবার মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, 'তোমাকে বলিনি, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে! কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা!'

* * *

সুবুদ্ধিমান পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অর্থনীতি জানি নে, এসব মতামতের কতখানি ধোপে টেকে, বলতে পারবো না। আমি যা শুনেছি, সেইটেই রিপোর্ট করলুম। এবং আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এসব 'পাবে' শুম্‌পেটার, কেইনস্ শাখ্‌ট্ আসেন না। আসে যেদো মেদো। কিন্তু ভুললে চলবে না, কথায় বলে, দশের মুখ খুদার তবল।

হাসির অ-আ, ক-খ

॥ এক ॥

হাসির অ-আ, ক-খ।

হাসির 'চুটকিলা' (উইট্, হিউমার এনেকডোট) নিয়ে যে-সব সঙ্কলন বেরোয়, সেগুলো বেশীরভাগ আপনার আমার মত সাধারণ জনই করে থাকে। অবশ্য এদের নির্মাতারা, অর্থাৎ যারা সব উইট্ বা রসিকতা প্রথম পাঁচজনকে হাসিয়ে কিংবা একজনকে চটিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ওয়াইল্‌ডের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক, কিংবা হুইল্‌লারের মত চিত্রকর নন। আবার এ কথাও অতি সত্য যে, বেশীরভাগ চুটকিলাই অতি সাধারণ জনই করে থাকে—সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, এমন কি সমাজেও তাঁরা বিখ্যাত নন। পাড়ার চায়ের দোকানে যে-লোক রসিয়ে গল্প বলে, কারও কথার উত্তরে হাসির জবাব দিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে মারে, সে-লোকটি দোকানের বাইরে হয়তো কোনও কিছুতেই সার্থক হয়নি—হয়তো বা পাড়ার মুরুব্বী তাকে ''বিশ্ব-বকাটে'' পদবী দিয়ে বসে আছেন, কারণ চায়ের দোকান থেকে ছেলের মারফৎ থ্রু গৃহিণী তার কয়েকটি রসিকতা তাঁর কানে এসে পৌঁছেছে, এবং হয়তো বা তাঁরই মত দু-একটি মুরুব্বীকে নিয়েই।

অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ চুটকিলা নির্মাণ করেছে এরাই। লোকমুখে ঘুরে ফিরে এ-দেশ ও-দেশ হয়ে হয়ে বিশ্বময় এরা ছড়িয়ে পড়ে। বরঞ্চ ওরই মত যে লোকসঙ্গীত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরও নির্মাতার সন্ধান কোনও কোনও স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের বৃহৎ অংশের মূল অনুসন্ধান কেউ করে না, করে কোনও লাভও নেই।

লোকসঙ্গীত, রূপকথার মত এই সব হাসির চুটকিলার সৃষ্টিকর্তা প্রধানত জনগণ। অবশ্য গুণী, জ্ঞানী, রসিক সাহিত্যিকরাও এতে আপন আপন মৃদুহাস্য, অট্টাহাস্য, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিয়েছেন।

তা ছাড়া এমন সব ঘটনাও ঘটে, যা দেখে বা শুনে মনে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যারা ঘটনাটা দেখলো বা শুনলো, তাদের কারও একজনের সামান্যতম রসবোধ থাকলে এবং

সে ঘটনাটি 'ব্রডকাস্ট' করলেই হল। যেমন আইনস্টাইনের গৃহিণী ছিলেন অতিশয় সরলা নারী।[১] কী-এক পরব উপলক্ষে, স্বামী অসুস্থ বলে, তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে একা গেছেন আমেরিকার বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে। সেখানে দৈত্য-দানবের মত ভীষণদর্শন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি। বিমূঢ়ের মত এটা-সেটা দেখতে দেখতে একজন কর্তাব্যক্তিকে তিনি শুধোলেন, 'এগুলো—এগুলো দিয়ে কি হয়?' কর্তাব্যক্তি বিগলিত হয়ে সুমধুর মৃদুহাস্য হেসে মুরুব্বীর সুরে বললেন, 'কেন ম্যাডাম, এই সব যন্ত্রপাতি দিয়েই তো আপনার স্বনামধন্য স্বামীর থিয়োরি সব সপ্রমাণ করা হয়।' ম্যাডাম তো 'দশ হাত বরফপানিমে'। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু আমার স্বামী তো এসব টোকেন পুরনো খামের উল্টো দিকে।'

এ গল্প বানানোর ভিতর কারও কোনও কেরদানী নেই।

এই রকম দুনিয়ার যত রকমের হাস্যরসের উপাদান থাকতে পারে, তারই একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন জর্মনির এক উত্তম সাহিত্যিক। পূর্বেই বলেছি, সাধারণত এরকম সঙ্কলন করে থাকেন আপনার আমার মত সাধারণ জন, তাই সঙ্কলনগুলো অসাধারণ হয় না। এটা অবশ্য একটা paradox. পূর্বে যখন বলেছি, পৃথিবীর বেশীর ভাগ চুটকিলাই নির্মাণ করে সাধারণ জন, তখন তার সঙ্কলন করবে সাধারণ জন—এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু এইখানেই প্যারাডক্স্। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে।'' এক ইরানী কবিও বলেছেন, 'যে-শুক্তি মুক্তার জন্ম দিয়েছে আপন প্রাণরস দিয়ে, সে-শুক্তিকে তো মুক্তার মূল্য বিচারের সময় ডাকা হয় না—ডাকা হয় জহুরীকে।' কিংবা বলতে পারি, নেপোলিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী যে তাঁর জননীই লিখবেন, এমন কোনও কথা নয়।

বর্তমান পুস্তকের নাম, 'আ বে ৎসে ডেস লাখেনসা',—হাসির অ-আ ক-খ (এক্স ওয়াই জেড—যদি কখনও বেরোয়, তবে 'দেশে'র পাঠককে জানাব।) লেখকের নাম জিগিসমুন্ট ফন্ রাডেকি। ল্যাট্ভিয়ার রাজধানী রিগা শহরে এঁর জন্ম ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। পড়াশুনা করেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে, পরে এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে জর্মনিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা কাটান তুর্কিস্থানে এঞ্জিনীয়ার রূপেই। সাহিত্য-রস কিন্তু বরাবর ছিল। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিনে আসার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা চিত্রকর এবং সাহিত্যকররূপে। উত্তম ইংরেজী জানেন। জি. কে. চেস্টারটনের ইনি পরম ভক্ত এবং হিলের বেলকের উৎকৃষ্ট জর্মন অনুবাদ তিনি করেছেন—যদিও জর্মনিতে অনুবাদকরূপে তাঁর সর্বোত্তম খ্যাতি রুশ ঔপন্যাসিক গগলের বই জর্মনে তর্জমা করার ফলে।

এঁর জীবনীকার বলেন, রাডেকির বীণায় প্রচুর কোমল এবং অতিকোমল। তার প্রতিটি ধ্বনিতে তত্ত্ব-দার্শনিকের ক্ষীণ মধুর স্মিতহাস্য।।

---

১ এঁর সরল হৃদয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও আমাদের ছেলেবেলায় কিছু কিছু শুনিয়েছেন। বারান্তরে সে-কথা হবে।

জর্মন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্‌স্ নখাগ্রদর্পণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এঁর সঙ্কলন হাসির 'অ-আ, ক-খ' সত্যিই যেন হাস্যরসের কনসার্ট। ব্যালাকত্তাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগি পিয়ানো কোনও যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দু'একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মুশকিল। আমার বিশ্বাস গোটা সঙ্কলনটি আপনি যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনও লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। আপনার সঙ্কলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সঙ্কলনের সঙ্কলন বিপদসঙ্কুল। তবু চেষ্টা দিতে ক্ষতি নেই এবং গুণীরা যখন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিসমিল্লা করি :

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনও কোনও মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেন্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই, জলও কম, আর খাবার সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কর্নড্ বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নূতন অফিসার। রান্নাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন—শুঁকলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম...আজ ডিনারে তা হলে কর্নড্ বীফ!'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একটি রা-ও কাড়লে না। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন্ এক কক্‌নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ মরি! ওয়াটসন!'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'এ কথা বলার জন্যে তো ভূতের দরকার হয় না হুজুর।' আস্ত না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাফ-গবেট ছিলেন, সেটা হোমস্‌পিয়াসীদের জানা। এটি প্রধানত তাঁদের জন্যই। আসছে বারে নিবেদন করব হরেকরকম্বা। পূর্বোক্ত আইনস্টাইন-গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সঙ্কলন থেকেই নেওয়া।

॥ দুই ॥

সিগিসমুন্ট্ ফন রাডেকি তাঁর হাস্যরস সঙ্কলনের পুস্তিকায় একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা দিয়েছেন। সে অবতরণিকায় আর পাঁচজন মোকা-বেমোকা-উদাসীন জর্মনের মত তিনি পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। জর্মনদের যে পাণ্ডিত্য ফলাবার ব্যামোটা আছে সে-বিষয়ে স্বয়ং জর্মনরাই সচেতন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা যেরকম হক্ক না-হক্ক গল্প বানাই—মারোয়াড়ীদের পয়সার লোভ, পূর্ববঙ্গবাসীদের খামোখা চটে যাওয়া নিয়ে—ইয়োরোপীয়েরাও সে রকম করে থাকে। গ্যোরিঙ যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার জন্য সেখানকার হাজতে, তখন তিনি মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ কেলিকে নিম্নের চুটকিলাটি বলেন :

একজন ইংরেজ—একটা আস্ত ইডিয়ট। দুজন ইংরেজ একত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লাবের পত্তন। তিনজন হলে নূতন এক সাম্রাজ্য জয়।

একজন ইতালিয়ান—উত্তম গাইয়ে। দুজন হলে ডুয়েট। তিনজন হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন। (এটা যে কি রকম খাঁটি কথা সেটা গত বিশ্বযুদ্ধে বার বার সপ্রমাণ হয়েছে।)

একজন জর্মন, পণ্ডিত।[১] দুজন জর্মন—একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে বসবে। তিনজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা।

অন্যান্য জাতও গ্যোরিঙের গল্পে স্থান পেয়েছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে উপস্থিত আমাদের প্রয়োজন নেই। তা সে যাই হোক, রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় অহেতুক পাণ্ডিত্য ফলাননি।

'ইহ সংসারে আমাদের কত জিনিসেরই না অভাব, এবং তাই নিয়ে একমাত্র মানুষই রোদন করে কিন্তু ঐ অভাবের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে। মানুষের যে দেহাতীত সত্তা আছে সে-ই আমাদের দেহ থেকে অশ্রুজল ঝরায় এবং সে-ই আমাদের দেহের দু পাশ এবং ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসায়। কিন্তু এই পৃথিবীতে সে জিনিস কি, যা হাস্যকৌতুক রসের সৃষ্টি করে?'

প্রশ্ন শুধিয়ে উত্তরে রাডেকিই বলছেন, 'সব, সব কিছুই...। যেমন সব কিছুই কাঁদাতেও পারে। তারা, ফুল, পশুপক্ষী এদের নিজেদের সত্তা দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ামাত্রই এগুলো কৌতুকরসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—কারণ এই মানুষই বিশ্ব-সংসারের হাসি এবং কান্নার কেন্দ্র। কারণ এই মানুষ নির্মিত হয়েছে অর্ধেক পশু থেকে এবং অর্ধেক চৈতন্য দিয়ে। এই যে কাদামাটি আর

---

১ রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'জার্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই।' এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'জর্মন' লিখতেন—যদিও এখানে 'জার্মান' লিখেছেন। হালে জনৈক পত্রলেখক 'জর্মন' লেখার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেছেন বলে এ-কথাটি বলতে হল। 'জর্মন' লেখার অন্য কারণও অবশ্য আছে।

জর্মন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্স্ নখাগ্রদর্পণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এঁর সঙ্কলন হাসির 'অ-আ, ক-খ' সত্যিই যেন হাস্যরসের কনসার্ট। ব্যালাকত্তাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগি পিয়ানো কোনও যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দু'একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মুশকিল। আমার বিশ্বাস গোটা সঙ্কলনটি আপনি যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনও লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। আপনার সঙ্কলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সঙ্কলনের সঙ্কলন বিপদসঙ্কুল। তবু চেষ্টা দিতে ক্ষতি নেই এবং গুণীরা যখন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিসমিল্লা করি :

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনও কোনও মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেন্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই, জলও কম, আর খাবার সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কর্নড্ বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নূতন অফিসার। রান্নাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন—শুঁকলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম...আজ ডিনারে তা হলে কর্নড্ বীফ!'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একটি রা-ও কাড়লে না। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন্ এক কক্নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ মরি! ওয়াটসন!'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'এ কথা বলার জন্যে তো ভূতের দরকার হয় না হুজুর।' আস্ত না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাফ-গবেট ছিলেন, সেটা হোমস্পিয়াসীদের জানা। এটি প্রধানত তাঁদের জন্যই। আসছে বারে নিবেদন করব হরেকরকম্বা। পূর্বোক্ত আইনস্টাইন-গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সঙ্কলন থেকেই নেওয়া।

॥ দুই ॥

সিগিসমুন্ট্ ফন রাডেকি তাঁর হাস্যরস সঙ্কলনের পুস্তিকায় একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা দিয়েছেন। সে অবতরণিকায় আর পাঁচজন মোকা-বেমোকা-উদাসীন জর্মনের মত তিনি পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। জর্মনদের যে পাণ্ডিত্য ফলাবার ব্যামোটা আছে সে-বিষয়ে স্বয়ং জর্মনরাই সচেতন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা যেরকম হক্ক না-হক্ক গল্প বানাই—মারোয়াড়ীদের পয়সার লোভ, পূর্ববঙ্গবাসীদের খামোখা চটে যাওয়া নিয়ে—ইয়োরোপীয়েরাও সে রকম করে থাকে। গ্যোরিঙ যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার জন্য সেখানকার হাজতে, তখন তিনি মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ কেলিকে নিম্নের চুটকিলাটি বলেন :

একজন ইংরেজ—একটা আস্ত ইডিয়ট। দুজন ইংরেজ একত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লাবের পত্তন। তিনজন হলে নূতন এক সাম্রাজ্য জয়।

একজন ইতালিয়ান—উত্তম গাইয়ে। দুজন হলে ডুয়েট। তিনজন হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন। (এটা যে কি রকম খাঁটি কথা সেটা গত বিশ্বযুদ্ধে বার বার সপ্রমাণ হয়েছে।)

একজন জর্মন, পণ্ডিত।[১] দুজন জর্মন—একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে বসবে। তিনজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা।

অন্যান্য জাতও গ্যোরিঙের গল্পে স্থান পেয়েছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে উপস্থিত আমাদের প্রয়োজন নেই। তা সে যাই হোক, রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় অহেতুক পাণ্ডিত্য ফলাননি।

'ইহ সংসারে আমাদের কত জিনিসেরই না অভাব, এবং তাই নিয়ে একমাত্র মানুষই রোদন করে কিন্তু ঐ অভাবের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে। মানুষের যে দেহাতীত সত্তা আছে সে-ই আমাদের দেহ থেকে অশ্রুজল ঝরায় এবং সে-ই আমাদের দেহের দু পাশ এবং ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসায়। কিন্তু এই পৃথিবীতে সে জিনিস কি, যা হাস্যকৌতুক রসের সৃষ্টি করে?'

প্রশ্ন শুধিয়ে উত্তরে রাডেকিই বলছেন, 'সব, সব কিছুই...। যেমন সব কিছুই কাঁদাতেও পারে। তারা, ফুল, পশুপক্ষী এদের নিজেদের সত্তা দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ামাত্রই এগুলো কৌতুকরসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—কারণ এই মানুষই বিশ্ব-সংসারের হাসি এবং কান্নার কেন্দ্র। কারণ এই মানুষ নির্মিত হয়েছে অর্ধেক পশু থেকে এবং অর্ধেক চৈতন্য দিয়ে। এই যে কাদামাটি আর

---

১ রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'জার্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই।' এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'জর্মন' লিখতেন—যদিও এখানে 'জার্মান' লিখেছেন। হালে জনৈক পত্রলেখক 'জর্মন' লেখার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেছেন বলে এ-কথাটি বলতে হল। 'জর্মন' লেখার অন্য কারণও অবশ্য আছে।

সৃষ্টিকর্তার মুখের ফুঁ দিয়ে তৈরী মানুষ—তার হাসি এবং কান্না অতি সাধারণ সরল,—আর গভীর মনোবেদনায় যখন মানুষ কাঁদে তখন তার সে রোদন সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। হাসির বেলাও তাই। মানুষ যখন ফুর্তিতে থাকে তখন সে হাসে কিন্তু কৌতুকরসের সৃষ্টি হওয়াতে মানুষ অকস্মাৎ যে অট্টহাস্য করে ওঠে সে হাসি ভিন্ন। কিন্তু ফুর্তিতে থাকলেই যে কৌতুকের সৃষ্টি হয় এমন কোনও কথা নয়। সেখানে মানুষ হাসে সে ফুর্তিতে আছে বলে, আর এস্থলে তার উল্টোটা—এস্থলে মানুষ হেসে ফুর্তি পায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে রাডেকির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। তিনি বলছেন, 'সুখে (অর্থাৎ যখন ফুর্তিতে আনন্দে আরামে—লেখক) আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটি আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।' এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি তত্ত্বও যোগ দিয়েছেন—আমি বোধ করি, যে কারণ-ভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য ও কৌতুক-হাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।'[১]

আর বর্তমান লেখক শুধোয় তাহলে বেদনাজনিত অট্টহাস্যও কি ঐ একই পর্যায়ে পড়বে? কিংবা দেখবো, আকাশের জল, চোখের জল আর গোলাপের জল একই কারণে ঝরছে?

মূল কথায় ফিরে যাই। রাডেকি বলেছেন, 'একদা সর্ব প্রকারের কাব্যই আবৃত্তি করা হত কিংবা গাওয়া হত। এর বহু পরে মানুষ এগুলো লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলো। এবং এরও পরে ছাপাখানায় সে কৃষ্ণমৃত্যু প্রাপ্ত হল (আমরা বলবো মা কালী কালির চরণাশ্রয় পেল) এবং আজ সে শুধু মানুষের চিত্তাকাশেই জাগরিত হতে পারে। একমাত্র কৌতুকরসই এখনও মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাপাখানায় সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় না। এ যেন কলকল উচ্চহাস্যে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের ঝরণা—মাঝে মাঝে এক পাশে গুটিকয়েক পাথরের মাঝখানে যে সে স্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই হল তার ছাপায় প্রকাশিত রূপ, কিন্তু সে অতি সামান্য এবং তার উদ্দাম গতিবেগকে কণামাত্র ব্যাহত করে না। এবং অন্য সর্ব কাব্যকলা যেমন যেমন ছাপার গোরস্তানে নীরব হতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক-কথিকা এগুলো নিজের ভিতর সংহরণ করে তাদের পুনর্জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলো। তাই কৌতুক-কথিকা চুটকিলা, কখনও বা কথক ঠাকুরের রূপকথা, কখনও বা বিষ্ণু শর্মার উপকথা, দশছত্রের উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা এমন কি রোমাঞ্চকর নাট্য। সংবাদপত্রের শক্তি এ ধরে এবং কয়েকটি শব্দের সাহায্যে যত্রতত্র যখন

---

১ পঞ্চভূত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড ৬১৭। পঞ্চভূত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। তারপর ১৩২৮ এবং ১৩৩৩-এর মাঝামাঝি কোনও সময়ে "আমরা হাসি কেন?" এই নিয়ে বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় আলোচনা করেন। তার অনুলেখন আমার কাছে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অন্যান্য আরও বহু অনুলেখনের সঙ্গে এটিও কাবুল বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। সে-সভায় ক্ষিতিমোহন সেন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কিংবা হয়তো ঐ সময়কার "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় এর অনুলেখন পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে জনৈক লেখক একটি অত্যুত্তম প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন, হাস্যের কারণ সম্বন্ধে আঁরি বের্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখাটি বের্গসঁর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

তখন এক লহমায় নাট্যশালার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। সে একাধারে রাজদূত, লোকদূত, চারণ এবং নাট্যকার। কৌতুক-কথিকা হাস্যগাথা রচনা পেশাদারের একচেটিয়া নয়, বরঞ্চ বলতে হবে এটি পাঞ্চজন্য রসসৃষ্টি। "হাস্যরস-লেখক বলতে যা বোঝায় তাঁদের মত একটি ছত্র না লিখেও মানুষ তার জীবনে হাস্যরস সঞ্চয় করতে পারে ও সৃষ্টি করতে পারে—" জ্যাঁ পল বলেন।'

লোকমুখে এই হাস্যরস সৃষ্টির ঐতিহ্য বেঁচে রইল কি করে?

রাডেকি বলেন, 'সমাজের বাঙ্ময় রূপ নিত্য প্রয়োজনীয়। স্ফুট বাক্য দ্বারা মানুষ আপন মনের চিন্তা হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে, আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। তার লীলাভূমি—রাজনৈতিক সভা-সমিতি, থিয়েটার, বারোয়ারী পুজো ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মচেতনা প্রকাশ পায় তখনই যখন রামাশ্যামা সবাই সমান অংশীদার হয়ে হাস্যকলার সৃষ্টি করে' (এস্থলে বর্তমান লেখকের টীকা—শুধু তাই নয়, চুটকিলা-ভূমিতে গণতন্ত্রের এমনই কট্টরতা যে অতিসাধারণ জনও আকছারই ছোট্ট একটি টিপ্পনী কেটে গেরেমভারী মাতব্বরজনকে ডিগবাজী খাইয়ে দেয়)। তারপর রাডেকি এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছেন এই বলে :—'হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে।'

আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠকখানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর ছুটে যাই নে। কিন্তু সবাই যদি একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে অবশ্যই যাই।

এ বড় অদ্ভুত সমস্যা। দুঃখ-বেদনা আমরা দেখতে চাই নে, কিন্তু কাব্যে ঠিক সেই জিনিসটেই আমরা খুঁজি।

কৌতুক-হাস্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও 'পঞ্চভূতে' লিখেছেন, 'রামায়ণের সীতা বিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখ-পীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত।' এতখানি বলার পর রবীন্দ্রনাথ সূত্র দিচ্ছেন, 'বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি।' আমরা সম্পূর্ণ একমত। তবে তিনি যে কারণ দিয়েছেন—'কারণ, দুঃখানুভব আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে'—সেখানে সবাই একমত নাও হতে পারেন।

আজ যে বাঙলা দেশে রাজশেখরের এত খ্যাতি তার কারণ 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়—তার কারণ তাঁর 'চলন্তিকা', রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, হয়তো বা তাঁর প্রবন্ধাবলী। যদিও আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর হাস্যরস অতুলনীয়, কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করার মত—তা সে শ্রেষ্ঠতর কিংবা নিকৃষ্টতরই হক—লেখক বাঙলা দেশে আছে। চলন্তিকার চেয়ে ভালো অভিধান ইংরিজীতে আছে কিন্তু হাস্যরসিক রাজশেখর জেরম কে জেরম, উডহাউসের বহু বহু ঊর্ধ্বে।

তা সে যাক্। কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবং আমরাও স্বীকার করলুম,

'দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি'—তাই যদি হয় তবে ফিলিমওয়ালারা কেন বলেন ট্রাজেডি অচল, দর্শক কমেডি দেখতে চায় এবং শুধু এ-দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি অল্পবিস্তর তাই।

তার কারণ বোধ হয় এক হতে পারে যে শিশুর রূপকথা কখনও ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয় না, এবং যেহেতুক সিনেমা-দেখানেওয়ালারা ত্রিশ বছর বয়সেও শিশুমন ধরেন তাই তাঁরা ট্রাজেডি পছন্দ করেন না। কিন্তু এস্থলে সে আলোচনা কিঞ্চিৎ অবান্তর।

*　　　*　　　*

রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় আরও অনেক মধুর এবং জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। এবং শেষ করেছেন এই বলে, 'হাস্যকথিকার (চুটকিলার) প্রাণরস কিন্তু ঐ বস্তু শব্দের মাধ্যমে বলাতে—ছাপাখানার মারফতে নয়।' তুলনা দিয়ে বলেছেন, 'প্রথমটা যেন উচ্ছল প্রাণরসে সঞ্চারিত উড়ন্ত প্রজাপতি—ছাপাখানার মাল যেন পিন দিয়ে বেঁধা কাঁচের বাক্সের ভিতর মৃত প্রজাপতি।'

রাডেকি অবতরণিকা শেষ করেছেন তাই এই বলে, 'আমি হালে একটি চমৎকার রসিকতার গল্প শুনতে পেলুম। তদ্দণ্ডেই সেটি লিখে নিলুম। পরে সেটি ছাপায় প্রকাশিত হল! যিনি সেই গল্পটি বলেছিলেন সে কথক সেটি পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ হয়েছে—কিন্তু স্বরলিপি কই?'

অর্থাৎ এ যেন কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত না গেয়ে আবৃত্তি করে শোনাল। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী। তিনি নাকি এরই কাছাকাছি অন্য একটি তুলনা দিয়েছেন। অনুবাদ যেন কাশ্মিরী শালের উল্টো পিঠ। ডিজাইনটা বোঝা যায় কিন্তু অন্য সব কিছু লোপ পায়।

হাসি-কান্না

তরুণ লেখককে সাবধান করে দি, তিনি যদি ইহজগতে অজরামর যশ অর্জন করতে চান তবে যেন তিনি হাস্যরসের বেসাতি না করে ঢালেন অঢেল করুণ রস। আর বাঙালীর হৃদয়ের উপর যদি 'জগরনটের' মত তিনি মোক্ষম আসন চেপে বসে থাকতে চান তবে যেন সেটিকে চেপটে, থেৎলে, নিংড়ে, একদম সমূচহ তিক্তের চেয়েও তেতো করে পরিবেশন করেন। দেবদাস রক্তবমি করছে আর গাড়োয়ানকে বার বার শুধোচ্ছে আর কত বাকি, কিংবা অরক্ষণীয়ার 'সাজ' দেখে বাচ্চা বলছে, 'পিসিমা সং সেজেছে'—ছাড়ুন এ-রকম কিছু মাল, আর দেখতে হবে না, আপনি আমাদের ডিহি শ্রীরামপুর সেকেন্ড বাইলেন কম্বল বিতরণী সভা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে 'ভায়া' মাদ্রা কালীবাড়ি প্রসাদ-বিতরণী সমিতি হয়ে নাক বরাবর পৌঁছে যাবেন পদ্মশ্রী, আকাদেমি প্রাইজে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আহা, বাঙালী বড্ডই কোমল হৃদয়। শুনেছি, এক বাঙালী ছোকরা লন্ডনে বাসকালীন তিনটি বছর মাত্র অবশ্যকর্তব্য ব্যারিস্টারি ডিনারটি খাবার জন্য—ভুল বললুম, খাবার জন্য নয়, নিছক এটেন্ড করার জন্য—হস্টেল থেকে বেরতো; ফিরে এসে ফের ধুতি গেঞ্জি পরে লেপের তলায় ঢুকে দেবদাস পড়তো আর তার তলায় যতখানি সম্ভব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিত।

আল্লা রসুলের কসম খেয়ে আমি মুসলমানের ব্যাটা বাঙালী মুসলমান ফের বলবো, রাজশেখরের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কারণ তাঁর 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়। তাঁর খ্যাতির কারণ 'চলন্তিকা' এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। অথচ চলন্তিকার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় অভিধান ইংরিজী জর্মনে আছে, ইংরিজীতে গ্রীক কাব্যের অনুবাদ করে একাধিক লেখক রাজশেখরকে আগের থেকেই ছাড়িয়ে বসে আছেন। অথচ হাস্যরসে রাজশেখরের যে কৃতিত্ব তার সঙ্গে তুলনা করি কার সঙ্গে। সেরভান্তেস, মলিয়ের, জেরম, উডহাউস কেউই কাছে দাঁড়াতে পারেন না। গ্রীক সাহিত্যের কথা আর তুলছি নে, সেখানে আছে ব্যঙ্গ, সেটায়ার,—বিশুদ্ধ হাস্যরস নয় এবং সেগুলোও রাজশেখরের কাছে আসতে পারে না। এটা ডবল কসম খেয়ে বলছি।

বাঙলা কথা শুনুন। আপনাকে একটা সোনার মোহর দিলে আপনি খুশী হবেন, কিন্তু ভুলে যাবেন দুদিন বাদেই। ওদিকে কেউ যদি পাঁচ টাকা হাওলাত নিয়ে শোধ না করে তবে সে কলিজার ঘা দগদগ্ করবে বহু-বহুকাল অবধি। শারীরিক স্তরে নেবে বলতে পারি, আপনাকে কেউ সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাতে চাইলে আপনি বিরক্ত হবেন কিন্তু কেউ যদি শরীরে পিন ফোটায় তবে মারমুখো হবেন।

আরেকটি কথা; করুণ রস বুঝতে হলে বিদ্যেবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। হাস্যরসের বেলা ভাষাজ্ঞান (বিশেষ করে 'পান্' বোঝবার বেলা) ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার, অনেক-কিছুই জানতে হয়। যেমন মনে করুন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ছোট হাস্যরসের চুটকিলাটি।

একটি ছোট্ট মেয়ে ঠিকমত হাঁটতে পারছে না দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কড়ে আঙুলটি বাড়িয়ে দিলেন, সে যেন ওটা ধরে সোজা হয়ে চলে। মেয়েটি খপ করে তাঁর গোটা হাত ধরে নিলে। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'দেখলে, মেয়েকে একটি আঙুল দিয়েছি কি না, সে তখ্খুনিই পাণিগ্রহণ করতে চায়।' এস্থলে পাণিগ্রহণের অর্থ যদি কেউ না জানে তবে সে বুঝতেই পারবে না, এর রস কোথায়।

এরই পিঠ-পিঠ একটি মার্কিন রসিকতা আছে, কিন্তু অতখানি সূক্ষ্ম নয়। তারা বলে, 'গিভ এ ডেম এন ইঞ্চ...এ্যান্ড শী উয়োন্টস টু বী এ রুলার।' 'মেয়েছেলেকে এক ইঞ্চি (লাই) দিয়েছ, কি সে অম্নি রুলার হতে চায়।' এখানে রুলারের যে দুটো অর্থ আছে সে তত্ত্ব যদি শ্রোতার জানা না থাকে তবে সব গুড় বরবাদ।

এদেশে উত্তম ক্লাস রসিকতা করে গেছেন আরেকটি ব্যক্তি। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পুণ্যশ্লোক, সায়ংসন্ধ্যা স্মরণীয়। তিনি তাঁর ঠাট্টা-মস্করা ছদ্মনাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' নিয়ে করেছেন বলে অনেকেই এ-তত্ত্ব জানেন না। তাঁর একটি গল্প অতুলনীয় —দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী হাতের কাছে নেই। মোটামুটি যা বলেছেন তা এই, অমুককে আমি নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়ার পর শুনিতে পাইলাম অন্য অমুককে ইহার পূর্বেই নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম—কারণ আকাশে একসঙ্গে দুইটি চাঁদ কখনই দেখা যায় না। এক্ষণে এই উপাধি লইয়া দুইজনে হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি হউক তাহা আমি চাহি না। বিদ্যাবুদ্ধিতে অবশ্য দুইজনই একই প্রকার (অর্থাৎ দুটোই আস্ত পাঁঠা—লেখক)। অতএব, স্থির করিয়াছি আকাশের চাঁদটি লইয়া, সেইটিকে দুই ভাগ করিয়া, দুইজনকে দুইটি অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিব।

অর্ধচন্দ্র এস্থলে কেউ যদি শুধু 'ক্রেজন্ট্ মুন' অর্থে নেন তা হলেই তো চিত্তির!

এ-পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত হই-চই হয়েছে—অর্থাৎ ধর্ম যে রকম সম্মান পেয়েছে সে রকম গালাগাল খেয়েছেও সে বিস্তর—অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান নিয়ে অতখানি হয়েছে বলে জানি নে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেকখানি খুঁটিনাটি না জানলে তাদের নিয়ে একে অন্যকে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে সেগুলো ঠিকমত রসিয়ে রসিয়ে চাখা যায় না।

প্রথম একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দি।

"মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্।" শ্রীযুক্ত সুশীল দে এটিকে 'বাঘে মোষে (রাজায় রাজায়) যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়', এরই সমার্থে ধরেছেন। শ্রীযুত দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থখানা রচনা করে আমাদের যে কী উপকার সাধন করেছেন সেটি অবর্ণনীয়; কাজেই আমি যদি এস্থলে আমার জানা অন্য অর্থটি নিবেদন করি তবে তাঁর পাণ্ডিত্য-জ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হবে না।

মোল্লাকে কড়া কথা শোনালে বা তার উপর চোটপাট করলে সে তো আর জমিদার নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার দাদ নেবে। সে বেচারা ছুটে যায় মসজিদে। সেখানে গিয়ে আল্লার কাছে সে তার ফরিয়াদ জানায় ও অপরাধীর সাজা কামনা করে। কিন্তু কথায় বলে, 'শকুনির শাপে কি গরু মরে' (সুশীল দে, ৭৮১১)—অপরাধীর কিছুই হয় না। মোদ্দা কথা তা হলে দাঁড়ায়, মোল্লার আর কী মুরদ! সে ঐ মসজিদ তক্ ছুটে গিয়ে চেল্লাচেল্লি মাত্রই করতে জানে; তাতে কারও ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

ঠিক ঐ রকম শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়াঝাঁটি জানা না থাকলে নিচেরটা বুঝবেন কি করে?

(শাক্ত-বৈষ্ণব উভয়ের কাছে সবিনয় ক্ষমা-ভিক্ষা করতঃ)

বৈষ্ণব : আচ্ছা ভাই, তোমরা তো বলো, 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'—তবে পাঁঠাটাকে যখন বলি দাও তখন তার ভিতরের 'শক্তিটাকে' কি বলি দেওয়া হয় না? লক্ষ্য করোনি পাঁঠার কী অসাধারণ প্রাণশক্তি—লম্ফঝম্প!

শাক্ত : না, ভাই, তা নয়। পাঁঠাকে যখন ধরে বেঁধে হাড়িকাঠে পুরি তখন সে নির্জীব। তখন আর তার শক্তি কই? আছে শুধু চৈতন্য। তখন শুধু ওইটুকুকেই বলি দি।

এ বছরে প্রতিটি লেখার সময় স্বামীজীর কথা মনে পড়ে। তিনি যে শুষ্ককাষ্ঠ অরসিকজন ছিলেন না সেইটে এই সুবাধে মনে পড়ল। নিম্নের রসিকতাটি ঈষৎ দীর্ঘ কিন্তু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দীর্ঘতর শুনতেও কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।

(মুসলমানদের শীয়া সম্প্রদায়ের কাছে গোস্তাকীর বেহদ্ মাফ চেয়ে)

'লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের বড় ধুম। বড় মসজিদ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে। বেসুমার লোকের সমাগম। হিন্দু-মুসলমান, কেরানী য়াহুদি ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ শীয়াদের রাজধানী। আজ হজরত হাসান-হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতি-ফাটানো মর্সিয়ার কাতরানি কার না হৃদয় ভেদ করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাশা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের —যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ।

সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ শহরপসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় তো ফাটক পার হয়ে মসজেদের মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো —ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসান-হোসেনকে মেরে ফেলে; তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টা সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদগদ স্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি? অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভালা বাবা অজিদ্ দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিতক্ রোবত। (ধন্য বাবা ইয়েজিদ্, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!')।[১]

রস তো পেলেনই, কিন্তু পাঠক স্বামীজীর গল্প বলার টেকনিকটি লক্ষ্য করুন।

রসিকতা

হাসতে হয়, না হেসে উপায় নেই। এমন কি যারা 'হাতুড়ি আর কাস্তে'র নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণখুলে নয়, কিংবা 'পাবে' বসে বেপরোয়া গাল-গল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তর্পণে টাপে-টোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে একটি রসের গল্প মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলা দেশে পৌঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিস্ট আরেক কম্যুনিস্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, 'জানিস ভাই, "প্রাভদা" কাগজ সব চেয়ে সেরা পলিটিকাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে কাগজে ঘোষণা করেছে।'

দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট : (অধিকতর সোল্লাসে) 'পয়লা প্রাইজ কত কমরেড?'

প্রথম কম্যুনিস্ট : 'কুড়ি বচ্ছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।'

---

১ বেসুমার = অগুন্‌তি; আদমশুমারী তুলনীয়। মর্সিয়া = শোকগীতি। কাফগাফের উচ্চারণ = কাফ আরবী বর্ণমালার অক্ষর। আরব ইহুদী ছাড়া অন্যের পক্ষে উচ্চারণ কঠিন। গাফ উচ্চারণ সহজ। তবে কাফ-গাফ সংযুক্তভাবে সমষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়। জবান = ভাষা। আবা কাবা = ঝোলা জামা। চুস্ত = টাইট। তাজ মোড়াসা = বাঁধা তৈরী পাগড়ি। শহরপসন্দ = শহরের সকলেই যে বস্তু পছন্দ করে। জম মরদ = জওয়ান মর্দ। ইয়েজিদ = আজকাল এজিদই লেখা হয়, কিন্তু ইয়েজিদ মূল উচ্চারণের অনেক নিকটবর্তী।

'নির্বাসন' না 'উইন্টার স্পোর্টস্ অ্যান্ড হলিডে' আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ-চীনে বুঝি মানুষ মুখ বন্ধ করে আছে। যেমন হিটলার আমলে জর্মনিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জর্মন আরেক জর্মনকে শুধোলে, 'তুই নাকি ভাই, ডেন্‌টিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস? কেন?'

'কি আর হবে? দাঁতের চিকিৎসা করবো কি করে? কেউ যে মুখ খুলতে আদৌ রাজী হয় না।'

তা নয়। লোকে মুখ খোলে। কারণ যে কর্তাব্যক্তিরা রুশ-চীনের ফুটন্ত জলের কাৎলির উপরে বসে আছেন তাঁরাও জানেন, মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন্ ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন্ ধরনের রসিকতা 'হারাম' বিধান দিয়ে সাইবেরিয়া ব্যবস্থা করতে হয়—চীন দেশে, শুনেছি, নেফা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সব চেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন, বাধ্য হয়ে অর্ধ-দিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই কিছুটা মনের ভার নামাক—একটা নূতন অক্টোবর রেভলুশন অদ্যকার কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন সম্বন্ধে পোলান্ড-রুমানিয়ার কাষ্ঠ-রসিকেরা বলে, 'সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তম্ভ।'

ভবিষ্যতে কি রকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরও তিনটি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চিন্ময় থেকে মৃন্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সক্কলের আপন আপন সলুন মোটরগাড়ি, এমন কি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মস্কোর উপরে শূন্যমার্গে আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের দেখা। একজন আরেকজনকে শুধালে, 'কোথায় চললি কমরেড?'

'তুই যদি আমার পিছু না নিস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কৃষ্ণসাগরের পারে ওডেসার রেশন শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।'

এ তো হল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপতির সাথে রসকেলিতে মত্ত। হুঙ্কার দিয়ে স্বামী বললে, 'এই বুঝি প্রেম করার সময়! ওদিকে যে রেশন শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে!'

সত্যই তো। প্রেম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু নেবু কিছু আর নিত্যি-নিত্যি মেলে না।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে।

গৃহবণ্টন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কি বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ফ্ল্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না? তা আর এমন কি? আমার উপদেশ নিন। স্ত্রী বদল করুন। ঢের কম

হাঙ্গামায় পাবেন। ফ্ল্যাট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

কিংবা বাড়ি বাবদে :—

ক্লাস টিচার শুধোলেন, 'লেলিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছো?'

'আজ্ঞে কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে। আমরা থাকি মধ্যিখানে। আমাদের তো দেয়াল নেই।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীন দেশের—মন্ত্রী মশায় বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, '১৯৬০-এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়াতে পেরেছি। ১৯৬১-তে ৬০ গুণ। এ বছরে দু'শ গুণ—দাঁড়ান, কি হল? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, কমরেড স্টুডিয়ো অ্যাসিস্টান্ট, একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকিনি।'

তবে কোনও কোনও বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ গল্পটাও হলদে, না লাল জানি নে। এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো। আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত। এখন সে দুর্দিন গেছে। এখন স্ত্রী বলেন, তোমার পাতলুন আর শর্টটা দাও তো। আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও।'

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, আরও পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ির মত কাজ করছে তখন তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাৎলে দেয় কিভাবে কর্মগুলো সুষ্ঠুরূপে করতে হয়। ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে। সেটা পরের পুরুষেও সংক্রামিত হয়। হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সক্কলকে হপ্তায় দু'দিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মারবে। তার চেয়ে আপিসের কলম পেষা ঢের ভালো।' এরা বলে, নিগ্রো-দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নূতন ধবল-দাসত্ব।]

কম্যুনিস্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোরবেলা—এদেশে যে রকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারী জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশী বরদাস্ত করা হয় না।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওলা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলছে, 'কমরেড, অযথা ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।' কিংবা,

'কি বললে? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাইনি।' কিংবা খবরের কাগজে শোকসংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।' আপন সোশালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দুজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশী আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবেদন করেছি। এগুলো সচরাচর তৈরী হয়

কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দুর্নীতি, বড়কর্তাদের বিলাসব্যসন (হালে চীনও খ্রুশ্চফকে গালাগালি দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দুখানা আপন মোটরগাড়ি আছে), ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীনচিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার খাটানো, উপরাষ্ট্র-ধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না, তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরণ নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে, 'তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?'

দ্বিতীয় কয়েদী, 'কি করি বল। সরকার পক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।' কিংবা শিক্ষামন্ত্রীকে 'পাগল' বলার অপরাধে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারী কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

রুশ কর্মী কথায় কথায় বললে, 'আমি সব চেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের জন্যে কাজ করতে।' সরকারী কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, 'বড় আনন্দের কথা। তা আপনি কি কাজ করেন?' 'আজ্ঞে, আমি গোর খুঁড়ি।'

কিংবা,

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত :—

খবরের কাগজের হকাররা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, 'রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে।' রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'সবাই? সবাই?'

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কন্ডাক্টর : 'এগিয়ে চলুন, মশাইরা, এগিয়ে চলুন।'

'আমরা "মশাইর" নই, আমরা কমরেড।'

'মস্করা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।'

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টাপেটোপে নিতান্ত আপনজনের মাঝখানে। নইলে :—

তিন বৃদ্ধ পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে। তার মধ্যে দুজন ওয়াক্ থুঃ ওয়াক্ থুঃ বলে থুথু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, 'দয়া করে কোনও প্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।'

ইংরিজীতে বলে, 'নীরবতা হিরণ্ময়।'

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহু শত বৎসর ইয়োরোপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশী। ওদিকে হিটলার যে রকম একদা ইহুদিদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যত দূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে ও 'অন্তরে অন্তরে অন্তরীণ' হয়ে থাকে।

'চতুর পোলিশ ইহুদি মূর্খ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কিভাবে আলাপ করে?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।' কিংবা,

সরকারী কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, 'কমরেড লেভি, আপনি ফর্মে লিখেছেন, আপনার কোনও আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।'

'তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।'

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া যায় 'বড় পাণ্ডাদের' নিয়ে রসিকতা। তার কারণ উৎপীড়িত জনেরাও অতি অল্প দিনের অভিজ্ঞতায়ও বুঝে যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয়, গৌণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। এ কথাটা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গ্যোরিঙ তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শুধু বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসুর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খ্রুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়া-বাড়ি নেই তবু দু-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপাদেয়। তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খ্রুশ্চফ্ ও পুলিসকর্তা (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাখারফ্ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাখারফ্ বললেন, 'কেনেডির অলঙ্কারগুলো লক্ষ্য করেছিলি? একদম সাচ্চা।'

নিকিতা বললেন, 'না কই, দে তো।'[১]

নানাপ্রশ্ন

যতই বয়েস বাড়ছে, কোথায় না মনের ভিতর যে-সব প্রশ্ন জাগে তার সংখ্যা কমবে, উল্টে তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিন পূর্বে বাঙলায় লেখা কয়েকখানি মুসলমানি কেতাব বা পুঁথি হাতে পড়লো। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য। বিষয়বস্তু ফার্সী, যদিও নায়ক-নায়িকা কোনও কোনও মূল কাব্যে আরবদেশের—ফার্সীর মাধ্যমে বাঙলা দেশে এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে এনেছেন ইরানী মেজাজ। সেটা মধুর,—আরবী কাব্যের মূল সুর দার্ঢ্য।

বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, যে সব কবি বাঙলায় এ-সব কাব্য 'স্বাধীন অনুবাদ' করেছেন এঁদের অনেকেই উত্তম ফার্সী জানতেন। কেউ কেউ ভালো আরবী ও সংস্কৃত জানতেন, এবং প্রায় সকলেই তখনকার দিনের প্রচলিত বাঙলা কাব্যের ভাষা জানতেন। ছন্দও হয় পয়ার নয় ত্রিপদী। এমন কি কবিদের একজন পয়ার লিখতে লিখতে এমনই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য যে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ভী আমদানি করতে হয় সে বাৎ বেবাক ভুলে গেছেন এবং কাব্য সমাপ্তির পর যখন কানে জল গেল তখন কুছ্ কুছ্ ত্রিপদী-ভী[২]-বগ্‌হার দিয়ে কবি-ধর্মের ইমান দুরস্ত রাখলেন।

---

১ 'ভেল্টভখের' (ৎসুরিষ) ১৪৫২ সংখ্যার সাহায্যে লেখা।

২ ইনি অবশ্য অনেক পরের কবি।—সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১০, ১১১ পশ্য।

তাই প্রশ্ন, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা বাংলা কাব্যে বিদেশী সুর আনলেন, তাঁরা উত্তম ফার্শী এবং আরবী শব্দ বাঙলাতে আমদানি করলেন না কেন?

দর্শনের অনুশাসনে, যে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তোমার কণামাত্র ধারণা নেই, যে উত্তর কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে না আসতে পারে সে সম্বন্ধে তুমি কণামাত্র কল্পনা করতে পারো না, সে প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, সে প্রশ্ন বাতিল ইনভ্যালিড। তাই আমার মনে যে কাল্পনিক 'উত্তর' এসেছে সে দুটির ইঙ্গিত দিই।

প্রবন্ধান্তরে বলেছি, বাঙলা দেশ চিরকালই বিদ্রোহী। এ-দেশ মুসলমান আগমনের পর থেকে সুভাষ বসু পর্যন্ত একমাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে কেন্দ্রের অর্থাৎ দিল্লী-আগ্রার হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত পাঠান মোগল প্রায় সব বাদশাকেই এ-দেশে আসতে হয়েছে 'বিদ্রোহ দমন করতে'—আমরা অবশ্য বলবো, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। বিশেষত বাঙলার স্বাধীন পাঠান রাজাদের আমলের তো কথাই নেই। তখন বাংলা দেশ চীনের সঙ্গে রাজদূত বিনিময় করছে, প্রতিবেশী জৌনপুরী রাজাদের সঙ্গে কখনও লড়াই করছে, কখনও আশ্রয় দিচ্ছে, এবং জনশ্রুতি যে, বাঙলা দেশে স্বাধীন রাজা ইরানের কবি হাফিজকে বিস্তর সওগাৎ পাঠিয়ে দাওয়াৎ করেছেন এদেশে। অবশ্য নৌপথে।

এখানেই হয়তো রহস্যদ্বারের গুপ্ত কুঞ্চিকা।

স্থলপথে ইরান যাবার কথাই ওঠে না। মাঝখানে জৌনপুর, দিল্লী, লাহোর, কান্দাহার, হিরাত কত না স্বাধীন রাজত্ব! একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে হরবকৎ। নিরীহ কবি, চিত্রকর, গায়কের তো কথাই ওঠে না, ইরান-তুরানের ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধারা পর্যন্ত মেরে কেটে হয়তো দিল্লী অবধি দু-একজন এসে পৌঁছেছে, 'দিল্লী দূর অস্ত্' বরঞ্চ 'দিল্লী নজ্‌দীক্ মীশওদ' (দিল্লী কাছে এল), কিন্তু 'বাঙলা দূর অস্ত্' শুধুই নয় 'দূরান্তর অস্ত'।

এদিকে বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের মাতৃভাষা ফার্সী নয়, ফার্সী তাদের কোর্ট লেনগুইজ মাত্র—এমন কি স্টেট লেনগুইজও নয়—যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁরা সে ভাষা ভুলে যাচ্ছেন, ওদিকে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বিদেশাগত নূতন কবি নূতন লেখক সে ভাণ্ডারের মাল নিয়ে আসছেন না, রাজদরবারেই যখন ফার্সী দিনের পর দিন শুকিয়ে আসছে তখন জনসাধারণে সে-ভাষা প্রচলিত ও প্রসারিত হবে কি করে?

দু-চারজন পণ্ডিতদের কথা সব সময়ই আলাদা। রামমোহন হীব্রু জানতেন, হরিনাথ দে না জানি কটা বিদেশী ভাষা সে-সব দেশে না গিয়ে এমন কি সে-সব ভাষার পণ্ডিতদের সংস্পর্শে না এসেও শিখতে পেরেছিলেন। অবশ্য স্বাধীন বাঙলায় তাঁর চেয়ে অনেক বেশী আলিম ফাজিল ছিলেন কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেরই ছিল 'কাফিরদের' ভাষা বাঙলার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা (ঐ যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও বাঙলার প্রতি বিশেষ কোনও শ্রদ্ধা ছিল না)। এঁরা বাঙলায় কাব্য এমন কি ধর্মালোচনা করতেও কড়া বারণ করতেন। কিন্তু যেখানে স্টেটের খানিকটা উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ওটাকে কিছুটা উপেক্ষা করা যায়। তাই দৌলত কাজী, আলা-ওল সৈয়দ সুলতান ইত্যাদি কবিদের আবির্ভাব।[১] পূর্বেই

---

১ 'সৈয়দরা' নিজেদের মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর বলে দাবী করেন। মুসলমান ধর্মে যদিও সৈয়দদের বিশেষ কোনও সম্মান দেখাবার নির্দেশ নেই তবু কার্যত এঁরা অনেকটা ব্রাহ্মণদের সম্মান পান। তার কারণ অবশ্য অংশত এই যে এঁদের ভিতরই ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রচলন ছিল

বলেছি এঁরা ফার্সী জানতেন উত্তম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তাঁদের পাঠকমণ্ডলী, কি মুসলমান কি হিন্দু কেউই বিদেশী আরবী ফারসীর সঙ্গে সুপরিচিত নন। কাজেই আসল উদ্দেশ্য সমাধান হবে না আদপেই।

(এর সঙ্গে আজকের দিনের একটি তুলনা দিতে পারি। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখি, কোনও পশ্চিমবঙ্গবাসী ঢাকার কোনও উটকো খবরের কাগজ থেকে আরবী-ফার্সী মিশ্রিত বাঙলা উদ্ধৃত করে আর্তরব ছাড়ছেন, এত বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ যদি ঢাকার লেখকরা ব্যবহার করেন তবে এক নূতন ভাষার উদ্ভব হবে এবং বঙ্কিম-রবির বাঙলা 'দ্বিখণ্ডিত' হয়ে যাবে। এঁরা যদি অনুগ্রহ করে ঢাকার নিত্যকার খবরের কাগজ পড়েন, লেখকদের সাহিত্য রচনা পড়েন তবে দেখতে পাবেন ঢাকা সেই বাঙলাই লিখেছে কলকাতা যে বাঙলা লেখে—দু-চারটি 'আব্বা', 'আম্মা', 'ফজরের নামাজে'র কথা হচ্ছে না, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ আলাল হুতোমে আছে—এবং তার কারণ দৌলত কাজী, আলাওলের বেলায় যা হয়েছিল তা-ই। ঢাকার উত্তম ফার্সী জাননেওয়ালা লেখকও বোঝেন যে তিনি ফার্সী জানলে কি, তাঁর পাঠকের অধিকাংশই যে ফার্সী জানেন না। এস্থলে অবশ্য মডার্ন কবিদের মত যাঁরা মনে করেন, যত দুর্বোধ্য লেখা যায় ততই 'সুবোধ পাঠক' প্রশংশা করবে বেশী, তাঁদের কথা হচ্ছে না।)

আকবরের আমলেই প্রথম অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কিন্তু তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

ইংরিজি শব্দ যখন প্রথম বাঙলাতে ঢুকতে আরম্ভ করে তখন লেখা হয়েছিল 'লভ', 'কালেজ' ইত্যাদি; আজ আমরা লিখি 'লাভ' 'কলেজ'। আজ আবার দেখতে পাই, 'স্যুটিং' 'শুটিং', 'হাসপাতাল', 'হাঁসপাতাল' একই শব্দ দুই বা তিন রকমে লেখা হচ্ছে। তার উপর জুটেছে এসে আরেক আপদ। ছেলে-ছোকরারা ফরাসী, জর্মন ভাষাতে ওকীব-হাল হয়ে উঠেছে, 'পারি' 'পারী' এমন কি দু-আঁসলা 'প্যারি' পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে,—'প্যাঁসনে', 'পাঁশনে' আরও কত কী?

দৌলত কাজী ইত্যাদি লেখকগণ মাত্রাধিক আরবী-ফারসী শব্দ বে-এক্তেয়ারভাবে গ্রহণ করেননি সত্য কিন্তু কিছু পরিমাণে তো করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁরা আমাদেরই মত এলোপাতাড়ি যাঁর যা খুশী করেছিলেন, না কতকগুলো সুস্পষ্ট আইন বেঁধে নিয়ে সেগুলো যতদূর সম্ভব মানাবার চেষ্টা করেছিলেন?

যেমন মনে করুন এ যুগের মরমিয়া কবি হাসন রাজা গাইলেন,

"মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমিন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দিন।"

এখানে 'দিন'-কে যদি বাঙলা 'দিবস' অর্থে নেওয়া হয় তবে ছত্রটির কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে শব্দটি আরবী 'দীন' অর্থাৎ ধর্ম। অর্থ দাঁড়ালো 'আমার কানে এসে

বেশী। এবং ঠিক যেরকম, ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র বানায়, এবং শাস্ত্র ভাঙ্গে তারাই—রামমোহন বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করুন—ঠিক সেই রকম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সৃষ্টিতেও সৈয়দের ভাঙা-গড়ার সাহস বেশী। হিন্দুর বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যে মুসলমান কবি সম্মানের সর্বোচ্চ আসন পেয়েছেন তাঁর নাম সৈয়দ মোর্তুজা।

মুসলমানী ধর্মের খবর পৌঁছিল বলে সে ধর্ম তার অস্তিত্ব পেল, যেরকম আমি যখন আঁখি মেলে চাইলুম তখনই দ্যুলোক ভূলোকের সৃষ্টি হল।' কট্টর আদর্শবাদীর (আইডিয়ালিস্ট স্কুল) মত হাসন রাজা বলেছেন, 'ত্রিলোকের চিন্ময় মৃন্ময় জগৎ তাদের অস্তিত্বের জন্য আমার চিত্ত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করছে। আমি না থাকলে এসবের অস্তিত্ব নেই।'

পুনরায় বলেছেন,

"আমা হইতে আসমান জমিন, আমা হইতে সব
আমা হইতে ত্রিজগৎ, আমা হইতে রব।"

এখানে 'রব' আওয়াজ এই অর্থে নিলে সদর্থ হয় না। আরবী 'রব' শব্দের অর্থ 'ভগবান'। হাসন রাজা বলতে চান, 'আমার চৈতন্য যদি ভগবানের অস্তিত্বের কল্পনা না করতো তবে তাঁর স্বয়ম্ভূ অস্তিত্বই হত না।'

॥ দুই ॥

টকির কল্যাণে আমরা একটা জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। টকি আসার পূর্বে আমরা ভাবতুম, আমরা রকে বসে বেহারী মুটের সঙ্গে সে উচ্চারণে হিন্দী কথা বলি, সেইটেই অতি বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণ, এবং ক্লাসে মাস্টার মশাই যে ইংরিজি উচ্চারণে টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়েন সেই উচ্চারণই অক্সফর্ড কেমব্রিজে চালু।

পৃথিবীর সর্ব আর্য ভাষা এমন কি সেমিতি ভাষাতেও একটি ধ্বনি কথায় কথায় আসে, কিন্তু বাঙলায় (এবং ওড়িয়া, আসামীতে) নেই। ইংরিজিতে 'the'-র 'ই' উচ্চারণ; ফরাসীতে 'le'-র 'e'; জর্মনের 'gegeben'-এর তৃতীয় 'e' উচ্চারণ; আরবী ফার্সী, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠীতে 'কলম' শব্দে 'ক' এবং 'ল'-এর মধ্যে 'ল' এবং 'ম'-এর মধ্যে যে উচ্চারণ আছে, সেটি বাঙলাতে নেই।

সোজা কথায় হিন্দীর 'আমি' বা 'আমরা' বলতে যে হম শব্দটি আছে তার 'হ' এবং 'ম'-এর মাঝখানে যে ধ্বনিটি আছে সেটা আমাদের কেউ শুনেছেন 'অ' এবং তাই লিখেছেন 'হম্' এবং অধিকাংশই শুনেছেন 'আ' এবং তাই লিখেছেন 'হাম'। এ যুগে সচেতন হয়ে আমাদের অনেকেই লিখতে আরম্ভ করেছেন 'হ্যম'। (উপস্থিত আমরা এই ধ্বনিটির নাম দিলুম 'অস্পষ্ট স্বর')।

দৌলত কাজী, আলাওলের সামনে সর্বপ্রথম এই 'অস্পষ্ট ধ্বনি' নিয়েই এল সমস্যা। কলম জবরদস্ত, মক্কা, মদিনা ধরনের অসংখ্য আরবী ফার্সী শব্দে আছে এই অস্পষ্ট ধ্বনিটি; এটাকে প্রকাশ করেন কোন্ চিহ্ন দিয়ে? 'কলম', না 'কালাম', না 'কল্যম' (আজকে পূর্বোল্লিখিত 'হ্যম'-এর মত)?

আলাওলরা অনেকেই সংস্কৃত জানতেন, এবং এটিও জানতেন যে সংস্কৃতে এ ধ্বনিটি আছে বটে, কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে 'অ' রূপে। যেমন সংস্কৃতে 'কমল' শব্দের 'ক' এবং 'ম'-এর মাঝখানে আছে সেই 'অস্পষ্ট স্বর', কিন্তু বাঙালী সেই অস্পষ্ট ধ্বনির পরিবর্তে 'কমল' উচ্চারণ করে 'অ' দিয়ে, অর্থাৎ বাঙলা শব্দ 'ঘর' উচ্চারণ করতে যে

'অ' উচ্চারণ করি সেই 'অ' দিয়ে।

তাই তাঁরা মনে মনে আন্দেশা করলেন, সংস্কৃতের 'কমল' এবং আরবী-ফার্সীর 'কলমে' যখন একই উচ্চারণ তখন এই ধ্বনি প্রকাশের সময় বাঙলায় কোনও পরিবর্তন না করাই ভাল। অবশ্য তাঁরা 'কলম' না লিখে 'কালাম' লিখতে পারতেন (আজকে যে রকম কেউ কেউ 'হদিস' না লিখে 'হাদিস' লেখেন, 'বরকৎ' না লিখে 'বারাকৎ' লেখেন) কিন্তু তা হলে বিপদ হত যে, দীর্ঘ আ-কার-যুক্ত 'কালাম' নামক যে ভিন্ন শব্দ আছে সেটার অর্থ 'বাণী'—আবুল কালাম আজাদ-এর অর্থ 'বাণীর পিতা, যিনি স্বাধীন') সেটাতে এবং 'লেখনী'তে (অর্থাৎ 'কলম'-এ) যে পার্থক্য আছে সেটা আর লেখাতে দেখানো যেত না।'

অবশ্য তাঁরা 'কালাম' (কলমের জন্য, এবং 'কালাম' বাণীর জন্য) লিখতে পারতেন কিন্তু সেটা করতে গেলে অন্যান্য নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়—এবং সে দীর্ঘ আলোচনার জন্য এ-স্থলে স্থানাভাব।

এই আইন তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালী কি ভাবে 'অ' এবং 'আ' উচ্চাবণের ভিতর পার্থক্য করে সে-সম্বন্ধেও বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন বলে একটি ব্যত্যয় তাঁরা করে দিয়েছিলেন। আরবী ফার্সী শব্দের আদ্যক্ষরে 'আলিফ', 'আয়েন', বা 'হে' থাকলে সেখানে 'আ' ব্যবহার করেছেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাই 'অল্লা' 'অহমদ' না লিখে লিখেছেন 'আল্লা', 'আহমদ'; 'অব্দুলে'র বদলে 'আব্দুল' এবং 'হমিদে'র 'হসেনে'র পরিবর্তে 'হামিদ' 'হাসেন'।

দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দীর্ঘ হ্রস্ব নিয়ে। সংস্কৃত 'দিন' এবং 'দীন' উচ্চারণে, 'কুল' এবং 'কূল' উচ্চারণে আমরা কোনও পার্থক্য করি না, এমন কি সংস্কৃত পড়ার সময়ও না। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে, বাঙালাতে আরবী-ফার্সী শব্দ লেখার সময় তাঁরা সব শব্দই হ্রস্বর্বণ দিয়ে লিখবেন। কাজেই আরবী 'ধর্ম' অর্থে 'দীন' শব্দ যদিও দীর্ঘ উচ্চারণে আছে তবু তাঁরা বাঙলাতে দিন-ই লিখলেন, এবং ঠিক সেই মত 'নূর' 'রসূল' না লিখে 'নুর' 'রসুল' লিখলেন।

তৃতীয় সমস্যা, সংস্কৃতে শ, ষ, স-এর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ। আমরা বাঙলাতে তিনটিকেই এক উচ্চারণ 'শ' অর্থাৎ 'sh'-এর মত করে থাকি। শুধু সংযুক্তের বেলা এবং অন্যান্য কোনও কোনও স্থলে ইংরিজি 's'-এর উচ্চারণ, অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত 'স'-এর উচ্চারণ করে থাকি। মস্তক, পুস্তক, আস্তে, শ্রাবণ, প্রশ্ন ইত্যাদিতে আমরা 'শ' উচ্চারণ না করে 'স', অর্থাৎ 'sh' না করে 's' করে থাকি। আরবী-ফার্সীতে আছে চার রকমের ঐ ধরনের উচ্চারণ। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণপদ্ধতি মেনে নিয়ে একটি 'স' দিয়েই সব কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন। তবে পুব বাঙলায় 'ছ' অক্ষর 'স'-এর মত উচ্চারিত হয় বলে মাঝে মাঝে (পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক কালে আকছারই) 'ছ' এসে 'স'-এর স্থান নিয়েছে।

এ আলোচনার সর্বশেষে কিন্তু নির্ভয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে তারই রীতিনীতি মেনে নিয়েছিলেন। উদ্ভট বিদকুটে বানান লিখে নূতন নূতন ধ্বনি আমদানির বন্ধ্যাগমন করেননি। আরবী-ফার্সী শব্দের বাঙলা বানানে প্রথম ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯৩৬ সালে বাঙলা বানান নিয়ন্ত্রণ ও সরল করতে চাইলেন। কিন্তু সে আলোচনা

অতিশয় দীর্ঘ হয়ে পড়বে, আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং তদুপরি আমার বিলক্ষণ জানা আছে, এ আলোচনায় অধিকাংশ পাঠকেরই কোনও উৎসাহ নেই। তবু যে আমি করছি, তার কারণ, বাঙলা বানানের অরাজকতার মাঝখানে একথাও সত্য যে বাঙলার একাধিক তরুণ নানা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা শব্দ ও ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাঁরা যদি এসব বিষয়ে গবেষণা করেন তবে আমার 'নানা প্রশ্নে'র কিছুটা উত্তর আমি হয়তো পাব।

এটা অবশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নূতন নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বানানের অরাজকতা দূর করার জন্য সাহিত্য-পরিষদ (?) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (?) অনুরোধ করেন, তিনি ঐ সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। আমার যতদূর জানা আছে, তিনি সে কার্য শেষ করে উঠতে পারেননি। আমার এ মন্তব্যে ভুল থাকতে পারে, কারণ সমস্ত জিনিসটা আমার আবছা-আবছা মনে আছে।

শেষ প্রশ্ন :—

বাঙলা বাক্যগঠন, পদবিন্যাস অর্থাৎ সিনটেক্স্ এল কার অনুকরণে?

ফার্সীতে বলি, চুন (যখন) পাদশা (বাদশা) মরা (আমাকে) দীদন্দ (দেখলেন) উনহা (উনি) গুফতন্দ (বললেন) তু (তুই) কুজা (কোথায়) মীরওয়ী (যাচ্ছিস্)?

হুবহু একই সিনটেক্স্?

ফার্সী থেকে?

এবং সবশেষে প্রশ্ন :—

আমরা যে গোটা গোটা বাঙলা লেখার সময় এবং সাইন-বোর্ডে বাঙলা অক্ষরের কোনও জায়গায় মোটা কোনও জায়গায় সরু করি সেটা এল কোথা থেকে? ফার্সী লেখার কলম (—আমাদের প্রাচীন লেখনী বা লোহার স্টিলো না—) ব্যবহার করেছিলুম বলে?

জাতীয় সংহতি

মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।

এই যে ফার্সী নামক ভাষা এটি সাতশ' বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল। যদিও পাঠান ও মোগল কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। শেষ বাদশা বাহাদুর শা' বাদশার অন্তঃপুরেও তুর্কী বলা হত। যদিও রাজদরবারে ফার্সী চলতো, কিন্তু কবিসম্মেলনে প্রধানত উর্দু।

ইংরেজও প্রথম একশ' বছর এ দেশে ফার্সী দিয়েই কাজ চালায়। ১৮৪০-এর কাছাকাছি একদিন তারা ফার্সী নাকচ করে দিয়ে ইংরিজি চালালে। যে হিন্দু কায়স্থরা একদা অত্যুত্তম ফার্সী শিখে পদস্থ রাজকর্মচারী হতেন, তাঁরা ৫০/৬০ বছরের ভিতর ফার্সী বেবাক ভুলে গিয়ে ইংরিজির মাধ্যমে রাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকের মুখে শুনি, কলকাতা হাইকোর্টে নাকি এখনও তাঁদের প্রাধান্য অতুলনীয়। বাদবাকি ভারতবর্ষে এখন কজন লোক ফার্সী জানেন সেটা বের করতে হলে দিনের বেলাও লণ্ঠন নিয়ে বেরুতে হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কথা হচ্ছে—অবশ্য এই দুই

সম্প্রদায়েরই যাঁরা উর্দুর শক্ত গোড়াপত্তন করতে চান তাঁরা ফার্সী শেখেন—বাঙালী যেমন আপন বাঙলাকে জোরদার করতে হলে সংস্কৃত শেখে।

যে ফার্সী প্রায় সাতশ' বৎসর ধরে ভারতবর্ষে দাবড়ে বেড়াল, হাজার বছর ধরে তুর্কীস্থান থেকে তাইগ্রীস নদ অবধি রাজত্ব করলো (লাতিনের মতই ফার্সীকে সে যুগের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বলা যেতে পারে) সেই ফার্সীই পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষে লোপ পেল!

ইংরিজি মাত্র একশ' বছর রাজত্ব করেছে। তার লোপ পেতে কত দিন লাগবে?

শ্রদ্ধেয়া বিজয়লক্ষ্মী সেদিন বলেছেন, 'ইংরিজি আমাদের লিগেসি, ওটা আমরা ছাড়ব কেন? তাঁর পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় পিতা মোতীলাল ফার্সীকে তাঁর লিগেসি মনে করতেন। ইংরেজ আমলে একদা দিল্লীর বিধানসভায় দুই ইংরেজ একে অন্যকে প্রচুর অহেতুক প্রশংসা করলে পর মোতীলালজী বললেন, 'ফার্সীতে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে : "মন্ তোরা হাজী মীগোইম্, তো মরা কাজী বগো!" অর্থাৎ আমি তোমাকে হাজী বলে সম্বোধন করবো, আর তুমি আমাকে কাজী বলে সম্বোধন করো—অথচ ইনিও মক্কাতে গিয়ে হজ করেননি, উনিও কাজী বা ম্যাজিস্ট্রেট নন।' সেই ফার্সী ভাষার লিগেসি গেছে,—ইংরিজির কবে যাবে?

পাঠক ভাববেন না, আমি ইংরিজি তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। আদপেই না। নিজের স্বার্থেই আমি চাই, ইংরিজি থাকুক—এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায়, মশাই, হিন্দীর 'গাড়ি আতী হৈ, জাহাজ জাতা হৈ' লিঙ্গ মুখস্থ করে করে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাব! যে কটা দিন বেঁচে থাকবো, ইংরিজি ভাঙিয়েই খাব। সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, আমি আপনি চাইলে না চাইলেও ইংরিজির ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।

আরেকটি উদাহরণ নিন। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওকীবহাল নই—যা শুনেছি তাই বলছি। ইংলন্ডে নাকি নরমান বিজয়ের ফলে ফরাসী রাষ্ট্রভাষা হয়ে যায়, এবং তামাম ইংলন্ডের লোক নাকি পড়িমড়ি হয়ে ফরাসী শেখে। কবি চসারের সামনে নাকি সমস্যার উদয় হয়, তিনি ফরাসী না ইংরিজিতে কাব্য রচনা করবেন? (ভাগ্যিস ইংরিজিতে করেছিলেন, কারণ ফরাসী লিখে কোনও ইংরেজ যশ অর্জন করেছেন বলে শুনিনি; এদেশে যেমন আটশ' বছর ফার্সী চর্চার পর এক আমীর খুসরৌই কিছুটা নাম করতে পেরেছেন—তাও তাঁর মাতৃভাষা ছিল ফার্সী)।

নরমান বিজয় খতম হওয়ার পরও ইংরেজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তার ফরাসী লিগেসি যেন মকুব না হয়ে যায়। কোটি কোটি পৌণ্ড খর্চা করে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ফরাসী শিখিয়েছে, কাচ্চা-বাচ্চার জন্য ফরাসী গভার্নেস রেখেছে, ছুটিছাটা পেলেই প্যারিস পানে ধাওয়া করেছে। আর তার ভাষার ভাই মার্কিনও ফরাসী মত্ততায় কিছুমাত্র কম নয়। শুনেছি, মার্কিনী ইংরিজিতে নাকি প্রবাদ আছে, 'সাধু মার্কিনেরই মৃত্যুর পর প্যারিস-প্রাপ্তি হয়—' সেই তার স্বর্গপুরী, মুসলমানের বেহেশৎ, হিন্দুর কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির মত।

ফরাসী শেখানোর বাজে খর্চা যাঁরা কমাতে চান তাঁরা নাকি হালে হাতে-কলমে সপ্রমাণ করেছেন যে, লন্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিক্ষিত ইংরেজকে ফরাসীতে প্রশ্ন শুধোলে

শতেকে গোটেক ফরাসীতে উত্তর দিতে পারে, কি না পারে।

শুনেছি ব্রিজ দিয়ে নাকি ফ্রান্স-ইংলন্ডে যোগ করে দেওয়া হবে। হায় রে কপাল! যখন ভাষার সেতু ছিল, তখন লোহার সেতু ছিল না; এখন লোহার সেতু হচ্ছে তো ভাষার সেতু নেই!

আরেকটি উদাহরণ দিই। খ্রীষ্টধর্ম ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবার পর খ্রীষ্টভক্তগণের বাসনা হল, খ্রীষ্টধর্মের কল্যাণে সমস্ত ইয়োরোপে যে এক নবীন ঐক্য দেখা দিয়েছে সেটা যেন লোপ না পায়। তাই তাঁরা আপ্রাণ লাতিন আঁকড়ে ধরে রইলেন। পাছে সেই ঐক্য লোপ পায়, তাই দেশজ অনুন্নত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না (মুসলমানরাও বহুকাল কোরাণের ফার্সী কিংবা উর্দু, বাঙলা অনুবাদ করতে দিতে চাননি, ঐ একই কারণে)। লুথারের অন্যতম প্রধান সংস্কার ছিল জর্মন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রচার। ফলে শেষ পর্যন্ত ফরাসী লাতিনের স্থানটি কেড়ে নিল—এই সেদিন পর্যন্ত জর্মনভাষী ফিড্রিক দি গ্রেট ফরাসী কবি ভলতেয়ারকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর অতি-কাঁচা ফরাসী কবিতা মেরামত করিয়ে নিতেন—এবং সর্বশেষে ইয়োরোপের সর্বভাষা আপন আপন দেশে মাথা খাড়া করে দাঁড়ালো। ইস্তেক ডেনিশ, ফিনিশ পর্যন্ত। লাতিন-ফরাসী সংহতি গেল। অনেক পর্যটকের মুখে শুনতে পাবেন—সে আসন এখন ইংরিজি নিচ্ছে। শুনে হাসি পায়। হোটেলবয়রা কিছুটা ইংরিজি বলতে পারে বইকি, যেমন মাদুরার হোটেলবয়ও কিঞ্চিৎ হিন্দুস্থানী কপচায়, কিন্তু প্যারিস কিংবা ভিয়েনার রাস্তায় ঐসব দেশবাসীর সঙ্গে ইংরিজিতে দু'দণ্ড রসালাপ করবার চেষ্টা দিন না, দেখুন না ফলটা কি হয়।

আমি যদি বলি, সমস্ত ইয়োরোপে যতখানি ইংরিজি বলা হয়, তার তুলনায় ভারত পাকে বেশী হিন্দুস্থানী বলা হয়, তবে ভুল বলা হবে না—অবশ্য বই পড়ার কথা হচ্ছে না, সেটা নির্ভর করে জনসাধারণে শিক্ষার বিস্তৃতির উপর।

অর্থাৎ ইংরিজি ও লাতিন সংহতি এনে দিতে পারবে না।

কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার উদাহরণ আরব-আফ্রিকা ভূখণ্ডে। ইরাক থেকে আরম্ভ করে সিরিয়া, লেবানন, মিশর, তুনিস, আলবজজরিয়া, মরক্কো, এদিকে কুয়েইত, বাহরেন, মক্কা-মদিনা, ইয়েমেন, জর্ডন, সর্বত্রই আরবী প্রচলিত। লেবানন বাদ দিলে এদের প্রতিটি রাষ্ট্রে চৌদ্দ আনা পরিমাণ লোক মুসলমান এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু বের্‌বের্ কপ্তীক ও নিগ্রো রক্ত বাদ দিলে সকলের ধমনীতেই প্রায় আভেজাল সেমিতি রক্ত।

কিন্তু কোথায় সেই আরব সংহতি?

প্রাচীন দিনের কাহিনীতে ফিরে যাব না। এই আপনার আমার চোখের সামনেই দেখতে পেলুম, ইরাক সে-সংহতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, কুয়েইত জাতভাই কাসেমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিধর্মী (কারও কারও মতে 'কাফের') ইংরেজকে দাওয়াত করে খানা খাওয়ালে, এবং পরশু না তরশু দিন সিরিয়াও নাসেরের মিশরীদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে। এমন কি সিরিয়ার মসজিদে মসজিদে নাকি মোল্লারা নাসেরকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন, নাসের নাস্তিক, টিটোর সঙ্গে কোলাকুলি করে, তারই আশকারায় মিশরের টেলিভিশন অশ্লীল ছবি, অর্ধনগ্না রমণী দেখায়!

এক ধর্ম, এক রক্ত, এক ভাষা। এক ভাষা, বিশেষ করে বললুম, কারণ সিরিয়া,

ইরাক, মিশরের কথ্য ভাষাতে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও ওসব জায়গায় কোনও উপভাষা সৃষ্টি হয়নি—সেই এক হাজার বছরের পুরনো ক্লাসিকাল আরবীই সর্বত্র চলে। তবু আর মিলন হয়ে উঠছে না।

* * *

কাজেই সংহতির সন্ধানে অন্যত্র যেতে হবে। গুজরাতী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, সবাই মিলে হিন্দী কপচালেই যে রাতারাতি আমাদের জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে, এ-দুরাশা যেন না করি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী বলেই বলছি তা নয়, আমার মনে হয়, তিনিই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার চিন্তা করেছেন।

ভারতীয় সংহতি

ভারতীয় সংহতি তবে কোথায়?

এস্থলে নিবেদন করে রাখি যে আমার ধারণার সঙ্গে অল্প লোকেরই ধারণা মিলবে ও যাঁদের সঙ্গে মিলবে তাঁরা এবং আমিও এ-দুরাশা পোষণ করি না যে বিংশ শতাব্দীর লোক আজ অথবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বক্তব্য কান দিয়ে শুনবে।

বেদ উপনিষদ নমস্য কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষেই এসবের চর্চা অতি কম। এমন কি পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি, গীতা পর্যন্ত এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ প্রচলিত ছিল না।

আপনি ভারতবর্ষের যে কোনও গ্রামে যান না কেন, তা সে মালাবারে আসামে পাঞ্জাবেই হোক—সেখানকার লোকনাট্য চারণ গানে সর্বত্রই মহাভারত রামায়ণ বিরাজিত। জনপদবাসীর রসাস্বাদনের প্রধান উৎস রামায়ণ মহাভারত। আমি একবার মালাবারের গ্রাম্য কথাকলি দেখতে এবং শুনতে গিয়ে তিন মিনিটেই বুঝে যাই, হনুমান সভাজনকে সালঙ্কার বর্ণনা করছেন, তিনি কি করে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন, নগর পরিদর্শন করলেন, লঙ্কার কদলীবনে কি প্রকারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটালেন, অবশেষে রাবণের অনুচর তাঁর পুচ্ছটিতে অগ্নিসংযোগ করলে তিনি কি প্রকারে গৃহ থেকে গৃহান্তরে লম্ফপ্রদান করে নগরীতে ব্যাপকভাবে বহ্নি প্রজ্বলিত করলেন। মালায়ালম ভাষার এক বর্ণ না জেনেও আমি স্বচ্ছন্দে গল্পটি উপভোগ করলুম।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাঁরাই পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন, রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় জীবনের কতখানি গভীর অতলে প্রবেশ করেছে।

এবং এই নাট্যনৃত্য উপভোগ করে শুধু হিন্দু না, মুসলমানও। কারণ ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মাতৃভাষা এক। বাঙ্গলার মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন বাঙলা, গুজরাতী মুসলমানের মাতৃভাষাও গুজরাতী। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন উর্দু, হিন্দুরও তাই—এখন অবশ্য হিন্দী ক্রমে ক্রমে উর্দুর জায়গা দখল করে নিচ্ছে। মাতৃভাষায় আমোদ-আহ্লাদ করাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা—শুনেছি দেশবিভাগের পরও 'হরহর মহাদেব' ফিল্ম ঢাকাতে সে বক্স আপিস ভরলে তাতে সিনেমার মালিকগণ বিস্মিত হন।

কিন্তু অমিলও আছে।

ধর্মজগতে হিন্দু ভীষ্ম-কর্ণকে আদর্শ বলে ধরে নেয়, মুসলমান নেয় না। গোব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করবার কোনও কারণও মুসলমানের নেই। অবশ্য আউল-বাউল মুর্শিদীয়া মিস্টিকগণের গানে কিছুটা রামায়ণ-প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ব্যাপকভাবে সেটা গ্রহণ করেনি।

* * *

রামায়ণ-মহাভারতের উৎস থেকে সঞ্জীবনী-সুধা আহরণ করে হিন্দু সংহতি পুনর্জীবিত করা যায়—অবশ্য যদি সাহিত্যিক, সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতাদের এ পন্থায় আস্থা থাকে এবং সে কর্মে নিজেদের নিয়োগ করেন, বিনোবাজী যে রকম করেছেন, কিন্তু যদি ভারতীয় সংহতির কথা তোলা যায় তবে সমস্যাটা কঠিন হয়, কারণ ভারতবর্ষে মুসলমান খ্রীষ্টান পার্শী গারো নাগা আদিবাসীও আছেন। জৈনদের কথা তুলছি নে, কারণ একমাত্র উপাসনা পদ্ধতি বাদ দিলে তাঁরা সর্বার্থে হিন্দু।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কোন্ জায়গায়? রসের ক্ষেত্রে যে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সে-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

এখন যা বলতে যাচ্ছি, সেটি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে।

ছেলেবেলা থেকেই আরব দেশাগত দু'একটি আরব মুসলিমের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তী যুগে আরব দেশে থাকবার আমার সুযোগ হয়েছিল।

এঁদের ধর্মবিশ্বাস সরল। এঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাতালা এই বিশ্ব মানুষের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু পাছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে তাই তিনি ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। সেই ধর্মে কতকগুলি বস্তু ও আচরণ আল্লা বেআইনী বলে হুকুম দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাতালা হুকুম দিয়েছেন, তুমি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো, যদি সকলকে সমান সম্মান সমান প্রেমের চোখে দেখতে পারো। না পারলে তোমার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অন্যায়।

আরব ভূমি তথা অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে তাই যদি কেউ বৃদ্ধ বয়সেও পুনরায় ভার্যা গ্রহণ করে তবে তাই নিয়ে লোকনিন্দা হয় না। সমাজ ভাবে, সে একাধিক স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারবে কিনা, সে দায়িত্ব তার স্কন্ধে।

কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান অর্থাগম হলেই দ্বিতীয় দারা গ্রহণ করে না। তার ভিতরে কেমন যেন একটা ত্যাগের আদর্শ আছে। তার বক্তব্য, 'আল্লাতালা আমাকে এটা সেটা অনেক কিছুই উপভোগ করতে দিয়েছেন সত্য কিন্তু আমি চেষ্টা করে দেখি না, আমার এগুলো না হলে চলে কিনা?'

এ-কথা বলা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয় যে কোরানে ত্যাগের আদর্শ নেই। বিস্তর আছে। বস্তুত জকাৎ (বাধ্যতামূলক দান-ক্ষয়রাত) ইসলাম সৌধের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং নিতান্ত দীন-দুঃখী ছাড়া সকলকেই কিছুটা দান করতে হয়। তদুপরি সুফী এবং সাধুসন্ত সম্প্রদায় তো চূড়ান্ত ত্যাগের আদর্শই বরণ করে নেন। উপস্থিত এঁদের কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য ভারতীয় মুসলিম যতখানি ত্যাগের আদর্শ বরণ করেছে—সে শুধু ধনদৌলতের বেলায়ই নয়, আমোদ-আহ্লাদ পারিতোষ-আনন্দের আভ্যন্তরীণ জগতেও—

অন্যান্য মুসলিম ততখানি করেনি।

এই ত্যাগের মন্ত্র ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে প্রচলিত।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—অর্থাৎ তাকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে।

* * *

এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও ত্যাগ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

যার কিছু নেই, উপার্জন করার কোনও ক্ষমতা নেই, তার মুখে 'ত্যাগ ত্যাগ' শোভা পায় না। বিশেষত এই বিংশ শতাব্দীতে। যখন অক্ষম জন সর্বদায়িত্ব এড়িয়ে 'ত্যাগে'র অছিলা ধরে সোশাল সার্ভিসের নাম করে আশা করেন, সমাজ তাঁকে পুষবে, এবং ভালো ভাবেই পুষবে, কারণ তিনি 'সর্বস্ব' (!) 'ত্যাগ' করেছেন, তখন আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে (এরই অন্য উদাহরণ মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—'শক্তিহীনের ক্ষমা ক্ষমা নয়)। সোজা কথা বিড়লা-টাটার দৌলত তাঁরাই ত্যাগ করতে পারেন,—আমি পারি নে, কারণ ও দৌলত আমার নয়।

ওদিকে আবার উপনিষদ বলেছেন, 'মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্!' অন্যের ধনের উপর লোভ করো না।

অর্থাৎ চাষা, মজুর, সাহিত্যিক, মাস্টার আপন আপন পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে, অন্যের ধনের প্রতি লোভ না করেও।

সেই ধন অর্জন করে ত্যাগের মাধ্যমে তাকে উপভোগ করতে হবে।

এই আদর্শ হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই আছে, এবং বহু যুগ ধরে জীবনে উপলব্ধি করেছে বলে এই দৃঢ়ভূমির উপর জাতীয় ঐক্য গঠিত হতে পারে। তাহলে আর কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না।

শুধু তাই নয়, তা হলে ভারতবর্ষ যে শুধু শক্তিশালী রাষ্ট্র বলেই গণ্য হবে তা নয়, সে ভদ্রতম সম্ভ্রান্ততম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হবে।

ভাষা

আমার আর একটি প্রশ্ন আছে :

এই যে লাকসমবার্গের মত ক্ষুদে রাষ্ট্র কিংবা জনবিরল ফিনল্যান্ড, কিংবা ঐ ধরনের ছোট-বড় নানারকমের রাষ্ট্র রয়েছে, কোন্‌খানে দেশটা সে দেশের আপন ভাষায় না চালিয়ে অন্য কোনও বিজাতীয় ভাষায় চালানো হচ্ছে?

সুইজারল্যান্ডের লোক তিন অঞ্চলের তিন ভাষায় কথা বলে। জর্মন, ফরাসী এবং ইতালীয়। রোমান্‌শ ভাষায় এত কম লোক কথা বলে যে সেটার কথা না হয় নাই তুললুম। এদের সকলের পক্ষে দিশীই হোক আর বিদেশীই হোক—কাজ চালাতে যে বিস্তর সুবিধা হত সে বিষয়ে কি সন্দেহ? কত পয়সা খরচ করে তিন-তিনটে ভাষায় সরকারী-বেসরকারী বিস্তর জিনিস ছাপাতে হয়, তিন ভাষায় লোকে বক্তৃতা দেয় বলে পার্লামেন্টের কাজ দ্রুতগতিতে এগোয় না, এক অঞ্চলের জিনিস অন্য অঞ্চলে বেচতে হলে তার জন্য আলাদা বিজ্ঞাপন, আলাদা এজেন্ট রাখতে হয়, এবং আরও কত যে ঝামেলা তার ইয়ত্তা

নেই। কিন্তু ওরা হাসিমুখে সব-কিছুই মেনে নিয়েছে।

তার কারণ মাত্র একটি, এবং সে-কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রযোজ্য।

মাতৃভাষা ছাড়া আর অন্য কোনও ভাষায় কাজ চালানো যায় না।

অবশ্য আজ যদি বাঙলা দেশ চালানোর জন্য একজন রাজা, তাঁর জনা পঁচিশ মনসবদার এবং একটি পুরুষ্টু সৈনদল থাকলেই যথেষ্ট হত—তাহলে ইংরিজি হিন্দী যে-কোনও ভাষা দিয়েই অল্পায়াসেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত। যেমন ধরুন একটা চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার, গুটিকয়েক কেরানীতে ইংরিজির মারফতে দিব্য কাজ চালিয়ে নেয়। কিন্তু আজ পৃথিবীর অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আজ বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক গ্রামবাসীর যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি কতকগুলো হক্ক এবং দাবিও আছে। এরা প্রত্যেকেই যে শহরে এসে মন্ত্রী হতে চায় তা নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে এদের মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে গা-গতর খাটানোর পর যদি দু'মুঠো না খেতে পায় তবে রাষ্ট্র অবিচার করছে।

গণতন্ত্রের সামনে এই বড় পরীক্ষা।

এবং আমি এর উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিতে চাই।

গ্রামবাসীর সক্রিয়, সতেজ এবং দরদী সহযোগিতা না পেলে বাঙলার কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, নেতারা, সমাজপতিরা এদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন কোন্ ভাষার মাধ্যমে? ইংরিজির কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি; এইবার হিন্দীতে আসি।

প্রথমেই একটা সাফাই গেয়ে নিই। আমি হিন্দী-প্রেমী এবং ঐ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। হিন্দী বাঙলার বুকের উপর চেপে বসে একদিন 'হিন্দী ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম' কায়েম করবে এ দুর্ভাবনা আমার মনের কোণেও আসে না। বস্তুত স্বরাজ-লাভের পর কলকাতা তথা বাঙলা দেশে হিন্দী প্রচারের যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমি আদৌ সন্তুষ্ট নই—এর চেয়ে ঢের ব্যাপকতর চেষ্টার প্রয়োজন হবে—কিন্তু সে-কথা পরে হবে, উপস্থিত ফের গ্রামে ফিরে যাই।

গ্রামে গ্রামে পাঠশালে পাঠশালে হিন্দী শেখাতে হলে যে কতখানি রেস্তোর প্রয়োজন হবে সেটা একবার শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এ নিয়ে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর করতে চাই নে—জিনিসটা এতই সরল এবং স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, যে দেশের লাখের মধ্যে একজন গ্রামবাসীও আপন প্রদেশের বাইরে যায় না, তার পক্ষে ভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই।

সবসুদ্ধ মিলিয়ে দেখা গেল, নেতারা তা হলে এঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন বাঙলার মারফতেই।

কিন্তু নেতারা যদি পরিপুষ্ট হন হিন্দী চর্চা করে, তাহলে ইংরেজ আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে—তাঁরা জানতেন ইংরিজি, শ্রোতারা জানত বাঙলা, দুজনার চিন্তা-জগৎ, অনুভূতি ক্ষেত্র ভিন্ন। শেষটায় নেতারা যে অতিকষ্টে বাঙলা শিখে কাজ চালালেন, সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

ওদিকে ভারতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি তো চাই। এই যে প্রদেশে প্রদেশে দ্বন্দ্ব, একই প্রদেশের ভিতর সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর অবিচার, এ তো ক্রমাগতই বেড়ে চলছে,

এর বিরুদ্ধে তো কিছু-একটা করা চাই।

এর সরল সহজ রাস্তা নেই।

ভাষা এক না করেও সংহতি হয়—যেমন সুইজারল্যান্ডে, বেলজিয়ামে আছে—এবং ভাষা এক হলেও সংহতি না হতে পারে—যেমন নাসের, কাসেম, মক্কার বাদশা, কুয়েতের শেখ সক্কলেরই ভাষা আরবী কিন্তু এদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের অন্ত নেই। এই যে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সংযুক্ত আরবরাষ্ট্র (UAR) করা হল তার সূতিকাগৃহ তো শ্মশান-শয্যায় পরিণত হতে চলল।

মহাত্মাজীকে এক ইংরেজ সাংবাদিক শুধিয়েছিল, 'তোমরা আপসে এত লড়ো কেন?' মহাত্মাজী বলেন, 'ইংরেজ লড়ায় বলে।' ফের প্রশ্ন—'ইংরেজ লড়তে চাইলেই তোমরা লড়ো কেন?' উত্তর হল, 'আমরা মূর্খ বলে!'

সেই হল মুখ্য কথা! আমরা মূর্খ!

এখন তো আর ইংরেজ নেই, কেউ ওস্কাচ্ছে না, আমরা তবু লড়ে মরছি!

তাহলে প্রশ্ন—এই মূর্খতা ঘুচাই কি করে?

বিদ্যাদান করে, ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করে, রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে।

এইখানেই অধীনের সবিনয় নিবেদন—সেটি মাতৃভাষার মারফতেই করতে হবে, অন্য কোন পন্থা নেই, নেই, নেই।

ভ্যাকিউয়াম

কবি এবং বৈজ্ঞানিকে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত সে-কথা আমরা জানি। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'অহো-হে! কী সুন্দর সূর্যোদয়।' বৈজ্ঞানিক গম্ভীর কণ্ঠে টিপ্পনী কাটলেন, 'হস্তীমূর্খ! সূর্যের আবার উদয়, অস্ত কি? পৃথিবীটা ঘুরে যাওয়াতে মনে হল সূর্যোদয় হয়েছে।'

কিন্তু কোনও কোনও স্থলে উভয়েই এক মত পোষণ করেন।

কবি গাইছেন,

'কে বলে সহজ, ফাঁকা যাহা তারে
সহজ কাঁধেতে সওয়া
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়
ততই কঠিন বওয়া॥'

বৈজ্ঞানিকও উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে'—

'নেচার এবরজ ভ্যাকিউয়াম।'

ধর্মের উচ্ছেদ যাঁরাই কামনা করেন তাঁরাই এ তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। প্রাচীন যুগের চার্বাকপন্থী বা তার পরবর্তী যুগের মক্কার কাফিরদের কথা হচ্ছে না। এ যুগের কথা বললেই এ যুগের লোক সাড়া দেয়। এ যুগে ধর্মের প্রধান শত্রু টোটেলিটেরিয়ান স্টেট, একচ্ছত্র রাষ্ট্র—'জগদ্দল রাষ্ট্র' বললে জিনিসটা আরও পরিষ্কার

হয়। তা সে রাষ্ট্র ফাসিস্টই হোক আর কম্যুনিস্টই হোক।

হিটলার বা স্তালিনের ভাবখানা অনেকটা এই : 'কী! আমার রাষ্ট্রে আমি ভিন্ন অন্য কার মুরদ যে আমার কথার উপর কথা কইতে যাবে? আপন রাষ্ট্রের প্রতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি—অবশ্য আখেরে সেটাও আমি দখল করবো—তোমার আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-দর্শনে তোমার আদর্শ ঠিক করে দেব আমি।' এ যেন বাইবেল বর্ণিত যেহোভার তীব্র তীক্ষ্ণ আদেশ, 'আমা ভিন্ন তোর অন্য কোনও উপাস্য দেবতা থাকবে না।'

এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠলো সেটা প্রধানত ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্পী-দার্শনিকের সে রকম কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। আর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা জীবনদর্শন চিন্তা করেন কমই। গবেষণার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আইন-আদালত নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা গোড়ার দিকে কিছুটা আপত্তি জানান বটে, কিন্তু দেশের ডিক্টেটর একবার জোর করে, ভয় দেখিয়ে, যে করেই হোক—যদি 'আইনত' পাস করিয়ে নিতে পারেন যে তিনিই সর্ব আইনের মূলাধার, তা হলে এদের আর আইনত কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। মিলিটারির বেলায়ও হুবহু তাই। ডিক্টেটর যখন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক উর্দি পরে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ান তখনই সেনানায়করা শপথ নেন যে তাঁর কোন আদেশ তাঁরা ভঙ্গ করবেন না। সকলেই জানেন, হিটলারকে নিধন করার জন্য বড় বড় সেনাপতিরা যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন তখন তাঁদের প্রধান অন্তরায় ছিল এই শপথ।

শেষ পর্যন্ত যখন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতনের ফলে ধর্ম ভূগর্ভে আশ্রয় নেয়, তখন ধর্মবৈরী ডিক্টেটররা সম্মুখীন হয় পূর্ববর্ণিত ঐ 'ভ্যাকিউয়ামে'র সম্মুখে। এতদিন ধরে ধর্ম মানুষের জীবনে বৃহৎ এক অংশ জুড়ে বসে ছিল, এখন ধর্ম চলে যাওয়াতে সে জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে গেল সেটা পূর্ণ করা যায় কি প্রকারে?

হিন্দুর ধর্মজীবনে বাধ্যবাধকতা অত্যল্প (তাও ব্রাহ্মণের); তার বাধ্যবাধকতা সামাজিক জীবনে। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের ঠিক তার উল্টোটা। তারা সমাজে স্বাধীন। কিন্তু ধর্মে প্রচুর বাধ্যবাধকতা।[১] ডিক্টেটর বনাম ধর্মে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং এখনও চলেছে, সেটা প্রধানত খ্রীষ্টান দেশেই সীমাবদ্ধ বলে আমরা সেইটে নিয়ে আলোচনা করব। তবে এ দেশের হিন্দু পাঠকেরা খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে ইসলামের সঙ্গে বেশী পরিচিত বলে তার থেকেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেব।

খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের সর্বপ্রথম মূল সিদ্ধান্ত—ইমান। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস—faith কি? তুমি যদি বলো, ঈশ্বর নেই—জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে রকম বলে,—কিংবা বলো, ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু দেবদেবীও আছেন অসংখ্য কিংবা বলো যীশুতে বিশ্বাস না করেও মোক্ষলাভ সম্ভবে—তা হলে তুমি শুধু পাপী না, তুমি অখ্রীষ্টান (খ্রীষ্টান দৃষ্টিবিন্দু থেকে 'কাফির') হয়ে গেলে। ডিক্টেটররা এ সবেতে যে খুব বেশী আপত্তি করেন

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ তাই আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের একাধিক চিঠিতে লেখেন, হিন্দুর ধর্ম ও খ্রীষ্টানদের সমাজ নিয়ে নূতন হিন্দু-জীবন গড়তে হবে। বঙ্কিমও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বহু-বিবাহনিরোধ ব্যাপারে বলেছেন, এ জিনিস খারাপ, ধর্ম দিয়ে প্রমাণ করেই বা লাভ কি? হিন্দু চলে সামাজিক লোকাচার মেনে।

তা নয়, তাদের আপত্তি, তুমি যখন বলো, কর্তব্য নির্ধারণার্থে তুমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর নির্ভর করো, তখনই তাদের আপত্তি। হিটলার স্তালিন বলেন, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেব আমি। বাইবেল কুসংস্কারাচ্ছাদিত, বুর্জুয়ানির্মিত, প্রলেতারিয়া-শোষক গ্রন্থ। আসল কেতাব 'মাইন কাম্‌পফ' কিংবা 'ডাস্ কাপিটাল'। বিশ্বাসী খ্রীষ্টান যে রকম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না, যীশু কোনও ভুল করে থাকতে পারেন, বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট ঠিক তেমনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না, মার্ক্স-লেনিন প্রচারিত ডাইলেক্টিক্যাল ম্যেটিরিয়ালিজ্‌মে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে।

কিন্তু এই ইমান বা faith ভিতরকার জিনিস—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইমান চলে গিয়ে ভ্যাকিউয়াম সৃষ্ট হল কিনা, হলপ করে কিছু বলা যায় না।

আসল শিরঃপীড়া ধর্মের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। সেখানে যে ভ্যাকিউয়াম তৈরি হয় সেটা ভরাট করা যাবে কি দিয়ে?

আবালবৃদ্ধ নরনারী যায় রবিবারে চার্চে। বুড়োরা যাক্—মরুক গে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে করা যায় কি? ঠিক ঐ সময়েই লাগিয়ে দাও—কুচকাওয়াজ, মার্চ। হিটলার-পন্থীরা দাঁড়াও চক্রাকারে। নেতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করবে, 'হাইল (জয়তু!)' জোয়ানরা সমস্বরে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দেবে—'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ফের 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ইত্যাদি। টকটকে লাল মুখ যতক্ষণ না নীল হয়ে যায়। গির্জাতেও তো ঐ রকমই হয়। পাদ্রীসাহেব মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরা উত্তর দেন দুই-চারিটি শব্দে কিংবা শুধু 'আমেন' (তথাস্তু) বলে।

ক্রিসমাস, ইস্টারের উপাসনা জব্বর ভারী রকমের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি-ডে ন্যুরন্‌বের্গে। সপ্তাহব্যাপী মোচ্ছব। ঝাড়া চারটি ঘণ্টা হিটলার দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত প্রসারিত করে দাঁড়ানেল বেদী—থ্যুড়ি—প্ল্যাটফর্মের উপর। বিশ্বাসী দল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁর সামনে দিয়ে মার্চ পাস্ট করলেন। কী উত্তেজনা, কী উৎসাহ! বিদেশাগত 'কাফির' (অর্থাৎ এখনও যে নাৎসী-ধর্ম গ্রহণ করেনি) তো বে-এক্তেয়ার—ইস্তেক জর্মনীর দুশমন ইংরেজের রাষ্ট্রদূত হেন্ডারসন। অবশ্য পাঁড় কাফির এসব পরবে আসে না—যেমন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মসিয়ে ফ্রাঁসোয়া পঁসে! তিনি ফাঁড়া এড়াবার জন্য ঐ সময় ছুটি নিয়ে চলে যেতেন স্বদেশে, জমিদারী তদারক করতে।...রুশ দেশেও এসব 'পরব' হয়।

ধর্মের আরেক অঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধন—উপবাস। প্রবর্তিত হল 'আইন-টপ্‌ফ্—গরিস্ট।' সপ্তাহে একদিন খাবে শুধু এক পদের খানা। মাংস, আলু, ফুলকপি, চর্বি সবসুদ্ধ মিলিয়ে ঘ্যাঁট। 'অর দ্যভ্‌র' দিয়ে আরম্ভ করে 'সেভরি' পর্যন্ত অষ্টাদশপদী খানা মানা। (কিন্তু বিপদে পড়লে আমরা, ধর্মভীরুজনও, 'ডুবে ডুবে জল খাই', ঠিক তেমনি প্রচুর নাৎসী প্রেসার কুকারের মত একটি পাত্রে তিন খোপে তিন রকমের খাদ্য রান্না করে খেল—কারণ বলা হয়েছে, 'আইন-টপ্‌ফ্'—অর্থাৎ 'এক হাঁড়িতে' রান্না খাদ্য এক হাঁড়িতেই তো রান্না হয়েছে, আপত্তি আর কি? হিটলারের কর্তাভজা শিষ্য পার্টি সেক্রেটারি আরেক কাঠি সরেস। হিটলার 'মীটলেস্' তিনি 'কাটলেস্'। অর্থাৎ নিরামিষাশী হিটলারের সঙ্গে নিরামিষ ঘ্যাঁট খেয়ে হুজুরের সম্মুখে 'ধর্মরক্ষা' করে আপন ঘরে গিয়ে খেতেন তিনখানা শুয়ারের 'কাটলেস্', (কটলেট্)!

খ্রীষ্টান যায় জেরুজালেমে যীশুর কবর দেখতে, মুসলমান যায় পীরের দর্গা জিয়ারৎ

করতে, বৌদ্ধ যায় তথাগতের অস্থিদন্তের আধার দেখতে—(হিন্দুর ও বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা, কারণ সে মৃতদেহ দাহ করে) এসব তীর্থযাত্রায় প্রচুর পুণ্য।

এদের সবাই হার মানে রুশের কাছে। হাজার হাজার নরনারী নাকি দুরন্ত শীতে রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—লেলিন-স্তালিনের 'মামি' দেখবে বলে। আর 'মামি' যে কাস্কেট। বা গোরস্তানের চেয়ে হৃদয়-মনের উপর বেশী দাগ কাটবে তাতে কি সন্দেহ?

এ বিষয়ে কম্যুনিস্টরা আমাদের হারিয়েছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত আরেকটি রিচুয়ালে তারা সর্বাগ্রণী :—

ক্যাথলিক যারা তারা পাদ্রীর সামনে আপন পাপ স্বীকার করে (কন্‌ফেশন), জৈন-বৌদ্ধ বর্ষশেষের পর্যুষণে আপন আপন দুষ্কৃতি স্বীকার করে, মুসলমান সর্বজনসমক্ষে আল্লার কাছে তওবা করে ক্ষমা চায়।

রুশদেশের দেশদ্রোহীরা ধরা পড়লে এই কনফেশনের ধুন্দুমার লেগে যায়। কে কত বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি। সবাই সমস্বরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে, 'না না, আমি সবচেয়ে পাপী, আমি সর্বনিকৃষ্ট।'

এ সম্বন্ধে একটা চুটকিলও হালে শুনেছি, রুশ প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর কাছ থেকে।

আর পাঁচটা দেশের মত রুশও পণ্ডিতগোষ্ঠী পাঠালে মিশরে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করতে। খুঁড়তে খুঁড়তে তাঁরা একটি 'মামি' পেয়ে গেলেন। খ্রুশ্চফ খুশী হয়ে শুধোলেন, 'ওটা কত দিনের পুরনো?' পণ্ডিতেরা নিরুত্তর। খ্রুশ্চফ শাসালেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাদ। উত্তর না দিতে পারলে সাইবেরিয়া।' পরদিন সব পণ্ডিত ম্যাদ-শেষের পূর্বেই হাজির। চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। খ্রুশ্চফ বললেন, 'হুঁ?' পণ্ডিতেরা সমস্বরে : 'চার হাজার দু'শ বৎসর।' 'বেশ, কি করে জানলে?' পণ্ডিতেরা ঐক্যতানে, 'মামি স্বীকার করেছে (কন্‌ফেশন)।'

* * *

এরকম প্রচুর উদাহরণ আমি টায়-টায়, দফে দফে, প্রো ফর্মা দিতে পারি। কিন্তু রচনাটি ইতিমধ্যেই আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বেসামাল হয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষে নিবেদন :

'হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যেন মনে না করেন, আমি ঐসব ধর্মের কর্মকাণ্ড (রিচুয়ালের) এবং নাৎসী-কম্যুনিস্টদের কর্মকাণ্ড সব কটাকে একই মূল্য দিই। কম্যুনিস্টরাও যেন বিরক্ত না হন যে আমি তাঁদের 'বিজ্ঞানসম্মত' 'র‍্যাশনাল' কর্মকাণ্ড 'ধর্মের আফিঙে' মাখানো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি শুধু প্যারালেল দেখিয়েছি।

এস্থলে সেই ফরাসী প্রবাদবাক্য স্মরণ করি :—'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম শোজ্‌।' 'যতই সে বদলায়, ততই তাকে আগের মত দেখায়।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

ধর্ম তবে কি?

ধর্ম

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় কে, ওটার কী-ই বা প্রয়োজন? প্রশ্নটির ভিতরে অনেকখানি সত্য লুকানো আছে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম তাঁর রাজত্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত্রকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। একদা গঙ্গাস্নান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত বলে সেটি ধর্মের আদেশ রূপে মেনে নেওয়া হত, কিংবা বলা যায়, ধর্মের আদেশ বলে সেটি পুণ্য বলে বিবেচিত হত। এখন সেটা ডাক্তারই "স্ট্রংলি রেকমেন্ড" করেন, এবং অধুনা বিজ্ঞানও নাকি সপ্রমাণ করেছে, গঙ্গাজলে কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যেগুলো অন্য জলে নেই। ধর্ম এখানে বৈদ্যের হাতে এ পুণ্যকর্ম করার আদেশ ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা বলা যায়, বৈদ্য সেটা কেড়ে নিয়েছে। আর কিছুটা কেড়ে নিয়েছে ম্যুনিসিপ্যালিটি— কোনও কোনও দেশে ম্যুনিসিপ্যালিটিই ফরম্যান জারি করে, বাড়ি বানাবার সময় প্রতি কখানা ঘর পিছু একটি বাথরুম রাখতেই হবে। না হলে প্ল্যান মঞ্জুর হবে না। আহারাদিতেও তাই। ডাক্তারই বলে দেয় কোন্‌টা খাবে, কোন্‌টা খাবে না—অর্থাৎ কোন্‌টাতে পুণ্য আর কোন্‌টাতে পাপ। এবং আকছারই তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে অনুশাসন দেন। যেমন খেতে বলেন চিকেন-সুপ—হিন্দুধর্মে, অন্তত বাঙলা দেশের হিন্দুধর্মে সেটা পাপ।

দান করা মহাপুণ্য। ধর্মের সনাতন আদেশ। কিন্তু আজকের দিনে আপনি আমি এ-অনুশাসন মেনে চলি আর নাই চলি, সরকার কান পকড়কে তার ইনকাম এবং অন্যান্য বহুবিধ ট্যাক্স তুলে নেবেই নেবে এবং সভ্যদেশে তার অধিকাংশই ব্যয় হয় দীন-দরিদ্রের জন্য। (আজ যে মুরারজীভাই দিবারাত্র "অস্তি নাস্তি ন জানাতি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ" করছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি যদি সে পয়সা দু হাতে খরচা করে যুদ্ধের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাড়ান—সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা অনেকখানি ঘুচবে, বেকার-সমস্যা ঘুচলো বলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে—তিনি যদি কঞ্জুষি করেন, তবেই হবে আমাদের চরম বিপদ—কিন্তু এটা অর্থনীতির একটা উৎকট সমস্যা এবং হিটলারই সর্বপ্রথম এর সমাধান করেন দু হাতে পয়সা খরচ করে; পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশের প্রাচীন-পন্থী অর্থমন্ত্রীরা তখন দেশের দুরবস্থা দেখে আকুল হয়ে, পাছে ভবিষ্যতে আরও কোনও নূতন বিপদে পড়তে হয় সেই ভয়ে সরকারের খরচা প্রাণপণ কমিয়ে "রিজার্ভ ফান্ড" নামক দানবের ভুঁড়ি মোটার চেয়ে মোটা করতে থাকেন। তাদের দেখাদেখি ব্যাঙ্কার সাহুকাররাও ক্রেডিট দেওয়া বন্ধ করে কিংবা কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও কমতে থাকে এবং সৃষ্ট হয় "দুষ্টচক্র"—ভিশাস্ সারকল। সরকার ব্যাঙ্কার টাকা দেয় না বলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়ে না, আর দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়ে না বলে সরকার খাজনা ট্যাক্সো পায় আরও কম এবং তারস্বরে চিৎকার করে, "আরও ছাঁটাই করো, আরও ছাঁটাই করো।")[১]

---

১ এ রকম ক্রাইসিসের সময় আরও একটা মজার ব্যাপার ঘটে। ঐ সময় বড় বড় প্রাচীন

এই পরিস্থিতি হতে পারে বলেই ধর্ম প্রাচীন দিনে তার একটা ব্যবস্থা করেছিল।

দোল-দুর্গোৎসবে দান। এতে মহাপুণ্য।

বহুকাল পূর্বে আমি বাচ্চাদের মাসিকে একটি অনুপম প্রবন্ধ পড়ি। অসাধারণ এক পণ্ডিত সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে জমিদারকে অন্ন, বস্ত্র, ছত্র, তৈজসাদি, পাদুকা, খট্ট, অলঙ্কার—দুনিয়ার কুল্লে জিনিস দান করতে হত। এতে করে চাষা, জোলা, ছাতাবানানেওলা, কাঁসারি, কামার, মুচি, মিস্ত্রি—বস্তুত গ্রামের যাবতীয় কুটিরশিল্প এক ধাক্কায় বহু-বিস্তর বিক্রি করে রীতিমত সচ্ছল হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, কাঁসারি দু পয়সা পেত বলে সে ছাতা কিনত, ছাতাওয়ালার চার পয়সা হল বলে সে শাঁখা কিনত—ইত্যাদি ইত্যাদি, আদ্ ইনফিনিতুম্। এবারে আর "নষ্টচক্র" বা "ভিশাস সারক্ল" নয়—এখন যাকে বলে স্পায়ারেল মুভমেন্ট—"চক্রাকারে স্বর্গ-বাগে!"

তারপর লেখক দুঃখ করেছিলেন, আজ যদি বা জমিদার পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে পূর্ব-বর্ণিত সর্বদানই যথারীতি করেন তবু মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। বস্ত্র এসেছে বিলেত থেকে (তখনকার দিনে দিশী কাপড় অল্পই পাওয়া যেত), ছত্র রেলি ব্রাদার্সের, বাসনকোসন অ্যালুমিনিয়মের এবং অন্যান্য আর সব জিনিসের পনেরো আনা এসেছে হয় বিদেশ থেকে, নয় দেশেরই বড় বড় শহর থেকে (শাঁখা জাতীয় মাত্র দু-একটি জিনিস আপন গ্রামের কিংবা গ্রামের বাইরের কুটিরশিল্প থেকে)। মোদ্দা মারাত্মক কথা—জমিদারের গ্রাম এবং কিংবা আর পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাগোষ্ঠী (ইউনিট) সে কোনও সাহায্যই পেল না। আখেরে দেখা যাবে কোনও কুটিরশিল্পই ফায়দাদার হল না, হল শিল্পপতিরা—দিশী এবং বিদেশী।

এবং লাওৎসে বলেছেন—অবশ্য বর্তমান চীনা সরকার সেটা মানে না—যখনই দেখতে পাবে বড় শহরে বড় বড় ইমারত তখনই বুঝতে হবে, এগুলো গ্রামকে শুষে রক্তসঞ্চয় করেছে। পতন অনিবার্য।

ধর্ম এখন পুণ্যের দোহাই দিয়ে দানের কথা জমিদারের সামনে তোলে না—আর জমিদারকে সে পাবেই বা কোথায়? হয়তো তিনি শহরে থাকেন কিংবা সরকারের নূতন নীতির ফলে লোপ পেয়েছেন। তা সে যাই হোক, এ কথা তো ভুললে চলবে না, দান মাত্রই দান, "পেরসে", পুণ্য নয়। গ্রাম পোড়াবার জন্য কেউ যদি দেশালাই চায় তবে আমি তো তাকে দেশালাই দান করে পুণ্যসঞ্চয় করি নে!

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাঙ্কের কাছে আরও ক্রেডিট চায় তখন ব্যাঙ্ক ভাবে, "এদের বিস্তর টাকা দিয়েছি—আর কত দেব? এত কালের বড় ব্যবসা—নিশ্চয়ই টিকে যাবে।" ব্যাঙ্কার তখন ছোট ব্যবসাকে টাকা দেয়, পাছে তারা দেউলে হয়ে যায় এবং ব্যাঙ্কের আগের দেওয়া সব টাকা মারা যায়। ফলে বিপদ কাটার পর দেখা যায় অনেক প্রাচীন, খানদানী ব্যবসা দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর ছোট ব্যবসাগুলো টিকে গেছে। অবশ্য এর একটা নৈসর্গিক—অতএব দুর্বোধ্য—কারণও থাকতে পারে। মহামারীতে বাড়ির রোগা-পটকাটাই যে মরে এমন কোনও কথা নয়। অনেক সময় তাগড়াটাই মরে। হয়তো মা রোগা-পটকাটারই যত্ন বেশী করেছিল বলে! ব্যাঙ্কার বড় ব্যবসাকে যে রকম যত্ন না করে করেছিল ছোটটার!

শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করলেই যে দান হত তা নয়। জামি মসজিদ নির্মাণ করে শাহ্-জাহান নিশ্চয়ই পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু তাজ বানাতে—অর্থাৎ খাসপেয়ারা বেগম সাহেবের জন্য গোর বানাতে—কোনও পুণ্য আছে বলে ইসলাম ফতোয়া দেয় না। তাই বোধ হয় পাশে মসজিদ বানিয়ে দিয়ে একটুখানি পুণ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু যে রাজা-বাদশা-জমিদারই এ সব পুণ্যকর্ম করতেন তাই নয়। বছর কুড়ি পূর্বে আমি মোটর-বাসে করে সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ যাওয়ার পথে "পাগলা" গ্রামের কাছে এসে দেখি এক বিরাট মসজিদ। ড্রাইভার বললে, এক জেলে হাওর-বিলের ইজারা নিয়ে বিস্তর পয়সা জমানোর পর এ মসজিদ গড়িয়েছে।[১]

এই বীরভূমে যে শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে তার পরোক্ষ কারণে কিছুটা পুণ্য কিছুটা স্বার্থ আছে। মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়ার সময় সর্বপ্রথম জলের চিন্তা করেছিলেন। কুয়ো তো খোঁড়াবেন, সে তো পাকা কথা, কিন্তু যদি সেটা শুকিয়ে যায়? শান্তিনিকেতনের অতি কাছে ভুবনডাঙা। রাইপুরের জমিদারবাবু ভুবনমোহন সিংহ সেখানে খাদের মাটি খনন করে নীচু জমির উপরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি উঁচু বাঁধ (দীঘি) পূর্বেই তৈরী করে দিয়েছিলেন। (মতান্তরে এটি রাইপুরের ঘোষালদের—এরা সিংহ পরিবারের পুরোহিত—ব্রহ্মত্র ছিল।) এই পুণ্য-স্বার্থে মেশানো বাঁধের উপর ভরসা রেখে মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়েন।[২]

এখন আর কেউ বাঁধের জন্য ধর্মের দোহাই দেয় না। এখন অন্য পন্থা। গত নির্বাচনের সময় এই বীরভূমেরই একটি গ্রাম তিনজন প্রার্থীকে বলে—সরকারের সাহায্যে বা অন্য যে কোনও পন্থায় যে প্রার্থী তাদের গ্রামে ছটি টিউবওয়েল করে দেবে তাকে তারা একজোটে দেবে ভোট!

ভাবি, কোন্ শ্রাদ্ধের—না, কোন্ বাঁধের জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! ধর্ম তারই সঙ্গে ভেসে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা

শুধু এ-দেশে নয়, সব দেশেই ধর্ম তার তালুক-মুলুক হারায় যখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। আসলে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা তার প্রকৃত পরিচয় বাতলায় না। ধর্মনিরপেক্ষ আমরা 'সেকুলার' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে নিয়েছি,

---

১ ঈষৎ অবান্তর হলেও এই নিয়ে একটি সমস্যার কথা তুলি। রোজার মাসে অসুস্থ ছিল বলে একজন লোক উপবাস করতে পারেনি। এখন ঈদ পরবের পর সে রোজা রাখতে যাবে, এমন সময় সে মসজিদ (কিংবা কুয়ো, কিংবা পান্থশালা—এ সবকে "সবীল-আল্লা" "ঐশ মার্গ", 'যে পথ আল্লার দিকে নিয়ে যায়' বলা হয়) বানাতে চাইলে। তখন প্রশ্ন, সে উপবাস করা মুলতুবী রেখে মসজিদ বানাবে কি না? ভারতের মুসলমান যে "মানবধর্মশাস্ত্র" মানেন তাঁর মতে, রোজা পরে রাখবে। এ অনুশাসন যিনি দিয়েছেন তিনি আসলে ইরানী।

২ অঘোর চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন আশ্রম, পৃঃ ৯ ও পরবর্তী।

এবং সেই সেকুলার শব্দের অন্য অর্থ 'প্রোফেন'—'হিরেটিক্যাল'ও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মবৈরী এমন কি ধর্মাঘ্নও হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যায়তন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না। করলে বরঞ্চ ভালো হত। ধর্ম তাহলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো বা জিতে যেত। কিন্তু সে সুযোগ ধর্ম পায় না—তার জয়াশা অতি অত্যল্প হলেও। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, সে ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে, এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। তার ভাবখানা অনেকটা এই :—ধর্ম বাদ দিয়ে শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুই হয়, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাসের পর যদি কাজকর্ম করে দু-পয়সা কামাতে পারে—তবে ধর্ম অপ্রয়োজনীয় অবান্তর।

এক ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন আঁক কষে ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন সৌরজগৎটা কি ভাবে চলে তখন কে এক ধার্মিকজন শুধালো, 'কিন্তু তোমার সিস্টেমে তো ভগবান নেই।'—উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, 'ওঁকে বাদ দিয়েই যখন সিস্টেমটা নিটোল ত্রুটিহীন, তখন তাঁকে লাগাবার কি প্রয়োজন?' কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিকটি ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ ধর্মভীরু ছিলেন বলে আস্তে আস্তে যোগ করলেন, 'কিন্তু দরকার হলে তাঁকে টেনে আনতাম বইকি।' সে দরকার অদ্যাবধি হয়নি। সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মের সেই কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তাটুকু স্বীকার করে না।

বেদের বড় বড় দেবতা ইন্দ্র বরুণ, এঁরা যে লোপ পেলেন তার কারণ এ নয় যে কোনও বিশেষ যুগে এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্ম-সংস্কারকগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আসলে মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পেল, প্রকৃতি তার নিয়ম অনুযায়ী চলছে। বৃষ্টি-বর্ষণ, ফসল উৎপাদন, গোধনবৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন এঁদের না ডেকেও সমাধান হয়। তবে বিশ্বাসীজনের কথা স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিনব্যাপী অনাবৃষ্টি হলে এখনও তাঁরা হোমযজ্ঞাদি করে থাকেন, বিশ্বাসী মুসলমান এখনও মোকদ্দমা জেতার জন্য মৌলা আলীর দর্গায় গিয়ে ধর্না দেয়।[1] ভলটেয়ারকে কে যেন শুধিয়েছিল, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'অবশ্যই যায়। তবে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক খাইয়ে দিলে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই থাকে না।'

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্র বরুণ চলে যাওয়ার পরে কালী হনুমান এলেন কি করে? কুরান হদীসে যখন স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লা, মানুষকে তার ন্যায্য হক্কাহক্ক (হক্+ন+হক্, অ+হক্) ইন্‌সাফের সঙ্গে বিতরণ করেন, মধ্যস্থতা করার জন্য উকিল ধরে কোনও লাভ নেই, তখন মানুষ নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদরপীর কিংবা পুত্রলাভের জন্য সোনা গাজীর শরণাপন্ন হয় কেন?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, অনার্যদের স্বধর্মে আকর্ষণ করার জন্য আর্যরা অনার্যদের অনেক দেবদেবীকে আপন ধর্মে স্থান করে দেন। অনার্যরা অনুন্নত। তারা ঐসব দেবীর

১ দক্ষিণ মিশরে ক্রমাগত কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে একবার বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাজী (চীফ জাস্টিস) সে নামাজের ইমাম (প্রধান) হবেন। ইনি ছিলেন মারাত্মক ঘুষখোর। নামাজে যাবার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। কাজী যখন আল্লাকে শুকরীয়া (ধন্যবাদ) জানাবার জন্য মিম্বরে (পুল্‌পিটে) উঠলেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। টীকাকার বলছেন, 'টিটকারির ভয়ে কাজী মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।'

সত্যতায় তখনও বিশ্বাস করে। যারা করে করুক, ক্ষতিটা কি? বদর পীর মৌলাআলীর বেলাও তাই। এবং সবচেয়ে মোক্ষম 'যুক্তি'—পুরুত মোল্লাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ তো আর পূজাপাটা করেন না, আল্লাকে যে-সাধক নূর বা জ্যোতিরূপে অনুভব করে আপন ক্ষীণ জ্যোতি-শিখা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন—'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই'—তিনি তো আর মোল্লা ডেকে শীর্ণি চড়ান না।' তাই ঘেঁটু-মনসা মৌলাআলী সোনা গাজীর দরকার। সত্যপীর তো আরও শহর-পসন্দ, জনপদবল্লভ—উভয় ধর্মেরই বিশ্বাসীজনকে পাওয়া যায়। মোল্লা পুরুত দুজনারই সুবিধা।

সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে এস্থলে আরেকটি প্রশ্ন তুলি। তবে কি আজ আর বেদাধ্যয়নের কোনও প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। ঋষি কবিরূপে বেদে যে মধুর এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সেটি বড়ই মূল্যবান। বুদ্ধি দিয়ে যেটা বুঝেছি সেইটে কবির্মনীষীর প্রসাদাৎ তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সম্যক অনুপ্রাণিত হই। অনুভূতির হৃদয়াবেগ তখন ধ্যানলোকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে।

এরই তুলনায়—যদিও এর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—একটি উদাহরণ দিই। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বুদ্ধি দিয়ে বুঝলুম, দুরাশা করে শুধু বঞ্চিত হতে হয়। তখন যদি কেউ এসে আবৃত্তি করে—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।'

তখন কেমন যেন সেই নিরাশার মাঝখানেও অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করি।

ফ্রান্স যখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন 'মাসে ইয়েজ' গীতি কী অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণাই না তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিল।

অনেকখানি দাগা খাওয়ার পর যখন মাইকেল 'আশার ছলনা'র কথা ভাবছেন তখন যদি কুরান শরীফের 'ঊষস্' সুরা পড়তেন তবে কি অনেকখানি সান্ত্বনা পেতেন না?

৯৩ অধ্যায়
ঊষস্
(অদ্—দুহা)
মক্কায় অবতীর্ণা
(একাদশ পংক্তি)
আল্লার নামে আরম্ভ—তিনি করুণাময়, দয়ালু।

ঊষালগনের আলোর দোহাই,
নিশির দোহাই ওরে,
প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো
ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো
রয়েছে ভবিষ্যৎ
একদিন তুই হবি খুশী লভি
তাঁর কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়েছেন ঠাঁই

তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ।
দেখায়ে দেছেন তোরে।
সে কৃপার কথা স্মরণ রাখিস।
অসহায় জন, ওরে—
—দলিস নে কভু। ভিখারী-আতুর
বিমুখ যেন না হয়।
তাঁর করুণার বারতা যেন রে
ঘোষিস জগৎময়॥

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

সত্যেন দত্তের অনুবাদে আরম্ভ, 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই ওরে।' অথচ আরবীতে 'অদ্-দুহা' অর্থ 'ঊষা'। ইংরেজি অনুবাদের সর্বত্রই 'আর্লি আওয়ার অব দি মর্নিং'। হয়তো সত্যেন দত্ত ভেবেছিলেন আরবের মধ্যাহ্নসূর্য অতুলনীয়। আল্লা যদি কোনও নৈসর্গিক বস্তুকে সাক্ষী ধরে দোহাই দেন, তবে তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্যকেই নেবেন। আমাদের মনে হয় ঊষা নেওয়া হয়েছিল এই অর্থে যে, রাত্রির অন্ধকার যতই সূচীভেদ্য এবং নৈরাশ্যজনক হক না কেন, ঊষার আলো প্রভাসিত হবেই হবে। আল্লা এস্থলে বলেছেন, সেটা যে রকম সত্য, আমার বাক্যও তেমনি ধ্রুব।

যাঁরা কুরান শরীফকে 'মেটাফরিকালি' ও 'সিম্বলিকালি' (অর্থাৎ দ্বিতীয় 'পক্ষে') রূপকে ব্যাখ্যা করেন (যেমন পরবর্তী ওমর খৈয়ামের মদকে ভগবৎপ্রেম অর্থে ধরেন, কিংবা ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চা শিকা 'কালী-পক্ষে'ও অনুবাদ করেছেন) তাঁরা বলেন এখানে 'প্রভাতসূর্য' (ঊষস্, অদ্-দুহা) হজরৎ মুহম্মদের (দ) প্রেরিত-পুরুষ রূপে আগমনের সূচনা করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু কুরান শরীফকে এ রকম রূপক অর্থে নেন না।

ধর্ম ও কম্যুনিজম্

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশে প্রলেতারিয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু—কিংবা কর্মসূচী-এজেন্ডাও বলতে পারেন—ছিল মাত্র একটি। ভগবান আছেন কি নেই? বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, জনমত নেওয়া হক, প্লেবিসিট্ করো।

আজকের দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বিপুল ভোটাধিক্যে' ভগবানের পরাজয় হল। 'বিপুল' কেন,—ভগবান অতিকষ্টে পেলেন শতকরা মাত্র একটি ভোট । ভগবান থাকলেও বোঝা গেল তাঁর পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট অতিশয় রদ্দী, তাঁর 'মাথুর' সত্যসত্যই মথুরা চলে গিয়েছেন; জীপ, মাইক ইত্যাদির সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না : তাঁর টাউটরা উভয়

পক্ষের পয়সা খেয়ে শেষটায় ভোট দিয়েছে গণ্ডার আণ্ডা ফেলে দুশমন কাফিরদের সঙ্গে। তবুও হয়তো তিনি আরও দু-চারখানা বেশী ভোট পেতেন, যদি পোলিং বুথের একটু দূরে সামান্য কামুফ্লাজ করে কিঞ্চিৎ ধান্যেশ্বরী গমরাজ ভদ্কার ব্যবস্থা রাখতেন। এসব কোনও তরীবৎ না করে আজকের দিনে ভোটের আশা! হুঃ! তাঁর ডিপজিটও মারা যায়। সে নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই। কারণ তাঁর ম্যানিফেস্টোতে ছিল তিনি ধর্মাচারিগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে নেবেন। অর্থাৎ পোস্ট-ডেটেড্ চেক অন এ নন-একজিস্টিং ব্যাঙ্ক! তবে এস্থলে নিছক সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে : গডের দুশমনরাই যে শুধু এই জিগির তুলেছিল তা নয়, এর কম-সে-কম পঁচিশ বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আস্তিক স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে বসে তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন, 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

তা সে যাই হোক, ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে রুশ থেকে বিদায় নিলেন।

'উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ!' পাঁড় আস্তিকেরা অবশ্য বলবেন, 'ভোট দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব অথবা তদ্বিপরীত প্রমাণ করার চেষ্টা বাতুলতা। এ সেই পুরনো লোকসঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয়,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে
সোনার জহুরী
নিকষে ঘষলে কমল
আ মরি আ মরি॥

আত্মার উপলব্ধির চরম কাম্য ঈশ্বর। তিন কোটি গাধা-গরু-খচ্চর একজোট হয়ে ম্যাঁ, ম্যাঁ, না, না করলেই কি তিনি লোপ পেয়ে যাবেন!'

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রুশের এই সশস্ত্র সংগ্রাম পছন্দ করি। সংগ্রামে পরাজিত, এমন কি নিহত হলে আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিকজনের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু তাতে করে ধর্ম লোপ পান না। তাই যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিৎকার করেন, 'ধর্ম গেল', 'ধর্ম গেল', কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন 'ইসলাম ইন ডেনজার', তখন অধমের নিবেদন, পৃথিবীর তাবৎ হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মের এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না, তাবৎ মুসলমান মারা গেলেও শব্দার্থে লুপ্ত হবেন না। 'ইসলামে'র শব্দার্থ, 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা।' শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁরই শরণ নিতে আদেশ করছেন, তখন ঐ অর্থেই করেছেন। 'সর্বধর্ম' বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি different ideals, different values। আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন 'আদর্শ' বুঝিবা একে অন্যকে contradict করে ও সবাই সত্য। তা নয়। সত্য এক। সত্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণলাভ করে শ্রীরাধা বললেন, 'দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব'।

তাই সত্য নিরূপণার্থে দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়তো হয়। কিন্তু অবহেলা ভয়ঙ্কর জিনিস।

আমার মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, রোমকরা যদি প্রথম খ্রীষ্টানদের অত্যাচার না করে অবহেলা করতো, মক্কাবাসিগণ যদি মহাপুরুষ ও তাঁর সঙ্গীদের নির্যাতন না করতো, তাহলে কি হত?

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্কুল-কলেজে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মকে অবহেলা করা হল। গোড়ার দিকে যখন খ্রীষ্টানরা হিন্দুধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন বস্তুত হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন লাভ হয়। ঐ চ্যালেঞ্জের ফলে হিন্দুদের ভিতর আরম্ভ হল আত্মজিজ্ঞাসা—যে সতীদাহ, বহুবিবাহ, অবরোধ-প্রথা নিয়ে হিন্দু শত শত বৎসর ধরে আপনমনে কোনও চিন্তাই করেননি, তাই নিয়ে আরম্ভ হল তীব্র আলোড়ন আন্দোলন। আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যে-রকম রাজনীতি, সাহিত্য ও ফুটবল নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে, ঠিক সেইরকম প্রায় একশ বছর ধরে চললো ধর্ম এবং সমাজ নিয়ে আলোচনা। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'সমাজে যে সব অনাচার প্রচলিত আছে, এর পিছনে ধর্মের সম্মতি নেই।' তাই নিয়ে চললো কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর আলোচনা, প্রচুর আন্দোলন।

পক্ষান্তরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট হৃদয় এবং মন একত্র হয়, সেখানে যদি ধর্ম অবহেলিত হয়, সেখানে যদি ধর্ম নিয়ে তর্ক আলোচনা না হয়, তাহলে শহরের গলিতে গলিতে এবং গ্রামে গ্রামে পুরুত-মোল্লারা পেয়ে যান প্রায় অবারিত রাজত্ব—উর্দুতে বলে, তখন তাদের 'দোনো হাত ঘি মে ঔর গর্দান ডেগ্‌মে'—ডেগ্‌চির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে তারা তখন পোলাও খায়। ধর্মের নামে তখন সমাজে জমে ওঠে কুসংস্কারের স্তূপ। বিবেকহীন রাজনৈতিকরা নেয় তার চরম সুযোগ। বারোয়ারি পূজার নাম করে তহবিল তছরুপাৎ, মা-দুর্গা চেহারা নেন ফিল্ম স্টারের কিংবা পূজাকমিটি-সেক্রেটারির লেটেস্ট গার্ল ফ্রেন্ডের। আমার চোখের সামনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নামলেন এক মহিলা। পেটকাটা ব্লাউজ, শাড়িখানা যেন রবারের তৈরী, সর্বাঙ্গে সেঁটে আছে—তাকাতে লজ্জা করে, লিপস্টিক-রুজের কথা বাদ দিন—কী আপদ, আপনারা জানেন, আমি কোন্ টাইপ মীন করছি—ইনি বাড়ির মহিলাদের নিয়ে মিলাদ শরীফ পরব করতে এসেছেন! পরে বন্ধুর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, দোয়াদরূদ পড়ার সময় মাথায় ঘোমটা টানার যে প্রয়োজন, সেটা নাকি ঐ মহিলা করে উঠতে পারছিলেন না, শাড়ি ছোট, বার বার খসে পড়ছিল, বার বার হাত ওঠাচ্ছিলেন বেয়াড়া ঘোমটা দুরস্ত করতে। শেষটায় নাকি সক্কলের দৃষ্টি পড়ে রইল মোল্লানীর হাত-কসরৎ দেখার দিকে।

শুনেছি রুশের সংবিধানে নাকি আছে, 'ধর্মনিরপেক্ষ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার অধিকার সর্ব কম্যুনিস্টের আছে।' ফলে ঐ সময়কার একখানা রুশভাষায় লিখিত ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানের পাঠ্যপুস্তকে নিম্নলিখিত কথোপকথন :

প্রথম ছাত্র : ঈশ্বর নেই।

দ্বিতীয় ছাত্র : ওটা একটা বুর্জোয়া কুসংস্কার—ভূতেরই মত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাবুলে থাকাকালীন স্নিয়েশকফ নামক একটি পরিবার—বাপ, মা, ছেলে—তিনজনাই আমার কাছে ইংরেজী পড়ত। যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঐ জায়গাটি এল, তখন স্নিয়েশকফ একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'এটা থাক।' ব্যাপারটা ১৯২৭ সালের। তখনও কম্যুনিস্ট রেভলুশন হার্ডবইলড এগ্ হয়নি। জোয়ানদের সকলেই 'ইকনে'র সামনে বিড় বিড় করে বড় হয়েছে। আমি বললুম, 'থাকবে কেন? আমি তো বৌদ্ধধর্মের বই পড়ি সেখানেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়।'

তারপরে ১৯৪১/৪২ সনে রুশ যখন হিটলারের হামলায় যায়-যায়, কখন স্তালিন খুলে দিলেন বেবাক চার্চ, বিস্তর মঠ, নিমন্ত্রণ করলেন মিত্র ইংলন্ডের ডাঙর পাদ্রীকে। আবার গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা উঠলো, 'হে ঈশ্বর, হোলি রাশাকে ("হোলি"?—তওবা, তওবা) বাঁচাও।'

সেই অরণ্যের মত জনসমাগম, ধর্মোচ্ছ্বাস দেখে স্তালিন খুশী হয়েছিলেন, না পাঁড় কম্যুনিস্টের যা হওয়া উচিত—ব্যাজার হয়েছিলেন, জানি নে। হয়তো বা বিষাদে হরিষ, কিংবা হরিষে বিষাদ। কে জানে!

আমার মনে হয়, ১৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত যদি ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে তাকে অবহেলা করা হত, তবে বোধ হয় ঠিক এতটা হত না।

এক ঝাণ্ডা

বহু শক্তিকামী জন, দেশ যখন স্বাধীন, তখন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না। কারণ সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত, নানা পাণ্ডার নানা দল। এসব ঝামেলার ভিতর ঢুকতে হলে প্রথমত দরকার গণ্ডারের মত চামড়া, দ্বিতীয়ত বিপক্ষকে নির্মমভাবে হানবার মত ক্ষমতা, তৃতীয়ত দেশের নেতা হওয়ার মত এলেম এবং তাগদ আমার আছে—এই দম্ভ। যাঁদের এ-সব নেই, তাঁরা হয়তো আপন গণ্ডির লোককে তাঁদের মতামত জানান, বড়জোর কাগজে লিখে সেগুলো প্রকাশ করেন, কিন্তু দৈনন্দিন রাজনীতি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেন।

কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন তাঁরা এক ঝাণ্ডার নিচে এসে দাঁড়ান। সেদিন এসেছে।

পরাধীন জাতের একমাত্র রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করা। স্বাধীন জাতি আক্রান্ত হলে তার একমাত্র রাজনীতি আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। সে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের অন্য কোন রাজনীতি থাকতে পারে না। বিধানসভা, রাজ্যসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, এমন কি পাড়ার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে তখন বিরুদ্ধ পক্ষ বলে কিছু থাকতে পারে না। দেশের লোক যাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছে তাকে তখন প্রশ্নজালে উদ্ব্যস্ত না করা, কিংবা গুরুগম্ভীর মাতব্বরী ভর্তি উপদেশ দিয়ে তাঁর একাগ্র মনকে অযথা চঞ্চল না করা। যদি সে নেতার প্রতি দেশের আস্থা চলে যায়, তবে তাঁকে তাড়াবার জন্য গোপনে দল পাকাতে হয় না। দেশের সর্বসাধারণ তখন চিৎকার করে ওঠে ও সে সময় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। ১৯৪০-এ চেম্বারলেন যেরকম মানে মানে সরে দাঁড়ালেন।

এটা শুধু সম্ভব, যেখানে গণতন্ত্র আছে। ডিক্‌টেটরদের স্বৈরতন্ত্রে এ ব্যবস্থা নেই। সেখানে গেস্তাপো, ওপগু বজ্রহস্তে জনসাধারণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখে—যতদিন পারে। তারপর একদিন মুস্‌সলিনিকে মরতে হয় গুলি খেয়ে এবং মাথা নিচের দিকে করে ঝুলতে হয় ল্যাম্পপোস্ট থেকে, হিটলারকে মরতে হয় আত্মহত্যা করে।

রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন, 'আমি যে আমার ভগবানে বিশ্বাস করি তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন'—ঠিক ঠিক কথাগুলো আমার

মনে নেই বলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আমি যে পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস করি, তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলেই সে-স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলেই আপনাকে, আমাকে, আর পাঁচজনকে বিশ্বাস করেছেন—আমরা যে-রকম তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমরা যেন তাঁর সে বিশ্বাস-ভঙ্গ না করি। শত্রু দেশ থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই ভাষায় বলি, "আরাম হারাম হ্যায়!"

আমার দুঃখের অবধি নেই, শেষ পর্যন্ত চীনদেশ আমাদের আক্রমণ করল! প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে, তখন ভারতবাসীমাত্রেই মর্মাহত হয়েছিল। সদয় পাঠক এস্থলে আমাকে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে অনুমতি দিন। আমি তখন জর্মনিতে পড়াশুনা করি। সে সময় আমাকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে চীন-জাপানের কথা ওঠে! আমি বলেছিলুম, 'এই যে অর্বাচীন জাপান সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে তার পিতামহ চীনের বুকে বসে তার দাড়ি ছিঁড়ছে, এর চেয়ে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে!' পরদিন দুই বয়স্ক চীনা ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত—এঁরা দুজনেই আপন দেশের অধ্যাপক। জর্মনি এসেছিলেন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক জন আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'জাপান শক্তিশালী জাতি। অক্ষম চীনের প্রতি দরদ দেখিয়ে তার বিরাগভাগজন হতে যাবে কে? আপনি কাল সন্ধ্যায় যা বললেন, সে শুধু ভারতবাসীই বলতে পারে।' অন্য জনের চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে জল বেরিয়ে এসেছে। আমি জানতুম, চীনা ভদ্রসন্তান অত্যন্ত সংযমী হয়, সহজে আপন অনুভূতি প্রকাশ করে না, কিন্তু এখানে এ কী করুণ দৃশ্য! আর আমি পেলুম নিদারুণ লজ্জা। আমি পরাধীন দেশের জীবনমৃত অর্ধ-মনুষ্য। আমার কী হক্ক এসব বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করবার!

আজ জানতে ইচ্ছে করে, এই দুই অধ্যাপক এখনও বেঁছে আছেন কি না! থাকলে তাঁরা কি ভাবছেন!

কিন্তু এ-সব কথা বলার প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যে কত যুগের হার্দিক সম্পর্ক, সে তো ইস্কুলের পড়ুয়া জানে। শুধু এ-দেশ নয়, চীন দেশেও। কারণ চীন দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আছে; আজ যদি চীনের টুথব্রাশ-মুস্টাশ্‌হীন নয়া হিটলাররা সে-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বর্বর অভিযানই কাম্য মনে করেন, তবে যে-সব সভ্য-ভূমিতে এখনও ঐতিহ্য সংস্কৃতির মর্যাদা আছে, তারা চীনের এই অর্বাচীন আচরণ দেখে স্তম্ভিত হবে। অবশ্য এ-আচরণ সম্পূর্ণ নূতন নয়। রুশ দেশ যখন প্রথম কম্যুনিজম ধর্ম গ্রহণ করে তখন সে-দেশও তার গগল, পুশকিন, তুর্গেনিয়েভ, চেখফকে 'বুর্জুয়া', 'শোষক', 'প্রগতিপরিপন্থী' বলে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখতে পেল, কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতে চাইলে অন্য কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—মানবসভ্যতার যে চিরন্তন দেয়ালী উৎসব চলছে, তাতে যদি রুশ তার ঐতিহ্যের প্রদীপ নিভিয়ে বসে থাকে তবে সে অন্ধকার কোণ থেকে কেউ তাকে টেনে বের করবে না। তাই আজ আবার রুশ দেশ বিনা বিচারে তার সাহিত্যিকদের পুস্তক ছাপে—সেগুলোতে সে যুগের অনাগত কম্যুনিজমের জয়ধ্বনি থাক আর নাই থাক।

তাই যখন কম্যুনিজম গ্রহণ করার পর চীন বললে, 'পৃথিবীতে হাজার রকমের ফুল ফুটুক'—তখন আমরা মনে করেছিলুম, অপরের প্রতি সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য স্মরণ করেই চীন এ-কথা বলেছে, কিয়ৎকালের জন্যে রুশ আপন ঐতিহ্য অস্বীকার করে যে মূর্খতা দেখিয়েছিল, তার থেকে সে শিক্ষালাভ করেছে, এবং এখন লাওৎসে কনফুৎস এবং বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের সঙ্গে কম্যুনিজম মিশে গিয়ে এক অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা, ধন-বণ্টন পদ্ধতি দেখা দেবে। তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু সে এক্সপেরিমেন্ট যে বিশ্বজনের কৌতূহল আকর্ষণ করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'এই হাজার রকমের ফুল ফুটুক' যে নিতান্ত মুখের কথা, সেটা তিন দিনেই ধরা পড়ে গেল। আমরাই যে শুধু ধরতে পেরেছি তাই নয়, চীনা আক্রমণের পরের দিনই এক সুইস কাগজে একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরোয়। ছবিতে জনমানবহীন বিরাট বিস্তীর্ণ এক বরফে ঢাকা মাঠে মাত্র একটি ফুল ফুটেছে। তার নীচে লেখা 'ভারতবর্ষ'। তারই পাশে দাঁড়িয়ে চু এন লাই। পাশে যে সখা দাঁড়িয়ে, তাকে বলছেন, 'এ-ফুলটি আমি তুলে নেব।'

অত সহজ নয়।

একদিন জাপান তার উত্তমর্ণ চীনকে আক্রমণ করেছিল। আজ চীন তার উত্তমর্ণ ভারতকে আক্রমণ করেছে।

চীন দেশ কখনও কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেনি। লাওৎসে, কনফুৎস যে জীবনদর্শন প্রচার করেছেন, তাতে আছে কি করে সাধু, সৎ জীবন যাপন করা যায়, কিন্তু ইহলোক পরলোকে মানুষের চরম কাম্য কি এই পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয়াশ্রিত মরদেহ চৈতন্যের ঊর্ধ্বলোকে কি আছে, কি করে সেখানে তথাগত হওয়া যায়, এ সম্বন্ধে তাঁরা কোনও চিন্তা করেননি।

অথচ বুদ্ধের বাণী যখন মৃদু কাকলি রবে চীন দেশে পৌঁছল, তখন থেকেই বহু চীনা এদেশে এসেছেন। ইৎসিং, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চাঙ, আরও সামান্য কয়েকটি নাম আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এঁরা ছাড়া এসেছেন আরও বহু বহু চীনা শ্রমণ। বিশেষ করে য়ুয়ান চাঙের ভ্রমণ-কাহিনী পড়লে আজও মনে হয় যেন পরশু দিনের লেখা! বৌদ্ধ শ্রমণ যেমন যেমন ভারতের নিকটবর্তী হতে লাগলেন, তখন তাঁর হৃদয়মনে কি উত্তেজনা, ভারতবর্ষে পৌঁছে তার প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে তিনি কী রকম রোমাঞ্চ কলেবর! কামরূপের রাজা যখন তাঁকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে পূবদিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন, ঐ আপনার মাতৃভূমি, পঁচিশ মাইল হয় কি না হয়, তখন বৃদ্ধ শ্রমণ চিন্তা করেছিলেন, কত না বিপদের সম্মুখীন হয়ে, কত না ঘোরালো পথে তাঁকে তথাগতের জন্মভূমিতে আসতে হয়েছে।

ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন তাঁকে সসম্মানে সখারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

আজ যদি চীন সে সখ্য ভুলতে চায়, ভুলুক।

ভারতও তার রুদ্র রূপ দেখাতে জানে।

জয় হিন্দ্।

"রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"

চীনেদের ঠেঙিয়ে বের করতে হবে, এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু 'রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?'—এর অর্থটি সরল। যে মেয়ে রাঁধছে তার যদি খোঁপাটি তখন ঢিলে হয়ে যায়—তবে সে কি রাঁধতে রাঁধতেই চুল বাঁধে না? রান্না বড়ই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু চুল বাঁধাটা এমন কিছু মারাত্মক অপরিহার্য শুভকর্ম নয় যে, তদভাবে বাড়িসুদ্ধ লোক মারমুখো হয়ে চেলি নিয়ে বাড়ির বউয়ের দিকে তাড়া লাগাবে। তবু বাড়ির বউ জানে, রাঁধতে হয়, চুলও বাঁধতে হয়।

অর্থাৎ চীনাকে ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা কাজ আছে। সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে না হলেও দেশসুদ্ধ লোকের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে লিপ্ত হয়ে শিবনেত্র হয়ে যাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। অবশ্য এ কথা সত্য, যুদ্ধের বাজারে কোন্‌টা যে 'রাঁধা' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক আর কোন্‌টা যে 'চুল বাঁধা' অর্থাৎ দোহার, এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে যায়। ধড়িবাজ মেয়ে যে চুল বাঁধার ছল করে রান্নার গাফিলি করে এটা জানা কথা এবং কট্টর গিন্নী যে বেধড়ক রান্নার তোড়ে খাটাশের মত চেহারা বানিয়ে তোলেন সেও জানা কথা।

এ দুটোর তফাত করবেন দেশের কর্তাব্যক্তিরা। আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। তবে কিঞ্চিৎ অতি সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। একবার আমি অতিশয় অনিচ্ছায় এক খণ্ড যুদ্ধের মাঝখানে তুচ্ছ উলুখড়েরও জীবন যে কি মর্মান্তিক নিদারুণ হতে পারে তার প্লীহাতঙ্কী—পীতাতঙ্কের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলবেন না, ওটা আমার নেই—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলুম। সে দুর্দিনে পেটের ভাত জুটছিল না বলে ভয়ের চোটে সেটা শুকিয়ে চাল হতে পারেনি। তার বর্ণনা পুস্তাকাকারে ছাপিয়েও ছিলুম। তবে আপনারা সেটি পড়েছেন বলে মনে হয় না—বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট তো তাই বলে।

দ্বিতীয়বার আমি স্যানা হয়ে গিয়েছি—কথায় বলে, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' সন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত উভয় পক্ষের যুযুধানকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করার পর যখন আমার প্লীহা দ্বিতীয়বার উলুখড় হতে কবুল জবাব দিল, তখন নিরপেক্ষ স্থূল অকুস্থলে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আমি আমার যুবতী স্ত্রী নিয়ে পলায়ন করি ('য পলায়তি স জীবতি'—কে বলে আমি সংস্কৃত জানি নে!)।

দেশে ফিরেই কানটি সেঁটে দিলুম বেতারের লাউড্‌স্পীকারের সঙ্গে। জর্মন কি বলছে না বলছে সে তো ইংরেজ এই কালা আদমীকে সদয় হয়ে শোনাবে না। তারপর মস্কো বেতার। সেটা যখন হিটলার গুঁড়িয়ে দিল তখন কুইবিশেফ। সেটাও যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়েও শোনা যায় না, তখন রুশদেশেরই ছোট্ট বেতার কেন্দ্র আজারবাইজান—ভাগ্যিস তারা ফার্সিতেও খবর প্রচার করত।

যুদ্ধের পর হালের বলদ নৌকোর পাল বিক্রী করে যুদ্ধ বাবদে জর্মন এবং ফরাসী বই কিনেছি দেদার। ইংরিজি বই এদেশে পাওয়া যায়। চুরি করে চালিয়ে নিই।

মোকা পাওয়ামাত্রই দুবার জর্মন ঘুরে এসেছি। ১৯৫৮ এবং এই গ্রীষ্মের ১৯৬২-তে।

এবং জোর গলায় পরিষ্কার করে ফের বলতে হল, প্রধানত মিশেছি নিম্নমধ্যশ্রেণী এবং ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে—তাদেরই মিলনকেন্দ্র ক্লাইপেতে, লকালে বা বিয়ারখানায়, যা খুশি বলতে পারেন। বড়লোকদের সঙ্গে মিশেছি অল্পই। তবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায় মিশতে হয়েছে খানিকটা। ক্রুপ্ স্টীনেসদের সঙ্গে মেশবার কোনও সুযোগই হয় নি। আমার লেখা গোগ্রাসে না গিলে আস্তে আস্তে পড়লেই এ কথাটা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। জর্মনি সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান-গম্যি তার ৯০ নঃ পঃ বিয়ারখানা থেকে সংগৃহীত, বাকিটা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি থেকে। তাদের সক্কলেরই মোটরগাড়ি ছিল কিন্তু দাসী, হাউস-টখটর, এমন কি হেল্পিং হ্যান্ডও ছিল না।

এর থেকে আমার যা সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই জোরে দু'একটি কথা নিবেদন করি।

এই 'চুল বাঁধার' কথা ধরা যাক্।

১৯৩৯-এ হিটলার যখন লড়াইয়ের জিন্ বোতল থেকে বের করে আসমানে ছেড়ে দিলেন তখন যুদ্ধ বাবদে তাঁরও অভিজ্ঞতাও ছিল কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি করপরেল রূপে লড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাতে করে তো 'অল আউট ওয়োর' সম্বন্ধে ওকীব হাল হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাই তিনি ভাবলেন, সর্বপ্রথম উচিত-কর্ম হচ্ছে, বিলাসব্যসন ত্যাগ করা। তাই বন্ধ করে দাও হেয়ার ড্রেসিং সলুনগুলো।

এস্থলে একটুখানিক সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়, জর্মনির শহুরে মেয়েরা এই ড্রেসিং সলুনের উপর কতখানি নির্ভর করে। এবং আজকের চেয়ে ১৯৩৯ সালে নির্ভর করত আরও অনেক বেশী। তখনও পার্মানেন্ট ওয়েভ-এর জোর রেওয়াজ। সলুনওলী প্রথম চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে পরিয়ে দেয় এক মুকুট, চালিয়ে দেয় ইলেক্‌টিরি যন্ত্র। এসবের মারপ্যাঁচ আমি বুঝি নে। তবে মুকুট খোলার পর দেখা যায়, দিব্য ঢেউ-খেলানো চুল হয়ে গিয়েছে। নূতন করে গোড়ার দিকের চুল বেশ খানিকটে না গজানো পর্যন্ত এ ঢেউ লোপ পায় না।

যারা সলুনে ঢেউ-খেলানো চুলের মাথা বানিয়ে নিয়ে আসে, তাদের মস্তকে হল বজ্রাঘাত—হিটলারের এই হুকুম শুনে। শহরের বহু বহু মেয়ে আপন চুলের তদারকি নিজে করতে পারে না। এক মাসের ভিতরই দেখা গেল মাথায় মাথায় বাবুইয়ের বাসা। কিন্তু কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে হুজুর হিটলারের কাছে এর প্রতিবাদ জানায়! সবাই গিয়ে কেঁদে পড়লেন ফ্রাউ গ্যোবেল্‌সের পায়ে। এভা ব্রাউন, রীফেনটালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে হিটলার প্রায় প্রতিদিন গ্যোবেল্‌স্‌দের বাড়ি যেতেন। শেষ দিন পর্যন্ত হিটলারের উপর ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি—স্বৈরতন্ত্রের সর্বাধিনায়কের উপর যতখানি হতে পারে। (তাই ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ যখন জানতে পারলেন হিটলার আত্মহত্যা করবেন, তখন তিনি বললেন, 'ফ্যুরার-হীন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কি লাভ, আমিও আত্মহত্যা করব', এবং তিনি তাই করেও ছিলেন।)

ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ হিটলারের সামনে গিয়ে বললেন, 'মাইন ফ্যুরার (প্রভু আমার)! আপনি কি চান যে আপনার জওয়ানরা রণক্ষেত্র থেকে ছুটিতে ফিরে এসে দেখুক কতকগুলো উস্কোখুস্কো চুলওলী খাটাশীদের?'

হিটলার আইন নাকচ করে দিলেন।

তাই বলছিলুম রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?

* * *

এখন প্রশ্ন, কোন্ কোন্ কর্ম স্থগিত রাখতে হবে, আর কোন্ কোন্ কর্ম আরও জোরসে চালাতে হবে। পূর্বেই এ-প্রশ্নের আভাস দিয়েছি এবং এখনও বলছি, আমি সমাজপতি নই, কাজেই আমি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তবে একটা কথা বলতে পারি, বুক ঠুকে বলতে পারি—আমরা যেন হাসতে ভুলে না যাই। অর্বাচীন চীনের আচরণে ব্যথিত হয়ে আমাদের শিবুদা (শিবরাম চক্রবর্তী) যদি মশকরা করতে ভুলে যান তবে আমি হাসতে হাসতে তাঁকেই জবাই করব।

এই হাসতে পারাটা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। পণ্ডিতজী চীনকে বিশ্বাস করে যে ঠকেছেন তাই নিয়ে সুবে বিলেত-মার্কিন পশ্চিম ইয়োরোপ হাসছে। কত না কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র বেরোচ্ছে। আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারছি নে সত্য কিন্তু শীতকালে ঠোঁট ফেটে গেলে লোক যে রকম হাসে সে রকম হাসছি তো সত্য। কারণ একা পণ্ডিতজী তো চীনকে বিশ্বাস করেননি, আপনি আমি রামা-শ্যামারাও করেছিলুম। এখন সবাই আমাদেরই নিয়ে হাসছে। এ অবস্থায় আমাদের চটে যাওয়াটা অতিশয় অরসিকের কর্ম হবে। আমরাই শুধু দুনিয়ায় পাগলামি, দুষ্টামি দেখে হাসব, আর আমাদের সরলতা আমাদের ভালো-মানষামী দেখে অন্য লোকের হাসি আমরা সইব না, এটা কোনও ভালো কথা নয়।

এই তো সেদিন একটা রসিকতা পড়ছিলুম।

পূর্ব জর্মনির এক কুকুর পশ্চিম জর্মনির মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে এসেছে। অতিথিবৎসল দাদা শুধোলে, 'তোকে কি খেতে দেবো বল দিকিনি, ভাইয়া! গুটিকয়েক সরেস, তাজা খাজা হাড্ডি চিবুবি?'

পূর্ব জর্মনির কুকুর বললে, 'না, থ্যাঙ্কু! আমাদের ওদিকে মেলাই খাবার রয়েছে! তোদের চেয়ে অনেক ভালো!'

দাদা শুধোলে, 'তবে, তবে কিছু একটা চাটবি? জল? শরবৎ? দুধ? মদ?'

'না, ওসবে আমার দরকার নেই। বাড়িতে ঢের রয়েছে।'

'তাহলে চল্, আমার ঘরে একটু জিরিয়ে নে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আমার দিব্য সুন্দর ঘর রয়েছে বাড়িতে।'

বড়দা তখন চটে গিয়েছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললে, 'তবে এখানে মরতে এসেছিস কেন? তোর যখন সবই রয়েছে?'

'ও দাদা! এখানে যে প্রাণভরে ঘেউ ঘেউ করা যায়। আমি ঘেউ ঘেউ করব।'

* * *

ঐ হল লৌহ-যবনিকার ওপারের দেশের আইন। সেখানে আপন আপত্তি-অজুহাত চেঁচিয়ে জানানো বারণ। সেখানে আইনকানুন সর্বনেশে। আমরা এদিকে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করতে পারি—কিন্তু হাসতে যেন না ভুলি।

ওয়ার এম্

রাজা প্রজাগণকে কহিলেন,

'দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত[১] বংশের[২] ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্যে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।[৩] আর শত্রুগণ যদি বলপূর্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষত অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে! তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থে তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন উৎপাদনপূর্বক[৪] রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদকালে ধনকে প্রিয় বোধ করা অত্যন্ত অকর্তব্য।'

রাজ্যপালন সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্মকে প্রশ্ন করায় ভীষ্মের উত্তর। মহাভারত,

---

১. ২. ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়। অনুবাদকের টীকা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 'বসুমতী'।

৩ আজকের দিনের 'উয়োর-বনড, ডিফেন্স্ সার্টিফিকেট্'।

৪. ধন উৎপাদনের একমাত্র পন্থা, প্রোডাক্শন্ বাড়ানো। অর্থাৎ ইন্ডাসট্রিয়াল ও এগ্রিকালচরল তৈজসপত্র বাড়ানো। না হলে শুধুমাত্র ধনে সর্ব সমস্যার সমাধান হয় না। কথিত আছে, বর্বর মঙ্গলরা যখন প্রবল প্রতাপশালী আব্বাসী খলিফার রাজধানী বাগ্দাদ দখল করে খলিফাকেও বন্দী করতে সক্ষম হল, তখন মঙ্গল সেনাধ্যক্ষ খলিফাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজনের জন্য খলিফার সামনে রাখলেন থালা থালা সোনা-জহরৎ। নিজের সামনে রাখলেন উত্তম উত্তম আহারাদি। খেতে খেতে খলিফাকে শুধোলেন, 'হুজুর, খাচ্ছেন না কেন?' হুজুর চুপ করে রইলেন। পুনরায় সেই প্রশ্ন। পুনরায় 'নো রিপ্লাই'। তৃতীয় বারে নিরুপায় হয়ে খলিফা বললেন, 'এগুলো তো খাবার জিনিস নয়।' মঙ্গল বললেন, 'সে কি হুজুর, আপনার রাজত্ব জয় করবার পর আপনার ধনাগার বোঝাই পেলুম এই সব সোনা-জহর। ভাবলুম এগুলো বুঝি আপনি খান। অন্য কোনও কাজে লাগাননি তাই।'

অর্থাৎ, শুধু ধন দিয়ে সব-কিছু হয় না।

তাহলে ধনী লোকের বাড়িতে ডাকাতি হত না।

হিটলার কি আদর্শ নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সেটা জানবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ দেউলে রাষ্ট্রকে তিনি কি করে জোরদার করলেন সেটা জানা উচিত। তিনিও বলেছিলেন, 'আমার ব্যাঙ্কে সোনা-জহর নেই। বয়ে গেল! আমি চাই জোয়ান মেয়েমদ্দ। যারা উৎপাদন করতে পারে। আপন বাহুবলে। আমি রাজা, তখন সেগুলো কিনব।' তাই ভীষ্মদেব ধন উৎপাদনের আদেশ দিয়েছিলেন।

শান্তিপর্ব, সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে তৃতীয় খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ।

যুদ্ধ কাম্য নয়। একথা সত্য, যুদ্ধের সময় অনেকেই আপন শৌর্য, বীরত্ব দেখিয়ে আপন জাতকে গৌরবান্বিত করেন, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যায়, যুদ্ধে অমঙ্গলের অংশই বেশী।

তাই যখন কোনও জাতিকে বাধ্য হয়ে সংগ্রামে নামতে হয়—আজ আমরা যে-রকম নেমেছি—তখন তাকে খুব ভালো করে, অতিশয় সুস্থ মস্তিষ্কে আবেগ-উচ্ছ্বাসরহিত হৃদয়ে চিন্তা করে নিতে হয়, তার উদ্দেশ্য কি? সে কি চায়? একে বলা হয় ওয়ার এম্।

তার খানিকটা নির্ভর করে বিপক্ষের মতলবটা কি, সে কি চায়—তার ওপর।

চীন প্রাচ্যদেশের জনবলে বলীয়ান মহারাষ্ট্র। কিন্তু জন থাকলেই ধন হয় না। চীন গরিব দেশ। তাই গত দশ-বারো বৎসর ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি করে সে আপন ধনদৌলত বাড়াতে পারে। প্রধানত রুশের সাহায্যে।

ইতিমধ্যে এই নয়া কম্যুনিস্ট জাত অর্থাৎ চীন—খানদানী কম্যুনিস্ট জাত অর্থাৎ রুশকেও খানদানিত্বে এক কাঠি ছাড়িয়ে যেতে চাইল। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আকছারই হয়েছে। পূর্ববাংলায় মুসলমানরা বলে, 'নয়া মুসলমান গোরু খাওয়ার যম হয়।' অর্থাৎ শ্মশানের চাঁড়াল যদি হঠাৎ দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যায় তবে তার বাড়িতে যা সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঘটা লাগে তা দেখে জাত ব্রাহ্মণ পরিত্রাহি রব ছাড়ে। চীন বেশ কড়া গলায় রাশাকে বললে, 'তুমি যেভাবে মার্কিনিংরেজের সঙ্গে দহরম-মহরম করছ সেটা মার্কস্-লেনিনবাদের বিশ্ব-কম্যুনিজম আশু আনয়ন করার বিপক্ষে যায়। তুমি শান্তি চাইছ; এ করে এখনকার মত শান্তি পাচ্ছ বটে, কিন্তু চিরন্তন শান্তি আসবে একমাত্র বিশ্ব-কম্যুনিজমের ফলরূপে। তার জন্য দরকার আপন "ধর্মে"—অর্থাৎ কম্যুনিজমে—বিশ্বাস। তার অর্থ শান্তির মারফতে ইহসংসারে কোনও প্রকারের প্রগতি হয় না। সর্ব প্রগতি যুদ্ধের মাধ্যমে। অতএব মার্কিনিংরেজ যেখানে বলবে "শান্তি চাই", তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলবে "যুদ্ধ চাই"। এই করে আসবে বিশ্ব-কম্যুনিজম।

রুশ বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু মার্কস-লেলিনের আমলে অ্যাটম বম্ ছিল না। এখন যদি যুদ্ধ চালাই তবে আখেরে যে সব-কিছু লণ্ডভণ্ড ছারখার হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে কে?'

এখানে এসে চীন কিছু বলে না। কারণ চীন জানে, রুশ ইংলন্ড আমেরিকার জনসংখ্যা ৯৯ পার্সেন্ট মরে গেলেও তার আপন দেশে থাকবে লক্ষ লক্ষ লোক। কারণ তার জনসংখ্যা সক্কলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। তারাই তখন পৃথিবীর রাজত্ব করবে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। ১৯৩৮-এ ইংরেজ-ফরাসী চেয়েছিল হিটলারে-স্তালিনে লড়াই লাগিয়ে দুই ব্যাটাই মরে; তাঁরা পরমানন্দে বিশ্ব-সংসারটা চষে বেড়াবেন।

কট্টর কম্যুনিস্ট বিশ্বাস করে যে, যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না তারা সবাই এক গোয়ালের গরু। তার কাছে মার্কিন যা ভারতবাসীও তা। ইংরিজীতে কথায় কথায় বলে যে আমার স্বপক্ষে নয় সে আমার শত্রু—নিরপেক্ষ বলে কোনও জিনিস নেই। কাজেই আমরা যে ভারতীয়েরা চীনের শত্রু-মিত্র কিছুই নই, আমরাও তার শত্রু—আমাদের একমাত্র 'অপরাধ' আমরা কম্যুনিস্ট নই—অথচ ধর্ম জানেন, আমরা কম্যুনিস্টদের প্রতি যতখানি সহনশীল, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা পোল্যান্ড অতখানি হবে না। যদি আজ পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তবে কম্যুনিস্টদের ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। এই যে পশ্চিম জর্মনি

গণতান্ত্রিক দেশ, সেও কম্যুনিস্টদের বরদাস্ত করে না।

খুশ্চভ এ তত্ত্বটি ভালো করেই জানেন। তাই তিনি ভারতকে শত্রুর চোখে দেখেন না। তাঁর বিশ্বাস তিনি এবং অন্য কম্যুনিস্টরা যদি আমাদের দিকে চোখ রাঙায়—আক্রমণ দূরে থাক—তবে আমরা পুরো পাক্কা ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গিয়ে মার্কিনকে আমাদের দেশে বিমানঘাঁটি বানাতে দেব, এবং শেষ হিসেবের দিন তার হয়ে রুশের বিরুদ্ধে লড়ব।

চীন যখন রাশাকে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করতে পারলো না, এবং শুধু তাই নয়, রুশ যখন চীনের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত না করতে পেরে তার সর্ব সাহায্য বন্ধ করে দিল—শুনতে পাই রাশানরা চীন ত্যাগ করার ফলে তাদের তৈরী কারখানাগুলো চালকের অভাবে খাঁ খাঁ করছে—তখন চীন বললে, 'এটার একটা ইস্‌পার-উস্‌পার করতে হবে। আমি ভারত আক্রমণ করে দেখি রুশ তখন কি করে? সে তো আর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্র—অর্থাৎ ভারতকে সাহায্য করতে পারবে না!'

এইটে চীনের গৌণ ওয়ার এম্—যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

মুখ্য ওয়ার এম্ তবে কি?

পোল্যান্ড-রুশের বিরুদ্ধে হিটলারের ওয়ার এম্ ছিল, (১) ওদের সৈন্যবাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করা, (২) ওদের নেতৃস্থানীয় কমিসারদের নিধন করা—তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, অর্থাৎ কোলডব্লাডেড মার্ডার। (৩) তাদের রাজত্বে জর্মনদের বসতি স্থাপনা করে তাদের দিয়ে দাসের কাজ করানো।

রুশভেল্ট ঠিক অতখানি চাননি। তবে তিনিও জর্মনদের কাছ থেকে শর্তহীন আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন—আন্‌কন্ডিশনাল সারেন্ডার। অর্থাৎ তিনি নাৎসী গুণ্ডা ও জর্মন জনসাধারণের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেননি। চার্চিল এটা পছন্দ করেননি—তিনি চেয়েছিলেন নাৎসী রাষ্ট্রের পতন ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ঐ ছিল তাঁর ওয়ার এম্।

চীন আমাদের সমূলে ধ্বংস করে এ-দেশে চীনা চাষাভূষোর বসত করতে চায় নি কিন্তু চীনের অন্যতম ওয়ার এম্ ছিল এদেশে কম্যুনিস্ট রাজ বসানো। চীন আশা করেছিল সে ভারতে হামলা দেওয়া মাত্রই এ-দেশের কম্যুনিস্টরা দেশের জনসাধারণকে তাতিয়ে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বসাতে পারবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সেটা হল না। এমন কি অনেক খাঁটি কম্যুনিস্ট, চীনের এ আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছেন এবং অনেকেই পণ্ডিতজীর ঝাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন—আর খ্রুশ্চভ-পন্থীরা তো রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

স্মরণ রাখা উচিত, চীনাদের এ ওয়ার এম্ উপস্থিত মূলতবী থাকলেও সেটাকে সে কখনও বর্জন করবে না। আমাদের তার জন্য হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে—হয়তো বা বহু বৎসর ধরে।

আমার মনে হয় চীন চায় আমাদের পঙ্গু করে রাখতে। প্রাচ্য দেশের দুই বিরাট ভূখণ্ড চীন এবং ভারত। ভারত কম্যুনিস্ট না হয়েও দেশের ধনদৌলত বাড়াতে চেয়েছে, আর চীন কম্যুনিজমের মাধ্যমে। এবং চীন যে বিশেষ সফল হয়নি এ কথা বিশ্বসুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি সেও জানা কথা। আখেরে তা হলে আমরাই প্রাচ্য দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় হব। চীনের কর্তারা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না।

তাই তাঁদের মতলব আমরা যেন আমাদের ধনদৌলত বাড়ানো বন্ধ করে বন্দুক

কামানের দিকে মন দিই। তাই নিয়ে চীনের কোন আশঙ্কা নেই, কারণ চীন বিলক্ষণ জানে, আমাদের বন্দুক-কামান যতই বাড়ুক না কেন, আমরা কখনও চীন আক্রমণ করবো না। মাঝের থেকে বন্ধ্যা বন্দুক-কামানের সেবা করে আমাদের ধনদৌলত বৃদ্ধি ক্ষান্ত হবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বন্দুক-কামান বাড়াতে হবে।

কিন্তু আমাদের ওয়ার এম্ চীনার বিনাশ-সাধন নয়। আমাদের ওয়ার এম্ অত্যন্ত লিমিটেড—সঙ্কটকালে আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। এবং ভবিষ্যতে যেন সে দম্ভ-ভরে পুনরায় আক্রমণ করার সাহস না পায়। তার জন্যে বেশ কয়েক বৎসর ধরে বন্দুক-কামান বানাতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরিব-দুঃখীর মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য আমাদের ধনদৌলতও বাড়াতে হবে।

তাই বলছিলুম, রাঁধবো এবং চুলও বাঁধবো।

দ্য গল্

একপাল কাকের মধ্যিখানে ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারলে যা হয়, কয়েক দিন পূর্বে ইউরোপোমেরিকায় তাই হয়ে গেল। বারোয়ারী বাজার, বারোর হাট, যুক্তহট্ট—যা খুশি বলুন—তারই দিকে তাগ করে জেনেরাল শার্ল দ্য গল্ ইংরেজকে জল-চল করার বিরুদ্ধে যে ডাণ্ডাখানি হালে ছুঁড়লেন, তারই ফলে ইউরোপোমেরিকায় তো কা-কা রব উঠেছেই, এদেশেও কা-কা রব ছাড়িয়ে উঠছে স্বস্তির প্রশ্বাস। এ অধম অর্থনীতির খবর রাখে যতখানি নিতান্ত না রাখলেই নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সবিনয়ে বলবো, যত দিন যাচ্ছে ততই অর্থবিদ 'পানডিট'দের প্রতি ভক্তি আমার কমছে।[১] মূল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছি, তবু এই সুবাদে নিবেদন, এদেশের কর্তারা যে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন, ব্রিটন্ বারোর বাজারে ঢুকে পড়লে ভারতীয় মাল অনায়াসে ব্রিটেনে ঢুকতে পারবে না, আমার হৃদয় সে ভয়ে কম্পিত নয়। বস্তুত আমি কাফেরের মত বলবো, এই বিলিতী তথাকথিত সুখ-সুবিধেই আমাদের সর্বনাশ করছে। দুনিয়ার সর্বত্র আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের মাল চালাবার চেষ্টা করছি নে। আমাদের লক্ষ্মীছাড়া ক্যাপিটালিস্টরা ইংরেজের হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে লক্ষ্মীলাভ করছেন। কিন্তু ওঁদেরই বা দোষ দিই কেন? স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বার বার এ নির্জন প্রান্তরে আমি চিন্তা করছিলুম, তাঁর সব কিছুই তো অল্পস্বল্প বুঝি, তাঁর 'রাজযোগ' আমার নিত্যপথপ্রদর্শক,—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কথা, বড় কাজ কি ছিল? যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম সেটি জড়ত্বনাশ। চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং কর্মে আমরা জড় হয়ে গিয়েছি। বিশেষ করে কর্মে। গীতায় আছে, কর্মেই আমাদের

---

১ হিটলার এঁদের নিয়ে বড় মস্করা করতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যখন দেশের ভার কাঁধে নিয়ে বেকার-সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ আরম্ভ করলুম তখন দাড়িওলা অর্থবিদ অধ্যাপকরা ভল্যুম ভল্যুম কেতাব লিখে সপ্রমাণ করলেন, দেশের সর্বনাশ হবে। যখন সমাধান করে ফেললুম, তখন ফের ভল্যুম ভল্যুম কেতাব বেরোলো যাদের মূল বক্তব্য, "বলেছিলুম, তখনই বলেছিলুম, এই সমস্যার এই সমাধানই বটে"। কেইনস্, শাখ্ট, শুমপেটার কজন?

অধিকার, ফলে নেই। আমরা গীতার উপর আরেক কাঠি সরেস হয়ে গেলুম। বললুম, 'কর্মেও আমাদের অধিকার নেই।'

'এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারও হুঁস[১] ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার[২] এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, বেহুঁশ[৩] যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, 'প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ''।'

সুপ্তি তবু ভালো। তার থেকে জাগৃতি আছে। কিন্তু জড়ত্বের কোনও ম্যাদ নেই।

এই জড়ত্বেরই অন্য শব্দ ক্লৈব্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ''ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।''

পণ্ডিতজীও তাই উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার বলছেন—'আমরা যেন কমপ্লেসেন্‌সের স্রোতে গা ঢেলে না দিই—ক্ষণতরে চীন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে।' কমপ্লেসন্‌স্ জড়ত্বেরই ভদ্র নাম।

আমাদের ছাত্রেরা গাইডবুক মুখস্থ করে পাস করে, আমরা—অধ্যপকেরা—ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলেজে যা শিখেছিলুম তাই পড়িয়ে কর্তব্য সমাধান করি, আমাদের ধার্মিকজন কোনও এক গুরুতে আত্মসমর্পণ করে ধর্মজীবন পালন হল বলে আশ্বস্ত হন, যে-বই লিখে আমাদের সাহিত্যিক বিখ্যাত হন তিনি বার বার সেইটেরই পুনরাবৃত্তি করেন, আমাদের ফিল্ম-পরিচালকেরা একই প্লট সাতান্ন বার দেখান, এবং যে ব্যবসায়ীদের কথা নিয়ে এ-অনুচ্ছেদ আরম্ভ করেছিলুম—একই বাজারে বছরের পর বছর মাল পাঠিয়ে পরমানন্দে শয্যায় গা এলিয়ে দেন। 'নব নব সঙ্কটের অভিযানে' পদক্ষেপ করার জন্য যে বিধিদত্ত প্রাণশক্তি আমাদের রয়েছে সেটা জড়ত্বের বল্মীকে আচ্ছাদিত।

আমাদের 'জীর্ণ আবেশ' 'সুকঠোর ঘাতে' কাটাবার জন্য স্বামীজী এনেছিলেন 'জড়ত্ব-নাশা মৃত্যুঞ্জয় আশা'।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজীর উদ্দাম অফুরন্ত স্বতশ্চল প্রাণশক্তি দেখে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভয় পেয়ে বললেন, 'এ আমি কি গড়লুম!' তাই সে 'ভুল শোধরাবার' জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি নিজের কাছে টেনে নিলেন। শঙ্করাচার্যকে যে-রকম টেনে নিয়েছিলেন, চৈতন্যকে যে-রকম।

*　　　*　　　*

আশা করি কেউ ভাববেন না দ্য গল্‌কে আমি চৈতন্য স্বামীজীর পর্যায়ে তুলছি : কিংবা আমি দ্য গলে মালা পরাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। স্বল্পবিস্তর নিবেদন করি।

ইংরেজের যে-রকম রাজকীয় সেন্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়, ফরাসীর তেমনি স্যাঁ

১. ২. ৩. বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ষড়বিংশ খণ্ডের ১৩১ পৃঃ থেকে আমি উদ্ধৃত করছি। কেউ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ 'হুঁস', সঙ্গে সঙ্গে 'হুঁশিয়ার' এবং 'বেহুঁশ' লিখলেন কেন? খনে 'স' খনে 'শ'? স্পষ্টত একই মূল থেকে তিনটি শব্দ তো এসেছে।

সীর। দ্য গল সেখানে শিক্ষালাভ.করেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জর্মনদের কাছে বন্দী হন। এই সময় বন্দী অবস্থায় তিনি জর্মন ভাষা শিখে নেন। হালে তিনি জর্মানগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ঐ দেশ ভ্রমণের সময় একাধিক শহরে জর্মন ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে ফ্রান্সের কোনও রাষ্ট্রপতি জর্মনিতে যাননি—নেপোলিয়নের কথা বাদ দিন, তিনি গিয়েছিলেন বিজেতারূপে—তার উপর ইনি বলেছেন তাদেরই মাতৃভাষা, জর্মনরাতর। তাদের হর্ষধ্বনি বেতারে শুনেছি।

কিন্তু পুরানো কথায় ফিরে যাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তিন ফরাসী বীর দেশের সম্মান পেতেন। ফক, জফ্র এবং পেতাঁ। প্রথম দুজন মারা যাবার পর পেতাঁই ফ্রান্সের রক্ষণ বিভাগের সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত প্রাকার নির্মাণই ফ্রান্স সংরক্ষণের জন্য প্রশস্ততম—ফলে কোটি টাকা খরচা করে তৈরী হলো মাজিনো লাইন—বহুশত বৎসর পূর্বে চীনারা যে-রকম দেওয়াল গড়েছিল।

দ্য গল্ ছিলেন পেতাঁর সহকর্মী। কিন্তু পদে পদে তিনি পেতাঁর সঙ্গে দ্বিমত। তিনি বার বার বলেছেন, এরকম পাঁচিল তুলে জড়ভরতের মত পিছনে বসে থাকলে আত্মরক্ষা হয় না। পেতাঁ তাঁর কথায় কান দেননি।

তারপর যখন ১৯৪০-এ ফ্রান্স নির্মমভাবে পরাজিত হল তখন সবাই বুঝলো প্রাচীন যুগের দেওয়াল বাঁধার জড়ত্ব সত্য সংরক্ষণ নয়।

এইখানেই দ্য গলের মাহাত্ম্য!

॥ দুই ॥

ফরাসী বিদ্রোহ শেষ হলে পর এক ফরাসী নাগরিক জনৈক নামজাদা জাঁদরেলকে শুধোয়, 'মসিয়ো ল্য জেনারেল, এই যুগান্তকারী বিদ্রোহে আপনার কঁত্রিবিউসিয়োঁ—''অবদান''—কি ছিল?' মসিয়ো ল্য জেনারেল গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে সপ্রতিভ মৃদু হাস্য হেসে বলেছিলেন, 'পৈতৃক প্রাণটি বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।'

বাস্তবিকই তখন ঘড়ি ঘড়ি কর্ণধার বদল, এবং এক এক কর্ণধার প্রাক্তন অন্য কর্ণধারের কর্ণকর্তন করেই সন্তুষ্ট নন, কানের সঙ্গে মাথাও চান।[১] হালে ইরাকে যা।

১৯১৮ এবং ১৯৪০-এর মাঝখানের সময়টাতে একই ধুন্ধুমার। তবে মাথা কাটাকাটি আর হত না। শুধু 'মন্ত্রিসভার পতন' নিয়েই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হতেন। এবং এ-সব পতন সর্বক্ষণ লেগে থাকত বলে ১৯৩৮-এ এক ফরাসী কাফেতে চুকুশ চুকুশ করতে করতে বলেছিল, 'এই প্যারিসেই অন্তত হাজারখানেক প্রাক্তন মন্ত্রী আছেন। একটু কান পাতলেই শুনতে পাবে, পাশের টেবিলে কেউ বলেছে, ''ক'ৎ জেতে ল্য মিনিস্ৎর্''—আমি যখন

---

১ ম্যাট্রিকের বাঙলা পরীক্ষায় একটি ছেলে লিখেছেন,

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পদ নাক কান তাঁর

মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' তারপর সেই ফরাসী আমাকে সাবধান করে দেয়, আমি যেন বেশী দিন ফ্রান্সে না থাকি; বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ হয়তো একদিন ক্যাক করে পাকড়ে নিয়ে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে। তাঁর উপদেশ আমি পুরোপুরি নিইনি। তবে কাফেতে বসে প্রায়ই অজানা জনকে বলতুম, 'ক'ৎ জেতে ল্য মিনিস্ৎর্—আমি যখন মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' আশ্চর্য কারও চোখে অবিশ্বাসের আমেজ দেখিনি। ফরাসী কলনী আলজেরিয়া থেকে কালা আদমী ভী মসিয়ো ল্য মিনিস্ৎর্ হতে আপত্তি কি?

তা সে কথা থাক্।

আসল কথা হচ্ছে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন ইতালিয়ানে বিস্তর বই বেরোয়, ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ কি তাই নিয়ে। এতদিন পর আমার আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় মাদাম তাবুই লিখিত একখানা বই বাজারে বেশ নাম কেনে।

ইংরিজি অনুবাদে তার নাম ছিল, 'পেরফিডিয়াস আল্‌বিয়েন অর্ আঁতাঁৎকর্দিয়াল?' —'বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ কিংবা তার সঙ্গে দোস্তী?'

বৈঠে মেরেছি সমস্ত রাত; ভোরবেলা দেখি, বাড়ির ঘাটেই নৌকা বাঁধা। ব্যাপার কি? যে-দড়িতে নৌকা বাঁধা ছিল সেটা খুলিনি।

এও তাই। দ্য গল্ আবার ফিরে এসেছেন যেখানে মাদাম তাবুই আপন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই লক্ষ্মীছাড়া ইংরেজকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে পাকাপাকি কোনও দোস্তী করা যায় কি না? পূর্বেই বলেছি, দুই যুদ্ধের মাঝখানে ফ্রান্সে এতই ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হত যে, ভেবেচিন্তে ইংরেজের সঙ্গে কোনও একটা চুক্তি—আঁতাঁৎ—করা, কিংবা আরো মনস্থির করে না-করা, কোনটাই করা যেত না। মাদাম তাবুইয়ের বিশ্লেষণ—যতদূর মনে পড়ছে—একটু অন্য ধরনের ছিল। তিনি বলেছিলেন, উভয় দেশেরই দুর্ভাগ্য যে আমরা কোনও পাকাপাকি সমঝাওতায় আসতে পারছি না। তার কারণ, আমাদের এখানে যখন গরমপন্থীরা (কনজারভেটিভ) মন্ত্রিসভা গড়চেন, তখন বিলেতে নরমপন্থীরা (লিবরেল অথবা লেবার), এবং আমরা যখন নরম তখন ওরা গরম।

তা সে যে-কোনও কারণেই হক, দুই যুদ্ধের মাঝখানে কোথায় না ফরাসী-ইংরেজ একজোট হয়ে বিশ্বশান্তির জন্য লীগ অব নেশন্স হক, কিংবা অন্যত্রই হক পাকা বুনিয়াদ গড়ে তুলবে, না আরম্ভ হল দু-জনাতে খ্যাচা-খেঁউ। এর উদাহরণ তো মাদাম তাবুই প্রচুর দিয়েছেন। তাঁর বই বেরোনোর পরের শেষ উদাহরণ আমরা দিই। হের হিটলার যখন সগর্বে সদম্ভে রাইনল্যান্ডকে সমরসজ্জায় সাজাতে আরম্ভ করলেন তখন ফ্রান্স আর্তকণ্ঠে সেদিকে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ভের্সাইয়ের চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল, জর্মন এ কর্মটি করতে পারবে না, এবং সে চুক্তির বরাত ফরাসী ইংরেজ দুজনের উপর ছিল। ইংরেজ সে আর্তরব শুনে সাড়া তো দিলই না, উল্টে দেখা গেল, সে গোপনে গোপনে হিটলারের সঙ্গে একটা নৌচুক্তি করে বসে আছে। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী এস্থলে বোঝা কঠিন নয়—তা আপনারা সেটাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' 'পারফিডি' বলুন আর নাই বলুন। তার শক্তি জলে। হিটলার যদি তাকে কথা দেয়, সে সেখানে লড়ালড়ি করবে না, তবে চুলোয় যাক রাইনল্যান্ডের সমরসজ্জা।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল। ফ্রান্স গেল। ব্রিটেন যায়-যায়। প্রথমবারের মত এবারও মুশকিল-আসান মার্কিন সবাইকে বাঁচালে।

কোথায় না এখন এ-দুজাত শিখবে একজোটে কাজ করতে, যাতে করে ফের না একটা লড়াই লাগে, উল্টে দ্য গল্ লেগে গেলেন ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইয়োরোপের উপর সর্দারী করতে!

দ্য গলের বিশ্বাস, ইংরেজ তার সর্বস্ব বেচে দিয়েছে মার্কিনের কাছে। তাই মার্কিন ইংরেজের কাঁধে ভর করে ইয়োরোপে নেবে সেখানে সর্দারী করতে চায়। পক্ষান্তরে ফ্রান্স, লা ফ্রাঁস, তুজুর লা ফ্রাঁস। বাঙলা কথায়, সভ্যতা-ঐতিহ্য-বৈদগ্ধ্যের মক্কামদিনা ফ্রাঁস। ইয়োরোপ তথা তাবৎ দুনিয়ার কেউ যদি সর্দারী করার হক্ক ধরে তবে যে ফ্রাঁস।

তাই তিনি করতে চাইলেন জর্মনির সঙ্গে দোস্তী। তা তিনি করুন। খুব ভালো কথা। দোস্তী ভালো জিনিস।

তারপর তিনি হাত বাড়ালেন খ্রুশ্চফের দিকে। সেও ভালো কথা। আমরা—অন্তত আমি—রাশার শত্রু নই।

ইংরেজ চাইলে, চতুর্দিকে এত সব দেদার দোস্তী হচ্ছে, সে-ই বা বাদ যায় কেন? বারোয়ারী বাজারে সে-ই বা ঢুকবে না কেন?

দ্য গল্ মারলেন ইংরেজের গালে চড়।

এখন কি হবে?

আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ফ্রান্স যে সর্দারী করতে চাইছে তার মত কোমরে জোর তার নেই। জর্মনির সঙ্গে তার দোস্তীও বেশীদিন টিকবে না। কারণ জর্মনি চায়, পূর্ব-পশ্চিম জর্মনির সম্মেলন। রাশা তার প্রতিবন্ধক। দ্য গলকে একদিন তার বোঝাপড়া করতে হবে। তখন হয় জর্মনি না হয় রাশাকে হারাতে হবে! তখন কোথায় রইল ইয়োরোপের উপর সর্দারী?

তলস্তয়

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্রজীবনের সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হলে শরৎচন্দ্র এ কথাটি বলেছিলেন। সমস্ত বাংলা দেশ তখন জয়ধ্বনি করে এই বিস্ময়ে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

কবিগুরু তলস্তয়ের[১] মৃত্যু-সংবাদ যখন রুশ সাহিত্যের তখনকার দিনের শরৎচন্দ্র গর্কির কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর শোকলিপি শেষ করার সময় লিখেছিলেন, 'তাঁর দিকে তাকিয়ে—যে আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি নে—মনে মনে বলেছিলুম, "এই লোকটি ঈশ্বরের মত (গড্ লাইক)"।'

প্রতি ধর্মেই একটি প্রশ্ন বার বার উঠেছে। ভগবান যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করতে চান, তখন তা করেন কোন্ পদ্ধতিতে? ভারতীয় আর্যরা উত্তরে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান তখন মানুষের মূর্তি ধরে অবতাররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ এবং মহাবীর হয়তো নিজেরা এই মতবাদকে স্বীকৃতি দিতেন না, কিন্তু বহু বৌদ্ধ এবং

---

১ লেয়ো নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। জন্ম—ইয়াস্নায়া পলিয়ানা (তুলা) ৯.৯.১৮২৮; মৃত্যু আস্তাপভো (তামবভ) ২০.১১.১৯১০।

জৈন ওঁদের পূজা করেন অবতাররূপে এবং হিন্দুরাও বুদ্ধকে অবতারের আসনে বসাতে কুণ্ঠিত হননি।

সেমিতি জগতে বিশ্বাস, ভগবান তখন মানুষের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তাঁকে তাঁর 'প্রফেট', 'পয়গম্বর', 'রসুল', 'প্রেরিত পুরুষ' নাম দিয়ে নবধর্ম প্রচার করতে আদেশ দেন। ইহুদী এবং মুসলমানদের বিশ্বাস, এঁরা কখনও কখনও অলৌকিক দৈবশক্তির আধার হন, কখনও হন না।

খ্রীষ্টের আসন মাঝখানে। তিনি কখনও বা ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কখনও ঈশ্বররূপে, কখনও বা সুদ্ধমাত্র 'প্রেরিত পুরুষ' রূপে অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ইসলাম তাঁকে অলৌকিক শক্তিধারী ('মুআজিজা বা মিরাকল' করার অধিকারী) পয়গম্বররূপে স্বীকার করে। খ্রীষ্ট যে অবতাররূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার পিছনে হয়তো প্রাচীন ভারতীয় আর্যধর্মের প্রভাব আছে।

এ তথ্য প্রমাণ করা সহজ নয়, কিন্তু হিটাইটদের আমল থেকেই পূর্ব ভূমধ্যসাগর তটাঞ্চলে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে যে দুজন অবতার সর্বজননমস্য, তাঁরা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

রামচন্দ্র রাবণকে শাসন করে দুষ্কৃতির বিনাশ করেন ও পুণ্যাত্মা জনের মনে সাহস বাড়িয়ে দেন। এবং এই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অস্ত্রধারণ করতে বিমুখ হননি। পরবর্তী যুগে বোধ করি প্রশ্ন উঠেছিল যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাণনাশ কি নিতান্তই অপরিহার্য? এ যুগে তাই দেখতে পাই মাইকেল যখন সীতাকে দিয়ে রামের বর্ণনা করাচ্ছেন তখন বলছেন, 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবননাশে সতত বিরত।'

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে হয়তো প্রশ্নটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্য বা আদর্শ (এন্ড) মহান হলেই কি যা খুশি সে পন্থা (মীন্‌স) অবলম্বন করা যায়? মহাভারতে তাই কি শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করছেন না, কিন্তু অবশ্য অর্জুনকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন?

এরপর বুদ্ধদেব। তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবননাশ করতে মানা করেছেন। কিন্তু রামকে যেরকম এক রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে অন্য রাষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কৃষ্ণকে যেরকম অধর্মচারী রাষ্ট্ররাজ দুর্যোধনের মোকাবেলা করতে হয়েছিল, বুদ্ধদেবকে সেরকম কোনও রাষ্ট্রের বৈরভাবের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হতে হয়নি। সমাজের ভিতর ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণনাশ না করেও প্রাণধারণ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যদি বর্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র এসে লুণ্ঠন, নরহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে কি আক্রান্ত নৃপতি ক্ষমা ও মৈত্রী নীতি অবলম্বন করে নিষ্ক্রিয় তুষ্ণীম্ভাব দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করবেন?

বুদ্ধদেবের পর খ্রীষ্ট যখন সে যুগের অধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র গঠন প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাইলেন, তখন দ্বন্দ্ব বাধলো সে রাষ্ট্রের স্তম্ভদ্বয় ধনপতি ও ধর্মাধিকারীদের সঙ্গে। তিনি অস্ত্র ধারণ করতে অসম্মত হন। ক্রুশের উপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (পাঠক কিন্তু ভাববেন না, তাই বলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বাধা পড়ে গেল—বস্তুত খ্রীষ্টান মাত্রেরই বিশ্বাস প্রভু যীশু ক্রুশে জীবন দেওয়াতেই তাঁর বাণী জনগণের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হল, তাঁর জীবনদানের ফলেই আমরা জীবনলাভ করলুম, কিন্তু এ প্রস্তাবনা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবান্তর।)

এরপর ঐ সেমিতি জগতেই হজরৎ মুহম্মদ। মক্কাতে যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করেননি। মক্কার রাষ্ট্রপতিরা যখন তাঁকে মেরে ফেলা সাব্যস্ত করলেন, তখন তিনি মদিনার নাগরিকদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তাদের দলপতি হবেন—তারা অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ ছিল না।[১]

আপন ধর্মকে উচ্চতর আসনে বসানোর জন্য কোনও কোনও অমুসলমান ধর্মযাজক হজরৎ মুহম্মদকে রক্তলোলুপ উৎপীড়করূপে অঙ্কিত করেছেন (যেন অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করে আপন জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না।) কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে লুণ্ঠনকারী বর্বর নামে মুসলমানরা তুর্ক অভিযানকারীরা (এস্থলে ফিরোজ, আকবরের কথা হচ্ছে না)। বার্নার্ড শ মুহম্মদ-চরিত মন দিয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর কাল্পনিক কথোপকথনে এ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। মুহম্মদকে দিয়ে বলাচ্ছেন, "I have suffered & sinned all my life through an infirmity of spirit which renders me incapable of slaying. " *

বস্তুত নানাদিক দিয়ে দেখতে গেলে হজরৎ মুহম্মদ শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে আসন নেন (এঁরা গীতা ও কুরান দিয়ে গিয়েছেন) এবং মোদ্দা কথা এই দাঁড়ায় যে, রাষ্ট্র যখন তাঁর বিরুদ্ধারণ করল, তখন তিনি যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ না হয়ে 'শর সংহরণে' প্রস্তুত রইলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ দেখতে পাই বিরুদ্ধাচরণকারীর সম্মুখে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়।

এরপর তেরশত বৎসর ধরে কেউ আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাবের উত্থাপন করেনি। পাণ্ডা পুরোহিতদের টিকা-টিপ্পনীর ভিতর খ্রীষ্টের বাণী নানা বিকৃত রূপ ধারণ করল—পাদ্রী সায়েবরা প্রতি যুদ্ধে পরমোৎসাহে বন্দুক কামান মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূত-পবিত্র করে যুদ্ধে পাঠালেন।

এযুগে তলস্তয়ই পুনরায় খ্রীষ্টকে আবিষ্কার করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমাজে তথা সাহিত্যে[২] সম্পূর্ণতম খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি করলেন

---

১ বার্নার্ড শ খ্রীষ্ট মুহম্মদের এক কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গীতে।

* "Who is to be the judge of our fitness to live? said Christ. "The highest authorities, the imperial governors, and the high priests find that I am unfit to live; Perhaps they are right."

"Precisely the same conclusion was reached concerning myself", said Muhammad. "I had to run away and hide until I had convinced a sufficient number of athletic young men, that their elders were mistaken about me : that, in fact, the boot was on the other leg."

Bernard Shaw, The Black Girl in Search of God, P. 57.

২ যাঁরা নোবেল প্রাইজের নাম শুনলেই চৈতন্য হারান তাঁদের বলে দেওয়া ভালো যে, ঐ প্রাইজ যদিও ১৯০১ খ্রীঃ থেকে দেওয়া আরম্ভ হয়, ও তলস্তয় ১৯১০-এ গত হন, তিনি এটি পাননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যতা-বৈদগ্ধ্যের মূলে কুঠারাঘাত। তার অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ এবং বিশেষ করে ধর্ম—এগুলোর পিছনে যে কত বড় ভণ্ডামি লুকানো রয়েছে, সেটা দেখাতে গিয়ে তিনি যে দার্ঢ্য, মেধা ও কঠোর সত্যনিষ্ঠা দেখালেন, তার সামান্যতম বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। 'ওয়র এন্ড পীস' তিনি লিখেছিলেন হীরার কলম নিয়ে সোনার কালি দিয়ে—আর তাঁর জীবনের এই চরম উপলব্ধি তিনি লিখলেন দধীচির অস্ত্র-নির্মিত দমশ্ কী তলওয়ার দিয়ে আপন বুকের রক্ত মাখিয়ে।

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ মহাপাপ' তাঁর এ-বাণী 'দুখবর' সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল এবং বহু দুখবরণ করার পর তলস্তয়েরই সাহায্যে নির্বাসন স্বীকার করে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। শেষ পরীক্ষা সেখানে হয়নি।

রুশ রাষ্ট্র তলস্তয়কে কখনও সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করেনি বলে বলা অসম্ভব, তাঁকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশবরণ করতে হত কিনা। তবে একথাও ঠিক, আপন আদর্শের চরম মূল্য দেবার জন্য তিনি আত্মজন পরিত্যাগ করে পথপ্রান্তের অবহেলায় প্রাণত্যাগ করেন।

তলস্তয়-কাহিনী এখানেই হয়তো শেষ, কিন্তু সেই চিরন্তন কাহিনী আরও এগিয়ে গিয়েছে এবং কখনও শেষ হবে কিনা জানি নে।

গাঁধীকে বহু অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলন তলস্তয়। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম, যিনি বিদেশী পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন।

এবার এটম বোমা তৈরী হচ্ছে।

প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দা'নুন্দ্‌জিয়ো

গ্রীকের উত্তরাধিকারী লাতিন। লাতিন তার অনুপ্রেরণা, প্রাণরস, কলাসৃষ্টির আদর্শ ও তাকে মৃন্ময় করার পদ্ধতি সব কিছুই নিয়েছে গ্রীক থেকে। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যও সংস্কৃতের এতখানি পদাঙ্ক অনুগমন করেনি। বরঞ্চ বলবো উর্দুর সঙ্গে ফার্সীর যে সম্পর্ক, লাতিনের সঙ্গে গ্রীকের তাই। অহমিয়ারা যদি রাগ না করেন তবে বলবো, বাঙলা ও অহমিয়ার মধ্যে ঐ সম্পর্কই বিদ্যমান, যদিও বাঙলার মৃত্যু হওয়ার পর অহমিয়া তার উত্তরাধিকারী হয়নি—বাঙলা তার উৎকর্ষের এক বিশেষ চরম স্তরে পৌঁছনোর পর অহমিয়া তার রস-সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যকে তার আদর্শরূপে ধরে নেয় (এখানে বুরুঞ্জী বা দলিলদস্তাবেজের গদ্যের কথা হচ্ছে না)।

বহুশত বৎসর ধরে লাতিন পাশ্চাত্ত্যভূমির সর্ব চিন্তা সর্ব অনুভূতির মাধ্যম ছিল। এমন কি লাতিনের উত্তরাধিকারী ইতালীয়, ফরাসী, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষা পূর্ণ সমৃদ্ধি পাওয়ার পরও—এমন কি এত শতাব্দীতেও, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যখনই চেয়েছেন যে তাবৎ ইয়োরোপ তাঁদের রচনার ফললাভ করুক তখনই তাঁরা আপন আপন মাতৃভাষা—জর্মন, ফরাসী ইত্যাদি না লিখে লিখেছেন লাতিনে। ইবন খলদূনের (ইনি মার্কসের বহু পূর্বে ইতিহাসের অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন) আরবী পুস্তকের অনুবাদক মাতৃভাষা ব্যবহার না করে খলদূনের 'মোকদ্দমা'—'প্রলেগমেনন' অনুবাদ করেছেন লাতিনে। এ শতাব্দীতেও জলালউদ্দীন্ রুমীর ফার্সী থেকে ইংরিজিতে তর্জমা করার সময়

ইংরেজ তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলো অনুবাদ করেছেন লাতিনে—উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্কের হাতে এ বই পড়লে তারা যেন বুঝতে না পারে।

খাস লাতিনের জন্মভূমি ও লীলাস্থল যদিও ইতালীতে এবং ইতালীয় সাহিত্যের অতি শৈশবাবস্থায়ই দান্তের মত অতুলনীয় মহাকবির আবির্ভাব, তবু কার্যত দেখা গেল লাতিনের অন্য উত্তরাধিকারী ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য যেন তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই হতে পারে যে, ইতালীয়রা তখন শুধু সাহিত্য নয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারুশিল্পেও আপন সৃজনীশক্তির বিকাশ করছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারিস ক্রমে ইয়োরোপের কলাকারদের মক্কা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় রুশের তুর্গেনিয়েফ, জর্মনির হাইনে, পোলান্ডের শঁপা, এমন কি ইতালীর রসসীনি—এঁরা সকলেই প্যারিসে বসবাস করতেন।

এর পরই ফরাসীতে যাকে বলা হয় ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌ল্—'শতাব্দীর সূর্যাস্ত'।

দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো খ্যাতিলাভ করেন ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে—কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাররূপে এবং কর্মযোগী—ফিউমের 'রাজা'রূপে তিনি খ্যাতির চূড়ান্তে ওঠেন ১৯১৯-এ, অর্থাৎ আমাদের শতাব্দীতে। আরবী ভাষায় এঁদের বলা হয় 'জু অল্ করনেন'—'দুই শতাব্দীর অধিপতি'।

বহু রাগরঙ্গে রঞ্জিত বৈচিত্র্যপূর্ণ এঁর জীবন। ইস্কুলে থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে রোমে এসে ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য তিনি ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পদাতিক, নৌবাহিনী ও বিমানবহরে সর্বত্রই সমান খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষ করে বিমান পরিচালনায়। আজ যেটাকে স্ট্যান্‌ট্ ফ্লাইং বলা হয়, তার প্রধান পথপ্রদর্শক দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো। অমর খ্যাতির জন্য তাঁর এমনই অদম্য প্রলোভন ছিল যে, তার জন্য তিনি সর্বদাই প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারপর মিত্রশক্তি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিউমে বন্দরকে ইতালী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেন, তখন কবি দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর রুদ্রতম রূপ ধারণ করলেন। ফিউমে বন্দর দখল করে তিনি সেখানে এক রাজ্য স্থাপন করে নিজেকে 'অধিপতি' রূপে ঘোষণা করলেন। কবি, সৈনিক, নেতা তিন রূপেই তিনি স্বপ্রকাশ হলেন। মাত্র ১৫ মাস তিনি সেখানে 'রাজত্ব' করেছিলেন বটে, কিন্তু ইতালীর লোক আজও তাঁকে 'ফিউমের বীর', জাতির গর্বরূপে স্বীকার করে।

প্রেমের জগতেও দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো অভূতপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন। লোকে বলে, তিনি নাকি একসঙ্গে পাঁচটি রমণীর সঙ্গে প্রেম করতে পারতেন। একসঙ্গে পাঁচসেট প্রেমপত্র লিখেছেন (কু-লোকে বলে, সেক্রেটারীকে ডিক্‌টেট করতেন) এবং প্রত্যেক সেটই একেবারে অরিজিনল, অন্যান্য সেট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'লে ভের্জীনি দেল্লে রক্কে' 'গিরিকুমারীত্রয়'-এ। সেখানে উপন্যাসের নায়ক কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না, তিন নায়িকা, আনাতোলিয়া, ভিয়োলান্তে, মাসসিমিল্লা, কাকে তিনি বরণ করবেন। এ উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর পক্ষে একই সময়ে এই তিনজনকে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ এই তিন বোনের চরিত্র তিনি এমনই অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, দৃঢ় রেখায় অঙ্কন করেছেন যে, প্রত্যেকটি চরিত্র আপন মহিমায় স্বপ্রকাশ। তার

সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা চারুশিল্পী দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, খুবই সহজ বলতে হবে।

দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো চরিত্র বুঝতে ভারতবাসীর খুব অসুবিধা হয় না। কিছুদিন পূর্বেও আমরা পরাধীন ছিলুম। আমরা যদি হটেনটট বা বন্টুর মত ঐতিহ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতিহীন জাত হতুম, তা হলে আমাদের অপমানবোধের বেদনা এতখানি নির্মম হত না। ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌লে ইতালী স্বাধীন বটে, কিন্তু সে তখন তার গৌরবময় নেতার আসন ছেড়ে দিয়েছে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলন্ডকে। এমন কি যে অন্নবস্ত্র সমস্যা তাকে তখনও (এখনও) কাতর করে রেখেছে—সেটাকে ঐতিহ্যহীন সুইটজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ততদিনে সমাধান করে ফেলেছে। জাত্যাভিমানী স্পর্শকাতর ইতালীয় মাত্রই যখন দেখত প্রতি বছর হাজার হাজার ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন তার প্রাচীন কীর্তিকলা দেখবার জন্য রোম নেপল্‌স্‌ ভেনিস পরিক্রমা করে, গ্যোটে বায়রন কেউই বাদ যান না[১] এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখে ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপদ আপন ইতালীয় ভ্রাতা, এঁদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, তখন ঐতিহ্যচেতন ইতালিয়ার মরমে মরাটা কি হৃদয়ঙ্গম করাটা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন? দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন শুধু তার পূর্ব গৌরব, প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্যই নয়, তাঁর সদাজাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয় অহরহ তাঁকে সচেতন রাখতো দেশের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে। ভেনিস দেখে বহু দেশের বহু কবি আপন মাতৃভাষায় তার প্রশস্তি গেয়েছেন, কিন্তু দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর উপন্যাস 'ইল ফুয়োকো'—'অগ্নিশিখা', 'ফ্রেম অব লাইফে'—তাঁর যে বর্ণনা এবং দরদবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সে জিনিস ইতালীয় সাহিত্যে অতুলনীয় তো বটেই, অন্য সাহিত্যেও আছে কিনা সন্দেহ—অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

ইয়োরোপে রেনেসাঁস যাঁরা আনয়ন করেন, তাঁদের শেষ প্রতিভূ দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো মাঝখানে কত শত বৎসরের ব্যবধান, তবু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়—এবং যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাঁরা বলেছেন তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হত—তিনি কি স্বচ্ছন্দে রেনেসাঁস সৃষ্টিকর্তা অতিমানবদের মধ্যে বিচরণ করেছেন। ওদিকে তিনি নিজেও মনে

---

১ এবং এ যুগে—

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রাণী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিন আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
ঊষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"

রবীন্দ্রনাথ, পূরবী॥

পক্ষান্তরে ইতালীয় কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন—

ইতালি, ইতালি! এত রূপ তুমি
কেন ধরেছিলে হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে
নিরাশার কালিমায়।

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

(Italia, Italia, o tu cui feo la sorte)

করতেন যে, তিনি প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিক্‌সের পরবর্তী পুরুষমাত্র। একটি ফোয়ারার বর্ণনা দিতে গিয়ে দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো সে ফোয়ারার পাথরের খোদাই কতকগুলি লাতিন প্রবাদ তুলে দিয়েছেন। লাতিন অনেকখানি পড়া না থাকলে এরকম একটি অনবদ্য সঙ্কলন অসম্ভব।

কর ত্বরা, ওগো,
তোল ফুলগুলো
ভরা মধু গন্ধে।
পলাতকা ঐ
মুহূর্তগুলির
পরা নীরিবন্ধে॥

PRAECIPITATE MORAS,
VOLUCRES CINGATIS,
UT HOBAS NECTITE FORMOSAS, MOLLIA SEATA, ROSAS

Hasten, hasten ! Weave garland of fair roses to girdle the passing hours.

সেই ফোয়ারার জল নিচের আধারে জমেছে; সে বলছে :—

জীবন সলিল
পান করিবে কি?
এ যে বড় মধুভরা—
আঁখিজলে করো
লবণসিক্ত
তবে হবে তৃষা-হরা॥

FLETE HIC OPTANTES NIMIS ESS ACQUA DULCIS AMANTES
SALSUS, UT APTA VEHAM, TEMPERE HUMOR EAM.

Weep here, ye lovers who come to slake your thirst. Too sweet is the water. Season it with the salt of your tears.

গ্রীক এবং লাতিন থেকে তিনি নিয়েছিলেন তাঁর ভাষার অলঙ্কার। আজ যদি বাংলাতে কেউ পদে পদে কালিদাস শূদ্রকের মত উপমা ব্যবহার করতে পারেন এবং সে তুলনাগুলো হয় এ যুগের বাতাবরণেই—কারণ দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো ক্লাসিক্‌সে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও নিশ্বাস নিতেন বর্তমান যুগের আবহাওয়া থেকে—তা হলে তার সঙ্গে দা'নুন্‌দ্‌জিয়োর তুলনা করা যাবে। এ যুগের লেখকদের মধ্যে প্রধানত নীৎশে, শোপেনহাওয়ার, দস্তেয়ফস্কি এবং সুরকারদের মধ্যে ভাগ্‌নার তাঁর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাই এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে 'অতিমানব', 'সুপারম্যান' বা 'য়্যুবারমেনশে'র যে ধারণা ফিষটে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং কার্লাইল, মাদ্‌জীনি হয়ে নীৎশেতে পৌঁছয়—যার সাহায্যকারী ছিলেন ট্রাইশকে, কীপলিং, হাউস্টন, চেম্বারলেন এবং বের্গসোঁ—দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো এঁদেরই একজন। এঁরা সকলেই যে সুপারম্যান চেয়েছেন তা নয়, কেউ কেউ চেয়েছেন সুপাররেস—শ্রেষ্ঠ জাতি, যেমন হিটলার চেয়েছিলেন 'হেরেন-ফল্‌ক্‌' 'প্রভুর জাত'—কেউ কেউ চেয়েছেন সুপারস্টেট।

রাস্‌ল্ বলেন, 'তবু ফিষটে, কার্লাইল, মাদ্‌জীনিতে মুখের মিষ্টি কথায় কিছুটা নীতির দোহাই আছে, কিন্তু নীৎশেতে এসে তাও নেই।'[১] সেখানে উলঙ্গ রুদ্ররূপে 'সুপারম্যানে'র আপন শক্তিসঞ্চয়ই সর্বপ্রধান কর্তব্য, 'স্বধর্ম'। হিটলারের গ্যাস চেম্বার তারই এক কদম পরে।

আমার মনে হয়, দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো এসব কট্টরের সমধর্মী নন। তাঁর ভিতরকার আর্টিস্টই বোধ হয় তাঁকে সে বর্বরতা, নৃশংসতা থেকে বাঁচিয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে রসিক প্রতি মুহূর্তে পঞ্চভূতকে নিঃশেষে শোষণ করেছে, যার রচনার প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি শব্দে রূপরসগন্ধস্পর্শ ধ্বনির সমাবেশ, তুলনাব্যঞ্জনা মধুরতম সামঞ্জস্য যার অব্রণ-নিটোল সুডৌল নির্মাণপদ্ধতিতে সে সৃষ্টিকর্তাকে কোনও বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না।

দা'নুন্‌দ্‌জিয়োর সৃষ্টিতে আমি যদি কোনও ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকি তবে সেটা মাধুর্যের অতিরিক্ততায়—'কাদম্বরীতে' যে-রকম।[২]

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ

গিয়াস্-উদ্-দীন আবু-ল ফৎহ্ ওমর ইব্‌ন্ ইব্রাহীম অল খৈয়াম প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যে সুপরিচিত। তাঁকে নিয়ে ইরানের ভিতরে বাইরে সর্বত্র আজও পূর্ণোদ্যমে নানাপ্রকারে গবেষণা চলছে। এবং অত্যধিক গবেষণার মন্থনে যে বিষ ওঠে, তাও দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও জর্মন গবেষক বলেন, 'খৈয়াম নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সে খৈয়াম কোনও কবিতা রচনা করেননি।' জনৈক রুশ গবেষক বলেন, 'কিন্তু খৈয়ামের ঠিক পরবর্তী যুগের ইতিহাসে যে এই বাক্যটি পাচ্ছি—"তিনি খুরাসানের কবিদের অন্যতম"—এটার অর্থ কি?' তাই বোধ হয় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত—তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না—মাত্র নয়টি রুবাইয়াৎ[৩] (চতুষ্পদী) ওমরের বলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছেন। অথচ পার্টিশনের পূর্বেও কলকাতার তালতলায় যে বটতলা সংস্করণ খৈয়ামের রুবাইয়াৎ পাওয়া যেত তাতে থাকতো প্রায় বারোশটি।[৪] তবে অতিশয় এক-নজর ফেললেও ধরা পড়ে, এর শত শত রুবাইয়াৎ ইরানের একাধিক কবির কাব্যসঙ্কলনে—বিশেষত হাফিজের—ওদেরই নামে চলেছে। কোনও কোনও রুবাঈ (রুবাইয়াতের একবচন) তো পাওয়া যায় দু-তিন চার

---

১ বার্ট্রান্ড রাস্‌ল্—দি এনসেস্ট্রী অব ফ্যাসিজ্‌ম্।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, 'দেবপ্রিয়' 'বিধিদত্ত' 'সকলের সেরা জাতের' ধারণা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইহুদীরাই সৃষ্টি করে। সে ধারণার দলিলে বাইবেল ভর্তি। খ্রীষ্ট তার প্রতিবাদ করেন।

২ প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো—১২ মার্চ, ১৮৬৩—১লা মার্চ, ১৯৩৮।

৩ তাপসী রাবেয়া নাম এদেশে অজানা নয়। তার অর্থ 'চতুর্থ কন্যা'। 'রুবাইয়াৎ', 'রাবেয়া' ইত্যাদি শব্দ আরবী, 'আরবাৎ' অর্থাৎ 'চার' থেকে এসেছে।

৪ ইরানে ১৪০১ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১২০৮ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় ৮৮ বৎসর পরে লিখিত এক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় ২৫১টি—এটি এখন অক্সফর্ডে।

কিংবা ততোধিক কবির কাব্যে। এক জর্মন পণ্ডিত তাই এক বিরাট নিঘণ্টু (কনকরডেন্স, ক্রস্‌রেফরেন্স সম্বলিত কার্ড ইনডেক্স—যা খুশি বলুন) নির্মাণ করেছেন। খৈয়ামের নামে প্রচলিত প্রত্যেকটি রুবাঈ কোন্ কোন্ কবির কাব্যেও আছে তারই পরিপূর্ণ ফিরিস্তি। টাইমটেবিলের মত কলামের পর কলাম গেঁথে গেঁথে পাতার পর পাতা।

আমাদের মত সাধারণ পাঠক ভীত হয়ে সে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে।

কিন্তু আমাদের দলটি নিতান্ত ছোট নয়। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, খুদ খৈয়ামের দেশে ইরানেও আমাদের মত বিস্তর নিরীহ পাঠক আছেন, যাঁরা কোন্ রুবাঈটি খাঁটি আর কোন্‌টা মেকী তাই নিয়ে কালক্ষেপ করতে চান না।

এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যে কটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন তার কতগুলো ওমরের নয়। তৎসত্ত্বেও ইরানে তাঁরই উপর নির্ভর একটি খৈয়াম সংস্করণ বেরিয়েছে।

কিন্তু এই সংস্করণের আরও বৈশিষ্ট্য আছে।

এদেশে ফরাসী জর্মন শেখার প্রতি অনেকের উৎসাহ দেখা দিয়েছে। খৈয়ামের এই ইরানী সংস্করণে আছে : ১) ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ইংরিজি অনুবাদ ২) সেই অনুবাদের যতটা কাছাকাছি পাওয়া যায় তারই ফার্সী মূল (ফিট্‌স্‌জেরাল্ড অনেক সময় ভাবানুবাদ করেছেন বলে বলা কঠিন, ঠিক কোন্ ফার্সী রুবাঈটি অনুবাদ করেছেন, আবার এমনও দেখা যায়, একাধিক রুবাইয়াৎ থেকে তিন-চারটি ছত্র যোগাড় করে ইংরিজি একটি কোয়াট্রেন 'সৃষ্টি' করেছেন), ৩) ফরাসী অনুবাদ—কখনও মূল ফার্সীর অনুবাদ অর্থাৎ ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যে স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক তা নেননি, আর কখনও বা ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ইংরিজি থেকে ফরাসী অনুবাদ, ৪) জর্মন অনুবাদ—একাধিক জর্মন অনুবাদ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অনুকরণ এরা প্রায়ই করেন নি, ৫) আরবী অনুবাদ সরাসরি ফার্সী থেকে, তবে অনেক স্থলেই স্বাধীন। অনুবাদ করেছেন এক আরব কবি যদিও তিনি জাতে ইরানী।

এ ছাড়া সঙ্কলনে কয়েকটি মূল্যবান অবতরণিকাও একাধিক ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বিখ্যাত জর্মন ফার্সীবিদ্ রোজেন, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড, আরব পণ্ডিত আদীব অলতুগা, ইরানী পণ্ডিত হিদায়ৎ ও সঈদ নফীসী (ইনি কয়েক বৎসর ভারতে বাস করে গেছেন) এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে খৈয়ামপ্রেমী পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অবতরণিকা পড়া হয় 'পুরাতত্ত্ব' হিসেবে।

আমরা যখন ফরাসী বা জর্মন কোনও নূতন ভাষা শিখতে যাই তখন আমাদের হাতে দেওয়া হয় যে পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকে ঘরের আসবাবপত্রের নাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতার প্রতিশব্দ, স্টেশন, টিকিট, প্ল্যাটফর্ম, খাদ্যাদি বাগানের সাজসরঞ্জামের যাবতীয় জিনিসপত্র এদের নাম, লিঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বয়স্ক পড়ুয়ারা—এবং আমরা সচরাচর একটু বয়েস হওয়ার পরেই এ-সব ভাষা আরম্ভ করি—পায় অল্পই মনের খোরাক। লাগে একঘেয়ে—শিখে যাই গতানুগতিক ভাবে। আমি জানি একেবারে গোড়ার থেকে মন এবং হৃদয়েরই খাদ্য দেওয়া যায় না—কিন্তু কিছুটা শেখার পরেই তো মৃন্ময় বিষয়বস্তু থেকে চিন্ময়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। বয়স্কদের জন্য এরকম পাঠ্যপুস্তক বিদেশে আমি

দু'একখানা দেখেছি। এস্থলে আমার মূল বক্তব্য এই, আট বছরের বাঙালী ছেলে ফরাসী শিখতে চাইলে তার পাঠ্যপুস্তক হবে একরকম, আঠারো বছরের কিশোর শিখতে চাইলে হবে অন্যরকম।

যাদের কিছুটা ফরাসী বা জর্মন, অথবা উভয়েরই কিছুটা শেখা হয়ে গিয়েছে—আর খৈয়ামে আসক্তি থাকলে তো কথাই নেই—তাঁরা এই সঙ্কলনটি পড়ে আনন্দ তো পাবেনই, ভাষা-শিক্ষার কাজও অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ওমরের সবচেয়ে পরিচিত চতুষ্পদীটি নিচ্ছি :—

ফার্সীতে আছে—

গর দস্ত দহদ জ্ মগজে গন্দুমে নানী
ওজ্ মৈ দোমনী জ্ গুসফন্দী রানী
ও আনগে মন ও তো নিশসস্তে দর ওয়রানী
ত্রয়েশী বুদ ওয়া আন ন্হদ-হর সুলতানী

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
A Flask of wine, a Book of Verse–and Thou
Beside me singing in the Wilderness–
And Wilderness is Paradise enow.

Pour celui qui possede un morceau de bon pain
Un gigot de mouton. un grand flacon de vin.
Vivre avec une belle au milieu des ruines,
Vaut mieux qu d'un Empire etre le souverain

Wein, Brot, ein gutes Buch der Lieder :
Liess ich damit selbst unter Truemmern mich nieder,
Den Menschen fern, bei Dir allein,
Wuerd'ich gluecklicher als ein koenig sein.[১]

---

১ বাঙলায় :
বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর যদি তুমি রাণী,
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ॥

সত্যেন দত্ত

সে নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়া
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই ত সখী স্বর্গ আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

কান্তি ঘোষ

মূল ফার্সীতে আছে :

হাতে (দস্ত) যদি থাকে
গমের মগজের (মগ্‌জ্‌) রুটি (নান)
দুই মনী (দো মনী) মদ ও
ভেড়ার একখানা ঠ্যাঙ (রান্‌),
তোমাতে আমাতে যেখানে বসেছি
সেটি যদি ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণও হয়
(তবুও) আনন্দ (আয়েস) যা হবে
সে সুলতানের রাজত্বের (হদ্‌) চেয়েও বেশী।

ইংরিজিতে দেখা যাচ্ছে, ভেড়ার ঠ্যাঙ বাদ পড়েছে (বোধ হয় অনুবাদক এটাকে বড্ড গদ্যময় মনে করেছেন), কবিতার বই যোগ করা হয়েছে, প্রিয়ার সঙ্গীতও বাড়ানো হয়েছে; সুলতানের রাজত্বের বদলে স্বর্গপুরী। কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রথম ছত্রে আছে, 'বিনীৎ দ্য বাও'—পরে আবার সেটাই 'উইলডারনিস' হয় কি করে? সত্যেন দত্ত বুদ্ধিমানের মত 'বিজন' ব্যবহার করেছেন, 'উইলডারনিস' ও 'বনচ্ছায়া' দুই-ই বিজন। কান্তি ঘোষ উইলডারনিস বর্জন করে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছেন।)।

ফরাসীতে আছে ভালো রুটি, ভেড়ার ঠ্যাঙ ও তবে মদের পাত্রকে গ্রাঁ (grand ফরাসীতে বিরাট অর্থে) বলা হয়েছে, 'দু মনী' বাদ পড়েছে এবং ফার্সীতে যেখানে সুদ্ধ 'তুমি' আছে, সেটা ফরাসীতে সুন্দরী তরুণী (belle) হয়ে গিয়েছে। অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক।

জর্মনে মদ (Wein), রুটি (Brot) আর কবিতার বই (Buch)। দুম্বা বাদ পড়েছে, তবে 'বাও' নেই—আছে ফার্সীর সরল অনুবাদ 'ভগ্নাবশেষ মধ্যে' (Truemmern)।

ইরানী চিত্রকর চতুষ্পদীটি বর্ণে অলঙ্কৃত (ইলস্‌ট্রেট) করার সময় যুবক-যুবতীকে বসিয়েছেন ভাঙাচোরার মাঝখানে বিধ্বস্ত প্রাসাদের অবশিষ্ট একটি দেউড়ির কাছে। দূরের পটভূমিতে আব্‌ছা-আব্‌ছা দেখা যাচ্ছে, সপারিষদ সুলতান বসেছেন সিংহাসনে, সম্মুখে গায়িকা—কিন্তু সমস্তটাই যেন কোন প্রেতলোকের আবহাওয়াতে ভাসছে।

চিত্রকর ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের প্রভাবে পড়েছেন—কিঞ্চিৎ। যুবক-যুবতীর সম্মুখে দুম্বার ঠ্যাঙ আছে, মদের পাত্রও আছে, তবে সেটা বিরাট নয়, 'দু মনী' তো নয়ই এবং সেটি ইটালিয়ান পদ্ধতিতে খড় দিয়ে প্যাঁচানো—ইরানে সে-রেওয়াজ আছে বলে জানতুম না—কিন্তু যুবকের হাতে দিয়েছেন একখানি পুস্তিকা—ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ফিরিস্তিমাফিক —তবে তরুণী সে-মাফিক গান গাইছেন না। পায়ের কাছে আমাদের খোয়াই-ডাঙার বুনো ফুল। তেরঙা ছবি, রেজিস্ট্রেশন খারাপ।

আমাদের কৈশোর-যৌবনে বহু তরুণ-তরুণী ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ওমর প্রায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। সে রেওয়াজ এযুগেও হয়তো সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। যেটুকু স্মরণে রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ফরাসী-জর্মন অনুবাদ পড়লে ভাষাশিক্ষা দ্রুততর হবে, পাঠক আনন্দও পাবেন। হয়তো বা তারই ফলে আমরা আরেকখানা খৈয়ামের বাঙলা অনুবাদ পাবো।

পুস্তকে পঁচাত্তরটি চতুষ্পদীর জন্য পঁচাত্তরখানা তিনরঙা ছবি তো আছেই, তার উপর

এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কারুকার্য, আব্ছা তুলিতে আঁকা নানা প্রকারের অর্ধসুপ্ত চৈতন্যের স্বল্প প্রকাশ—কাব্য পড়ে চিত্রকরের প্রতিক্রিয়ার রূপ। ছবিগুলি রবি বর্মা স্টাইলে আঁকা—তবে তার চেয়ে ঢের কাঁচা। একটি ব্যাপারে কিন্তু সর্বচিন্তাশীল দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন—জামাকাপড়, বাড়িঘর, গাছপালা, আসবাবপত্র প্রায় সবই খাঁটি ইরানী। অবশ্য বিদেশী প্রভাব কিছুটা যে পড়েনি তা নয়, তবে সে সামান্য। বিদেশী—বিশেষ করে ইয়োরোপীয় চিত্রকর—যে রকম নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কিম্‌ভূত বদখৎ 'হাঁসজারু' তৈরী করেন, তিনি তার থেকে স্বভাবতই মুক্ত। এবং তাঁর ছবিতে যে এক নূতন পরীক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই চিত্রকর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে উপক্রমণিকায় লিখেছেন :

"At the end, I hope the Patrons of art find this gift amusing and this could be an Ideal Ideas (sic) for the young artists, and the old and experience (sic) artists could forgive some of the scenes which lacking the Proper Techniques (sic). I wish they call them to my attention, I'll be most greatful (sic)"...Akbar Tajvidi.

এ পুস্তক সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু মনোরম আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, এটির সঙ্গে শুধু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।[১]

The quatrains of Abolfath Ghiat-e-Din Ebrahim KHAYYAM of Nishabur, Published by Tahir Iran Co, 'Kashani Bros' Teheran, Lalezar-Istanbul Sq.

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সম্মুখে ঘন আঁধার"

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখনও হতাশ হয়, কখনও বা খুশী, বউ বাপের বাড়ি গেল তো মুখে ব্যাজার ভাব, এমন সময়ে চ্যারিটি ম্যাচের একখানা টিকিট ফোকটে পাওয়াতে সে বেদনা না-পাত্তা ঘুচে গেল—এই নিয়ে আমরা পাঁচজন আছি। সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এই আমরাই পৃথিবীতে ম্যাজরিটি। আমাদের বেদনা সামান্য, সেটা ঘুচতেও বেশীক্ষণ লাগে না।

অথচ মুনিঋষি পীর-প্যাকম্বর বলেন, 'তোমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতের সন্ধান করো।' একফোঁটা একটি মেয়েও নাকি বিস্তর ধনদৌলত পাবার পর বলেছিল, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তাতে আমার কি প্রয়োজন!'

চাকরি বজায় রাখার জন্য আমাকে সমস্ত জীবন ধরে দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের, (বেশী না, আল্লার দয়ায় মাত্র সাতটি) বিস্তর বই পড়তে হয়েছে। কিন্তু আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি, এই আমরা সাধারণ পাঁচজন তো অমৃত না পেয়েও দিব্য বেঁচে আছি, ওর পিছনে ছুটোছুটি করার আমাদের কী প্রয়োজন! আর বাঙলা কথা বলতে কি, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মত, তখন ঐ অমৃতটা আমাদের ঘাড়ে চাপানেই অন্যায়। অন্তত একটি

---

১ খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম কৃত তাঁর অনুবাদ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

মহাপুরুষ—আমাদের মতে—এ খাতায় একটি মুক্তো জমা রেখে গেছেন; তিনি বলেছেন, 'শুয়োরের সামনে মুক্ত ছড়িয়ো না।' তাই সই। গালাগালটা বরদাস্ত করে নিলুম। আর, মহাপুরুষ একথাটা বলার সময় ক্ষণেকের তরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছিলেন তো? তাতেই হয়ে যাবে। 'মোক্ষ' নামক 'অমৃত' বলে কোনও পদার্থ যদি থাকে তবে ঐ একটি চাউনিতেই সকলং হস্ততলং। অবশ্য সে অমৃতের জন্য কোনও অসম্ভব ভবিষ্যতে যদি আমার প্রাণ আদৌ কাঁদে!

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা দেখতে মানুষের মত বটেন, কিন্তু আসলে এঁরা মানুষ নন। নইলে বলুন দেখি, তুমি কবি, দু পয়সা তোমার আছে, পদ্মায় বোটে ভাসতে তুমি ভালোবাসো, কী দরকার তোমার ইস্কুল করার আর তার খাঁই মেটাবার জন্যে বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লী, বোম্বাই চষার? কিংবা বিবেকানন্দ। অসাধারণ জিনিয়স। পঁচিশ হতে না হতেই প্রাচীন অর্বাচীন দিশী-বিদেশী সর্বশাস্ত্র নখাগ্রদর্পণে! কী দরকার ছিল সেই সুদূর আমেরিকায় গিয়ে—শেকস্‌পীয়ারের ভাষায়—টু টেক্ আর্মস্ এগেন্‌সট্ এ সী অব ট্রাবল্‌স্?[১] কি দরকার ছিল অরবিন্দের নির্জনে ধ্যানে ধ্যানান্তরে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ব্রহ্মের কাছ থেকে অমৃতবারি আহরণ করে নিম্নে, তারও নিম্নে এসে এই ভস্মীভূত ভারতসন্তানকে পুনর্জীবিত করার?

এঁদের কথা বাদ দিলুম। এঁরা আমাদের মতন নন।

কিন্তু—এখানেই একটা বিরাট কিন্তু।

এই যে আমরা রামাশ্যামা, আমাদের ভিতর বিবেক-রবি নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের সক্কলেরই কি ওঁদের চেয়ে স্পর্শকাতরতা কম? ওঁদের মত কীর্তি আমরা রেখে যাই না, তাই বলে বেদনাবোধ কি আমাদের সক্কলেরই ওঁদের চেয়ে কম? বরঞ্চ বলবো, বিধি-প্রসাদাৎ, কিংবা আপন সাধনবলে তাঁরা চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বেদনাবোধ তাঁদের ভেঙে ফেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন জীবন্ত অবস্থায়ই হঠাৎ তাদের জীবন-প্রদীপ নিবে যায় আর চোখের সামনে সে যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যেন বিরাট নবাব-বাড়ি আধ ঘণ্টার ভিতর চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমরা যে ক'টি অকর্মণ্য গাছ তার চতুর্দিকে ছিলুম—যাবার সময় আমাদেরও ঝলসে দিয়ে গেল।

হয়তো ঠিক অতখানি না। আমার এক অতি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ছিল। ডিগডিগে লম্বা পাতলা, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভারী লাজুক। বিধবা মায়ের এক ছেলে। তাঁর মানা না শুনে পড়াশুনো করতে এসেছে শহরে। সে-গাঁয়ের আর কোনও ছেলে কখনও বাইরে যায়নি। এর বোধ হয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ছেলেটি কিন্তু তোৎলা। হয়তো সেই কারণেই বেশী লাজুক।

এক মাসও যায়নি। ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছেন ইস্কুল দেখতে। তাকে শুধিয়েছেন একটা প্রশ্ন। উত্তরটা সে খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু একে তো তোৎলা, তার উপর উত্তর

---

১ ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ নিয়ে তুলনাত্মক আলোচনা হচ্ছে। অন্য কেউ দেখিয়ে না দিয়ে থাকলে আমি একটি মিল দেখাই। দুজনেই প্রথমেই আমেরিকা গিয়েছিলেন ভারত-সেবার জন্য অর্থ আনতে। দুজনাই নিরাশ হয়েছিলেন।

জানে বলেই হয়ে গেছে বেজায় নার্ভাস্। 'তোৎ তোৎ' করে আরম্ভ করতে না করতেই ইন্‌স্‌পেক্টর তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন এগিয়ে।

ব্যাপারটা হয়েছিল বেলা তিনটেয়।

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাস! গাছ থেকে ঝুলছে।

ভাবুন তো, ইস্কুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে, সেই আপন নির্জন কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল? অপমানের কালনাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো সে দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য-অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও ভাবেনি? কিন্তু দয়াময়, আমাকে মাফ করো, আমি বিচারকের আসনে বসবার কে?

অতি গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক 'মহাবংশের' ঘোষ—বিনা পণে। ছেলেটি গরিব এই যা দোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড়ই কর্মঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলুম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যান্ডবিল বিয়ে-শ্রাদ্ধের চিঠি ছাপায়, কখনও বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপাবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, দুই দুপুরই বরাবর, সর্বত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, 'এই হয়ে এল।' অর্থাৎ শিগ্‌গিরই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে দরদী ভাবতো তাতে বলতো, 'মাকে নিয়ে আসছি।' গরিব মা গাঁয়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে দুমুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বৎসর পরে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার পূর্বেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না, এখন, বুড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে, পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ছন্নের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগরেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোট-বোনের ক্লাসফ্রেন্ড। আমি তার মুরব্বী। সিগরেট দিলুম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়। এক গাল হেসে বললে, 'মাকে নিয়ে আসছি।' মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার শহর এই দিয়ে আমায় ঘরে তুলছে?

বোন বললে, 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা কোথায়? পাগল হয়ে গেছে।'

তবু এখনও তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে ভূত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যেরকম দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মরে।

আর মাধবী? আমার বোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না, পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো

তেতলার একটি মেয়ের। আমরা যৌবনে যে সুযোগ পেলুম না তা যদি ঐ মেয়েটি পেয়ে থাকে তবে, আহা, ভোগ করুক না সে আনন্দ—তার ইয়ংম্যান প্রায়ই তাকে ফোন করে।

তারপর হঠাৎ মাসাধিক কাল কোনও ফোন নেই। ভাবলুম, আমি যখন আপিসে তখন বোধ হয় ফোন করে। তারপর একদিন বাথরুমের দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা আর আমার চাকরের ভীত কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, তেতলার মেয়েটি মেঝেতে পড়ে—ভিরমি গেছে—পাশে টেলিফোনের রিসীভার।

সন্ধ্যাবেলা আমার লোকটা বললো, 'ভিরমি কাটাতে বেশীক্ষণ লাগেনি, তবে কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে।'

আমার ঘরে এসে টেলিফোন করতো বলে আমি ইচ্ছে করেই কোনও কৌতূহল দেখাইনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খবরটা কানে এসে পৌঁছল। এসব ব্যাপার পাড়াতে জানাজানি হয়ে যায়। মেয়েটির পরিবারের ডাক্তারও আমার ভালো করে চেনা। ইংরিজিতে বললেন, 'He walked out on her to another girl !'

কেমন যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম, ঐ ভিরমি-যাওয়া মেয়েটার উপর পা দিয়ে যেন সেই ছেলেটা পার হয়ে আরেকটা মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। Walk on তো তাই মানে হয়! না?

আজ আর মনে নেই—কতদিন ধরে মেয়েটা কিছু খেলেই বমি করতো।

দু বছর তাকে দেখিনি। তারপর একদিন সিঁড়িতে দেখা। আগেকার মতই সেই সাজগোজ করেছে। মনে হল চীনে ফানুস দেখছি, কিন্তু প্রদীপটি নিবে গেছে।

ঐ বেদনাই তো সবচেয়ে বড় বেদনা।

মা যখন বাচ্চাকে মারে তখন সে বার বার ঐ মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয়ের জন্য—যেখান থেকে আঘাত আসছে সেখানেই। আশ্চর্য, কিন্তু আশ্চর্য হবার কীই বা আছে, কারণ মারুক আর যাই করুক, অজানার মাঝেও অবুঝ জানে সে তার মা-ই। কিন্তু যখন দয়িত walk out on her, তখন বেচারী আশ্রয় খুঁজবে কোথায়? সে দয়িত তো এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। এতদিন ধরে তার সামান্যতম বেদনা যখনই কোনও জায়গা থেকে এসেছে—বাপ মা সমাজ যেখান থেকেই হোক—তখনই ছুটে গিয়ে বলেছে তার দয়িতকে। ঐ বলা-টুকুতেই পেয়েছে গভীর সান্ত্বনা। আর আজ? আজ তার সেই শেষ নির্ভর গেল। বরঞ্চ পাষাণ-প্রাচীরের উপর বল ছুঁড়লেও সেটা ফিরে আসে। কথা বললেও প্রতিধ্বনি আসে। কিন্তু এখন শূন্যে, মহাশূন্যে সব বিলীন।...(অবশ্য মডার্নরা বলবেন, 'ওসব রোমান্টিক প্রেম আজ আর নেই। আজ এক মাস যেতে না যেতেই সবাই অন্য লাভার পেয়ে যায়।' তাই হোক্, আমি তাই কামনা করি। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ তাদের উপর।)

ধর্মের সমুখে উপস্থিত হলুম এই তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে। কেউ বলেন, 'এসব মায়া। তুমিও নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই, তথাপি কেন শোকাতুর হও।' কেউ বলেন, 'লীলা। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করো। সান্ত্বনা পাবে।' কেউ বলেন, 'মনই সর্ব দুঃখের উৎপত্তিস্থল। সেই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করো। তাতেই শান্তি।' আরও অনেক মত আছে।

আমি নতমস্তকে সব কটাই মেনে নিচ্ছি। মা-ঠাকুরমারা এসবে বিশ্বাস করতেন, কিংবা আরও ভালো হয় যদি বলি, ধর্ম তখন সজীব ছিল, সে তখন সে-বিশ্বাস জাগাতে

পারতো—তাই তাঁরা শান্তি পেয়েছেন।

কিন্তু ধর্ম কেন আমার সেই ভাগ্নেকে চিত্তবল দিল না আত্মহত্যা না করার জন্য, প্রেসের পাগলকে রুখলো না সেই দারুণ দুর্দৈব থেকে, প্রতিবেশীর মেয়েকে দিল না শক্তি সইবার—ফের স্বাভাবিক সুস্থ সবল হওয়ার? শুধু তাদেরই দোষ? ধর্মের আত্মশক্তি কমে যায়নি কি? কিংবা দোষ উভয়ের?

কম্যুনিজম তাই বুঝি। সে বলে রাষ্ট্রই সব। তোমার ব্যক্তিগত শোক কিছুই না। তুমি বেশী গম ফলাও, বেশী কামান বানাও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য। সব ভুলে যাবে। কম্যুনিস্টরা এ 'ধর্মে' বিশ্বাস করেন কিনা তা জানিনে কিন্তু এ-কথা জানি, রাষ্ট্র এ বিশ্বাস তাদের হৃদয়-মনে দৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অন্য ধর্মেরা করে?

* * *

আমরা কয়েকজন মিলে চা খাচ্ছিলুম। নানা রকম দুঃখ সুখের কথা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী বড্ডই স্পর্শকাতর ডাক্তার। হঠাৎ বললে, 'জানেন, আলী সাহেব, আমাদের হাসপাতালে একটি চার বছরের ছেলে বড্ড ভুগে খানিকটা সেরে বাড়ি গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে। ও সারবে না। আমি যখন ইনজেক্‌শন তৈরী করছিলুম তখন আমার গা ঘেঁষে যেন করুণা জাগাবার জন্য বললে, "দাক্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে"।

হে ধর্মরাজগণ, এ শিশুকে কি দিয়ে কে বোঝাবে?

দুপুর রাতে যখন তার ঘুম ভেঙে যায়, ইনজেক্‌শনের ভয়ে শিউরে উঠে চেয়ে দেখে, এই বিশাল পুরীতে কেউ নেই, তার কেউ নেই—তখন?

হয়তো বা বিজ্ঞান পারবে। বিজ্ঞান একদিন তাকে সরিয়ে দেবে। না পারলেও হয়তো তাকে কোনও প্রদোষ-নিদ্রায় (আমি এসব জিনিস জানি না, তবে twilight sleep না কি যেন একটা আছে এবং আশা, সেটা আরও উন্নতি করবে) ঘুম পাড়িয়ে দেবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখব, সে ঘুমিয়ে আছে, পুতুলটি বুকে চেপে ঘুমিয়ে আছে, নন্দনকাননের অপ্সরীদের আদর পেয়ে তার মুখে মিঠে হাসি।

জয় বিজ্ঞানের!

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তো জীবনের কোনও comprehensive philosophy নেই যা ভাগ্নেকে রাখবে, প্রতিবেশীর মেয়েকে নর্মাল করে তুলবে।

হে ধর্মরাজগণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে, তাকে আশীর্বাদ দিয়ে এবং আপন আত্মশক্তি দৃঢ়তর করে আমাদের বাঁচাও।

আমি জানি, আমার জীবনে সে দিন আমি দেখে যেতে পারবো না।

এই নির্জন প্রান্তরে এ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে থেকে 'নিশির ডাকে'র মত শুনতে পাবো, 'দাক্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে—', দেখতে পাবো সেই প্রদীপহীন চীনা ফানুস॥

রাজা উজীর

বন্ধুবর
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
করকমলে

হিটলারের প্রেম

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে জর্মনির জনসাধারণ পেল তার মোক্ষমতম শক্—যেন দেশবাসী আবারবৃদ্ধবনিতার মস্তকে স্বয়ং মুষ্টিযোদ্ধা ক্লে একখানি সরেসতম ঘুঁষি মেরে তাদের সবাইকে টলটলায়মান পড়পড়ায়মান করে দিলেন। ঘুঁষিটা এল হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র থেকে—ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি আকাশ থেকে জর্মনির বৃহৎ বৃহৎ বেতার-কেন্দ্রগুলো, বিশেষ করে শর্টওয়েভের—প্রায় সবগুলোকেই খতম করে দিয়েছেন।

বেতারে তখন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠান ক্ষণতরে বন্ধ করে বলা হল, 'আপনারা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য তৈরী থাকুন।' কিছুক্ষণ পরেই বেতারে ঘোষিত হল, 'আমাদের ফ্যুরার আডল্ফ্ হিটলার ইহলোক ত্যাগ করেছেন।'

এরপর যে শক্টা পেল সেটা তাদের খুলি ভেঙে দিল না বটে, কিন্তু মাথার মগজ দিলে ঘুলিয়ে। যেন অমলেট্ বানাবার কল ব্রেন-বকস্টার মধ্যিখানে তুর্কিনাচন লাগিয়ে দিলে।

হিটলার মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীমতী এফা ব্রাউন নাম্নী—তাবৎ জর্মনদের কাছে অজানা অচেনা এক কুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। সমস্ত জর্মনি যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট-জনের মত একে অন্যকে শুধালো, সে কি! গত বারোটি বৎসর ধরে যে ফ্যুরারের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, সে তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছবি। যিনি সুখময় নীড় নির্মাণ করেননি, বল্লভার সন্ধান করেননি, এমন কি বংশরক্ষা করে উত্তরাধিকারীরূপে কাউকে স্বহস্ত-নির্মিত ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের সিংহাসন বিনিন্দিত সহস্রায়ু রাইষের (নাৎসি রাজ্যের) সিংহাসনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাননি। অথচ তিনি কী ভালোই না বাসতেন শিশুদের,—যখনই জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই দেখেছি তিনি কী হাসিমুখে শিশুদের আদর করে বাহুতে তুলে নিয়েছেন, তাদের মাতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের শ্রেষ্ঠা নর্তকী, অভিনেত্রী, গায়িকা, সুন্দরীদের জন্মদিনে তাঁদের বাড়িতে দিশী-বিদেশী বিরল ফুলের স্তবক পাঠিয়েছেন। প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী গ্যোবেল্স আমাদের বেতারে কতশত বার বলেছেন, 'এই সন্ন্যাসীর হৃদয়কন্দরে কিন্তু নিভৃতে বিরাজ করেন সৌন্দর্যের দেবতা। এ তপস্বী সেই বিশ্বকল্পনাময়ী চিন্ময়ীর উপাসক। সে চায়, নিভৃতে নির্জনে একা মনে তাকেই রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলতে, তোমাদের গৃহ সুন্দরতররূপে নির্মাণ করে তারই প্রতিষ্ঠা করে তোমাদেরই গৃহ মধুময় করে তুলতে। কিন্তু হায়, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। জর্মনির ভাগ্যবিধাতা তাঁর স্কন্ধে তুলে দিলেন বিরাট বিশাল রাইষের গুরুভার। তাকে বিরাটতর, বিশালতর এবং সর্বোপরি তাকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে নির্মাণ করার গুরুভার। এবং সে রাষ্ট্র এমনই প্রাণবন্ত, দীর্ঘজীবী হবে যে এযাবৎ পৃথিবীতে যে-সকল সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র আপন নাম ইতিহাসে রেখে গেছে তাদের সবারই হতে হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের তুলনায় বালখিল্যবৎ—এ রাষ্ট্রের পরমায়ু হবে সহস্র বৎসর—থাউজেন্ড-ইয়ার-রাইষ।'

আরও অনেক কথা বলেছেন ফ্যুরার সম্বন্ধে, অনেক ছবি এঁকেছেন আডল্ফ্

হিটলারের তিনি, একের পর এক বিজয়মুকুট পরে ফ্যুরার যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে—যেন রাশার মৃত্যুদূত এসেছে তার আত্মাকে শয়তানের অতল গভীরে চিরতরে বিলীন করে দিতে—তাঁর সে বিজয়-গর্বিত ছবি; এবং তারপর যখন পরাজয়ের পর পরাজয় দ্রুততর গতিতে চারিদিক থেকে বজ্রমুষ্টিতে তাঁকে ধরতে গেছে তখনও চিরাশাবাদী গ্যোবেলস তাঁর বীণাযন্ত্র ভেঙে ফেলেননি, উচ্চতর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন তাঁর প্রভু, ফ্যুরারের প্রশস্তি-সঙ্গীত। সেখানে ফ্যুরার কৃচ্ছ্রসাধন-রত যোগী। তিনি সর্বসুখ বিসর্জন করে, সর্বধ্যান নিয়োজিত করে নির্মাণ করেছেন সেই ব্রহ্মাস্ত্র (প্রায় শব্দার্থ, প্রথমা বিজয়িনী victory one, অনুজা বিজয়িনী V II)—এবারে দধীচির অস্থি নিষ্প্রয়োজন (অর্থাৎ অন্য কোনও মিত্রশক্তির সাহায্যে জয়লাভ নয়, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর মিত্র ইতালী ও জাপান তাদের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ রণাঙ্গনেও কোনও বিজয়চিহ্নের আভাস দেখতে পাচ্ছে না। তিনি এই বার্লিন নগরী ত্যাগ করবেন না। এই ধ্যানপীঠের সম্মুখে এসেই শত্রুসঙ্ঘ হবে অবলুপ্ত, লীন হবে মহাশূন্যে।

এবং বিশ্বের ইতিহাসে এই অতুলনীয় 'ধর্ম' প্রচারক বক্তা, জনগণমনজয়ের বীর গ্যোবেলস প্রায় প্রতিবারই তাঁর ভাষণ শেষ করতেন এই বলে, 'বিশ্বের ইতিহাসের এই সর্বোত্তম আত্মত্যাগ বিশ্ববিধাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত হবে না।' (কানে কানে বলি, গ্যোবেলস ছিলেন নিরঙ্কুশ নাস্তিক; বরঞ্চ তাঁর প্রভু হিটলার অন্তত অদৃশ্য অজ্ঞেয় অন্ধ নিয়তিতে—'শিক্‌জাল'—বিশ্বাস করতেন)।

আজ হিটলার চিতাশয্যায় (বস্তুত তাঁর ও পত্নী এফার দেহ তাঁরই সর্বশেষ আদেশানুসারে দেশাচারানুযায়ী গোর না দিয়ে পেট্রল দিয়ে পোড়ানো হয়) প্রবেশকালের প্রাক্কালে বিবাহ করলেন তাঁর 'রক্ষিতা'কে—যার সঙ্গে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে সর্ববিলাসবৈভবে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত শৈলাবাসে কাটিয়েছেন কত না ক্লান্তিহীন দিবস, নিদ্রাহীন রভস যামিনী, বৎসরের পর বৎসর, অন্তত চৌদ্দটি বৎসর, অর্থাৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রায় দু-বছর আগের থেকে!

কই, গ্যোবেলসের অঙ্কিত সেই বিলাসবিমুখ জিতেন্দ্রিয় সর্বত্যাগী রাইষের মঙ্গল কামনায় ধ্যানমগ্ন তপস্বীর সঙ্গে তো বেতারে প্রচারিত, একগুণকে শতগুণে বর্ধিত করে বিজয়ী মার্কিন সেনা—উপস্থিত তারা জর্মনিতে থানা গেড়ে তার উপর সার্বভৌম রাজত্ব করছে—এবং তাদের অভ্যাসার্জিত 'কেলেঙ্কারি কেচ্ছা' বর্ণনের সুমেরু শিখরে তথাগত তথাকথিত জার্নালিস্টের প্রকাশিত জর্মন এবং ইংরিজি ভাষাতে প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হিটলারের ছবি আদৌ মিলছে না।

বের্ষটেশগাডেনে হিটলারের শৈলাবাস ছিল দশাধিক বৎসর ধরে সর্ব 'ধার্মিক' নাৎসি, এমন কি মধ্যপন্থী সরলহৃদয় লক্ষ লক্ষ জর্মনেরও পুণ্যতীর্থভূমি। হিটলার সচরাচর থাকতেন নিরস বিরস বৈশ্যভূমি বার্লিনে; সম্মুখে কৃষ্ণকঠিন প্রস্তর-নির্মিত অপ্রিয়দর্শন বস্তুতান্ত্রিক রাজবর্ত্ম চতুর্দিকে অভেদ্য পাষাণপ্রাচীর, পাষাণতর হৃদয়নির্মিত, বদনমণ্ডলে সর্বপ্রকারের অনুভূতি-প্রকাশবর্জিত, শীতল কৃষ্ণধাতুতে নির্মিত অস্ত্রহস্তে রক্ষীদল, পাত্র-অমাত্যের স্বতশ্চল শকটের যন্ত্রীরব-বিঘোষ নিনাদ, সদাই ফ্যুরারের পরিদর্শনের জন্যে বিকটতম শব্দ করে দ্রুতগতিতে গমনাগমনরত দৈত্যসম পর্বতপ্রমাণ ট্যাঙ্কবর্মপরিহিত সাঁজোয়া যান, আরও কত না নবীন নবীন বৃহৎ বৃহৎ মারণাস্ত্র, এবং ফ্যুরার-ভবনের

প্রশস্ত মর্মর সোপান বেয়ে উঠছেন নামছেন অভিজাত শ্রেষ্ঠতর মুকুটমণি রাজদূতরাজি—তাঁদের বেশভূষার দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা। বেশের উত্তমার্ধ স্বর্ণাস্তরণে এমনই অলঙ্কৃত—যে তার পটভূমি চীনাংশুক, পট্টবস্ত্র, না কিংখাপে নির্মিত সে-তত্ত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রত্যেকেরই সেই স্বর্ণাস্তরণের উপর হীরকখচিত ভিন্ন ভিন্ন মহার্ঘ্য ধাতুনির্মিত সারি সারি মেডেল—বিজয়-লাঞ্ছন—মনে হয় তার যে-কোনও একটা সারির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে একটিবার আঙুল চালিয়ে নেওয়া মাত্রই বেজে উঠবে যেন জলতরঙ্গে স্বরসপ্তক।

মানুষের ভক্তি যতই গভীর হোক, সেটা অতল নয়—গভীরতম মহাসমুদ্রেরও তল আছে। যতই গগনচুম্বী হোক গৌরীশঙ্কর নয়—এবং তিনিও চুম্বন করেন মহাউর্ধ্বের পদরেণুকণা অভ্রংরাশিমাত্র। কাজেই সেই ভক্তি বার্লিনের ঐ মারণাস্ত্র 'যক্ষপুরী'কে পুণ্যতীর্থভূমিতে পরিণত করতে পারেনি।

তারা ছুটে আসতো, বের্ষটেশগাডেনে। তার পরিবেশ, তার বাতাবরণ, চতুর্দিকে দীর্ঘশির অভিজাত শ্যামল বনস্পতি উচ্চতায় সেই সব বনবৃক্ষের তুলনায় সহস্রগুণে উচ্চ পর্বত, মেখলাকার শৈলমালা, তাদের অনেকেই শীতে-গ্রীষ্মে তুষারাবৃত, আর শীতকালে হিটলার ভবনের চতুর্দিকে হয়ে যায় ধবল বরফাচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনে বনস্পতিরাজি নিরবচ্ছিন্ন বন্য বিহঙ্গ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ।

লক্ষ লক্ষ নরনারী শোভাযাত্রা করে লাইন বেঁধে হিটলারের সামনে দিয়ে গৃহীর সরলতামাখা—অর্থাৎ কর্কশ মিলিটারি কেতায় নয়—'মার্চ পাস' করতো—হিটলার বিদেশাগত লয়েড জর্জ, জন স্যামুয়েল, অ্যান্টনি ইডেন জাতীয় অভ্যাগতদের আপ্যায়নে বা চপেটাঘাত প্রদানে অত্যধিক তৎপর না থাকলে পর।[১] নইলে এমনিতে দৈনন্দিন গেরস্তালি জীবনে হিটলার ছিলেন আদর্শ অতিথিসেবক, এবং এসব অপরিচিত লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ তীর্থযাত্রীদের প্রতি মাত্রাধিক সদয়। হিটলারের সেই বাড়ি নূতন জমিতে গড়া হয়েছিল বলে তখনও ছায়া দেবার মত বিস্তৃত ও দীর্ঘ বৃহৎ বৃক্ষ একটিও ছিল না। সেই কঠোর রৌদ্রে (উঁচু পাহাড়ের উপর রোদ বড় কড়া হয়) কখনও কখনও তিনি

---

১ আমার আশ্চর্য বোধ হয় এইসব ডিপ্লোমেটেরা সেই নরঘাতন হিটলারের সম্মুখে তখন কী বেহদ্ বেহায়া, বেশরম, বেইজ্জৎ বাঁদর-নাচ, আবার বলছি, কোমরে ছিটের ঘাগরা পরে বাঁদর-নাচ নেচেছেন! পরে এঁদের অনেকেই বলেছেন,—শিশুর মত গদ্গদ্ সরল কণ্ঠে—'আমরা তখন জানতুম না, মাইরি, লোকটা ও-রকম একটা আস্ত নর-পিশাচ!' বটে! ন্যাকামির জায়গা পাওনি? তোমরা fool তো বটেই, তদুপরি knave! তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলো, তোমরা জানতে না, হিটলার রাজাসনে বসার প্রথম দিনই কম্যুনিস্টদের উপর কী অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে, তারপর ইহুদিদের নিয়ে, তারপর ২০শে জুলাই ১৯৩৪-এ তাঁর সহকর্মীদের—র‍্যোম, এর্নস্ট, হাইন্‌ৎস (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এরা ছিল নির্দোষী)—mass murder without any trail (শব্দার্থে নির্বিচারে পাইকারী হারে খুন), তোমরা তো তখন নিতম্ব বাজিয়ে নৃত্য করেছ! কণ্টক কণ্টকে নাশ! মুখে যতই ধানাই-পানাই করো, ইহুদিদের প্রতি তোমাদের মনোভাব অন্তত আমার অজানা নয়।

আর যদি এ-সব না জানতে তবে নিজেদের 'ডিপ্লোমেট' বলে পরিচয় দাও কেন? রাস্তার মেৎরানী আর তোমাতে তাহলে কি তফাৎ!

পুরোপাক্কা দু-ঘণ্টা ধরে হিটলারি হাইল সেলুটে ডান হাত সম্মুখদিকে প্রসারিত করে স্কন্ধাবধি উত্তোলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন—পুরো প্রসেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। একদিন তাঁর সখা ওস্তাদের ওস্তাদ ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান (এঁর নামটি মনে রাখবেন, পাঠক, ইনি হিটলারের প্রেম-মঞ্চে বিদূষক—বিশুদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী তিন অঙ্ক নাটিকার শেষের দুই অঙ্কে অভিনেতা মাত্র তিনজন,—নায়ক, নায়িকা ও বিদূষক হফ্‌মান) হিটলারকে শুধোন, তিনি কি করে পুরো দু-ঘণ্টা ধরে এরকম হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন! হিটলার উত্তরে বলেন, নিছক মনের জোরে।

দ্বিতীয় 'শকে'র পর এই সব লক্ষ লক্ষ তীর্থ-প্রত্যাবর্ত ও 'ভগবান' হিটলারের শ্রীমুখ-দর্শনপ্রাপ্ত নরনারী বিহ্বল, সামান্য দুটি অসংলগ্ন বাক্য সংযোজিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, কর্তাভজাদের ন্যায় গুরু কাণ্ডারীতে যারা সর্ব প্রত্যয় সর্ব আত্মোৎসর্গ করে আপন আপন নোঙর ভবনদীতে অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে বসেছিল, তারা তখন কি ভেবেছিল?

এই গম্ভীর 'মার্চ পাস', হিটলারের সৌম্যস্মিত বদন (অবশ্য তাঁর টুথব্রাশ মুস্টাশ বাদ দিয়ে—এফা ব্রাউনও ছিলেন এটির জন্মবৈরী—কিন্তু ভক্তের কাছে তো 'বিটকেল গোঁপো গুরু ট্যারা চোখে চায়। তথাপি সে মোর গুরু নিত্যানন্দ রায়।') স্বস্তিবাচক আশীর্বাদসূচক, অভয়মুদ্রায় উত্তোলিত দক্ষিণ বাহু—তাঁর পিছনের পূত শান্ত সজ্জন ভবন, সেখানে গুরু অহোরাত্র জর্মন-মঙ্গল-কামনায় অহরহ তপস্যামগ্ন—তার পিছনে ছিল এত বড় ধাপ্পা! একটা রক্ষিতা রমণী নিয়ে সঙ্গোপনে ঢলাঢলি! তার জন্য অতিশয় সযত্নে জর্মনির সর্বশ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে নির্মিত হয়েছে ঐ বাড়ির একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আস্ত wing!

মার্কিনরা মেতে উঠেছে, এবং রুচিবিহারী একাধিক জর্মন যোগ দিয়েছে সেই ভূতের নৃত্যে (আমি দোষ দিচ্ছি নে, জর্মন তখন চরমতম দৈন্যপঙ্কে এমনি নিমগ্ন যে বেটাবেটির দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করার জন্য অনেক কিছু করতে সে প্রস্তুত—আমার আপন দেশের দৈন্য কি আমি চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখিনি, পরে বুঝিনি? এখন ঘাড় ফেরাই) হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গতম গোপন কথা বের করে রগরগে পর্নোগ্রাফ ছেড়ে টু ক্রোর পাইস্ কামাতে।

আর জর্মনি খায় শকের পর শক্। অবশ্য তখন জর্মনির এমনই দুরবস্থা যে প্রেস নেই, নির্জলা মিথ্যার বিরুদ্ধেও প্রকৃত সত্য দিবালোকে প্রকাশ করার উপায় নেই। এবং সমূহ বিপদও তাতে আছে! লেখককে যে কোনও মুহূর্তে বিন্-ওয়ারেন্টে, যদিও সে নাৎসি ছিল না—ধরে নিয়ে যাবে denazitication (of delousing) কোর্টে[১] এবং অন্য কিছু

১ এরা যখন মার্কিন জেল থেকে মুক্তিলাভ করলো, ততদিনে আবার জর্মনিতে আপন আধা-স্বাধীন সরকার, মায় আদালতসুদ্ধ বসে গেছে। এই আদালত এদের এবং অন্য বহু লোককে ধরে আবার আরম্ভ করলে denazitication (অর্থাৎ দেশকে ভূতপূর্ব নাৎসি-মুক্ত করা) মোকদ্দমা—গণ্ডায় গণ্ডায়। এনারা আবার ওঁয়াদের চেয়ে এক কাঠি সরেস। কারণ জজদের অনেকেরই সামনে এসে দাঁড়ালেন এমন সব নাৎসি যাঁদের হাতে বিচারকরা নাৎসি-রাজত্বে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। (অবশ্য লাঞ্ছিত হওয়ার সময় তাঁরা জজ ছিলেন না, কিংবা ডিসমিস হয়েছিলেন। এঁরা নিলেন তাঁদের পূর্ণ প্রতিহিংসা—জেল, নাগরিকাধিকার লোপ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল বহু লোকের—

সাক্ষীসাবুদ না নিয়ে, তুমি যে পাঁড় নাৎসি ছিলে সেইটে মার্কিন জংলী পদ্ধতি 'প্রমাণ' করে পাঠিয়ে দেবে শ্রীঘরে (অবশ্য তখন সেই বীভৎস খাদ্যাভাবের করাল কালে জেলে ভালো হোক, মন্দ হোক দু'মুঠো জুটতো)।

কিন্তু সুইটজারল্যান্ডের বৃহত্তম অংশের ভাষা জর্মন। বহু নাৎসি কন্সানট্রেশন ক্যাম্প এবং জেলমুক্ত নাৎসিবৈরী লেখক সেখানে গিয়ে আপন আপন বই বের করতে লাগলেন। তখন পরিপূর্ণ সত্য জানার ফলে জর্মনরা ধীরে ধীরে আপন আপন শক্‌মুক্ত হতে লাগল। এঁদের অনেকেই যদ্যপি হিটলার-যুগে মানব-দুর্লভ সাহস দেখিয়ে নাৎসি-বিরোধিতা করার ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও জেল বরণ করেন, (এবং সেখানে প্রায় সকলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর মারা যান) আজ তাঁরা সত্য বলতে গিয়ে অনেক স্থলে নাৎসি-বিরোধী এবং মিথ্যা হিটলার কেলেঙ্কারি প্রচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার হিটলারের প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বেরুলো, যেগুলো nosy American and peeping British—and some French thrown in the bargain for good measure—বহু পরিশ্রম করেও বের করতে পারেনি।

তারই অন্যতম, হিটলারের প্রেম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য বেরুলো যা দিয়ে প্রকৃত সত্য আজ হয়তো কিছুটা নিরূপণ করা যেতে পারে। এই যে মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে

এমন কি যাদের মার্কিন কোর্ট কোনও প্রমাণ না পেয়ে বেকসুর ছেড়ে দিয়েছিল। আবার উল্টোটাও হল। যেখানে জজ নির্বাচিত হলেন কোনও প্রচ্ছন্ন নাৎসি, তখন তিনি পাঁড় নাৎসিদের অনেককেও ছেড়ে দিলেন কিংবা দিলেন মোলায়েমতম সাজা। তারপর হল আরেক ফার্স। জর্মন আইনে নিয়ম (এ আইন রোমান আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত—ব্রিটিশ আইন তা নয়) কোনও অপরাধের বিশ বৎসর পরে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা হতে পারে না। হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫। মোটামুটি বলা যেতে পারে হিটলার নির্বাচিত নবীন চ্যান্সেলর মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ৮ই মে। অতএব লেগে গেল ধুন্দুমার। তা হলে ৮.৫.৬৫ তারিখে দেশে-বিদেশে লুক্কায়িত খুনিয়া খুনিয়া সব নাৎসি 'অজ্ঞাতবাস' থেকে বেরিয়ে আবার নবীন নাৎসি সঙ্ঘ তৈরী করবার চেষ্টা করবে। হয়তো বা এই কুড়ি বৎসরে যারা নাৎসিদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছিল তারা প্রাণ দেবে গুপ্ত নাৎসি ঘাতকের হাতে, অন্ততপক্ষে গোপনে অপমানিত লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হবে। কারণ এদের অনেকেই ছিলেন পয়লা নম্বরী নাৎসি যেমন হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বর্‌মান্, এবং ইহুদী নিধনের গ্যাসঘর তথা কনসানট্রেশন ক্যাম্পের চোপদার (ন'টি ল্যাজওলা চাবুক মারনেওলা), কমান্ডান্ট্, কয়েদীদের উপর মারাত্মক (এদের ৯৫% মারা যায়) সব ব্যারামের experiment করনেওলা ডাক্তার, অথবা পাঁড় নাৎসি সম্পূর্ণ বিবেকহীন আইন বাবদে পরিপূর্ণ নাৎসি কর্তাদের মেহেরবানীতে নিযুক্ত জজ যারা কারও বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ (নাৎসি) মোকদ্দমা আনা মাত্র আসামীকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে—মুক্ত অথবা গুপ্ত আদালতে হয় ফাঁসির হুকুম, নইলে চোদ্দ বছরের জেল। এদের অনেকেই বা অজ্ঞাতবাস থেকেই বেনামীতে নাৎসিবৈরীদের শাসিয়েছে।

তাই বহু আন্দোলনের পর—এমন কি ক্যাবিনেটে এ-বাবদে দ্বিধা ছিল যে, যদ্যপি ৮.৫.৪৫-এর পর কোনও নাৎসি-রাজ ছিল না, এবং ফলে তারপর কোনও নাৎসি অপরাধ হয়নি—এবং বিশ বৎসর পর সব খতম হওয়ার কথা। তবু—আরও দশ না কুড়ি বছর ধরে (আমার ঠিক মনে নেই) পূর্ব নাৎসিরা ধরা পড়লে মোকদ্দমা চলবে।

১৪/১৫ বছরের রক্ষিতাকে হিটলার বিয়ে করলেন, সেটা কেন? সত্যই কি তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, যাকে আমরা বাংলায় প্রেম বলতে পারি, কিংবা এফা কি নিম্নস্তরের হাপ্‌গেরস্ত (দেমি মঁদেন), তাঁর সঙ্গে হিটলার কি প্ল্যাটনিক প্রেম করেছিলেন (when "just nothing happens"), তাদের যৌন-জীবন কি সম্পূর্ণ নরম্যাল ছিল, হিটলার পারভার্স ছিলেন না কি না, এফাকে যদি সত্যই ভালবাসতেন তবে তাঁকে বহু পূর্বেই বিয়ে করলেন না কেন?—এবং জর্মনির জনসাধারণ বিশেষ করে মাতারা তো চাইতেনই যে ফ্যুরার হোন আর যাই হোন, ফ্যুরার হলেই তো আর দেহ পাষাণ হয়ে যায় না (এটা বিদ্যাসাগরের নকল; তিনি বলেছেন, "বিধবা হইলে তো তার 'দেহ' পাষাণে পরিণত হয় না", তার পূর্বের সমাজসংস্কারকরা বলতেন, "বিধবা হইলেই তো আর 'হৃদয়' পাষাণে পরিণত হয় না"), অতএব তাঁরও বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। এস্থলে বলা বাহুল্য, সেটা পূর্বেই বলেছি যে এফার সঙ্গে হিটলারের প্রকৃত সম্পর্ক এতই মাত্রাধিক মিলিটারি টপ্ সীক্রেটের মত তিনি লুকিয়ে রাখতেন, এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের এবং চাকর-বাকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে ঠোঁট সেলাই করে রাখতেন। এবং সর্বশেষে প্রশ্ন, এফাই কি তাঁর প্রথম প্রেম, না এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল? সেইটেই আজকের বিষয়বস্তু।

ন্যুর্‌ন্‌বের্গের মোকদ্দমার সময় (মিত্রপক্ষ বনাম নাৎসি রাইযের প্রধান প্রধান প্রতিভূ, যেমন হিটলারের পরের সম্মানিত জন ফিল্ড মার্শেল গ্যোরিঙ—হিটলার হঠাৎ মারা গেলে হিটলারের ফরমান অনুযায়ী তিনিই 'ফ্যুরার' হতেন; তাবৎ জঙ্গী বিভাগের বড়কর্তা —হিটলারের পরেই—কাইটেল, তার পরের জন য়োড্‌ল্ ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বসুদ্ধ ডজন দুই) আদালতের সামনে প্রাগুক্ত প্রশ্নগুলো আসামীরা দোষী না নির্দোষ সে বিচারে 'অল্পে'র চেয়ে 'বিস্তর' অবান্তর ছিল বলে সেগুলো আদালত সাতিশয় সংক্ষেপে সারেন। (অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কেন—কোটি কোটি লোক বললেও আমি সংখ্যাটাকে অস্মদ্দেশীয় গঞ্জিকা-নির্গত বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেব না—জানতে চেয়েছিল হিটলারের 'প্রেম' সম্বন্ধে এবং আজও জর্মনির ভিতরে বাইরে বিস্তর লোক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।) সৌভাগ্যক্রমে মার্কিনরা তাঁদের দেশের রীতি অনুযায়ী তাঁদেরই গুটিকয়েক সর্বোত্তম সাইকিয়াট্রিস্টকে সঙ্গে এনেছিলেন। আসামীদের একাধিকজন হিটলার ও এফাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—হিটলারের বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্গহফে এঁরা হিটলারের অতিথিরূপে একাধিকবার গিয়েছেন এবং নিতান্ত বাইরের (বেগানা) লোক না থাকলে তাঁরা হিটলার ও এফার সঙ্গে খেয়েছেন, বেড়াতে গিয়েছেন, পিকনিক করেছেন, বাড়ির প্রাইভেট ফিল্ম শো প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই একসঙ্গে বসে দেখেছেন।

তাই মার্কিন ডাক্তাররা মোকদ্দমায় অবান্তর হিটলারের যৌনজীবন সম্বন্ধে আপন আপন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এঁদের শুধিয়েছেন অনেক প্রশ্ন। যেমন ডাক্তার গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে গ্যোরিং বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'Of course he was normal like any one of us', অর্থাৎ হিটলার ছিলেন এ-সব বাবদে আর পাঁচজনের মতই নরম্যাল।

সেই সময়ই জর্মন জনগণ—অবশ্য প্রধানত জর্মন সাক্ষীদেরই মারফতে—একটি তরুণীর কথা জানতে পায়, নাম গেলী (Angelika—এবং Geli এঁর ডাকনাম) রাউগল্‌।

আমার ব্যক্তিগত মতে হিটলার ভালোবেসেছিলেন ½+১+½ (হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস

হাফ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দুবার।

প্রথম হাফটা সচরাচর রোমান্টিক 'কাফ্ লভ্', অর্থাৎ বাছুরের মত করুণ নয়নে তাকানো, ম্যা-ম্যা রব ছাড়া—যার অর্থ গোপনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করা, এবং সব চেয়ে বড় কথা বাছুর যে-রকম শিং গজাবার সময় যত্রতত্র ঢুঁ মেরে নিজের মস্তকদেশই জখম করে, বেশী চ্যাংড়ার বেলাও অবিচারে যত্রতত্র 'প্রেমে পড়ে' নাস্তানাবুদ হওয়া।

কিন্তু হিটলারের কাফ্ লভ্ প্রচলিত প্যাটার্ন নকল করেনি—এমন কি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাল্যজীবনের একমাত্র জীবনী-লেখক হিটলারের অতি প্রিয় একমাত্র বাল্যসখা—তিনি যা লিখেছেন সেখানে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, এ স্থলের নায়ক কিন্তু অসাধারণ প্রেমিক। আমি আজ সে কাহিনী কীর্তন করবো না, আমার উদ্দেশ্য সেই কাহিনী কিঞ্চিৎ শুনিয়ে দেওয়া যেটাকে হিটলারের ম্যুনিক যুগের (১৯২০ থেকে ১৯৩৩) সর্বঅন্তরঙ্গ জন—সংখ্যায় অতিশয় কম—এক বাক্যে হিটলারের 'ওয়ান এন্ড গ্রেট লভ্' বলেছেন—'গ্রেটেস্ট' বলেননি কারণ তাহলে অন্যগুলো অর্থাৎ যেগুলোকে আমি উপরে প্রথম 'হাফ' ও দ্বিতীয় 'হাফ' রূপে চিহ্নিত করেছি, ও ঐ একমাত্র গ্রেট লভের সঙ্গে একাসন না পেলেও একই শ্রেণীতে বসবার অনর্জিত সম্মানলাভ করে। কিন্তু সেই কাহিনীর নান্দী গাইবার পূর্বে, পাঠকের কৌতূহল কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্যে উল্লেখ করি, হিটলার তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে চার বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় অন্তত দুবার করে দুরু-দুরু বুকে ক্রস করেছেন, হ্যাট তুলে ভিয়েনার ভদ্রজনসম্মত পদ্ধতিতে গভীরতম বাত করেছেন—তিনি (জীবনী-লেখক—সে মহিলা এখনও জীবিতা এবং বিধবা, এখন বয়স প্রায় পঁচাত্তর—তাই ছদ্মনামে তাঁর 'পরিচয়' দিয়েছেন) যেদিন মৃদু হাস্য সহকারে প্রতিনমস্কার করেছেন সেদিন অষ্টাদশবর্ষীয় হিটলার।

'আশার বাতাসে করি ভর ফিরে যেত আডল্ফ্ কুটিরে'

আর যেদিন প্রিয়া সঙ্গের আর্মি-অফিসার উমেদার নাগরের প্রতি ঈষৎ সম্মোহিত বলে হিটলারের প্রতি ভ্রূ-কুঞ্চিত করতেন সেদিন হিটলার—ইংরিজিতে যাকে বলে 'saw red', অর্থাৎ তিনি মহাপ্রলয় ডেকে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করার জন্য সেই শিঙাটি খুঁজছেন। বাল্যবন্ধু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চীৎকার! অভিসম্পাত দিচ্ছে সবাইকে, আর বিশেষ করেই ঐ হতভাগ্য আর্মির পাপাত্মা অফিসারদের।[১] বন্ধু বলছেন,

---

১ ঐ সময় থেকেই হিটলার আর্মি-অফিসারদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন বললে হয়তো অত্যুক্তি তথা 'বিনা যুক্তিতে সমস্যাকে অত্যধিক সরল করে ফেলা'র—ওভার-সিম্প্লিফিকেশন—অকর্ম করা হবে। তবে এ-কথা সত্য, পরবর্তীকালে জর্মন আর্মি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান—except the army officers, এবং এটাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা করার ঠিক ২২ ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর জীবনের যে সর্বশেষ পত্র লেখেন সেটি আর্মির সর্বপ্রধান কর্তা—অবশ্য তাঁর পরে—কাইটেল্‌কে। সে চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জর্মন আর্মি অফিসারমণ্ডলীকে, আমাদের ভাষায় যেন পৈতে ছিঁড়ে, 'উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও' বলে ব্রহ্মশাপ দেওয়া। সে পত্রে তিনি বলেন, 'গত (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই, এ যুদ্ধের জর্মন অফিসারগণের সঙ্গে যুদ্ধের অফিসারদের কোনও তুলনাই হয় না। এ যুদ্ধ সম্মুখযুদ্ধে সংগ্রামকারী জোয়ানদের কর্মসিদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।'

১৪/১৫ বছরের রক্ষিতাকে হিটলার বিয়ে করলেন, সেটা কেন? সত্যই কি তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, যাকে আমরা বাংলায় প্রেম বলতে পারি, কিংবা এফা কি নিম্নস্তরের হাপ্‌গেরস্ত (দেমি মঁদেন), তাঁর সঙ্গে হিটলার কি প্ল্যাটনিক প্রেম করেছিলেন (when "just nothing happens"), তাদের যৌন-জীবন কি সম্পূর্ণ নরম্যাল ছিল, হিটলার পারভার্স ছিলেন না কি না, এফাকে যদি সত্যই ভালবাসতেন তবে তাঁকে বহু পূর্বেই বিয়ে করলেন না কেন?—এবং জর্মনির জনসাধারণ বিশেষ করে মাতারা তো চাইতেনই যে ফ্যুরার হোন আর যাই হোন, ফ্যুরার হলেই তো আর দেহ পাষাণ হয়ে যায় না (এটা বিদ্যাসাগরের নকল; তিনি বলেছেন, "বিধবা হইলে তো তার 'দেহ' পাষাণে পরিণত হয় না", তার পূর্বের সমাজসংস্কারকরা বলতেন, "বিধবা হইলেই তো আর 'হৃদয়' পাষাণে পরিণত হয় না"), অতএব তাঁরও বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। এস্থলে বলা বাহুল্য, সেটা পূর্বেই বলেছি যে এফার সঙ্গে হিটলারের প্রকৃত সম্পর্ক এতই মাত্রাধিক মিলিটারি টপ্ সীক্রেটের মত তিনি লুকিয়ে রাখতেন, এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের এবং চাকর-বাকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে ঠোঁট সেলাই করে রাখতেন। এবং সর্বশেষে প্রশ্ন, এফাই কি তাঁর প্রথম প্রেম, না এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল? সেইটেই আজকের বিষয়বস্তু।

ন্যুরন্‌বের্গের মোকদ্দমার সময় (মিত্রপক্ষ বনাম নাৎসি রাইষের প্রধান প্রধান প্রতিভূ, যেমন হিটলারের পরের সম্মানিত জন ফিল্ড মার্শেল গ্যোরিঙ—হিটলার হঠাৎ মারা গেলে হিটলারের ফরমান অনুযায়ী তিনিই 'ফ্যুরার' হতেন; তাবৎ জঙ্গী বিভাগের বড়কর্তা —হিটলারের পরেই—কাইটেল, তার পরের জন য়োড্‌ল্ ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বসুদ্ধ ডজন দুই) আদালতের সামনে প্রাগুক্ত প্রশ্নগুলো আসামীরা দোষী না নির্দোষ সে বিচারে 'অল্পে'র চেয়ে 'বিস্তর' অবান্তর ছিল বলে সেগুলো আদালত সাতিশয় সংক্ষেপে সারেন। (অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কেন—কোটি কোটি লোক বললেও আমি সংখ্যাটাকে অস্মদ্দেশীয় গঞ্জিকা-নির্গত বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেব না—জানতে চেয়েছিল হিটলারের 'প্রেম' সম্বন্ধে এবং আজও জর্মনির ভিতরে বাইরে বিস্তর লোক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।) সৌভাগ্যক্রমে মার্কিনরা তাঁদের দেশের রীতি অনুযায়ী তাঁদেরই গুটিকয়েক সর্বোত্তম সাইকিয়াট্রিস্টকে সঙ্গে এনেছিলেন। আসামীদের একাধিকজন হিটলার ও এফাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—হিটলারের বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্গহফে এঁরা হিটলারের অতিথিরূপে একাধিকবার গিয়েছেন এবং নিতান্ত বাইরের (বেগানা) লোক না থাকলে তাঁরা হিটলার ও এফার সঙ্গে খেয়েছেন, বেড়াতে গিয়েছেন, পিকনিক করেছেন, বাড়ির প্রাইভেট ফিল্ম শো প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই একসঙ্গে বসে দেখেছেন।

তাই মার্কিন ডাক্তাররা মোকদ্দমায় অবান্তর হিটলারের যৌনজীবন সম্বন্ধে আপন আপন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এঁদের শুধিয়েছেন অনেক প্রশ্ন। যেমন ডাক্তার গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে গ্যোরিং বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'Of course he was normal like any one of us', অর্থাৎ হিটলার ছিলেন এ-সব বাবদে আর পাঁচজনের মতই নরম্যাল।

সেই সময়ই জর্মন জনগণ—অবশ্য প্রধানত জর্মন সাক্ষীদেরই মারফতে—একটি তরুণীর কথা জানতে পায়, নাম গেলী (Angelika—এবং Geli এঁর ডাকনাম) রাউগল্।

আমার ব্যক্তিগত মতে হিটলার ভালোবেসেছিলেন ½+১+½ (হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস

হাফ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দুবার।

প্রথম হাফটা সচরাচর রোমান্টিক 'কাফ্ লভ্', অর্থাৎ বাছুরের মত করুণ নয়নে তাকানো, ম্যা-ম্যা রব ছাড়া—যার অর্থ গোপনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করা, এবং সব চেয়ে বড় কথা বাছুর যে-রকম শিং গজাবার সময় যত্রতত্র ঢুঁ মেরে নিজের মস্তকদেশেই জখম করে, বেশী চ্যাংড়ার বেলাও অবিচারে যত্রতত্র 'প্রেমে পড়ে' নাস্তানাবুদ হওয়া।

কিন্তু হিটলারের কাফ্ লভ্ প্রচলিত প্যাটার্ন নকল করেনি—এমন কি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাল্যজীবনের একমাত্র জীবনী-লেখক হিটলারের অতি প্রিয় একমাত্র বাল্যসখা—তিনি যা লিখেছেন সেখানে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, এ স্থলের নায়ক কিন্তু অসাধারণ প্রেমিক। আমি আজ সে কাহিনী কীর্তন করবো না, আমার উদ্দেশ্য সেই কাহিনী কিঞ্চিৎ শুনিয়ে দেওয়া যেটাকে হিটলারের ম্যুনিক যুগের (১৯২০ থেকে ১৯৩৩) সর্বঅন্তরঙ্গ জন—সংখ্যায় অতিশয় কম—এক বাক্যে হিটলারের 'ওয়ান এন্ড গ্রেট লভ্' বলেছেন—'গ্রেটেস্ট' বলেননি কারণ তাহলে অন্যগুলো অর্থাৎ যেগুলোকে আমি উপরে প্রথম 'হাফ' ও দ্বিতীয় 'হাফ' রূপে চিহ্নিত করেছি, ও ঐ একমাত্র গ্রেট লভের সঙ্গে একাসন না পেলেও একই শ্রেণীতে বসবার অনর্জিত সম্মাননলাভ করে। কিন্তু সেই কাহিনীর নান্দী গাইবার পূর্বে, পাঠকের কৌতূহল কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্যে উল্লেখ করি, হিটলার তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে চার বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় অন্তত দুবার করে দুরু-দুরু বুকে ক্রস করেছেন, হ্যাট তুলে ভিয়েনার ভদ্রজনসম্মত পদ্ধতিতে গভীরতম বাত করেছেন—তিনি (জীবনী-লেখক —সে মহিলা এখনও জীবিতা এবং বিধবা, এখন বয়স প্রায় পঁচাত্তর—তাই ছদ্মনামে তাঁর 'পরিচয়' দিয়েছেন) যেদিন মৃদু হাস্য সহকারে প্রতিনমস্কার করেছেন সেদিন অষ্টাদশবর্ষীয় হিটলার।

'আশার বাতাসে করি ভর ফিরে যেত আডল্ফ্ কুটিরে'

আর যেদিন প্রিয়া সঙ্গের আর্মি-অফিসার উমেদার নাগরের প্রতি ঈষৎ সম্মোহিত বলে হিটলারের প্রতি ভ্রূ-কুঞ্চিত করতেন সেদিন হিটলার—ইংরিজিতে যাকে বলে 'saw red', অর্থাৎ তিনি মহাপ্রলয় ডেকে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করার জন্য সেই শিঙাটি খুঁজছেন। বাল্যবন্ধু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চীৎকার! অভিসম্পাত দিচ্ছে সবাইকে, আর বিশেষ করেই ঐ হতভাগ্য আর্মির পাপাত্মা অফিসারদের।[১] বন্ধু বলছেন,

---

১ ঐ সময় থেকেই হিটলার আর্মি-অফিসারদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন বললে হয়তো অত্যুক্তি তথা 'বিনা যুক্তিতে সমস্যাকে অত্যধিক সরল করে ফেলা'র—ওভার-সিম্প্লিফিকেশন—অকর্ম করা হবে। তবে এ-কথা সত্য, পরবর্তীকালে জর্মন আর্মি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান—except the army officers, এবং এটাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা করার ঠিক ২২ ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর জীবনের যে সর্বশেষ পত্র লেখেন সেটি আর্মির সর্বপ্রধান কর্তা—অবশ্য তাঁর পরে—কাইটেল্‌কে। সে চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জর্মন আর্মি অফিসারমণ্ডলীকে, আমাদের ভাষায় যেন পৈতে ছিঁড়ে, 'উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও' বলে ব্রহ্মশাপ দেওয়া। সে পত্রে তিনি বলেন, 'গত (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই, এ যুদ্ধের জর্মন অফিসারগণের সঙ্গে যুদ্ধের অফিসারদের কোনও তুলনাই হয় না। এ যুদ্ধ সম্মুখযুদ্ধে সংগ্রামকারী জোয়ানদের কর্মসিদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।'

বুর্জুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি হিটলার অতি বাল্য বয়স থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে নিকৃষ্টতম ঘৃণা প্রকাশ করতেন—এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট-সেনাবাহিনীর অফিসারদের এবং তাদের উদ্ধত ভাব, দাম্ভিক আচরণের প্রতি—যত্রতত্র সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু, আদর-আপ্যায়ন যেন তাঁদেরই সর্বপ্রথম প্রাপ্য, যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং সেন্ট পীটার স্বহস্তে তাঁদের জন্যে সে শাহ্-ইন্-শাহী ফরমান লিখে দিয়ে নিজেই ধন্য হয়েছেন—এই ভাব।[১]

পুষ্পোৎসবের প্রভাতে হিটলার তাঁর সর্বোত্তম সজ্জা পরে পথপার্শ্বে অপেক্ষা করছেন, তাঁর প্রিয়ার জন্যে, তিনিও আসবেন শব্দার্থে পুষ্পরথে, পুষ্পাভরণ পরিধান করে। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশেষে তিনি এলেন। হিটলার হ্যাট তুলে অন্যদিনের তুলনায় প্রচুরতর সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালেন। সেই ভিড়ের মধ্যেও প্রিয়া তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর হাতের পুষ্পগুচ্ছ থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে প্রসন্ন

---

১ হিটলারের খাস চাকর—valet—ছিলেন জনৈক হাইন্‌ৎস লিঙে। ইনি হিটলারের জামাকাপড় দুরুস্ত রাখা, ওষুধপত্র হামেহাল হাজির রাখা এসব শত কাজ তো করতেনই—এমন কি ইভ্‌নিং ড্রেস পরার সময় বো-টিও তিনিই বেঁধে দিতেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ—এবং গরিমাময় কর্মও বটে—জর্মনির ফ্যুরার ও তার প্রিয়া এফার বিছানা তৈরী করা। একদা তিনি দুজনকে এমন অবস্থায় পান—হিটলার ব্যত্যয়-বিহীন অভ্যাসমত মাত্র সেই এক দিন দোরে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন—যে তাঁর চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। এই কর্মের জন্যে তাকে বাছাই করা হয় হিটলারের অতিশয় খাস সেনাবাহিনীর (এস্ এস্ = শুৎস্‌স্টাফেল) সর্বশ্রেষ্ঠ এক হাজার সৈন্য থেকে। প্রভুকে পূর্ণ দশটি বছর সেবার পর যখন হিটলার মিত্রশক্তির নিপীড়নে বার্লিনে প্রায় অবরুদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন অবশ্য মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য হিটলার তাঁকে ডেকে আপন পরিবারে চলে যাবার অনুমতি দেন। প্রভুভক্ত লিঙে যাননি। ফলে হিটলারের শেষ পর্বের আত্মহত্যার বুলেট শব্দ পর্যন্ত তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পান, তাঁর মৃতদেহ চিতাস্থলে বয়ে নিয়ে যেতে, চিতাতে অগ্নিসংযোগ করতে সাহায্য করেন। এফাও এঁকে বড়ই বিশ্বাস করতেন এবং প্রাণের কথাও খুলে বলতেন।

হিটলারের ভূগর্ভস্থ, বিরাটতম বোমার আক্রমণেও নিরাপদ 'বুঙ্কার' তিনি প্রভুর শবদাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি। সে কর্ম সমাধান করে তিনি যখন রুশ সেনানী ভেদ করে—রাশানরা তখন বুঙ্কার থেকে তিনশ গজ দূরে—মার্কিন অধিকৃত এলাকায় আপন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেন তখন বার্লিনেই রুশদের হাতে বন্দী হন। পূর্ণ দশটি বৎসর তিনি ঐ দেশের ডাকসাইটে সব কারাগারে—(কিছুকালের জন্য সাইবেরিয়া বাস করে তিনি বিশ্ববন্দীমণ্ডলীতে যেন সোনার তাজ পেয়েছেন! বহু যন্ত্রণা ভোগ করে ১৯৫৫-এ পশ্চিম বার্লিনে ফিরে আসেন। এসেই তিনি হিটলার সম্বন্ধে প্রচলিত বহুবিধ গুজোব বিনাশার্থে একখানা চটি বই লেখেন। তার এক স্থলে আছে, বিদেশের কোনও হোমরা-চোমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর পদলেহন করার পর তিনি অতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, 'দেখলে লিঙে (ইনি কোনও কোনও সময় অভ্যাগতের জন্য পানাদি নিয়ে যেতেন—লেখক), ব্যাটারা কি রকম গত যুদ্ধের সামান্য এক জোয়ানের (হিটলার কর্পোরেল ছিলেন) সামনে হাঁটু নিচু করছে। আর বিদেশী কোনও জঙ্গীলাট হলে তো কথাই নেই। বস্তুত হিটলার প্রকৃত মহান পুরুষদের মত এসব 'বুর্জুয়া স্নব'দের উপেক্ষা না করে তাদের 'সাষ্টাঙ্গ প্রণামে' পরিতৃপ্ত হতেন—যেন তাঁর তরুণ বয়স ও যৌবনকালের আহত আত্মাভিমান সান্ত্বনাপ্রলেপ পেয়ে বেদনা দাগটা (তখনও!) লাঘব করে দিত। লিঙে সম্বন্ধে আমি 'হিটলারের শেষ দশ দিন' নামক প্রবন্ধে, 'দু-হারা' গ্রন্থে ঈষৎ সবিস্তার লেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

মৃদু হাস্য করলেন।

সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে—বরঞ্চ বলা ভালো 'সে মহালগনে' তিনি সপ্তম স্বর্গেও যেতে সম্মত হতেন না—হিটলার বাড়ি ফিরলেন।

এই চার বৎসরের ভিতর হিটলার ঐ তরুণীটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর সখার কাছে, তিনিও যতখানি পারেন উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু হিটলার তাঁর কোনও উপদেশ, কিংবা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কোনও কৌশলই হাতে-কলমে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা দেননি! এ বড় আশ্চর্যের কথা। এ নিয়ে প্রাগুক্ত জীবনীকার বিস্তর গবেষণা, বিস্তর চিন্তা করেছেন, কিন্তু এস্থলে তার স্থানাভাব এবং ঈষৎ অবান্তর বলে বর্জন করতে অনিচ্ছায় বাধ্য হলুম। শান্তি-সময় ও সুযোগ পেলে চেষ্টা করবো। কারণ যদিও দুজনাতেই কোনও কথা হয়নি, পত্র-বিনিময় পর্যন্ত হয়নি, তবু ঘটনাটি সত্যই চিত্তাকর্ষণ করে—কারণ হিটলার তাঁর স্বর্গীয় প্রেমের অভিব্যক্তি, প্রিয়াকে এক শুভদিনে দাম্পত্য বন্ধনে বন্ধন করার শুভেচ্ছা, সবই বন্ধুকে বলতেন। গৃহনির্মাণের স্কেচ আঁকাতে হিটলার সেই তরুণ বয়সেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন (ফ্যুরার রূপে পরবর্তী জীবনে তিনি শতকর্মের মাঝখানে, এমন কি আত্মহত্যার কয়েক দিন পূর্বেও বহু অভূতপূর্ব বিরাট প্রাসাদ, সৈন্যদের জন্য য়ুনিফর্ম, মেডেল, নৌবহরের জন্য সাবমেরিন ইত্যাদি নানা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্কেচ করেছেন এবং প্রায় সব স্কেচই কর্মে পরিণত করা হয়েছিল) এবং তাই বিবাহের পর যে ভবনে কপোতকপোতী বাস করবেন তার অসংখ্য স্কেচ আঁকতেন হিটলার সমস্ত দিন ধরে।

হিটলার যখন স্কেচের উচ্চতম নভলোকে উড্ডীয়মান তখন কিন্তু তাঁর সখা, জীবনী-লেখক প্রখর ব্যবসায়-বুদ্ধিধারী—তাঁর পিতাও ব্যবসায়ী—ঘোর বস্তুতান্ত্রিক গুস্তাফ্—এক কথায় স্বপ্নলোকনিবাসী ডন কুইক্সোটের যেমন হুবহু উল্টো কড়া সংসারী তামসিক সাঙ্কো পান্জা, এস্থলে হিটলারের সাঙ্কো পান্জা ভিন্ন গোত্রের বসওয়েল, স্কেচের পাশে দাঁড়িয়ে বলতো, 'হুঃ! সবই বুঝলুম, কিন্তু সেই বস্তুটি টাকা!' তিনি জানতেন হিটলারের বৃদ্ধা মাতার অতি ক্ষুদ্র পেনশন ভিন্ন সে পরিবারে একটি কানাকড়িও আমদানি ছিল না।

হিটলার স্বপ্নভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'আখ্, তোমার শুধু টাকা, টাকা!'[১]

কিন্তু এ কাহিনী এখানেই থাক। আমি শুধু ভাবি, কবিসম্রাট দান্তের কথা।

---

১ আসলে কিন্তু এই সখা অতিশয় সদাশয় ভদ্র নির্লোভ ব্যক্তি। ওঁদের বয়েস যখন প্রায় কুড়ি (১৯১০/১১ গোছ) এবং একসঙ্গে একই কামরায় ভিয়েনায় বাস করতেন তখন হিটলার দৈন্যপঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে শেষটায় এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী সখা গুস্তাফকে বিব্রত না করার জন্যে—হিটলার আমৃত্যু ছিলেন এমনই আত্মাভিমানী, touchy, যেটাকে নিশ্চয়ই morbid বলা চলে—একদিন সখাকে কিচ্ছু না বলে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। তার প্রায় ২৫ বৎসর পর হিটলার লোকচক্ষের সম্মুখে রাজনৈতিক নেতারূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন, তখন গুস্তাফ্ খবরের কাগজ মারফৎ তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারলেন। তারপর ১৯৩৩-এ যখন হিটলার চ্যান্সেলর হলেন তখন দীর্ঘ ২৩ বছর পর গুস্তাফ্ তাঁকে চিঠি লিখলেন। উত্তরও পেলেন। ১৯৩৪-এ হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে যখন বিজয়ী বীরের মত লিন্ৎসে পৌঁছলেন তখন দুই সখাতে দেখা হল। গুস্তাফ্ ছোট্ট সরকারী চাকরি করতেন এবং অল্পেই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন বলে হিটলারের big offer তিনি গ্রহণ করলেন না।

তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচে সখীজনসহ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার মাত্র প্রেম-বিহ্বল কবির দিকে স্মিতহাস্য করেছিলেন। আরেকবার পুষ্পের জন্য বিখ্যাত ফ্লরেন্স্ (flora) নগরীর পুষ্পোৎসবে যখন সবাই সবাইকে পুষ্পোপহার দিচ্ছে, এমন কি অচেনা জনকেও, তখন—হয়তো—কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই প্রেমোন্মাদকে একটি ফুল এগিয়ে দেন। ব্যস্! আর তো কিছু জানবার উপায় নেই। তাই বোধ হয়, তথ্য যেখানে যত কম, কিংবদন্তী সেখানে, সেই অনুপাতে তত বেশী? সেই শত শত কিংবদন্তীর মাঝখানে একটি সত্য প্রোজ্জ্বল : দান্তের সুপ্ত কবিসত্তা তাঁকে সচেতন করে দিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমে আর এই নগরীর শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পার্থক্য কোথায়?' বিনয়ভরে যেন সেই পরমাত্মার সম্মুখে মস্তক নত করে দান্তে রচনা করলেন তাঁর 'স্বর্গীয় কাব্য' (দভীনা কম্মেদিয়া = ডিভাইন কমেডি)।

দান্তে আপন জন্মের নগর থেকে বিতাড়িত হন—রাজনীতির জুয়াখেলাতে হেরে গিয়ে। হিটলার স্বেচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে জর্মনি গিয়ে সেখানে পূর্ণ বারোটি বৎসর 'রাজমুকুট' পরার পর নিজ হাতে আপন প্রাণ নিলেন। আমি শুধু ভাবি হিটলার যদি রাজনীতিতে দান্তের মত নিষ্ফল হতেন তবে হয়তো তিনিও তাঁর বেয়াত্রিচেকে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে অজরামর করে রেখে যেতেন, অবশ্য নরদানব হিটলার নিশ্চয়ই দান্তের ইন্‌ফেরনো (নরক) অধ্যায়টা লিখতেন বেশী ফলাও করে। কিংবা হয়তো কাব্যলক্ষ্মীর জন্য নবীন মন্দির নির্মাণ করে—স্থাপত্যেই হিটলারের সর্বাধিক প্রতিভা ছিল, এ সত্য তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন।

পূর্ণপ্রেম

ভিয়েনাতে সর্বপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা অর্জন করে হিটলার দেশত্যাগ করে চলে গেলেন জর্মনির বাভারিয়া প্রদেশের প্রধান নগর ম্যুনিকে। সেখানেও তিনি বেকার, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে তিনি স্বেচ্ছায় জর্মন সৈন্যবাহিনীতে জওয়ান রূপে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধশেষে ম্যুনিকে ফিরে এসে জওয়ানদের কী যেন এক কালচারাল বা ঐ জাতীয় অস্পষ্ট কি এক ট্রেনিং দেবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, সরস্বতী তাঁর রসনায় বিরাজ করেন তাঁকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে

তবে প্রতি বছর দু'একবার হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে একসঙ্গে যেতেন। বস্তুত হিটলারের সর্বজীবনীকার একবাক্যে বলেছেন, গুস্তাফই একমাত্র হিটলার-সখা যিনি তাঁদের বন্ধুত্ব পৌণ্ড শিলিঙে পরিবর্তিত করেননি। জলসাতে যে যেতেন তার একমাত্র কারণ এক জলসাতেই আপন ছোট শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়—সঙ্গীতই ছিল উভয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়। গুস্তাফের ভদ্র আত্মবিসর্জন কতখানি, পাঠক এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সঙ্গীত, কিন্তু সে পথে সুযোগ না পেয়ে একটি ছোট্ট দফতরে চাকুরি নেন। হিটলার তাঁকে বলেন, 'যেখানে খুশী বলো, আমি সরকারী সঙ্গীতালয়ে তোমাকে প্রধান সঙ্গীতচালক করে দিচ্ছি। তুমি পাবে, সবসময়, সর্বাবস্থায় আমার প্রটেক্‌শন্!' গুস্তাফ্ সে লোভও সম্বরণ করেন।

জনসমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করাবার জন্য। এই সময় ম্যুনিক শহর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিক্ষুব্ধ। অসংখ্য রাজনৈতিক দল, এবং রাস্তায় রাস্তায় গণবিক্ষোভের কোলাহল। হিটলার এরই একটার সদস্য হলেন। যে দলের সভ্যসংখ্যা দশ হয় কি না হয়! ১৯১৯ থেকেই তিনি এই দল (National Sozialictiche Deutsche Arbeitspartei) —এরই প্রথম শব্দের Na এবং দ্বিতীয় শব্দের zi নিয়ে বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ দলের অজানা কে একজন Nazi—নাৎসি নামকরণ করে) গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন, অচিরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন, এবং বাভারিয়া প্রদেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কম্যুনিস্টবৈরী রূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুসরা জঙ্গীলাট, পয়লা নম্বর হিন্ডেনবুর্গের (ইনি পরবর্তী যুগে জর্মনির প্রেসিডেন্ট হন) সহকর্মী জেনারেল এরির্ষ লুডেন্ডর্ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিন-চার বৎসর যেতে না যেতে পার্টির সভ্যসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটলারের এতখানি শক্তিসঞ্চয় হল যে, তিনি সবলে বাভারিয়া প্রদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রমুখদের অপসারণ করে প্রদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হল। এই উদ্দেশ্যে লুডেন্ডর্ফকে পুরোভাগে নিয়ে এই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সদলবলে প্রধান রাজকার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। রক্ষীরা গুলি ছোঁড়াতে সমস্ত দল পালালো, স্বয়ং হিটলার কিঞ্চিৎ আহত হলেন (কিন্তু বন্দুকের গুলিতে নয়), কিছুদিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পাঁচ বছরের জেল হল। কিন্তু ইতিমধ্যে এবং বিশেষ করে কারাবাসের সময় তিনি ম্যুনিক তথা বাভারিয়া প্রদেশের সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন, (এবং তথাকার সরকার ইতিমধ্যে কম্যুনিস্টদের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি দেখে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে 'কণ্টক দ্বারা উৎপাটনার্থে') হিটলারকে অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ১৯২৩ সালেরই ডিসেম্বর মাসে এবং শুভেচ্ছার প্রতীক রূপে বড়দিনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে কারামুক্ত করে দিলেন।

হিটলার নবোদ্যমে ইতিমধ্যে নেতার অভাবে দ্বিখণ্ডিত পার্টিকে দিনে দিনে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন।

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে হিটলার সম্বন্ধে কোনও কিছু বললে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হয় না বলে সংক্ষেপে কয়েকটি বৎসরের বর্ণনা দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন ইতিমধ্যে হিটলার আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা। ভিয়েনায় এসে হিটলার কিছুদিন তাঁর বন্ধুর মারফতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর প্রিয়ার (লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন 'স্তেফানি') খবর নিতেন। তারপর সেই বন্ধু, গুস্তাফ্‌ও ভিয়েনায় এসে একই কামরায় বাসা বাঁধলেন। স্তেফানি হিটলারের তুলনায় বহু উচ্চবংশের কন্যা। পাত্র হিসাবে হিটলারের চেয়ে অযোগ্যতর পাত্র তখন বোধ হয় লিন্‌ৎস শহর খুঁজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যেত না। ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পূর্বেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জাতে প্রায় মজুর শ্রেণীর, অর্থসম্বলে প্রায় 'ধনুর্গুণ ভক্ষণে'র অবস্থা। হিটলার ভিয়েনা থাকাকালীন স্তেফানির বিয়ে হল সুযোগ্য বরের সঙ্গে। হিটলার সে খবর কখন পেয়েছিলেন—আদৌ পেয়েছিলেন কিনা, কারণ বন্ধু গুস্তাফ্‌ তাঁর সঙ্গে তখন ভিয়েনাতে এবং এঁদের দুজনার পরিবারের কেউই স্তেফানিকে চিনতেন না—এ সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকই নীরব।

কারণ তখন হিটলার বিরাট ভিয়েনা শহরের ঘূর্ণাবর্তে প্রায় বিলীন হবার উপক্রম।

তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচে সখীজনসহ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার মাত্র প্রেম-বিহ্বল কবির দিকে স্মিতহাস্য করেছিলেন। আরেকবার পুষ্পের জন্য বিখ্যাত ফ্লরেন্স্ (flora) নগরীর পুষ্পোৎসবে যখন সবাই সবাইকে পুষ্পোপহার দিচ্ছে, এমন কি অচেনা জনকেও, তখন—হয়তো—কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই প্রেমোন্মাদকে একটি ফুল এগিয়ে দেন। ব্যস্! আর তো কিছু জানবার উপায় নেই। তাই বোধ হয়, তথ্য যেখানে যত কম, কিংবদন্তী সেখানে, সেই অনুপাতে তত বেশী? সেই শত শত কিংবদন্তীর মাঝখানে একটি সত্য প্রোজ্জ্বল : দান্তের সুপ্ত কবিসত্তা তাঁকে সচেতন করে দিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমে আর এই নগরীর শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পার্থক্য কোথায়?' বিনয়ভরে যেন সেই পরমাত্মার সম্মুখে মস্তক নত করে দান্তে রচনা করলেন তাঁর 'স্বর্গীয় কাব্য' (দভীনা কম্মেদিয়া = ডিভাইন কমেডি)।

দান্তে আপন জন্মের নগর থেকে বিতাড়িত হন—রাজনীতির জুয়াখেলাতে হেরে গিয়ে। হিটলার স্বেচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে জর্মনি গিয়ে সেখানে পূর্ণ বারোটি বৎসর 'রাজমুকুট' পরার পর নিজ হাতে আপন প্রাণ নিলেন। আমি শুধু ভাবি হিটলার যদি রাজনীতিতে দান্তের মত নিষ্ফল হতেন তবে হয়তো তিনিও তাঁর বেয়াত্রিচেকে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে অজরামর করে রেখে যেতেন, অবশ্য নরদানব হিটলার নিশ্চয়ই দান্তের ইন্‌ফেরনো (নরক) অধ্যায়টা লিখতেন বেশী ফলাও করে। কিংবা হয়তো কাব্যলক্ষ্মীর জন্য নবীন মন্দির নির্মাণ করে—স্থাপত্যেই হিটলারের সর্বাধিক প্রতিভা ছিল, এ সত্য তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন।

পূর্ণপ্রেম

ভিয়েনাতে সর্বপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা অর্জন করে হিটলার দেশত্যাগ করে চলে গেলেন জর্মনির বাভারিয়া প্রদেশের প্রধান নগর ম্যুনিকে। সেখানেও তিনি বেকার, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে তিনি স্বেচ্ছায় জর্মন সৈন্যবাহিনীতে জওয়ান রূপে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধশেষে ম্যুনিকে ফিরে এসে জওয়ানদের কী যেন এক কালচারাল বা ঐ জাতীয় অস্পষ্ট কি এক ট্রেনিং দেবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, সরস্বতী তাঁর রসনায় বিরাজ করেন তাঁকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে

তবে প্রতি বছর দু'একবার হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে একসঙ্গে যেতেন। বস্তুত হিটলারের সর্বজীবনীকার একবাক্যে বলেছেন, গুস্তাফই একমাত্র হিটলার-সখা যিনি তাঁদের বন্ধুত্ব পৌণ্ড শিলিঙে পরিবর্তিত করেননি। জলসাতে যে যেতেন তার একমাত্র কারণ এক জলসাতেই আপন ছোট শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়—সঙ্গীতই ছিল উভয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়। গুস্তাফের ভদ্র আত্মবিসর্জন কতখানি, পাঠক এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সঙ্গীত, কিন্তু সে পথে সুযোগ না পেয়ে একটি ছোট্ট দফতরে চাকুরি নেন। হিটলার তাঁকে বলেন, 'যেখানে খুশী বলো, আমি সরকারী সঙ্গীতালয়ে তোমাকে প্রধান সঙ্গীতচালক করে দিচ্ছি। তুমি পাবে, সবসময়, সর্বাবস্থায় আমার প্রটেক্শন্!' গুস্তাফ্ সে লোভও সম্বরণ করেন।

জনসমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করাবার জন্য। এই সময় ম্যুনিক শহর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিক্ষুব্ধ। অসংখ্য রাজনৈতিক দল, এবং রাস্তায় রাস্তায় গণবিক্ষোভের কোলাহল। হিটলার এরই একটার সদস্য হলেন। যে দলের সভ্যসংখ্যা দশ হয় কি না হয়! ১৯১৯ থেকেই তিনি এই দল (National Sozialictiche Deutsche Arbeitspartei) —এরই প্রথম শব্দের Na এবং দ্বিতীয় শব্দের zi নিয়ে বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ দলের অজানা কে একজন Nazi—নাৎসি নামকরণ করে) গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন, অচিরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন, এবং বাভারিয়া প্রদেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কম্যুনিস্টবৈরী রূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুসরা জঙ্গীলাট, পয়লা নম্বর হিন্ডেনবুর্গের (ইনি পরবর্তী যুগে জর্মনির প্রেসিডেন্ট হন) সহকর্মী জেনারেল এরির্ষ লুডেন্‌ডর্ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিন-চার বৎসর যেতে না যেতে পার্টির সভ্যসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটলারের এতখানি শক্তিসঞ্চয় হল যে, তিনি সবলে বাভারিয়া প্রদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রমুখদের অপসারণ করে প্রদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হল। এই উদ্দেশ্যে লুডেন্‌ডর্ফকে পুরোভাগে নিয়ে এই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সদলবলে প্রধান রাজকার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। রক্ষীরা গুলি ছোঁড়াতে সমস্ত দল পালালো, স্বয়ং হিটলার কিঞ্চিৎ আহত হলেন (কিন্তু বন্দুকের গুলিতে নয়), কিছুদিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পাঁচ বছরের জেল হল। কিন্তু ইতিমধ্যে এবং বিশেষ করে কারাবাসের সময় তিনি ম্যুনিক তথা বাভারিয়া প্রদেশের সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন, (এবং তথাকার সরকার ইতিমধ্যে কম্যুনিস্টদের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি দেখে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে 'কণ্টক দ্বারা উৎপাটনার্থে') হিটলারকে অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ১৯২৩ সালেরই ডিসেম্বর মাসে এবং শুভেচ্ছার প্রতীক রূপে বড়দিনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে কারামুক্ত করে দিলেন।

হিটলার নবোদ্যমে ইতিমধ্যে নেতার অভাবে দ্বিখণ্ডিত পার্টিকে দিনে দিনে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন।

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে হিটলার সম্বন্ধে কোনও কিছু বললে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হয় না বলে সংক্ষেপে কয়েকটি বৎসরের বর্ণনা দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন ইতিমধ্যে হিটলার আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা। ভিয়েনায় এসে হিটলার কিছুদিন তাঁর বন্ধুর মারফতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর প্রিয়ার (লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন 'স্তেফানি') খবর নিতেন। তারপর সেই বন্ধু, গুস্তাফ্‌ও ভিয়েনায় এসে একই কামরায় বাসা বাঁধলেন। স্তেফানি হিটলারের তুলনায় বহু উচ্চবংশের কন্যা। পাত্র হিসাবে হিটলারের চেয়ে অযোগ্যতর পাত্র তখন বোধ হয় লিন্‌ৎস শহর খুঁজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যেত না। ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পূর্বেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জাতে প্রায় মজুর শ্রেণীর, অর্থসম্বলে প্রায় 'ধনুর্গুণ ভক্ষণে'র অবস্থা। হিটলার ভিয়েনা থাকাকালীন স্তেফানির বিয়ে হল সুযোগ্য বরের সঙ্গে। হিটলার সে খবর কখন পেয়েছিলেন—আদৌ পেয়েছিলেন কিনা, কারণ বন্ধু গুস্তাফ্ তাঁর সঙ্গে তখন ভিয়েনাতে এবং এঁদের দুজনার পরিবারের কেউই স্তেফানিকে চিনতেন না—এ সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকই নীরব।

কারণ তখন হিটলার বিরাট ভিয়েনা শহরের ঘূর্ণাবর্তে প্রায় বিলীন হবার উপক্রম।

কিন্তু এস্থলে তাঁর স্থাপত্য শিক্ষালয়ে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়া, তাঁর নিদারুণ দৈন্য, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অবিচারে নানা জাতের বই এনে সেগুলো গোগ্রাসে ভক্ষণ—এর কোনওটাই আমাদের বিষয়বস্তু নয়। আমরা জানতে চাই, ওয়াইন-উইমিন-সং—মদ্যমৈথুনসঙ্গীত—এই তিন বস্তুতে যে রাজসিক প্রিয়দর্শন ভিয়েনা নগর প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দিত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তো বহু পূর্বে সে প্যারিসকে ছাড়িয়ে গিয়েই ছিল, সেই ভিয়েনাতে নারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিটলারের কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কিনা।

গুস্তাফ্ দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, যতদিন হিটলার তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন ততদিন ওদিকে তাঁর কণামাত্র উৎসাহও তিনি কখনও দেখেননি। বস্তুত দীনবেশে সজ্জিত হলেও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনরত সন্ন্যাসীর চোখেমুখে যে দীপ্তি পথিকজনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভিয়েনার ভদ্র, দেমি মঁদেন, গণিকাদের চোখেও সেটা ধরা পড়তো হিটলারকে দেখে। এবং তরুণ হিটলারের দিকে কটাক্ষনয়নে তাকিয়ে বিশেষ ইঙ্গিতও দিত। সাদামাটা, কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত গুস্তাফ্ সেদিকে হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি তাঁর বাহু ধরে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলতেন, 'চলো চলো গুস্‌ৎল্, বাড়ি চলো।'

পূর্বেই বলেছি তারপর তিনি উধাও হলেন।

সেই ১৯০৮ থেকে ১৯১৯/২০ পর্যন্ত যে যা-কিছু লেখেন তার পনের আনা কাল্পনিক। অবশ্য ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যখন জওয়ানরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁর সম্বন্ধে সে সময়কার খবর সরকারী কাগজপত্রে রয়েছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে অবান্তর।

বস্তুত এ-কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ১৯০৮ থেকে ১৯২৫/২৬ পর্যন্ত কোনও রমণী তাঁর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।[১]

পরিচয় হয়েছিল তাঁর বহু রমণীর সঙ্গে—একে ভিয়েনায় তাঁর যৌবনের বেশ কিছুকাল কেটেছে, যে-ভিয়েনা রমণীজাতিকে খাতির করতে তার সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্য সর্বক্ষণ সচেতন, কিংবা 'অচৈতন্যি' দুটোই বলতে পারেন, এক কথায় ভিয়েনা গ্যালান্ট নগর—তদুপরি ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তিনি ম্যুনিকের রাজনৈতিক আকাশে অন্যতম জ্যোতিষ্মান গ্রহ, কম্যুনিস্টদের মোকাবেলা করতে পারেন একমাত্র তিনি

---

১ এমন কি পরবর্তী কালে এফা ব্রাউনও না।

এস্থলে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করি। ১৯৪১-এর গ্রীষ্মকালে হিটলারের সেনাদল যখন বীরবিক্রমে জয়ের পর জয় লাভ করে মস্কোপানে এগিয়ে চলেছে তখন তিনি প্রতিদিন লাঞ্চ-ডিনারের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। ১৯৪২/৪৩-এর শীতে স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর জেনারেলদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শুধু তাঁর মহিলা সেক্রেটারি-স্টেনোদের সঙ্গে খেতেন। এফার হেডকোয়ার্টার্সে আসার অনুমতি ছিল না। হিটলার সময় পেলে বের্খটেশগাডেনের বাড়ি বের্গহফে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন, কিন্তু ঐ ১৯৪১/৪২ এক বা দেড় বৎসর তিনি যে-সব গালগল্প করেছেন সেটি লিখে রাখা হয়েছিল স্টেনোদের দ্বারা। প্রকাশিত হয়েছে 'হিট্‌লারস্ টেবিল-টক্' শিরোনামায়। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার কেতাব। এ-পুস্তকের বহুস্থলে পাওয়া যায় রমণীজাতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। কিন্তু ভিয়েনা বাসকালীন কিংবা ১৯২৫/২৬ পর্যন্ত তিনি যে কোনও রমণীকে কাছের থেকে চিনতে পেরেছেন, এর কোনও ইঙ্গিত নেই। অবশ্য এ-দ্বারা কোনও কিছু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না।

রাস্তাঘাটে নাৎসি আর কম্যুনিস্ট দলে প্রায় প্রতিদিন মারামারি হয় এবং উভয় পক্ষে কয়েকটা গুপ্ত প্রকাশ্য খুনও হয়ে গিয়েছে—এ সবার নেতা তো বীর্যবান না হয়ে যায় না। তদুপরি মহিলাদের প্রতি কি প্রকারে ব্যবহার করতে হয়, তাদের প্রতি ব্যবহার্য সব আদবকায়দা-অটিকেট-গ্যালানট্রি তিনি জানেন—ভিয়েনাতে অবশ্যই তার বেশীর ভাগ তিনি দেখে শিখেছিলেন, কিন্তু হিটলারের মত অসাধারণ জিনিয়াসের পক্ষে সেইটে যথেষ্টর চেয়েও ঢের বেশী। এবং সর্বশেষ কথা, তাঁর যে একটা ম্যাগনেটিক চার্ম—চৌম্বিক আকর্ষণ শক্তি ছিল সেটা তো জর্মন ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বহু বিদেশী রমণীও বলেছেন।

আমি পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিটলার জীবনে প্রেম হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস হাফ।

স্তেফানির প্রতি তাঁর প্রেম প্রথম হাফটা, শেষ হাফটা এফা ব্রাউন, যাঁকে তিনি শেষ মুহূর্তে বিয়ে করেন এবং সেই সূত্রে পৃথিবীর বহুলোক এ প্রেমের খবর পায়। কিন্তু আমরা এস্থলে যে দৃষ্টিবিন্দু—অর্থাৎ প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে—হিটলারকে দেখছি, সেভাবে কেউ দেখেননি, লেখেননি। হয়তো সেই হাফটি এস্থলে আগে বর্ণনা করে মাঝখানের ফুল ওয়ানটিতে গেলে ভাল হত, পাঠক পুরো পার্সপেকটিভ পেতেন, কিন্তু শেষটায় অনেক চিন্তা করে দেখলুম বিশেষ কারণ না থাকলে এ ধারার খেলাতে কালানুক্রমিক অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত (সিনেমার ফ্লাশবেক কিংবা ফ্লাশ ফরওয়ার্ড টেকনিক অবশ্য আজকাল বড়ই জনপ্রিয়)। দ্বিতীয়, এফার সঙ্গে হিটলারের সর্বশেষ প্রেম ১৯৩৯—৪৫-এর যুদ্ধাদি দ্বারা এতই বিক্ষুব্ধ যে বহু অবান্তর নরনারীকে সেখানে টেনে এনে প্রবন্ধর কলেবর বাড়াতে হয়। তৃতীয়ত, অনেকেই সে-প্রেম সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পড়েছেন বলে স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে মূল ঘটনাগুলো শুধু আবার তাঁরা শুনতে পাবেন মাত্র—অর্থাৎ সে প্রেম বর্ণাতে হলে পূর্ণ পুস্তকের প্রয়োজন।

এস্থলে নিবেদন করা কর্তব্য মনে করি, রমণীর প্রতি পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম এদেশের এবং ওদেশের বহু কাব্যকাহিনীতে আছে কিন্তু বাস্তবে যদ্যপি যে কোনও কারণেই হোক (কুলীন প্রথার কথা তথা শ্রীকৃষ্ণ বা দশরথের কথা এস্থলে স্মরণে আনছি নে) আমরা আজ এদেশে একদারনিষ্ঠাতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখি, ইয়োরোপে বহুকাল যাবৎ একই রমণীকে আজীবন পুজো করার বিশেষ মূল্য দেয়নি। অতএব পাঠক যেন স্তেফানির কথা স্মরণে এনে হিটলারের সর্বমহৎ, সর্বগ্রাহী প্রেমকে তার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত না হয়।

ঠিক কোন্ সালে সে প্রেমের সূত্রপাত হয় সে কথা তাঁর অন্তরঙ্গতম ব্যক্তিও জানেন না—যদিও আমার সুদৃঢ় অচল বিশ্বাস, বয়সে পরিণত হওয়ার পর তিনি কারুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করেননি, ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান ছিলেন তাঁর একমাত্র নিত্যালাপী বিদূষক—তবে নিশ্চয়ই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে।

ইতিমধ্যে হিটলারের একটি বিশিষ্ট স্বভাবের উল্লেখ না করলে সে প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোটামুটি ১৯২৭, পাকাভাবে বলতে গেলে তার দু'তিন বছর আগের থেকেই হিটলার ম্যুনিকাঞ্চলে এমনই প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তাঁর চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। দিনের পর দিন বিশাল জনতার সামনে তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা দেশের দুঃখদৈন্যের নিদারুণ বর্ণনা দিচ্ছেন, বিশেষ করে শিশু

পুত্রকন্যার জন্য আহার বসন সংগ্রহার্থে মা-জননীদের কঠোর সংগ্রাম (মেয়েরা দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে কাঁদলেও তার সম্মিলিত ধ্বনি হিটলারকে কখনও কখনও পুরো দু-তিন মিনিট বক্তৃতা বন্ধ করতে বাধ্য করতো) এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কের ক্লৈব্য তথা পাপাচার (করাপশান) নিয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এবং সর্বোপরি তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর আশাবাদ যে তিনিই মেসায়া (কল্কি, যিনি পুনরায় পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনা করবেন) তিনিই ভের্সাঈ ডিকটাট্ (ডিকটাট্ ডিক্টেশন থেকে, অর্থাৎ ক্রীতদাসদের প্রতি যে কোনও অন্যায় পশুবলপ্রযুক্ত অলঙ্ঘ্য আদেশ, যে আদেশ পালন না করলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সবংশে নির্বংশ করা হবে এবং জর্মন রাষ্ট্র থেকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে) ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জর্মনিকে পুনরায় সার্বভৌম এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেশানরূপে পরিণত করবেন।[১]

ব্যক্তিগত জীবনেও হিটলার আর কাউকে আমল দিতেন না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর প্রিয় তিনটে কাফের একটাতে কয়েকজন বন্ধুসহ বসতেন। কিন্তু আমরা যাকে বলি আড্ডা মারা, কিংবা গালগল্প করা—যে কর্মে ভিয়েনা বাঙালীর চেয়েও এক কাঠি সরেস—এবং যে ভিয়েনায় হিটলার প্রথম যৌবন কাটান—সেটি হত না। হিটলার ভিয়েনাতে অনেক কিছু শিখেছিলেন, শুধু এই সমাজনন্দন আচরণটি রপ্ত করতে পারেননি। সর্বক্ষণ তিনিই কথা বলতেন, একমাত্র তিনিই।

এসব মণ্ডলীতে মহিলাদের নিরঙ্কুশ 'প্রবেশ নিষেধ' না হলেও তাঁদের মাত্র দু'একজন আহ্বান পেতেন অতিশয় কালেভদ্রে। হিটলার ভিয়েনার কায়দায় তাঁদের হস্তচুম্বন করতেন (যদিও জর্মনিতে তখন সেটা বিলকুল আউট্ অব্ ডেট্), তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখতেন, সামান্য হাঁ, হুঁ কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে দিতেন, কিন্তু একটা দিকে তিনি কঠোর কঠিন দৃষ্টি রাখতেন, কোনও রমণী যেন ভ্যাচর ভ্যাচর করতে আরম্ভ না করে—তা তিনি যত বুদ্ধিমতীই হোন, মাদাম পম্পাডুর। ইজাবেলা ডানকান, মাদাম দ্য স্তাল যেই হোন না কেন।

গেলীর প্রবেশ

সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, অবিশ্বাস্য—অতিপ্রাকৃত বা মিরাক্‌ল্‌ই বলা যেতে পারে।

নিতান্ত একটা চিংড়ি (চ্যাংড়ার স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন হিটলার তাঁর অন্যতম কাফেতে। অতি ভদ্রভাবে সে সবাইকে নমস্কারাদি করলে। সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাজ্জব কি বাৎ। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে তাবৎ কথাবার্তা সে-ই বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে—ওদিকে এতই বিবেচনা ধরে যে, একে কথা বলতে দেয়, ওকেও কথা বলতে দেয়, কাউকে অস্বাভাবিক আড়ষ্ট হতে দেয় না—সবাই, ইংরিজিতে যাকে বলে ভেরি মাচ্

১ হিটলারের বক্তৃতা দেবার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখা যায়—লেখক তাঁর বহু বক্তৃতা শুনেছে। এ বাবদে একটি অত্যুত্তম—সর্বোৎকৃষ্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না—পরিচ্ছেদ লিখেছেন জর্নলিস্ট মার্কিন মাউরার তাঁর 'জর্মনি পুট্‌স্ দি ক্লক ব্যাক্' পুস্তিকায়।

অ্যাট ঈজ—কিন্তু সব মন্তব্য, সব আলোচনা ঘুরে ফিরে যায় ঐ মেয়েটির কাছে।

আর অতিপ্রাকৃত, মিরাক্‌ল্ হল এই যে, স্বয়ং হিটলার চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে সুমধুর পরিতৃপ্তির মৃদুহাস্য বদনমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছেন।

হিটলারকে যখনই তাঁর চেয়ে বয়সে বড় মুরুব্বীস্থানীয় পার্টি-মেম্বরেরা শুধোতেন, 'বয়েস তো হল, বিয়ে-শাদীর কথা—'

হিটলার বাধা দিয়ে বলতেন, 'জর্মনি আমার বধূ!'

ঠাট্টাছলে বললেও এর ভিতর যে অনেকখানি সত্য লুক্কায়িত আছে সে তত্ত্বের কিছুটা সে-সব মুরুব্বীরা জানতেন। নইলে এ-জাতীয় প্রশ্ন ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিরদরদ-নির্মিত শিখরবাসী হিটলারকে জিজ্ঞেস করবে কে? কারণ তাঁরা এবং পার্টির অন্য সবাই জানতেন, হিটলার জাত-ব্যাচেলার। তা সে ভিয়েনীজ কেতায় সুন্দরীদের সামনে যতই গ্যালানট্রি, শিভালরি দেখান না কেন, রমণীদের কথা উঠলে টেবিলে দু-হাত রেখে, সুমুখের দিকে ঝুঁকে যতই সিরিয়াসলি তিনি কোথায় কোন্ সুন্দরী রমণী দেখেছেন, যে-বেভেরিয়াকে তিনি এত ভালোবাসেন যে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে এখানে এসে স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছেন সেই বেভেরিয়া মায় তার ম্যুনিক সুন্দরীর ব্যাপারে যে ভিয়েনার কাছেই আসতে পার না—এসব নিয়ে যত ধানাইপানাই তিনি করুন না কেন, পার্টির উঁচু মহলের প্রায় সবাই জানতেন যে হিটলারের পক্ষে কোনও সুন্দরীকে নিয়ে পার্টির অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর কিছুটা ঢলাঢলি বরঞ্চ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, কিন্তু বিয়ে করে বউ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর বাঁধবার মত মানুষ হের হিটলার নন। মাঝে মাঝে তাঁকে এ মন্তব্যও করতে শোনা গেছে : 'সুন্দরীদের ভালোবাসবো না—সে কি? আমি কি এতই রসকষবর্জিত আকাট! যা বলুন, যা কন্, আপনারা তো জানেন, আমার সত্তার অন্তস্তলে যে পুরুষ লুকানো আছেন তিনি আর্টিস্ট! এবং আমি ফুলও ভালোবাসি কিন্তু তাই বলে কি আমাকে বাগানের মালী হতে হবে?' প্রায় এ সত্যটিই চার্লস ল্যাম্ বলছেন, 'আমার ঘরে ফুল নেই কেন, শুধোচ্ছেন? আমি কি ফুল ভালোবাসি নে? নিশ্চয় বাসি। আমি শিশুদেরও ভালোবাসি—তাই বলে তাদের মুণ্ডুগুলো কেটে ঘরের ভিতর ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখি নে।' আর এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যের শেষ শব্দটি বলতে হলে বাঙলা প্রবাদেরই শরণাপন্ন হতে হয়—'বাজারে যখন দুধ সস্তা তখন গাই পোষার কি প্রয়োজন?'

পূর্বেই বলেছি, সত্যকার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিটলারের কেউ ছিল না। তবু মোটামুটি যাঁকে বলা যেতে পারে তিনি তাঁর ফটোগ্রাফার হফ্‌মান। এঁকে তিনি এই প্রসঙ্গে খাঁটি বৈষয়িক তত্ত্বকথাটি বলেন, 'জর্মনিকে গড়ে তোলা আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, আদর্শ। একবার আমার জেল হয়েছে, আবার যে কোনও মুহূর্তে আমার ছ' বছরের জেল হতে পারে। তখন বউ-বাচ্চা বাইরে, আমি গরাদের ভিতর। এটা কি খুব বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি?'

তবু বেশীর ভাগই এই নবাগতা সুন্দরী, ব্লন্ডিনী, মধুরভাষিণী, আত্মসচেতন অথচ বিনয়ী মেয়েটিকে দেখে (এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করে যে হিটলার কফি-চক্রের চক্রবর্তীর সম্মানিত আসন সানন্দে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন) ভাবলেন, তবে কি হিটলারের 'জর্মনি আমার বধূ' নীতিটি পরিবর্তন করার সময় এসেছে?

মেয়েটির নাম আঙেলিকা রাউবাল। হিটলারের সৎবোনের মেয়ে—ভাগ্নী। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে সত্য কিন্তু তেমন কোনও অলঙ্ঘ্য

আপ্তবাক্যপ্রসূত নিষেধ নেই।[১] মেয়েটির মা বিধবা, সামান্য যে পেনসেন পায় তাতে দুই কন্যাসহ জীবনযাপন সহজ নয়; এদিকে যে ছোট বৈমাত্রেয় ভাই আডল্‌ফকে, তার বহু দোষ—তার মারাত্মক গোটা তিনেক পূর্বেই নিবেদন করেছি—থাকা সত্ত্বেও, তাকে ছেলেবেলা থেকেই গভীরভাবে স্নেহ করেছেন, সেই আডল্‌ফ্‌, এখন সচ্ছল হওয়ার দরুণ আপন জন্মভূমি অস্ট্রিয়ার কাছেই—সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলে ম্যুনিক থেকে একশ মাইল দূরে বের্ষটেশগাডেনে বাড়ি কিনে তাঁকে অনুরোধ করেছে সীমান্তের এপারে এসে সে বাড়ির জিম্মা নিতে। বেচারা আডল্‌ফকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয় ম্যুনিক শহরে রাজনীতি নিয়ে, সময় পেলে ঐ গ্রামের নূতন বাড়িতে গিয়ে যেন একটুখানি আরাম পায়। তদুপরি এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে আঙেলিকা রাউবালের মা, হিটলারের এই সৎবোনটি যেমন বাড়ি চালাতে জানে, অতিথি-সজ্জনের সেবা করাতে নিপুণা, তেমনি পাচিকা রূপে সমস্ত নগরীতে অতুলনীয়া।[২] স্বভাবতই সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই মেয়েকে। এদের বড়টিই আঙেলিকা বা গেলী।

মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর সম্বন্ধে এবং মামা আডল্‌ফের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে একাধিক লেখক আপন আপন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতর দুজন দুই মত পোষণ করেন, এবং পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ সত্য

---

১ এই ভারতের অন্ধ্র অঞ্চলে হিন্দুসমাজে আপন সহোদরা ভগ্নীর মেয়েকে বিয়ে করা খুবই স্বাভাবিক, ও নিত্য নিত্য হয়। বস্তুত প্রথমেই মামাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করতে হয়—যেন ন্যায্য হক্ক তারই। সে রাজী না হলে অন্যত্র তার বিয়ে হয়।

২ হিটলার-পরিবারের কুলুজীটি দিশী-বিদেশী কোনও ঘটক-ঠাকুরেরই অমলানন্দের কারণ হবে না। প্রথমত হিটলারের (Hitler, Hiedler, Huetler, Huettler—আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত চাষাদের মত হিটলারের ঠাকুর্দারা নানাভাবে এ নাম বানান করেছেন; স্বয়ং হিটলারের পিতা—তাঁর জন্ম জারজরূপে—সে কথা পরে হবে, গোড়াতে Hiedler এবং পরে Hitler বানান করেছেন) পিতা এবং মাতা উভয়েই দুই ভাই, অর্থাৎ হিটলার পদবী এমন দুজনার বংশগত, এবং এই কারণে হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করেন তখন চার্চের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতামহ বিবাহ করেন Maria Anna Schicklgruber-কে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তার পাঁচ বৎসর পূর্বে Schicklgruber একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন কুমারী অবস্থাতেই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন। এই পুত্রই ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা। এবং যেহেতু নবজাত শিশুর মাতা বিবাহিত নয় তাই রীতি অনুযায়ী তাকে দেওয়া হয় মাতা-মাতামহের পারিবারিক নাম Alois Schicklgruber। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বিয়ের পরও পিতা তাঁর পুত্রের নাম Hiedler (তিনি এভাবেই বানান করতেন)—এ পরিবর্তন করার মেহন্নৎটুকু আপন স্কন্ধে তুলে নেননি। অবশ্য একথা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি বাতিলও করা যায় না যে Alois সত্যই ফ্যুরারের পিতামহ Johann Georg Hiedler-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, তবে সে অঞ্চলের সাধারণজনের বিশ্বাস ছিল Alois-এর জন্ম Johann Georg-এর ঔরসেই। Alois-এর মাতা Maria ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যেতেই Johann Hiedler অন্তর্ধান করেন। ত্রিশ বৎসর পর তিনি পুনরায় দেখা দিলেন এবং তিনজন সাক্ষী ও নোটারির (উকিলের) সামনে শপথ নিলেন যে, Alois Schicklgruber তাঁহারই ঔরসজাত পুত্র বটে। ঐদিন থেকে তাঁর নাম হল Alois Hitler (বা Hiedler)। ইনিও একাধিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর পিতারই মত। এদিক ওদিক বিস্তর ঘোরাঘুরির পর বিয়ে করেন

নিরুপণ করা অসম্ভব। তবে দুজনাই একমত যে ঐ গেলী-ই হিটলারের 'ওয়ান গ্রেট লাভ্'! এঁদের একজন হিটলারের ফোটোগ্রাফার বন্ধু হাইনরিষ হফ্‌মান। হিটলারের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিটলার সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন। বইখানার নাম 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' (ইংরিজি অনুবাদ)। বলা বাহুল্য যে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি সব কথা প্রাণ খুলে বলতে পারেননি, তবে এ-কথা সত্য, সব তত্ত্ব—গ্যাস চেম্বারে ইহুদী পোড়ানো ইত্যাদি—জেনে-শুনেও তিনি হিটলারদের নিন্দার চেয়ে প্রশংসাই করেছেন বেশী—তবে এ কথাও বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক ব্যাপারে হফ্‌মানের কোনও চিত্তাকর্ষণ ছিল না,—ঐ বিষয়, যুদ্ধবিগ্রহ, কনসানট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে দুই বন্ধুতে আলোচনা হত খুবই কম। ফটোগ্রাফার হলেও হফ্‌মান উত্তম উত্তম ছবির কদর ও সন্ধান জানতেন, এবং হিটলারেরও রুচি ছিল স্থাপত্য, চিত্রে ও ভাস্কর্যে। দুজনার আলাপ-আলোচনা হত আর্ট নিয়ে।

অন্যজনের নাম পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেস। এঁর বইয়ের নাম 'আনহার্ড উইটনেস'। হিটলার যখন ম্যুনিকে তাঁর দল গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন তখন উভয়ের পরিচয় হয়। পুৎসি বিত্তশালী খানদানী ঘরের ছেলে বলে তিনি হিটলারকে নানাভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হন। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পরও বেশ কিছুকাল তিনি 'দরবারে' আসা-যাওয়া করতেন, এবং প্রায়ই নিভৃতে হিটলারকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি 'দরবারে'র কূটনৈতিক মারপ্যাঁচে হেরে যান এবং সুইটজারল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধেন। ইনি তাঁর পুস্তকে হিটলার এবং গেলী উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদ্গার

শুল্ক বিভাগের এক পালিতা কন্যা Anna Glasl-Hoerer-কে। এ বিয়ে সুখের হয়নি। এবং এঁকে তালাক দেওয়ার পূর্বেই Alois 'বন্ধুত্ব' করেন কুমারী Franziska Matzelsberger-এর সঙ্গে। ফলে একটি পুত্রসন্তান হয়। এর নামও Alois। ইনিও জারজ; পরে আইনতঃ পিতার নাম পান। এঁর পিতা তাঁর মাতা Franziska-কে বিয়ে করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্ত প্রথম স্ত্রী Anna Glasl-Hoerer-এর মৃত্যুর পর। বিয়ের তিন মাস পর Franziska একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন (এঁর নাম Angela এবং ইনিই পরবর্তীকালে হিটলারের নতুন বাড়ি দেখাশুনো করার ভার নেন ও সঙ্গে নিয়ে আসেন কন্যা, হিটলারের প্রেয়সী Angelica, ডাকনাম Geli)। কিন্তু Angela-র জন্মের এক বৎসর পরে Franziska ক্ষয়রোগে মারা যান। এর চার বৎসর পর ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা Alois Hitler বিয়ে করেন তাঁর ঠাকুদ্দার ভাইয়ের নাতনী শ্রীমতী Klara Poetzl-কে, ৭ই জানুয়ারি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ বিয়ের চার মাস দশ দিন পরে জন্মান ফ্যুরারের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা Gustav এবং বাল্যকালেই মারা যান, এবং তার পরের কন্যা Idaও অল্পবয়সে মারা যান। ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলার তৃতীয় সন্তান (পিতার তৃতীয় বিবাহের)। তাঁর ছোট ভাই Edmund এ পৃথিবীতে মাত্র ছ' মাস ছিল। সর্বশেষ সন্তান—পঞ্চমা—Paula ফ্যুরারের মৃত্যুর পর, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত চিরকুমারী অবস্থায় Salzburg-এ বাস করতেন। এই পাউলা একবার ভ্রাতার (হিটলার তখন ফ্যুরার) বাড়িতে তাঁকে দেখতে আসেন, কিন্তু দীর্ঘদিন (হিটলারের হিসেবে) থাকেন বলে ভ্রাতা আডল্‌ফ তাঁকে আর কখনও নিমন্ত্রণ জানাননি।

সৎভাই (পিতার ২য় বিবাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র Alois) বার্লিনে মদ বেচতেন। তাঁর সম্বন্ধে হিটলার কখনও একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। তাঁর ছোট বোন Angela বেশ কয়েক বৎসর পরে হিটলারের গ্রামের বাড়ি চালানোর পরে ঝগড়া করে চলে যান, এবং এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেন। হিটলার এমনই চটে যান যে বিয়েতে কোনও উপহার পর্যন্ত পাঠাননি।

করেছেন। তার মতে গেলী অতিশয় সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মত ফ্লার্ট করার জন্য আকুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা হিটলার সম্বন্ধে আপন আপন বই লেখার পর, এই দুজনার বই বেরিয়েছে এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা হফ্‌মানের কাছাকাছি।

তা সে যা-ই হোক, এ-কথা সত্য হিটলার তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে কাফেতে যেতেন এবং আগে কাজের চাপে সিনেমা, থিয়েটার, অপেরায় অল্প যেতেন—এখন গেলীর চাপে সেগুলো বেড়ে গেল। কিন্তু আসলে হিটলার সব চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন গেলীকে মোটরে করে নিয়ে পিকনিক করতে—ম্যুনিকের চতুর্দিকে পিকনিকের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট স্থল বিস্তর। পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ, নদী, বনফুলে ভর্তি মোলায়েম ঘাসের ঢালু মাঠ, মহান বনস্পতি—কোনও বস্তুরই অভাব নেই। হফ্‌মান পরিবার প্রায়ই সঙ্গে যেতেন।

সোজা বাংলায় বলতে গেলে হিটলার এই কুমারীকে যেন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করতেন। এবং তাই লোকজনসমক্ষে তিনি কখনও বে-এক্তেয়ার হয়ে এমন কোনও আচরণ করেননি যা মুগ্ধ প্রণয়ী ইয়োরোপে মাঝে মাঝে করে থাকে। গেলীর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল,—হিটলার সে স্বর তালিম দিয়ে অপেরার জন্য গেলীকে তৈরি করতে চাইলেন এবং উপযুক্ত গুরু নিয়োগ করলেন। পুৎসি বলেন অন্য কাহিনী। তিনি বলেন, মেয়েটা ছিল অত্যন্ত বাজে ফ্লার্ট টাইপের। অপেরার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করতে হলে যে রেওয়াজ এবং বিশেষ করে যে কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল, গেলীর চরিত্রে তার কণামাত্র উপাদান ছিল না। প্রায়ই গুরুকে ফোন করে রেওয়াজ নাকচ করে দিত এবং এই ফাঁকে ফ্লার্ট করার তালে লেগে যেত। পুৎসির মতে শেষ পর্যন্ত গানের ক্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এ-কথা সর্ববাদিসম্মত যে ভিয়েনায় যে গুরুর কাছে গেলী সর্বপ্রথম গান গাইতে শেখা আরম্ভ করে সে তাঁর কাছে ফিরে যেতে চাইতো। জনশ্রুতি এ-কথা বলে, সেখানে নাকি গেলীর দয়িত বাস করতো।

এবং ঠিক এইখানেই ছিল হিটলারের ঘোরতর আপত্তি। শুধু তাই নয়, যদিও গেলীকে খুশী করার জন্যে হিটলার সব কিছুই করতে রাজী ছিলেন—যেমন গেলীর সঙ্গে টুপি-জুতো কিনতে যাওয়ার মত পীড়াদায়ক মারাত্মক একঘেয়ে ঘণ্টানিও তিনি বরদাস্ত করে নিতেন (হিটলার নিজেই বলেছেন, গেলীর সঙ্গে হ্যাট টুপি কাপড় কিনতে যাওয়ার চেয়ে কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষা ত্রিসংসারে আর নেই। আধঘণ্টা একঘণ্টা ধরে সে দোকানের মেয়েকে দিয়ে বস্তার পর বস্তা কাপড় নামাবে, তার সঙ্গে সে সব নিয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুটা না কিনে গট গট করে বেরিয়ে চলে যাবে অন্য দোকানে। হিটলার ততক্ষণ বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে আঙুলের নখ কামড়াতেন, কিন্তু যা-ই করুন আর নাই করুন, তার পরের বারও বাছুর ছানাটির মত গেলীর সঙ্গে কেনা-কাটা করতে যেতেন ঠিকই) কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি অচল অটল। তাঁর অনুমতি ভিন্ন গেলী যার-তার সঙ্গে আলাপচারী করতে পারবে না। এমন কি পরিচিতজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলবে না। এবং এই ফরমান্‌ যে কত সুদূরপ্রসারী সেটা স্বয়ং গেলীও জানতো না।

গেলী অবশ্যই জানতো হিটলার তাকে ভালোবাসেন, তার প্রেমমুগ্ধ, সে প্রেম যে কত

অতল গভীর সে-সম্বন্ধে বেচারীর কোনও ধারণাই ছিল না। একদিন সেটা সে বুঝতে পারলো রীতিমত ভীতশঙ্কিত হয়ে।

হিটলারের পার্টির সদস্যগণ যে যে কাজই করুন না কেন, সমাজে তাদের যে-স্থানই হোক না কেন, পার্টির ভিতর একটা প্রশংসনীয় সাম্যবাদ ছিল। হিটলারের মোটর ড্রাইভার এমিল মরিস ছিল প্রাচীন দিনের পার্টি-মেম্বার। সে একদিন কাঁপতে কাঁপতে হফ্মানের সামনে এসে বললে, সে গেলীর সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি করছিল, এমন সময় হঠাৎ হিটলার ঘরে ঢুকে রাগে-জিঘাংসায় যেন সর্ব আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে চিৎকারের পর চিৎকারে মরিসকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেন। মরিস তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলো, হিটলার যে কোনও মুহূর্তে পিস্তল বের করে গুলি চালাতে পারেন। ঘটনাটি হফ্মানকে বলার সময় সে তখন ভয়ে কাঁপছে।

হফ্মানের মতে গেলী ছিল পূত, পবিত্র, পুষ্পটির মত। তিনি বলেন, অপরাধ তার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু ছিল না। কিন্তু মরিসটি ছিলেন ঈষৎ নটবর। কিন্তু সেও যে ফ্যুরারের ভাগ্নীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে সেটা অবিশ্বাস্য। করতে গেলে তার বহু পূর্বেই মরিসের বন্ধুবান্ধব তাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে দিত।

হিটলারের শত্রুর অভাব কোনও কালেই ছিল না। এমন কি তাঁর প্রধান শত্রু কম্যুনিস্ট দলের কিছু কিছু সদস্য পার্টির আদেশানুযায়ী নাৎসি মেম্বারশিপ নিয়ে হিটলারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যথাস্থানে তাদের রিপোর্ট পাঠাতো। এদের তো কথাই নেই, আরও কেউ কেউ বলেন, সমস্ত ব্যাপারটা এতখানি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না।[১] তা সে যাই হোক, হিটলার আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পেলেন বহুকাল পরে—ইতিমধ্যে মরিস গা-ঢাকা দিয়ে থাকতো, হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে তুলকালাম কাণ্ড লেগে যেত।

ইতিমধ্যে আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেল। হিটলার প্রোপাগাণ্ডা-সফরে বেরুলে গেলী মায়ের কাছে, হিটলারের গ্রামের বাড়িতে চলে যেত। বোধ হয় তারই কোনও এক সময়ে হিটলার প্রিয়া গেলীকে একখানা চিঠি লেখেন—সেটাতে নাকি যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে হিটলার অতিশয় প্রাঞ্জল—শত্রুপক্ষের অভিমতে—অশ্লীল ভাষায় আপন কাম্য আদর্শ যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। যৌনবিজ্ঞানীরা বলেন, অত্যাচারী শাসকদের (টাইরেন্ট) অনেকেই নাকি মাজোকিস্ট হয়ে থাকেন—অর্থাৎ স্বাভাবিক যৌনসঙ্গমের পরিবর্তে উলঙ্গ রমণী সে স্থলে পুরুষকে তীব্র কশাঘাত করে, কিংবা তলায় সূক্ষ্ম লোহা লাগানো রাইডিং বুট পরে পুরুষের স্কন্ধোপরি ঘন ঘন বুটাঘাত করে, তবেই নাকি পুরুষ তার যৌনানন্দ পায়।[২] শত্রুপক্ষের মতে হিটলারের চিঠি মাজোকিস্ট দর্শন বিবৃত করেছিল। সে চিঠি নাকি দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ে যায় অন্য লোকের হাতে। অতি কষ্টে, বহু অর্থ নিয়ে (বলা হয় পার্টি-ফান্ড থেকে) এক ক্যাথলিক পাদ্রী—ইনি তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষ নাৎসি

---

১ হিটলারের প্রখ্যাত জীবনী-লেখক বুলক্ বলেন—'He (Hitler) discovered that she (Geli) had allowed Maurice to make love to her', ইংরিজিতে to make love হয়তো একাধিক অর্থ ধরে।

২ লন্ডন পুলিস নাকি বেশ্যাবাড়িতে হামলা চালালে মাঝে মাঝে চাবুক, লোহার গুলিওয়ালা রাইডিং বুট, ইত্যাকার যন্ত্রণাদায়ক সাজসরঞ্জাম পায়, বেশ্যাদের বক্তব্য, 'খদ্দের ভদ্রলোক'। তিনি

পার্টিতে যোগ দিলে কার্যে পরিণত করতে পারবেন এই আশায় পার্টিতে যোগ দেন—তারই বিনিময়ে চিঠিখানা কিনে নেন। (কথিত আছে, ৩০ জুন ১৯৩৪-এ হিটলার যখন বিনা বিচারে এক তথাকথিত 'বিদ্রোহী' দলের নেতা র‍্যোম্, হাইন্‌ৎস ইত্যাদিকে গুলি করে মারবার আদেশ দেন তখন সেই মোকায় আরও জনা চারশ'র সঙ্গে এই ফাদার স্টেম্প্‌ফলেকেও খুন করা হয়। তাঁর দোষ তিনি ঐ চিঠির সারমর্ম স্বমস্তিষ্কে সীমাবদ্ধ না রেখে দু-একজন অন্তরঙ্গ পার্টি-মেম্বারকে বলে ফেলেন। হিটলার-সখা হফ্‌মান অবশ্য এ চিঠির উল্লেখ করেননি, বরঞ্চ স্টেম্প্‌ফলে ও অন্যান্য নাৎসি নেতা নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর হিটলারের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন তাঁকে দেখা মাত্রই নাকি হিটলার বলে ওঠেন, 'জানো হফ্‌মান, শুয়োরের বাচ্চারা আমার প্যারা ফাদারকেও খুন করেছে!' অবশ্য এ-কথা সত্য যে, জুন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের আদেশে যে পাইকারি খুন 'জুন পার্জ' বা 'জুন মাসের জোলাপ' হয়—এ লেখক তখন জার্মানিতে ও ধুন্ধুমারের যতখানি আর পাঁচটা রাস্তার নাগরিক দেখতে পেয়েছিল, সেও পেয়েছে, কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিটলার জাতির সম্মুখে যখন আপন সাফাই গেয়ে বক্তৃতা করলেন, তখন আর পাঁচজন নাগরিকের মত সে সেটা বিশ্বাস না করে অবিশ্বাস করেছিল এবং পরবর্তী ইতিহাস-উদ্ঘাটন লেখককেই সমর্থন করে—তখন গ্যোরিং, হিমলার আদেশদাতা হিটলারকে না জানিয়ে, পরে মিথ্যে অভিযোগ এনে, আপন আপন ব্যক্তিগত শত্রুও খতম করেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, ফ্যুরারের গোপনীয় কেলেঙ্কারি বাবদে যখন ফাদার এতই অসতর্ক তখন এ মোকায় তাঁকে সরিয়ে ফেলাই ভালো—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকেও খুন করা হয়। কিন্তু এই 'পার্জ' বা জোলাপ গেলী-প্রেমের ছ' বছর পরের কথা, আমরা ১৯২৮-এ ফিরে যাই)।

তা সে চিঠি আদৌ হিটলার লিখেছিলেন কিনা সে তর্ক উত্থাপন না করলেও জানা যায়, ঐ সময়ে পার্টি-সদস্যদের ভিতর কানাঘুষা আরম্ভ হয়। কারণ ইতিমধ্যে হিটলার আরও ভালো রাস্তায় বৃহৎ ভবন কিনে সেখানে গেলীর জন্য রাজরাণীর মত আবাস নির্মাণ করে সেইটাকে আপন স্থায়ী আবাস-বাটি করেছেন, গেলীকে যত্রতত্র সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে যান, এবং নিতান্ত সরল পার্টি-সদস্যও দু-চারবার লক্ষ্য করলেই বলতো, নিশ্চয়ই ফ্যুরার এ মেয়েতে মজেছেন। তা তিনি মজুন, কিন্তু একে বিয়ে করলেই তো পারেন। নইলে শত্রুপক্ষ যে বলছে হিটলার রক্ষিতা পোষণ করেন, দু কান কাটার মত স্বভবনে তার সঙ্গে বাস করেন, তিন কান কাটার মত সগর্বে সদম্ভে তাকে নিয়ে সর্বত্র—এমন কি পোলিটিকাল পার্টি মিটিঙেও—যাতায়াত করেন, এবং আপন ভাগিনীর—তা হোক না সে সৎবোনের মেয়ে—ভবিষ্যৎটি যে ঝরঝরে করে দিচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর কোনও

স্ত্রীকে এসব করতে আদেশ দিতে পারেন না—স্বাভাবিক লজ্জাবশত। তাই এ ধরনের লোক আমাদের কাছে আসেন। আমরাও সাজসরঞ্জাম তৈরী রাখি। স্ত্রীলোক মাজোকিস্টও আছে, এবং যেসব রমণী স্বামী মারপিট করলে চিৎকার করে, কিন্তু যৌনানন্দ পায়, তাদের 'নরমতর' মাজোকিস্ট বলা হয়। অনেকের মতে অনেক রমণী বাড়িতে এমন সব কাজ করে থাকে বা করে না (যেমন ঘর ঝাঁট দিল না রান্না করলো না, বা স্বামীর গামছাখানা লুকিয়ে রাখলো) যাতে করে স্বামী তাকে ঠ্যাঙায়!

বিবেকদংশন নেই; আর এতদিন ধরে প্রচার যে, হিটলারের মত সর্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর হয় না, তিনি যে ঊনচল্লিশ বছর বয়সেও দারগ্রহণ করেননি তার একমাত্র কারণ, দারাপুত্রপরিবার দেশের জন্যে তাঁর আত্মোৎসর্গে অন্তরায় হবে বলে। জিতেন্দ্রিয় না কচু!

এই কেলেঙ্কারিতে পার্টির কতখানি ক্ষতি হচ্ছিল বলা কঠিন, এ কথা সত্য যে নাৎসি পার্টির ভ্যুরটেম্‌বের্গ অঞ্চলাধিপতি মুরুব্বী, পার্টির এক অতি প্রাচীন সদস্য যখন হিটলারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলেন তখন তিনি রাগে ক্রোধে চিৎকার করে তাঁকে পার্টি থেকে স্রেফ খেদিয়ে দিলেন।

এদিকে হিটলারের কড়া পাহারা গেলীর উপর। হফ্‌মানের মতে তিনি আদৌ জানেন না যে গেলী অন্যজনকে অতি গভীরভাবে ভালোবাসে—ভিয়েনায় নাকি দয়িতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এবং এ কথাও সত্য, গেলী বার বার সঙ্গীতচর্চা করার জন্য তার প্রাচীন গুরুর কাছে ভিয়েনায় যেতে চায়—এবং হিটলারের কবুল জবাব, 'নাইন' অর্থাৎ নো। যে ম্যুনিকের সহস্র সহস্র নরনারী হিটলারের উচ্ছ্বসিত ভক্ত, সেই হিটলার যখন গেলীর পদপ্রান্তে তাঁর প্রণয় রাখলেন তখন আর কিছু না হোক, এত বড় সর্বজনপ্রশংসিত একটা গ্রেটম্যানের বশ্যতা গেলীকে নিশ্চয়ই মুগ্ধবিহ্বল করেছিল। (প্রেমের প্রতিদান দিক আর না-ই দিক) এবং হয়তো হিটলার সেই বিহ্বলতাকেই প্রণয়ের প্রতিদান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। হফ্‌মানের মতে হিটলারের 'গ্রেট লভ্' ছিল স্বার্থপর প্রেম—অনেক মুনিঋষিরাও বলেন, 'গ্রেট লভ্ কখনও নিঃস্বার্থ হতে পারে না, সে 'লাভার' অন্য সকলের প্রতি হয়ে যায় হিংসাপরায়ণ, তার বুভুক্ষা অসীম। বার্নার্ড শও বলেছেন, 'গ্রেট লভ্' সামলে-সুমলে অল্প মেকদারে ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে হয়। নইলে দয়িতার দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন কোনও 'ম্যানিয়াক' প্রেমোন্মাদ তাকে অষ্টপ্রহর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিরুদ্ধনিশ্বাস করে তুলছে।

ম্যুনিকের বছরের সব চেয়ে বড় নাচের পরব এগিয়ে আসছে। প্রাণচঞ্চলা গেলী কেন, নিতান্ত অর্থাভাব না হলে, কিংবা প্রেমিকও দরিদ্র হলে, ম্যুনিকের কোনও তরুণী সে নাচ বর্জন করে? প্রথমটায় হিটলার তো কানই দেয় না। আর গেলীও ছাড়বে না। শেষটায় বাধ্য হয়ে হিটলার রাজী হলেন, কিন্তু শর্ত রইল দুটি। সঙ্গে যাবেন দুই গার্জেন এবং দুই গার্জেনদের প্রতিজ্ঞা করতে হল যে রাত এগারোটার ভেতর গেলীকে ফের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

সেই ডান্‌সের জন্য যে পারে সেই নতুন হালফেশানের ফ্রক তৈরী করায়। ম্যুনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজাইনার-দর্জি ডাঁই ডাঁই অতি অরিজিন্যাল ডিজাইন রেখে গেল। হিটলার এক নজর বুলিয়েই সব কটা নামঞ্জুর করে দিলেন। এগুলো বড্ড বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বড্ড বেশী সালঙ্কার—যদ্যপি ফ্রক হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট। গেলী যাবে সাধারণ ইভনিং ড্রেস পরে।

তাই হল। স্বয়ং হফ্‌মান ও তাঁর চেয়ে বুড়ো পার্টির প্রাচীন সদস্য আমান্ গেলীর 'চরিত্ররক্ষকস্বরূপ' তাকে মধ্যিখানে নিয়ে গেলেন নাচের মজলিশে। এক্ষেত্রে তরুণীরা প্রায় সর্বদাই আপন আপন লভারের সঙ্গে এ নাচে কেন—সব নাচেই যায়।

এবং ফিরতে হবে রাত ১১টায়। বলে কি? মাথা খারাপ!

হফ্‌মান বলেছেন—এবং এ লেখকও আপন একাধিক অভিজ্ঞতা থেকে অসংকোচে সায় দেবে—এ-সব নাচে ফুর্তি-ফার্তি ফষ্টি-নষ্টি এমন কি কিঞ্চিৎ বেলেল্লাপনা আসলে আরম্ভ হয় রাত বারোটার পর। আমার মতে জমে প্রায় দু'টোয় এবং নাচ ভাঙে ছ'টায়।

অনুমান করা কঠিন নয় যে গেলী অত্যধিক আপ্যায়িত বা সন্তুষ্ট হয়নি। নাচের মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে কপোত-কপোতীরা জোড়ায় জোড়ায় ফোটোগ্রাফ তোলায়। গেলীর যথেষ্ট কাষ্ঠরস ছিল। সে-ও ছবি তোলালে ঐ দুই প্রহরী 'ডালকুত্তা'র মাঝখানে। কপোত-কপোতীর এক হাতে থাকে সফেন শ্যাম্পেন গ্লাস, অন্য হাতে গোটাপাঁচেক বেলুনের সুতো, মাথায় ঐ বলডান্‌সেই কেনা রঙ-বেরঙের ফুল্‌স্‌ ক্যাপ, গাধার টুপি ইত্যাদি। গেলী ছবি তোলালে এমন কায়দায় যেন মনে হয় ফাঁসির আসামীকে তার দুই জল্লাদ তাকে ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাবার সময় প্রেস ফোটোগ্রাফার যে ভাবে ছবি তোলে।

হফ্‌মান বিরক্তির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় হিটলারের গচ্ছিত মহামূল্যবান গেলীকে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা সাড়ম্বরে 'সরকারী' কায়দায় গেলী ফোটোগ্রাফখানা মামাকে উপহার দিলেন। হিটলার এসব নাচ এককালে বিস্তর না হোক অল্পবিস্তর নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। তাঁর মত তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই ভাল।

বৈমাত্রেয় মামা হলেও গেলী পেয়েছিল হিটলারের একটি মহৎ গুণ; সে তার পেটের কথা কাউকে বলতো না। যে-পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেল তাঁর পুস্তকে হিটলার ও গেলীর বিরুদ্ধে প্রচুরতম বিষোদগার করেছেন তিনি সে সময়ে নিত্য নিত্য হিটলারের বাড়িতে আসতেন, এবং গেলীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর পুস্তকে গেলীকে দিয়ে রামগঙ্গা কিছুই বলাতে পারেননি। শুধু একবার নাকি তিনজনা যখন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হিটলার কি একটা রূঢ় মন্তব্য করলে, পুৎসি শুনতে পেলেন গেলী দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "ব্রুট"—পশু।

গেলীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল হফ্‌মান পরিবারের প্রতি এবং সমস্ত ম্যুনিক শহরে ঐ পরিবারের কর্ত্রী এর্না হফ্‌মানের সঙ্গে তার ছিল অন্তরঙ্গতা। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত আগাপাস্তলা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি, স্বামীকেও বোঝাতে পারেননি। পুৎসি তাঁর বিষোদগারের সময় গেলীর যত নিন্দাই করে থাকুন না কেন, এর্না পাঁচজনকে যা বলেছেন তার থেকে বোঝা যায়, তিনি, এর্না নিজে আর্টিস্ট ছিলেন বলে শুধু যে গেলীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মজেছিলেন তাই নয়, তার মানসিক ও চারিত্রিক একাধিক বিরল সৎগুণ তাঁকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। এমন যে বয়স্কা বান্ধবী যাঁর কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, বিপদে আপদে উপদেশ পথনির্দেশ চাওয়া যায় পাওয়া যায় তাঁর কাছেও গেলী তার সুখ-দুঃখের কথা বলত না। শুধু একদিন মাত্র, কেমন যেন আত্মহারা হয়ে সে স্বীকার করে যে, সে যখন ভিয়েনায় ছিল তখন কোনও একজনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। সামান্য এই, এতটুকু বলার পর সে হঠাৎ থেমে গেল, যেন সম্বিতে ফিরে এসে বুঝতে পারল, বড্ড বেশি বলা হয়ে গিয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আর যা আছে, সেটা আছেই। আপনিও কিছু করতে পারবেন না, আমিও কিছু করতে পারবো না। অতএব অন্য কথা পাড়ি।' এর্না দুঃখিনী গেলীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি

দিলেন—এর্না বাস্তবিকই দৃঢ় চরিত্রের রমণী ছিলেন, অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, নাৎসি পার্টিতে যোগ দেননি, এবং যদিও হিটলারকে সমীহ করে চলতেন তবুও অন্যান্য বাবদে দু-একবার তাঁকেও খাঁটি অপ্রিয় সত্য কথা শোনাতে কসুর করেননি—কিন্তু গেলী তার শামুকের খোল থেকে বেরুতে রাজী হল না। পরবর্তী ঘটনা থেকে মনে হয়, সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, সে যা চায় হিটলার তার ঘোরতর বিরোধী এবং এই নিরীহ হফ্‌মান দম্পতি এখনও হিটলারের স্বরূপ চেনে না, হিটলার তাঁর মর্জিমাফিক যে সব সম্ভব-অসম্ভব কার্য করতে ও করাতে পারেন সে সম্বন্ধে এঁদের কণামাত্র ধারণা নেই—হিটলারের যে-'স্বরূপ' সে তার প্রতিদিনের সান্নিধ্যে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিল।

সেদিন এর্না শুধু এইটুকু জানতে পেরেছিল যে গেলী ভিয়েনায় একজন আর্টিস্টকে ভালোবাসে, কিন্তু সে কে, তাদের দুজনার মধ্যে কি আদান-প্রদান হয়েছে গেলী যদি তার ভালোবাসার প্রতিদান পেয়ে থাকে তবে উভয়ের বিবাহের প্রতিবন্ধকই বা কি—এ-সব হফ্‌মানরা জানতে পারেননি, পরে অন্য কেউও জানতে পারেনি।

এদিকে গেলীর মুখ সদ্য প্রফুল্ল, মামার বুড়া-বুড়া প্রাচীন দিনের পার্টি সদস্যরা তার উপর বড়ই প্রসন্ন, মামার বানানো সেই কাঁটাজালের ভিতরও তার বিধিদত্ত সরসতা লোপ পায়নি। পুৎসি এটাকেই ঘৃণা করে বলেছেন, 'ককেটরি'—এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? ঢলাঢলি না? কি জানি! হফ্‌মান বলেন, তাঁর মনে সন্দেহ নেই যে এটা ছিল বাহিরের মুখোশ। এই প্রাণবন্ত, প্রকৃতিদত্ত সদাচঞ্চলা, আনন্দে হাসিতে যে কোন মুহূর্তে কারণে অকারণে শতধা হয়ে ফেটে যাওয়া যার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তার চতুর্দিকে বিধিনিষেধের কাঁটার জাল! ম্যুনিকের মত স্বাধীন শহরে—যেখানে নর-নারী কি রকম অবাধে মেলামেশা করে সেটা এদেশে বসে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—গেলী কারও সঙ্গে কথা কইতে পারবে না মামার অজান্তে, কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারবে না মামার পরিষ্কার অনুমতি ভিন্ন, এমন কি ঐ বয়সের আর পাঁচটা মেয়ে যে সামাজিকতা করে থাকে, লোকাচারসম্মত ভদ্রতা-সৌজন্য করে পাঁচজনের সাহচর্য সঙ্গসুখ পায়—এর কোন একটা সে করতে পারে না, মামাকে না জানিয়ে, মামার অনুমতি ছাড়া।

সেই 'ডালকুত্তা' শব্দটা হফ্‌মান তিক্ততার সঙ্গে নিজেই ব্যবহার করেছেন—দুটিকে নিয়ে ডান্‌সে যাওয়ার ফার্সের পরের দিন হফ্‌মান আর সহ্য না করতে পেরে হিটলারকে বললেন, 'আপনি গেলীর চতুর্দিকে যে পাঁচিল খাড়া করে তুলেছেন তার ভিতর মেয়েটার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে নাচে কাল রাত্রে তার ফুর্তি করার কথা ছিল, সেটা শুধু তার অবরুদ্ধ জীবনের তিক্ততা তিক্ততর করে তুলেছিল।'

হিটলার উত্তরে বললেন, 'আপনি জানেন, হফ্‌মান, গেলীর ভবিষ্যৎ আমার কাছে এমনই প্রিয়, এমনই মূল্যবান যে তাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এ-কথা খুবই সত্য আমি গেলীকে ভালোবাসি এবং আমি তাকে বিয়েও করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করা সম্বন্ধে আমার মতামত কি আপনি ভালো করেই জানেন, এবং আমি যে কদাপি বিয়ে করবো না বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছি সে-কথাও আপনি জানেন। তাই আমি এটাকে আপন ন্যায়সম্মত অধিকার বলে ধরে নিয়েছি যে যতদিন না গেলীর উপযুক্ত বর এসে উদয় হয় ততদিন পর্যন্ত সে যার সঙ্গে পরিচয় করতে চায় এবং

যারা তার পরিচিত তাদের উপর কড়া নজর রাখা। আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা। আমি মনে মনে দৃঢ়তম সংকল্প করেছি গেলী যেন জোচ্চোরের হাতে না পড়ে বা এমন লোকের পাল্লায় না পড়ে যে গেলীকে দিয়ে আপন ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেবার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের তালে আছে।'

হফ্‌মান এস্থলে যোগ দিচ্ছেন, হিটলার অবশ্য জানতেন না গেলী গোপনে গোপনে ভিয়েনাবাসী এক তরুণকে মনপ্রাণ দিয়ে গভীর ভালোবাসে।

হিটলার গিয়েছিলেন ম্যুনিকের বাইরে—গেলীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের কাছে—আবার যাবেন দূর হামবুর্গে, মাঝপথে কয়েক ঘণ্টার জন্য ম্যুনিকে থামবেন এবং গেলীকে গ্রাম থেকে আনিয়েছেন। হামবুর্গের দীর্ঘ সফরে সহযাত্রী হওয়ার জন্য তিনি পূর্বেই হফ্‌মানকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এস্থলে হফ্‌মানের বিবরণী মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ম্যুনিক সমাজে হিটলার গেলীকে পরিচয় করিয়ে দেবার চার বৎসর পর—কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গেলীকে ম্যুনিক সমাজে উপস্থিত করেন, তাহলে হবে সাত বৎসর পর, কিন্তু এ বাবদে আমি হফ্‌মানকেই বিশ্বাস করি, এবং এসব ঐতিহাসিকদের বই বেরিয়েছে হফ্‌মানের বই বেরুবার পূর্বেই) হফ্‌মান এলেন হিটলারের বাড়িতে। গেলী মায়েরই মতো ভালো ঘরকন্না করতে জানত, তাই সে তখন হিটলারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছে। হিটলার সখাসহ যখন সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামছেন, তখন উপরের তলার রেলিঙের উপর ভর করে, নিচের দিকে ঝুঁকে গেলী বলতে লাগল, 'ও রেভোয়া মামা অ্যাডল্‌ফ, ও রেভোয়া, হ্যার হফ্‌মান!' হিটলার দাঁড়ালেন, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দিকে চললেন। হফ্‌মান বাইরে এসে পেভমেন্টে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হিটলার এলে পরে মোটরে উঠে দুজনা চললেন উত্তর দিকে ন্যুর্‌ন্‌বের্গ পানে। শহর থেকে বেরুবার সময় হিটলার বন্ধু হফ্‌মানকে বললেন, 'কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।'

হফ্‌মান বিবেচক লোক। তিনি নিজেই ঠাট্টা করে বলেছেন, 'অনেকেই আমাকে আড়ালে হিটলারের কোর্টজেস্টার (গোপালভাঁড়) বলত, এবং হয়তো সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।' তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এ সময়কার দখিনা "ফ্যোন" বাতাসটা সক্কলেরই বুকের উপর চেপে বসে সবাইকে মনমরা করে দেয়।' কিন্তু হিটলার চুপ করে রইলেন, এবং দীর্ঘ ন্যুর্‌ন্‌বর্গের রাস্তা ড্রাইভ করার পর সেখানকার পার্টি-মেম্বারদের প্যারা হোটেলে উঠলেন।

পরের দিন ন্যুর্‌ন্‌বের্গ শহর ছেড়ে যখন তাঁরা বায়রট্ শহরের দিকে এগুচ্ছেন তখন হিটলার ড্রাইভিং সীটের সামনের ছোট্ট আয়নাটিতে লক্ষ্য করলেন, আরেকখানা মোটর দ্রুততর বেগে ক্রমশই তাঁদের গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। নিরাপত্তার জন্য হিটলারের হুকুম ছিল কোনও গাড়ি যেন তাঁর গাড়ি ওভারটেক না করতে পায়, কারণ ঐ সময় দুটো গাড়িই কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলে বলে অন্য গাড়ি থেকে হিটলারের উপর গুলি চালানো কঠিন নয়। হিটলার সোফার শ্রেক্‌কে সেই আদেশ দিতে যাচ্ছেন সেই সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, যে-গাড়ি পশ্চাদ্ধাবন করছে সেটা ট্যাক্সি এবং ড্রাইভারের পাশে হোটেলের

উর্দিপরা একটি ছোকরা ক্ষিপ্তের ন্যায় দু হাত নাড়িয়ে তাঁদের থামবার জন্য সঙ্কেত করছে। শ্রেক্ গাড়ি দাঁড় করালে ছেলেটি উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'হ্যার হেস (ইনি তখন এবং ১৯৪১-এ যখন অ্যারোপ্লেনে করে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে লন্ডন যান তখনও হিটলারের পরেই তাঁর স্থান ছিল) ম্যুনিক থেকে ট্রাঙ্ককল করে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে হিটলারের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ফোনে না পৌঁছনো পর্যন্ত হেস লাইন ছাড়বেন না।' দুই বন্ধু মোটর ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চললেন ন্যুর্‌ন্‌বের্গ পানে।

গাড়ি ভাল করে থামতে না থামতেই হিটলার লাফ দিয়ে মোটর থেকে বেরিয়ে ছুটে ঢুকলেন হোটেলের ভিতর এবং তারপর টেলিফোনের বাক্সে (বুথে)—বুথের দরজা পর্যন্ত তিনি বন্ধ করেননি। পিছনে পিছনে ছুটে এসেছেন হফ্‌মান এবং টেলিফোন বুথের দরজা খোলা বলে হিটলারের প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেলেন।

'এখানে হিটলার—কি হয়েছে?' উত্তেজনায় হিটলারের গলা খসখসে কর্কশ হয়ে গিয়েছে। 'হে ভগবান! এ কী ভয়ঙ্কর!' অপর প্রান্ত থেকে কি একটা খবর শুনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ হতাশা। তারপর দৃঢ়তর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, এবং সে কণ্ঠস্বর শেষটায় প্রায় চিৎকারের পর্যায়ে পৌঁছল, 'হেস! আমাকে উত্তর দাও—হাঁ কিংবা না—মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে তো?...হেস, তুমি অফিসার, সেই অফিসারের নামে দিব্যি দিচ্ছি—আমাকে সত্য করে বলো—মেয়েটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?...হেস! ...হেস!' এবারে হিটলার তীব্রতম কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। মনে হল তিনি অপর প্রান্ত থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছেন না। হয় লাইন কেটে গেছে, নয় হেস উত্তর দেবার দুর্বিপাক এড়াবার জন্য রিসীভার হুকে রেখে দিয়েছেন। হিটলার টেলিফোন বুথ থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন, তাঁর চুল নেমে এসে কপাল ঢেকে ফেলেছে (এ কথাটা তাঁর খাস চাকর লিঙে একাধিকবার বলেছে যে, হিটলার তাঁর মাথার চুল কিছুতেই বাগে রাখতে পারতেন না—অল্পেতেই সেটা কপাল ঢেকে ফেলত), তাঁর চাউনি ছন্নের মত, তাঁর চোখ দুটো যে উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করছে সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

শ্রেকের দিকে মুখ করে বললেন, 'গেলীর কি যেন একটা কি ঘটেছে। আমরা ম্যুনিক ফিরে যাচ্ছি। গাড়ির যা জোর আছে তার শেষ আউন্‌স্ পর্যন্ত কাজে লাগাও। গেলীকে জীবিত অবস্থায় আবার আমাকে দেখতেই হবে।'

'টেলিফোনের বুথ থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো যে সব কথা ভেসে এসেছিল তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, গেলীর কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক ঠিক কি সেটা বুঝতে পারিনি, এবং হিটলারকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও আমার ছিল না।'—বলছেন স্বয়ং হফ্‌মান।

হিটলারের উন্মাদ উত্তেজনা যেন সংক্রামক। শ্রেক্ চেপে ধরেছে অ্যাকসিলীরেটর। মোটরের মেঝে পর্যন্ত তার গাড়ি তীব্র আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে ম্যুনিকের দিকে। হফ্‌মান মাঝে মাঝে মোটরের ছোট্ট আর্শিতে দেখছেন হিটলারের চেহারা—ঠোঁট দুটো চেপে তিনি উইন্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে সম্মুখপানে তাকিয়েও যেন কিছু দেখছেন না। আমাদের মধ্যে একটি মাত্র বাক্য বিনিময় হল না—যে যার বিমর্ষ চিন্তা নিয়ে ডুবে আছে আপন মনের গহনে।

অবশেষে আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলুম এবং সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ জানতে পেলুম।

চব্বিশ ঘণ্টা আগে গেলী মারা গিয়েছে। সে তার মামার অস্ত্রভাণ্ডার থেকে একটি ৬.৩৫ পিস্তল নিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি জায়গায় গুলি করেছে। ডাক্তারের মতে যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা হত তবে হয়তো তাকে বাঁচানো অসম্ভব হত না। কিন্তু সে দরজা বন্ধ করে গুলি ছুঁড়েছিল, কেউ সে শব্দ শুনতে পায়নি এবং ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

ইতিমধ্যে পোস্টমর্টেম, করোনারের তদন্ত সব কিছু হয়ে গিয়েছে এবং পুলিস মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল, হিটলারের বিদায়ের অল্প পরেই গেলী আত্মহত্যা করে। সে দেহ এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে সুসজ্জিত করে কবরস্থানে রাখা হয়েছে—তিন দিন পর গোর হবে—এ সময় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মৃতকে শেষবারের মত দেখে নেন এবং আত্মার সদ্গতির জন্য আপন আপন প্রার্থনা জানান।

গেলীর মা ইতিমধ্যে বের্ষটেশগাডেন থেকে এসে গেছেন। পার্টির মুরুব্বীদের একাধিকজন ও হিটলার-ভবনের বন্ধু প্রাচীন দিনের 'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গেলীর মা নির্বাক অশ্রুধারে সিক্ত হচ্ছিলেন।

* * *

'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন তার সারমর্ম এই, হিটলার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে সিঁড়ি দিয়ে আবার দোতলায় উঠেছিলেন—এর বর্ণনা আমরা হফ্‌মান মারফৎ আগেই দিয়েছি—গেলীকে আরেকটু আদর করার জন্য, কারণ তিনি সেদিন ম্যুনিক ফিরেছিলেন এবং সেদিনই আবার ন্যুর্‌ন্‌বের্গ হয়ে হামবুর্গ চলে যাচ্ছিলেন বলে গেলীর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে পারেননি। সেই অনিচ্ছাকৃত অবহেলাটা যেন খানিকটা দূর করার জন্য তিনি উঠে গেলীর গালের উপর হাত দিয়ে আদর করতে করতে কানে কানে সোহাগের কথা কইছিলেন কিন্তু গেলী যেন কোনও সান্ত্বনা মানতে চায়নি, তার রাগও পড়েনি।

দুজনার চলে যাওয়ার পর গেলী ফ্রাউ ভিন্‌টারকে বলে, 'সত্যি বলছি, আমার ও মামার মধ্যে কোনও জায়গায় মিল নেই (নাথিং ইন্ কমন্)।'

ফ্রাউ ভিন্‌টার কিন্তু এ-কথা বললেন না, হফ্‌মানও নীরব, যে সেদিনই হিটলারে গেলীতে তুমুল কথা-কাটাকাটি হয়, এবং সেপ্টেম্বর মাসে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হলে—এবং সেদিন আদৌ হয়নি—অনেকেরই জানলা খোলা থাকে বলে একাধিক প্রতিবেশী সে কলহের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পান। শাইবার প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন (Shirar : The Rise & Fall of the Third Reich ; Aufstieg und Fall des dritten Reiches 1960/61) যে, গেলী ভিয়েনা গিয়ে গলা সাধবার জন্য আবার অনুমতি চাইছিল, এবং হিটলার পূর্বের ন্যায় কণ্ঠে অসম্মতি জানাচ্ছিলেন।

এই ব্যথাটা অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ গেলীর মৃত্যুর পর তার ঘরে ভিয়েনার গুরুর উদ্দেশে তার লেখা একখানা অর্ধসমাপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। যেটাতে সে গুরুকে জানাচ্ছে, সে আবার ভিয়েনায় এসে তাঁর কাছে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে চায়।

ফ্রাউ ভিন্‌টার আরও বললেন যে, মিত্রসহ হিটলার চলে যাওয়ার পর গেলী তাঁকে বলে যে সে এক বন্ধুর (বা বান্ধবীর) সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে, এবং তার জন্য যেন রাত্রের কোনও খাবার তৈরী করা না হয়। সে রাত্রে তিনি তাই গেলীকে আবার দেখতে না পেয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করেননি। গেলী ব্রেকফাস্ট খেত ভোরেই, এবং সে যখন তার অভ্যাসমত

ঐ সময়ে ব্রেকফাস্ট করতে এল না, তখন ফ্রাউ ভিন্‌টার তার ঘরে গিয়ে টোকা দিলেন। কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাবার চেষ্টা দিলেন, কিন্তু চাবি ফুটোতে লাগানো এবং ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে ডাকেন। তিনি দরজা ভেঙে যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্য। গেলী এক ডোবা রক্তে পড়ে শুয়ে আছে, তার পিস্তলটা সোফার এক কোণে। ফ্রাউ ভিনটার তৎক্ষণাৎ গেলীর মাকে খবর দেন, এবং হেস্‌ ও পার্টির কোষাধ্যক্ষ শ্বার্ৎসকে জানান।

অনেকেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হফ্‌মানের আত্মচিন্তা এস্থলে বিশেষ মূল্য ধরে। তিনি বলেছেন, 'হিটলার কি গেলীর আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানতেন? তিনি যে শহর ছাড়ার সময় বলেছিলেন, "কেন জানি নে, আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠছে" সেটা কি ইন্দ্রিয়াতীত কোনও অনুভূতিসঞ্জাত অস্বস্তিবোধ, অথবা কি গেলীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় এমন কিছু একটা ছিল যেটা তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল?'

তার চেয়ে যে জিনিস হফ্‌মানের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল সেটা এই : ফ্রাউ ভিন্‌টার বলেন, হিটলার এবং তিনি চলে যাওয়ার পর গেলী অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে নুয়ে পড়ে। এ তথ্যটা বুঝতে তাঁর কোনও অসুবিধা হল না, কিন্তু তারপর ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন সেটা তাঁর বিচার-বিবেচনাকে দিল একদম ঘুলিয়ে। ফ্রাউ ভিন্‌টার বার বার জোর দিয়ে বললেন, 'গেলী, হিটলার—একমাত্র হিটলারকেই ভালোবাসতো; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, গেলীর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকিটাকি মন্তব্য ফ্রাউ ভিন্‌টারকে দৃঢ়নিশ্চয় করেছিল হিটলারকেই গেলী ভালবাসে। হফ্‌মান বলছেন, 'কিন্তু আমার যতদূর জানা এবং ভালো করেই জানা—গেলী ভালোবাসতো অন্য একজনকে।'

এর সঙ্গে তাহলে আরেকটি তথ্য জুড়তে হয়, হফ্‌মানের ফোটো কর্মশালায় তার কিছুদিন পূর্বে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হন[১], যে এফাকে তিনি মৃত্যুর অল্প পূর্বে বিয়ে করেন, এবং হফ্‌মানের মতে তাঁদের বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয় বেশ কিছুকাল পরে এবং গেলী মামাকে লেখা এফার একখানা চিঠি দৈবযোগে মামার কোটের পকেটে পেয়ে যায়। তাহলে বলতে হবে, ফ্রাউ ভিন্‌টারের রহস্য সমাধান হয়তো সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও সেটা পরের এবং অনেক দিন ধরে চলছিল। গেলীর মা এমনিতেই এফা ব্রাউনকে পছন্দ করতেন না, এবং গেলীর মৃত্যুর পর সে অপছন্দটা পরিপূর্ণ ঘৃণায় গিয়ে পৌঁছল। হফ্‌মান এবং অন্যান্যরা তাঁকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করতেন তিনি ততই অকুণ্ঠ ভাষায় জোর দিয়ে বলতেন, তাঁর মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই সে, তাঁর মেয়ে হিটলারকেই ভালবাসতো এবং ঐ এফা ব্রাউনের অস্তিত্ব ও হিটলারের উপর তার প্রভাব গেলীকে গভীরতর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করে দেয়,

---

১ শাইরার বলেন, হিটলার ও ব্রাউনের পরিচয় হয় গেলীর মৃত্যুর এক বা দুই বৎসর পরে। কিন্তু এ বিষয়ে হফ্‌মানের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাস্য।

এবং এইটেই গেলীর অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধানতম কারণ।

*   *   *

এদেশের জোরালো গোটা দু-তিন দল তাদের বেপরোয়া আপন আপন দৈনিক নেই বলে বহু কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা অনায়াসে চাপা পড়ে। ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে অবস্থাটা ভিন্ন প্রকারের। বিশেষত ভাইমার রিপাবলিক যুগে—এই খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে, হিটলার চ্যানসেলার না হওয়া পর্যন্ত (১৯৩৩) জর্মনিক খবরের কাগজে কাগজে নরক ছিল গুলজার, বিশেষত জর্মনরা যখন ইংরিজী খবরওলাদের 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' 'থীভ্স্ এগ্রীমেন্টে' আদৌ বিশ্বাস করে না। তাই ম্যুনিকের খবরের কাগজগুলোর অস্বাভাবিক মৃত্যু যেন মৌচাকের উপর ঢিলের মত হয়ে এসে পড়ল। আর কাফে কাফে বারেতে বারেতে গুজোবগুঞ্জরণের তো কথাই নেই। এমন কি নাৎসি পার্টির ভিতরও নানা মুনি নানা মত দিতে লাগলেন। যারা সরাসরি দুশমন তাদের একদল বেশ জোর গলায় বললে, 'নাৎসি পার্টি তার প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে অটপসি আদৌ করাতে দেয়নি, কারোনারের সামনে যাকিছু ঘটেছে তার সমস্তটাই আগাগোড়া থাড্ডো কেলাসী থিয়েডারের ফার্স,' এবং এক দল বললে, 'তাই হবে, কারণ এটা আত্মহত্যা নয়, আসলে খুন, এবং খুনী স্বয়ং হিটলার। তিনি হামবুর্গ পানে রওয়ানা হয়েছিলেন সত্য কিন্তু সেটা ছিল ফাঁদ পাতার মত। সন্ধ্যার সময় ফের বাড়ি ফিরে আসেন, এবং গেলীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে এমন অবস্থায় পান যে তখন হিটলারের মত হিংস্র প্রাণীর মাথায় যে খুন চাপবে তাতে আর বিচিত্র কি?' অন্য দলের বক্তব্য, 'না, পরপুরুষ ছিল না, শুধু গেলীর ভিয়েনা যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে কথা-কাটাকাটি এমনই চরমে পৌঁছয় যে হিটলার আত্মকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মাদাবস্থায় গেলীকে খুন করেন।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'না, খুন করেছেন হিমলার। পার্টির মুরুব্বীরা যখন দেখলেন যে হিটলারের খোলাখুলি বেলেল্লাপনার ঠেলায় পার্টির ইজ্জৎ যায়-যায় (যদিও আমি যতদূর জানি জনসমাজে গেলীর সঙ্গে হিটলারের আচরণ ছিল ভদ্র, সংযত, ইংরিজিতে যাকে বলে 'করেক্‌ট্'; অন্যপক্ষের বক্তব্য আমরা যদি মিনিমাম্‌টাও নিই সেটাও যথেষ্ট খারাপ, কারণ এ-কথা তো আর মিথ্যে নয় যে, 'তুমি মেয়েটাকে ভালোবাসো এবং তাকে নিয়ে একই বাড়িতে বাস করো, আর তার মাকে রেখেছ দূরে গাঁয়ের বাড়িতে যখন তুমি তাঁকেও অনায়াসে এখানেই রাখতে পারতে—'), ওদিকে হিটলার ছাড়া যে পার্টি দুদিনেই কাত হয়ে যাবে সেটাও অবিসংবাদিত সত্য, তখন তাঁরা পার্টি বাঁচাবার জন্য হিমলারের উপর গেলীকে সরাবার ভার দিলেন। কর্মটি করেছেন হয় স্বয়ং তিনি বা তাঁর কোনও গুণ্ডাকে দিয়ে (পার্টিতে যে গুণ্ডার অভাব ছিল না সে তথ্যটি সবাই জানতেন, এবং না থাকলে নাৎসি পার্টি যে রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠেলায় একদিনও টিকতে পারতো না সেটা আরও সত্য)। ইত্যাকার নানাপ্রকারের গুজোবে তখন জর্মনি ম-ম করছে, কারণ গেলীর মৃত্যুর পূর্বেই নাৎসি পার্টি এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে রাস্তার উপর কারণে অকারণে যাকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে, এবং কম্যুনিস্টদের কাউকে একা পেলে তাকে পেটাতেও কসুর করে না; প্রতিদিন আবার কানে আসছে, এই বুঝি প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ নাৎসি নেতা হিটলারকে ডেকে পাঠাবেন, হয় আপন মন্ত্রিসভা গড়ে প্রধানমন্ত্রী—চ্যানসেলর হতে,

কিংবা কোয়ালিশন সরকার নির্মাণ করতে।

আমি তখন ম্যুনিকে বাস করলেও জর্মনিতে এবং প্রতিদিন লাঞ্চ-টেবিলে বন্ধুদের আলোচনা, কথা-কাটাকাটি শ্রবণই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের রীডিং রুম ম্যুনিক তথা জর্মনির সব বড় বড় শহরের প্রধান প্রধান খবরের কাগজ রাখতো, তদুপরি আমাদের কেউ না কেউ ম্যুনিক আসা-যাওয়া করছে, আর একজন তো খাস ম্যুনিকবাসী —সে শহরের বিরাট ম্যাপ খুলে হিটলারের বাড়ি, তিনি যে যে কাফেতে যান, সবগুলো পিন্ ডাউন করতে পারতো! কাজেই আমাদের লাঞ্চ-টেবিলে গুজবেরও অনটন ছিল না। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে এতদিন পরে আজ আমি তার অধিকাংশই ভুলে গিয়েছি। তবে ঘটনার প্রায় কুড়ি বৎসর পর থেকে যখন হিটলার সম্বন্ধে নানাপ্রকার পুস্তক বেরুতে আরম্ভ করলো (গেলী আত্মহত্যা করে ১৯৩১-এ; হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে ডেকে পাঠান তার তিন সপ্তাহ পরে এবং আলাপচারী যে নিষ্ফল হয় তার একমাত্র কারণস্বরূপ নাৎসিরা বলেন, হিটলার গেলীর মৃত্যুশোক তখনও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেননি বলে সমস্ত চিন্তাশক্তি একাগ্রচিত্তে ব্যবহার করতে পারেননি—ঘন ঘন আনমনা হচ্ছিলেন; ১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে হিটলার চ্যানসেলর হন, ১৯৩৯-এ তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করেন, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন; ইংরিজিতে প্রচলিত এ্যালন বুলক লিখিত ঐ ভাষায় হিটলারের 'স্ট্যাণ্ডার্ড' জীবনী বেরোয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে, হফ্‌মানের ১৯৫৪/৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, এবং অধুনা ১৯৬১—প্রকাশিত শাইরারের ১১৭৪ পৃষ্ঠার যে বিরাট বই বাজারে নাম করেছে তাতে কোনও মৌলিকতা নেই এবং আমার মনে হয় তিনি হফ্‌মানের বইখানা হয় পড়েননি, নয় একপেশে বলে খারিজ করেছেন। বলা বাহুল্য বুলক, শাইরার এবং শতকরা ৯০ খানা বই রাজনৈতিক তথা যুদ্ধবিদ্ হিটলারকে নিয়ে আলোচনা করে বলে তার মধ্যে প্রেম অল্প স্থানই পায়, এবং তারও অধিকাংশ পান এফা ব্রাউন, গেলী সত্যিই এখনও 'কাব্যের উপেক্ষিতা'!) তখন দেখে বড় আশ্চর্য বোধ হল যে তখনকার দিনে যেসব গুজোব আমরা স্রেফ গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম তার অনেকগুলোই এসব পুস্তকে রীতিমতো সম্মানের আসন পেয়েছে, এবং যেগুলোকে আমরা সত্য বা সত্যের নিকটতম বলে স্বীকার করে নিয়েছিলুম সেগুলোর উল্লেখ পর্যন্ত নেই!

অবশ্য এ-কথা উঠতে পারে যে, হফ্‌মানের মতে হিটলার গেলীর আত্মহত্যার জন্য নিতান্ত পরোক্ষভাবে দায়ী, আদৌ যদি তাকে দায়ী করা হয়, তিনি গেলীকে কড়া শাসনে রাখতেন (হিটলারের সাফাই 'আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা') আবার ওদিকে বলেছেন, 'গেলী ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, সদাই আত্মহত্যার জন্য মুখিয়ে থাকা টাইপের একদম খাঁটি উল্টোটি। তার প্রকৃতি ছিল বেপরোয়া, জীবনের মুখোমুখি হত সে প্রতিদিন নিত্য নূতন সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—এসব ভাবলে তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে সে আপন জীবন আপন হাতে নিতে নিজেকে বাধ্য অনুভব করলো।'

হফ্‌মান কৃত তাঁর সখা হিটলারের জীবনী হয়তো অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন, ভাববেন, রাজনৈতিক এবং গ্যাস-চেম্বারের প্রবর্তন ও সফলীকরণ-কর্তা হিটলারকে তিনি

সমর্থন করতে না পেরে—অবশ্য এটা সবাই স্বীকার করেছেন যে আর্ট ভিন্ন অন্য কোনও বিষয় নিয়ে তিনি অতি দৈবেসৈবে হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং আরও সত্য যে হিটলার, বিশেষ করে গ্যোবলসের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ডাঙরতম সরকারী চাকরি বা পার্টিতে কোনও গণ্যমান্য আসন নিতে নারাজের চেয়ে নারাজ সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন, অতএব রাজনৈতিক হিটলারকে দোষী বা নির্দোষী প্রমাণ করার হাত থেকে তিনি (সানন্দে) অব্যাহিত পেয়েছেন—তিনি 'মানুষ হিটলার'কে অযথা অপবাদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ-নেমকহালালী প্রশংসনীয়, কিন্তু সে কর্ম করতে গিয়ে তিনি কতখানি সত্যবাচন করেছেন সেটা অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করবে।

আমি তাঁকে মোটামুটি বিশ্বাস করেছি, এবং দৈনন্দিন জীবনে হিটলার যেখানে 'ছোট লোক' সেখানে পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টোভেলের—হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর বহুস্থলে অহেতুক বিষোদ্‌গার সত্ত্বেও—অনেক কথা মেনে নিয়েছি।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমার মনে হয়েছিল এবং এখনও মনে হয়, হিটলার জানতেন এবং ভাল করেই জানতেন যে গেলী ভিয়েনার এক আর্টিস্টকে গভীরভাবে ভালোবাসতো (আমার মনে হয় হফ্‌মান যে বলছেন, হিটলার সে খবরটি জানতেন না, এটা তাঁর ভুল এবং গেলীর ভিয়েনা যাবার জন্য উৎসাহ এবং মামাকে পীড়াপীড়ি সেখানে যাবার অনুমতির জন্য)। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে গেলী বরাবরই ম্যুনিকের রাজসিক বাসভবন, অতি সাধারণ মেয়ের জন্য সমাজে সর্বোচ্চ আসন, ম্যুনিকের সর্বজন সম্মানিত মামার 'গরবে গরবিনী' হওয়া, সেই গ্রেট মামার প্রেমনিবেদন তারই পদপ্রান্তে, সে মামা আবার তার কথায় কথায় ওঠ-বস করেন, সর্বোত্তম থিয়েটার অপেরায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসনাধিকার, এক কথায় বলতে গেলে ম্যুনিকের মত সুখৈশ্বর্য, সর্বপ্রকারের বিলাস, চিত্তহারিণী আমোদ-প্রমোদ দিতে সক্ষম—এসব ছেড়ে ভিয়েনাতে তাকে থাকতে হত সাধারণ—অবশ্য অপেক্ষাকৃত বিত্তশালিনী—ছাত্রীর মত। এ দুয়ের আশমান জমীন ফারাক। শুধু সঙ্গীতে পারদর্শিনী হওয়ার জন্য এত বড় সুখসম্মান বিসর্জন? আমার বিশ্বাস হয় না। পুৎসি যখন কটুবাক্য ব্যবহার করে বলেন, 'মেয়েটা পয়লা নম্বরের স্ফূর্তিবাজ ফ্লার্ট, কণ্ঠসঙ্গীত উচ্চতম পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে হলে যে অধ্যবসায় ও ফুর্তিফার্তি বিসর্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় সে-দুটো গেলীর ছিল কোথায়?' তখন আমার মনে হয় গেলীর মন পড়ে থাকতো ভিয়েনায়, যেখানে সে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রেওয়াজ করবে ও সন্ধ্যায় পাবে তার আর্টিস্ট দয়িতের কাছে অনুপ্রেরণা, যদি সেখানে দৈন্যেও বাস করতে হয়, সেটা সে ভাগাভাগি করবে তারই সঙ্গে; তার তুলনায় ম্যুনিকে মামার সঙ্গে বাস করে, মনে মনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থেকে উৎকৃষ্টতম বিলাসভোগ শতগুণে নিকৃষ্ট। ভিয়েনার ছাত্রজীবনের স্বাধীনতা, তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সম্মিলিত আনন্দোল্লাস নিশ্চয়ই ম্যুনিকের বন্দীশালা এবং প্রতি সন্ধ্যায় কাফেতে মামা এবং তার বুড়োহাবড়া ভারিক্কি-ভারিক্কি রাজনৈতিক পার্টি-মেম্বারদের সঙ্গে বসে প্রসন্নতা এমন কি উল্লাসের ভান করার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়, কিন্তু সেইটেই তত্ত্বকথা নয়—তত্ত্বকথা ঐ দয়িতের সঙ্গ-সুখ। সঙ্গীতই যদি বড় কথা হবে তবে ম্যুনিক কি অজ পাড়াগাঁ? ম্যুনিকে ঠিক সে সময়ে হয়তো কোনও 'মেস্ত্রো' 'ওস্তাদের ওস্তাদ' ছিলেন না, কিন্তু গেলী যে ভিয়েনাতে কোনও মেস্ত্রোর কাছে

সঙ্গীতাধ্যয়ন করেছিল এ-কথা তো কেউ বলেনি। না, সঙ্গীত তার শেষ বচসার এবং সবশেষে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার কারণ নয়।

হফ্‌মান বুঝতে পারেননি, কিংবা বলতে ভুলে গেছেন—সেটা পরবর্তী যুগের সহচরগণ বার বার উল্লেখ করেছেন—হিটলার ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু সুপক্কতম রাজনৈতিকদের পেটের কথা টেনে বের করার কৌশলটিতে সুপটু ছিলেন। আর এ তো চিংড়ি ভাগ্‌নি! হয়তো মামা তাঁর প্রেম নিবেদন করার পূর্বেই আবেগ-বিহ্বল তরুণী মামার সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাবার আশায় পূর্বাহ্নেই সব কিছু বলে বসে আছে। কিংবা হয়তো হিটলার যখন লক্ষ্য করলেন, গেলী তাঁর প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছে না তখন সেটা চেপে দিয়ে আঁকশি চালিয়ে বের করলেন গেলীর পেটের কথা—বরঞ্চ বলা উচিত হৃদয়ের ব্যথা। এবং তারই বা কী প্রয়োজন? সেই ১৯৩১ সালেই তাঁর পার্টির অসংখ্য স্পাই ছিল ভিয়েনায়—যে নগরে তিনি নিজে যৌবনের একাংশ রাস্তায় রাস্তায় স্বহস্তে অঙ্কিত পিকচার পোস্টকার্ড ফেরি করেছেন—নইলে ১৯৩৪-এ, এ ঘটনার মাত্র আড়াই বৎসর পরে তিনি তাঁর পার্টির লোকের দ্বারা ভিয়েনা শহরের জনসমাগমে পরিপূর্ণ দফতরে অস্ট্রিয়ান প্রধানমন্ত্রী ডলফুস্‌কে খুন করলেন কি প্রকারে? এবং তার চার বৎসর পরে একটিমাত্র গুলি না চালিয়ে ভিয়েনা দখল করলেন কি কৌশলে? তার তুলনায় একটি সাদামাটা ছাত্রী ভিয়েনাতে কি ভাবে জীবন-যাপন করেছিল সেটা বের করা তো অতি সহজ। ভিয়েনাতে সে-যুগে বিস্তর প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিল।

আমার মনে হয়—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—বুদ্ধিমতী গেলী তার মামার চরিত্রের একটা দিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল তখনই, যেটি বিশ্বমানব আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হল পুরো পনেরোটি বৎসর পরে, এবং তাও সম্ভব হত না, যদি যুদ্ধে হিটলার পরাজিত না হতেন এবং ফলে গ্যাসচেম্বার ইত্যাদি আবিষ্কৃত না হত। সে তত্ত্বটি—হিটলার কী অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর দানব!—এই তত্ত্বটি গেলী আবিষ্কার করে এক বিভীষিকার সম্মুখীন হল। হিটলার যে কোনও মুহূর্তে, কারও সুখদুঃখের কথা মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে তার দয়িতকে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে খুন করাতে পারেন। আজ যদি কেউ বলে, এই ভয় দেখিয়েই ব্ল্যাকমেল করে হিটলার গেলীকে ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত তাঁর ম্যুনিকের বাড়িতে—আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন কিন্তু বস্তুত পরাধীনের চেয়েও পরাধীন ভাবে—আটকে রেখেছিলেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হবে কেন? এবং হয়তো ঐ চার বৎসর ধরে তাকে বাধ্য হয়ে 'রক্ষিতার লীলাখেলা'ও খেলতে হয়েছিল। হফ্‌মান বলেছেন, গেলীর চরিত্রবল ছিল দৃঢ় এবং সে ছিল 'স্পিরিটেড গার্ল'। ম্যুনিক থেকে অস্ট্রিয়ার পথ কতখানি? আর বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি থেকে তো অস্ট্রিয়ান সীমান্ত আরও কাছে। পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া যায়। বস্তুত হিটলার সেই কারণেই বেছে বেছে ঐ জায়গাটিতেই বাড়ি কিনেছিলেন। এপারে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বাতাবরণ বড় বেশী উষ্ণ হয়ে পড়লে, কাউকে না জানিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে দিয়ে অক্লেশে ওপারে যেতে পারবেন বলে—অঞ্চলটাও অস্বাভাবিক নির্জন এবং ঐ যুগে পাসপোর্টের কড়াকড়ি তো ছিল না, এসব জায়গায় যারা নিত্য নিত্য ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এপার-ওপার করতো তাদের তো পাসপোর্ট আদৌ থাকতো না।

এমন অবস্থায়ও 'স্পিরিটেড' গেলী গ্রামে থাকাকালীন ওপারে চলে গিয়ে ভিয়েনা যেতে পারলো না?—সেখান থেকে ভিয়েনাও তো রেলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। না, তা নয়। অমতে যাওয়ার মানেই হত, দয়িতের অবশ্য মৃত্যু। এবং পরে সে নিজেও হয়তো কিড্‌ন্যাপ্‌ট্‌ হতে পারতো। তাই সে আপন কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিল, হফ্‌মানের স্ত্রীকে : 'Well that's that! And there's nothing you or I can do about it, So let's talk about something else.' এ কথোপকথনের উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি।

হয়তো আমার নিছক কল্পনা। কিন্তু আমার মনে হয় গেলী দিনের পর দিন অভিনয় করে গেছে (যেটা হফ্‌মান ঠিক ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু পুৎসি বুঝতে না পেরে 'ঢলাঢলি' বলেছেন), যদি শেষ পর্যন্ত মামার মন গলানো যায়। যখন দেখল কোনও ভরসাই নেই তখন করেছিল শ্মশান-চিকিৎসা—পুরোপুরি ঝগড়া, যেটা একাধিক প্রতিবেশী শুনতে পেয়েছিল, এবং হয়তো বা—হয়তো বা আত্মহত্যার ভয়ও দেখিয়েছিল এবং হয়তো তার চোখে-মুখে তখন এমন ভাব ফুটে উঠেছিল যে চতুর—শঠ—হিটলার বুঝেছিলেন, এ ভয় দেখানোটা নিতান্ত শূন্যগর্ভ নয়, এটা আর পাঁচটা হিস্টেরিক (এবং হফ্‌মান বলেছেন, গেলী আদপেই হিস্টেরিক ছিল না) মেয়ের মত নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ নয়। তাই বোধ হয় ম্যুনিক শহর থেকে বেরোবার সময় সখাকে বলেছিলেন, "কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে, 'I don't know why, but I have a most uneasy feeling' তাই তাঁর পরবর্তী বিষণ্ণতা। পথিমধ্যে টেলিফোনের কথা শুনেই যেন বুঝতে পেরেছিলেন, এ টেলিফোনে থাকবে গেলী সম্বন্ধে দুঃসংবাদ।

এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে গেলী যে ভয় দেখিয়েছিল সেটা শূন্যগর্ভ, ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। সে সেটা কাজে পরিণত করেছিল প্রথমতম সুযোগেই।

গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক

হিটলারের চরিত্রবল ছিল অসাধারণ এবং তাঁর ভেঙে পড়াটাও ছিল অসাধারণ। তবে যে দুটো ভেঙে পড়ার কারণ ইতিহাসের জানা আছে, তার শেষটা আত্মহত্যা করার কয়েক দিন আগের থেকে—তাঁর খাসচাকর (ভ্যালে) লিঙে সেটির কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন, এবং আর একটা, গেলীর মৃত্যুর পর। দুটো একই প্রকারের।

প্রথম দুদিনের খবর কেউ ভালো করে লেখেননি, তবে তখনকার দিনের অন্যতম প্রধান নাৎসি নেতা গ্রেগর স্ট্রাসার পরে বলেন যে, এ দুদিন তিনি এক মুহূর্ত হিটলারের সঙ্গ ত্যাগ করেননি, পাশে তিনিও আত্মহত্যা করেন।[১]

১ বোধহয় তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্ট্রাসারকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন 'জোলাপে'র (এটার উল্লেখ আমরা একাধিকবার করেছি) সময় মেরে ফেলা হয়।

এরপর তাঁর সঙ্গে ছিলেন, একমাত্র সাক্ষীরূপে, আমাদের পূর্বপরিচিত হফ্‌মান। এবার তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এটা সত্যই ওয়ান ম্যান্‌স্ স্টোরি। তিনি বলছেন, ম্যুনিকে ফেরার পর দুদিন পর্যন্ত হিটলারকে আমি আদৌ দেখতে পাইনি। তাঁর স্বভাব আমি ভালো করেই জানতুম এবং বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম যে, তিনি হয়তো নির্জনে একা একা থাকাটাই বেশী পছন্দ করবেন—আমিও তাই তাঁর পাশ ঘেঁষিনি। তারপর হঠাৎ মাঝরাতে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলো। নিদ্রাজড়িত অবস্থায় আমি গেলুম উত্তর দিতে।

হিটলারের গলা। 'হফ্‌মান, এখনও জেগে আছ কি? কয়েক মিনিটের তরে আমার এখানে আসতে পারো কি?' হিটলারেরই গলা বটে কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত অচেনা। সে কণ্ঠস্বর ক্লান্ত আর সর্ব অনুভূতি গ্রহণে জড়ত্বে চরমে গিয়ে পৌঁচেছে। পনেরো মিনিট পরেই আমি তাঁর কাছে পৌঁছলুম।

দরজা তিনি নিজেই খুলে দিলেন। অভ্যর্থনাসূচক কোনও কথা না বলে নীরবে তিনি আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন—তাঁকে দেখাচ্ছে বিরস, যেন সর্ব আত্মজন-বিবর্জিত। বললেন, 'হফ্‌মান, আমাকে তুমি সত্যিকার একটি মেহেরবানি করবে কি? আমি এ বাড়িতে আর টিকতে পাচ্ছি নে, যেখানে আমার গেলী মরে গেছে, ম্যুলার টেগার্নজে হ্রদের উপর তার সেন্ট কুইরীনের বাড়ি আমাকে থাকতে দিতে চেয়েছে; তুমি আমার সঙ্গে আসবে? গেলীর কবর না হওয়া পর্যন্ত সে কটা দিন আমি সেখানেই থাকতে চাই। ম্যুলার কথা দিয়েছে, সে ও-বাড়ির চাকর-বাকর সব কটাকে ছুটি দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র তুমিই সেখানে থাকবে আমার সঙ্গে। আমাকে এ অনুগ্রহটা তুমি করবে কি?' তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সনির্বন্ধ মিনতির অনুনয়; বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালুম।

সেন্ট কুইরীন বাড়ির প্রধান ভৃত্য বাড়ির চাবিটা আমার হাতে তুলে দিল। বিস্ময় এবং সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে শোকাঘাতে ভেঙে-পড়া হিটলারের দিকে একবার তাকিয়ে সে চলে গেল। সোফার শ্রেক্ আমাদের সে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর তাকেও ফেরত পাঠানো হল। চলে যাওয়ার আগে সে কোনও গতিকে সুযোগ করে আমাকে কানে কানে বলে গেল, সে হিটলারের রিভলবার সরিয়ে নিয়েছে, কারণ তার ভয় পাশে নৈরশ্যের চরমে পৌঁছে তাঁর আত্মহত্যা করার প্রলোভন হয়। এবারে রইলুম সুদ্ধ মাত্র আমরা দুজন—আর একটিমাত্র জনপ্রাণী নেই। হিটলার উপরের ঘরে আর আমি ঠিক তার নীচের ঘরটায়।

সে-বাড়িতে হিটলার আর আমি—মাত্র এই দুজন। আমি তাঁকে তাঁর ঘর দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই তিনি দু হাত পিছনে নিয়ে এক হাতে আরেক হাত ধরে পাইচারি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাঁর খেতে ইচ্ছে করছে কিনা। একটিমাত্র শব্দ না বলে তিনি শুধু মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালেন। আমি তবু এক গেলাস দুধ আর কিছু বিস্কুট উপরে নিয়ে তাঁর ঘরে রেখে এলুম।

আমি আপন কামরার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলুম উপরের পাইচারির তালে তালে ওঠা ভারী শব্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো সেই পাইচারি,—একবারও ক্ষান্ত দিল না, একবারও জিরুলো না। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল—আমি তখনও শুনছি তাঁর একটানা পাইচারি, ঘরের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত, ফের ঐ প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত। সেই

একটানা শব্দের মোহে আমি অল্প কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ কি যেন আমাকে আচমকা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিল। পাইচারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর যেন মৃত্যুর নীরবতা চতুর্দিকে বিরাজ করছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তবে কি করছেন হিটলার এখন...? অতি সন্তর্পণে এবং মৃদু পদক্ষেপে আমি যেন লুকিয়ে উপরের তলায় গেলুম। ওঠবার সময় কাঠের সিঁড়ি অল্প অল্প ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করলো। আমি দরজায় পৌঁছতেই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আবার পাইচারিটা আরম্ভ হল। বুকের বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল; আমি চুপিসাড়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

এবং এইভাবে চললো সমস্ত দীর্ঘরাত ধরে সেই পাইচারি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্তহীন দীর্ঘ ঘণ্টা। আমার মন চলে গেল আমাদের বিগত একাধিকবার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ টেগের্নজে হ্রদের কোলে লালিত বাড়িতে আসার স্মরণে। তখন সব কিছু কতই না সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

গেলীর মৃত্যু আমার বন্ধুর গভীরতম সত্তাকে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে তুলেছে। তবে কি তিনি নিজেকে তার জন্য দায়ী অনুভব করছিলেন? তিনি কি অনুতপ্ত আত্ম-অভিযোগ দিয়ে আপন সত্তাকে কঠোরতম যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন? তিনি এখন করবেনই বা কি? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আমার আমার মাথার ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ি পেটাচ্ছিল, আর আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না একটারও উত্তর।

ঊষার প্রথম আবির্ভাব অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করে তুলছিল, এবং আমি আমার জীবনে ঊষাগমনের জন্য হৃদয়ের ভিতর কখনও এতখানি কৃতজ্ঞ অনুভব করিনি। আমি আবার উপরে গিয়ে তাঁর দরজায় মৃদু করাঘাত করলুম। কোনও উত্তর এল না। আমি ভিতরে গেলুম কিন্তু হিটলার আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে আমাকে লক্ষ্যমাত্র করলেন না। দেহের পিছনে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ধরে, সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কোনও জিনিস না দেখে, তিনি তাঁর অন্তহীন পাইচারি চালিয়ে যেতে লাগলেন। যন্ত্রণায় তাঁর মুখের রঙ পাঁশুটে, ক্লান্তিতে সেটা ঝুলে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চেহারাটাকে করে দিয়েছে বিসদৃশ, চোখ দুটো ডুবে গিয়েছে কোটরের গভীরে, সেগুলোর নিচের অংশ কালো ছায়ায় কৃষ্ণমসীলিপ্ত আর ঠোঁট দুটো একটা আরেকটা চেপে ধরে এঁকেছে যেন তিক্ত অভিশপ্ত একটি রেখা। দুধ আর বিস্কুট স্পর্শ করা হয়নি।

চেষ্টা করেও সামান্য একটা কিছু খাবেন না তিনি, প্লীজ? আমি শুধালুম। আবার কোনও উত্তর এল না, শুধু সামান্য একটু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, অন্তত অল্প কিছু একটা ওঁকে খেতেই হবে, নইলে তিনি যে হুমড়ি খেয়ে ভিরমি যাবেন। আমি ম্যুনিকে আমার বাড়িতে ফোন করে শুধালুম, স্পাগেত্তি[১] কি করে রাঁধতে হয়? হিটলারের অন্যতম প্রিয় খাদ্য এটি। সেখান থেকে পাকপ্রণালীর যে দিকনির্দেশ পেলুম বর্ণে বর্ণে সেই অনুযায়ী আমি রন্ধনকলায় আমার নৈপুণ্য আছে কিনা সেই পরীক্ষাতে প্রবেশ করলুম। আমার নিজের মতে ফলটা ভালোই ওৎরালো। কিন্তু আবার

---

১ ইতালিয়দের স্টেপলফুড্—আমাদের ভাতের মত নিত্য খাদ্য। মাক্কারনী, স্পাগেত্তি, ভেরমিচেল্লি ইত্যাদি। সবই ময়দার তৈরী, অনেকটা মুসলমানদের সেঁওইয়ের মত। রান্না করা হয় নানা পদ্ধতিতে, তার শত শত রেসিপি (পাকপ্রণালী) আছে।

আমার ভাগ্য বাম। যদিও এই ধরনের স্পাগেত্তি তাঁর প্রিয় খাদ্য, যদিও আমি আমার রন্ধন-নৈপুণ্য প্রশংসা-প্রশংসায় সপ্তম স্বর্গ অবধি তুলে দিয়ে তাঁকে অনুনয়-বিনয় করলুম, চেষ্টা দিয়েও অতি অল্প একটুখানি মুখে দিতে—আমার মনে হল আমি যা কিছু বলেছি, সে তাঁর দুপাশ দিয়ে চলে গেছে, তিনি তার এক বর্ণ শোনেননি।

ধীরে মন্থরে দিনটা তার সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল, তারপর এল আরেকটা রাত্রি, সেটা আগেরটার চেয়েও বিভীষিকাময়। আমি আমার সহ্যশক্তি, আত্মকর্তৃত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছি। জেগে থাকা আমার পক্ষে এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে; ওদিকে উপরে সেই পাইচারি চলেছে তো চলেছে অবিরাম, আর তার শব্দ যেন কেউ তুরপুন দিয়ে আমার খুলি ফুটো করে ভিতরে ঢোকাচ্ছে। যেন এক ভয়াবহ উত্তেজনা তাঁকে তাঁর পায়ের ওপর রেখে চলেছে এবং কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না।

তারপর এল আরেকটা দিন। আমি নিজেই তখন যে কোনও মুহূর্তে আপন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় জড়নিদ্রায় অভিভূত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে পারি। আমার নড়াচড়া আমার কাজকর্ম করা সব কিছু যন্ত্রচালিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত অন্ধশক্তির প্রকাশ মাত্র। কিন্তু মাথার উপর পদধ্বনি কক্‌খনো থামেনি।

সন্ধ্যা ঘনানোর পর আমরা শুনলুম, গেলীর গোর হয়ে গিয়েছে, এবং হিটলারের সে-গোরের দিকে তীর্থযাত্রারম্ভ করতে কোনও অন্তরায় নেই। সেই রাত্রেই আমরা রওয়ানা দিলুম। নিঃশব্দে হিটলার ড্রাইভার শ্রেকের পাশে বসলেন। আমার উপরে যে অসহ্য চাপ আমাকে ধরে রেখেছিল সেটা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল আর আমি গাড়ির ভিতর সেই অবসাদজনিত অঘোর নিদ্রায় ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা-দুই ঘুমিয়ে নিলুম। ভোরের দিকে আমরা ভিয়েনা পৌঁছলুম, কিন্তু এই সমস্ত দীর্ঘ চলার পথে হিটলার একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেননি।

আমরা সোজা নগরের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কেন্দ্রীয় গোরস্থানে পৌঁছলুম। এখানে এসে হিটলার একা গোরের দিকে গেলেন। সেখানে পেলেন তাঁর নিজস্ব দুই এডিকং শ্বার্ৎস এবং শাউব—তারা সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আধঘণ্টার ভিতরই তিনি ফিরে এলেন এবং গাড়ি ওবের-জাল্‌ৎস্‌বের্গে চালিয়ে নিতে হুকুম দিলেন।

গাড়িতে উঠতে না উঠতেই তিনি কথা আরম্ভ করলেন। উইন্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেন আত্মচিন্তা করছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে বলে। 'আচ্ছা! তাই সই!' বললেন তিনি। 'আরম্ভ হোক তবে এখন সংগ্রাম—যে সংগ্রাম শিরোপরি কৃতকার্যতার বিজয়মুকুট পরবেই পরবে, পরতে বাধ্য।' আমরা সকলেই বিধির এক বিরাট আশীর্বাদপ্রাপ্ত স্বস্তি অনুভব করলুম।...

এরপর হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বক্তৃতাসফরে। আজ এখানে কাল সেখানে, এমন কি একই দিনে দু'তিন ভিন্ন ভিন্ন নগরে বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন। সেগুলো আগের চেয়ে যেন শ্রোতাদের করে দেয় অনেক বেশী আত্মহারা, যেন তাদের চিন্তাধারাকে তিনি হুকুম দিয়ে বাধ্য করছেন তারা যাবে কোন্ পথে। এবং শ্রোতাকেও বক্তৃতা দিয়ে আপন মতে টেনে আনার শক্তি যেন তাঁর বেড়ে গেছে শতগুণে। হফ্‌মান বলছেন, এই শহর থেকে শহর ছুটোছুটি, প্রথম জর্মনির সব চেয়ে শক্তিশালী মোটর মেৎসেডেজে করে, পরে আপন অ্যারোপ্লেনে (অনেকেই বলেন রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার জন্য ইওরো-

আমেরিকায় হিটলারই সর্বপ্রথম নিজস্ব হাওয়াই জাহাজ ব্যবহার করেন—এই ব্লিৎস্ প্রোপাগান্ডা যেন পরবর্তী যুগের ব্লিৎস্‌ক্রীগের পূর্বাভাস!); সেখানে বিরাট বিরাট জনসভা, শ্রোতাদের চিৎকার করতালি, মিটিঙ শেষে উন্মত্ত জনতার প্ল্যাটফর্ম আক্রমণ—ফ্যুরারকে কাছের থেকে দেখবার জন্য—এসব হট্টগোল ধুন্ধুমারের ভেতর হিটলার যেন গেলীর শোক নিমজ্জিত করে দিতে চাইছিলেন।

এর তিন সপ্তাহ পরে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ আলাপ-আলোচনার জন্য হিটলারকে ডেকে পাঠান, সে কথা পূর্বেই বলেছি। যাঁরা বলেন, সে আলোচনার নিষ্ফল হওয়ার কারণ গেলীর শোকে হিটলার এমনই মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর দাবী তিনি যথোপযুক্ত ভাষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেননি, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি বরঞ্চ হফ্‌মান যা বলেছেন তার সঙ্গে একমত। আমার মনে হয়, তখনও হিন্ডেনবুর্গ তাঁর চিরপরিচিত প্রাচীনপন্থী আপন চক্রের ভিতরকার নেতাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হননি। তখনও হিটলারের 'সময় হয়নি।'

* * *

গেলীর জীবন, তার মৃত্যু, তার স্মৃতি সব কিছু ধর্মে উদাসীন হিটলারকে যেন এক নূতন অনুষ্ঠানবেষ্টিত সংস্কার-বিশ্বাসী করে তুললো। তিনি স্বহস্তে গেলীর কামরা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে হুকুম দিলেন, একমাত্র গৃহরক্ষিণী ফ্রাউ ভিন্টারেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। বহু বৎসর ধরে তিনি প্রতিদিন গেলীর প্রিয় ফুল তাজা ক্রিসেনথিমাম সে ঘরে রাখতেন। বের্ষটেশগাডেনের বাড়িতে এবং পরবর্তী যুগে ফ্যুরার যখন দেশের সর্বাধিকারী (তিনি প্রথমে চ্যানসেলর বা প্রাইম মিনিস্টার রূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং বছর দেড়েক পর প্রেসিডেন্ট গত হলে তিনি সে পদ পূর্ণ না করে নিজেই গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ডিকটেটর—নিরঙ্কুশ নেতা—ফ্যুরার হন) তখন রাজভবনে গেলীর ছবি বিরাজ করতো সর্বত্র। বৎসরে দুই দিন—তার জন্মদিন আর মৃত্যুদিন রুচিসম্মত আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হত। সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রকর ও ভাস্করদের দেওয়া হল গেলীর নানা অবস্থায় তোলা নানাবিধ ফটোগ্রাফ। সেগুলোর উপর নির্ভর করে উত্তম উত্তম ওয়েলপেন্টিং ও মূর্তি নির্মিত হল। জর্মনির অন্যতম উৎকৃষ্ট শিল্পী তখনকার দিনের সর্বোৎকৃষ্টদের একজন—গেলীর একটি অনবদ্য ব্রোনজ্ মূর্তি নির্মাণ করেন। এদের একটা না একটা হিটলারের প্রতি বাসভবনে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে রাখা হত।

এর প্রায় তেরো বৎসর পর এই আর্টিস্টদের অন্যতম ৎসিক্লার যখন যুদ্ধে পরাজয় মনোবৃত্তি প্রকাশের ফলে নাৎসি গেস্তাপো পুলিসের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তির আশা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন তখন তিনি যে একদা গেলীর ছবি এঁকেছিলেন (যদিও কারও কারও মতে তিনি আর্টিস্ট হিসাবে ছিলেন অতিশয় মামুলী) সে কথা হিটলারকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তাঁকে তদ্দণ্ডেই মুক্তি দেন।

হফ্‌মানের বিশ্বাস, গেলীর সঙ্গে হিটলারের যদি পরিণয় হত তবে হিটলারের জীবন এরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি পেত না। তাঁর মতে শতধাবিভক্ত জর্মনিকে একাঙ্গ করে তাকে নবজীবনরস দিয়ে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু জর্মনির বাইরে যে সব বিবেচনাহীন অভিযানে বেরুলেন সেখানে পারিবারিক শান্তি এবং তৃপ্তি—হিটলার যেটাকে অসীম মূল্য দিতেন—তথা গেলীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিটলারের উপর তার অসীম প্রভাব

তাঁকে সংযত করে নিরস্ত করতো—তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস বীভৎসতাময় পরিবেশে ত্যাগ না করে শান্তিতেই ফেলতে পারতেন।

হফ্‌মান বলেন, তারপর যখনই গেলীর কথা উঠেছে, হিটলারের চোখ জলে ভরে যেত। এবং একাধিক পরিচিতজনকে হিটলার স্বয়ং বলেছেন, জীবনে ঐ মাত্র একবারই তিনি ভালোবেসেছিলেন।

*　　　　*　　　　*

গেলীর মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পর, হিটলার আত্মহত্যা করার প্রায় দেড়দিন পূর্বে, এফা ব্রাউনকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল পৃথিবীবাসীর এখনও যায়নি। কিন্তু তার বর্ণনা এর সঙ্গে যায় না।

আমি হিসেব করে দেখেছি, হিটলারের জীবনে তিনটি দুর্দৈব দেখা দেয়। প্রথম দুটিতে তিনি প্রায় ভেঙে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতেন—পাঠক আদৌ ভাববেন না, গ্যাস-চেম্বার নির্মাতার জন্য কোনও দিকে কোনও প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকে না, (তাহলে কসাইয়ের ছেলে মরলে সে কাঁদতো না) এবং এঁরা অসাধারণ জীব বলে যে সব স্থলে তাঁদের স্পর্শকাতরতা হয় অসাধারণ সূক্ষ্ম, তাঁদের বেদনানুভূতি প্রায় অনৈসর্গিক তীব্র—তৃতীয়বারের ঘটনা সকলেই জানেন। সেবারে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। আত্মহত্যা ছাড়া তখন তাঁর আর অন্য কোনও গতি ছিল না। প্রথম দুর্দৈব তাঁর মাতার মৃত্যু। হিটলার তখন বালক, কিন্তু সেই বালকই তার মাকে যা সেবা করেছে সেটা অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য—শুধু বলা যেতে পারে, স্বর্গজাত ভক্তি-প্রেমরস যেন ঐ মাত্র একবার পৃথিবীতে হিটলার-জননীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর বাল্যবন্ধু তখনকার দিনের হিটলার ও মাতার মৃত্যুর পর তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এরকম বর্ণনা আমি আর কোথাও পড়িনি। সেবারে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতার শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসে বসে কাটিয়েছিলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সেবা করেছেন সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে।

দ্বিতীয় দুর্দৈব—গেলীর আত্মহত্যা।

তৃতীয়বারে—এবং শেষবারের মত—তিনি সুযোগ পেলেন সেই পাইচারি করার।

তাঁর খাস চাকর লিঙে তার বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু লিঙে দেখেছিলেন কাছের থেকে বলে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা দিতে পেরেছেন, আর হফ্‌মান নিচের তলা থেকে শুনতে পেয়েছিলেন শুধু।

কিন্তু হায়, তাঁর শেষ পদচারণার পূর্বেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তাঁর শরীরের সম্পূর্ণ বাঁ দিকটা সমস্তক্ষণ কাঁপে (পার্কিনসন ব্যাধি কিংবা সেন্ট ভাইরাসের নৃত্য রোগ), বাঁ হাতটা এত বেশী স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে ঘন ঘন ওঠে নামে যে পাইচারি না করার সময়ও সেটাকে প্রায়ই তিনি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে শান্ত করার চেষ্টা দিতেন। বাঁ পা-টাকে ঘষ্টে ঘষ্টে টেনে টেনে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়, আর দু চোখের উপর কখনও বা ফিল্‌মের মত বাষ্পাভাস, আর কখনও বা অস্বাভাবিক তীব্র, উজ্জ্বল জ্যোতির মত।

এই বেদনাদায়ক অবস্থায় যখন সাধারণ জন শুয়ে বসেও শান্তি পায় না, তখন হিটলার দু হাত পিছনে নিয়ে সজোরে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে বাঁ পা টেনে টেনে—যেন কোনও জড়পদার্থ তিনি আপন দেহ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন—আরম্ভ করলেন সেই প্রাচীন দিনের পাইচারি। মাঝে মাঝে দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে তার ওপর

মুষ্ট্যাঘাত করেন—কারাবাসী-জন যে রকম করে থাকে; তবে কি তিনি শহরের চতুর্দিকে শত্রুসৈন্য বেষ্টিত হয়ে কারাবন্দীর অনুভূতিই অনুভব করেছিলেন?—কিন্তু হায়, এখন তিনি শক্তিহীন জরাজীর্ণ। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন পদচারণা করার দৈহিক শক্তি তাঁর আর নেই। তাই মাঝে মাঝে বসেন চেয়ারের উপর—আর শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন দেয়ালের দিকে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু এখন আর কি প্রয়োজন পদচারণের?

সেদিন গেলীর মৃত্যুর পর উত্তেজিত হয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি করে সে উত্তেজনা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলে। এবারে সে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার! শত্রুর হাতে অসীম যন্ত্রণা, অশেষ অপমানের পর হয়তো ফাঁসি। এবারে তোমার আত্মহত্যার পালা।

তবু পদচারণ করো, হিটলার!

একদা গেলী চলে যাওয়ার পর করেছিলে অস্থির পদক্ষেপ, এবার গেলীর সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রাক্কালে অবশ দেহ টেনে টেনে!

লক্ষ মার্কের বরমান

সম্প্রতি জর্মন সরকার ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে যার সাহায্যে মার্টিন বরমান নামক লোকটাকে গ্রেপ্তার করা যায় তবে তাঁকে এক লক্ষ জর্মন মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাই নিয়ে একখানি মাসিক পত্রিকা ফলাও করে উক্ত হ্যার বরমান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। পত্রিকাখানি চৌদ্দটি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং শতাধিক দেশে পড়া হয় বলে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দম্ভ করে থাকেন। প্রবন্ধ-লেখক তাই বলেছেন, হয়তো বা আপনিই রবমানকে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, কারণ হিটলারের মৃত্যুর পর বরমান কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছেন কেউ জানে না। সর্বশেষে প্রবন্ধ-লেখক বরমানের একটি বর্ণনা দিয়েছেন যাতে করে আপনি তাঁকে অল্পায়াসে বা অনায়াসে চিনে নিতে পারেন।

আমরা বরমান সম্বন্ধে যেটুকু জানি, তাতে মনে গভীর সন্দেহ হয়, লেখক বরমানের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী চললে তাঁকে আদৌ চিনতে পারবেন কিনা,—বরঞ্চ হয়তো তাঁকে পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে বেশী।

ইতিমধ্যে আরেকটা কথা বলে রাখি, উক্ত পত্রিকার ভারতীয় সংস্করণ বলেছেন, এক লক্ষ জর্মন মার্ক যে আপনি পাবেন তার ভারতীয় মূল্য এক লক্ষ টাকা। আমরা যতটুকু জানি, তার মূল্য অন্তত এক লক্ষ দশ হাজার টাকা—সাদা বাজারেই। এই হল প্রবন্ধটির বিসমিল্লাতে গলদ। এর পর অন্য সব গলদে আসছি। তার পূর্বে বরমানটির পরিচয় কিঞ্চিৎ দিই।

হিটলারের জীবনের শেষের দু বৎসর বরমান ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। তার পূর্বেই তিনি নাৎসি সেক্রেটারি হয়ে গিয়েছিলেন। নাৎসি পার্টিই যে জর্মনি চালাতো

সে-কথা সবাই জানেন—অন্য কোনও পার্টির অস্তিত্ব পর্যন্ত বেআইনী বলে গণ্য হত—এবং হিটলার ছিলেন তার সর্বময় কর্তা। এবং তার পরেই বরমান।

আইনত হিটলার হঠাৎ মারা গেলে কিংবা কোনও কারণে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাঁর জায়গায় বসার কথা ছিল গ্যোরিঙের। ওদিকে নাৎসি পার্টির সশস্ত্র বাহিনীর (এস্ এস্) বড়কর্তা ছিলেন হিমলার। তিনি আবার ছিলেন দেশের সামরিক বেসামরিক সর্ব রিজার্ভ ফোর্সের অধিপতি এবং সর্ব কনসানট্রেশন ক্যাম্প ছিল সম্পূর্ণ তাঁরই জিম্মায়। শেষের দিকে গ্যোরিঙ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং দেশের আপামর জনসাধারণ জানতো, হিটলারের হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে হিমলারই দেশের ফ্যুরার—লীডার—বা নেতা হবেন। আইষমান যা কিছু করেছেন সেসব হিমলারের হুকুমেই।

তা ছাড়া ছিলেন গ্যোবেলস। যদিও তিনি প্রোপাগান্ডা মিনিস্টার কিন্তু তিনি হিটলারের বিশেষ প্রিয় আমীর ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ও হিমলার যদি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন তবে বরমানও সেটা ঠেকাতে পারতেন না। বিশেষ করে গ্যোবেলস্‌কে। বরমান সেটি জানতেন, এবং হিমলারকে যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কোণঠাসা করে এনেছিলেন তবু গ্যোবেলস্‌কে ঠেকাতে পারবেন না জেনে তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি (ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট—মুডস ভিভেন্ডি) করে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, হিটলারের জীবনে শেষের বছরখানেক বরমান ছিলেন সর্বেসর্বা। হিটলারের তাবৎ হুকুম তাঁর মারফতে বেরুতো। তাঁর ইচ্ছেমত তিনিও হিটলারকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খ্রীষ্টধর্মের এমনই কট্টর শত্রু ছিলেন যে তাঁরা খ্রীষ্টানদের দমাবার জন্যে যে-সব ব্যবস্থা করতে চাইতেন তার দু-একটা হিটলারের মত ধর্মদ্রোহীর মনেও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল।[১]

এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই, গ্যোরিঙের পতনের জন্য বরমানই দায়ী। এমন কি হিটলারের বিনানুমতিতে তিনি হুকুম পাঠান যেন গ্যোরিঙকে গুলি করে মারা হয়। কিন্তু নাৎসি রাজ্য পতনের দিন আসন্ন দেখে যে-কাপ্তানের উপর যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি সেটা অমান্য করেন।

হিটলারের মাত্র একটি খাস দোস্ত ছিলেন। চক্রান্ত করে বরমান তাঁকেও প্রায় ছমাস ধরে হিটলারের কাছ থেকে দূরে রাখেন। হিটলারকে বলেন, তিনি সংক্রামক টাইফুসে ভুগছেন। হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কোনও গতিকে হিটলারের সাক্ষাৎ পান—শেষবারের মত। চক্রান্ত ধরা পড়ে। হিটলার কিন্তু বরমানকে কিছুই বললেন না। বরঞ্চ দোস্ত হফ্‌মানকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন দয়া করে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন।[২]

---

১ "অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস" বলতে হবে, নাৎসি সাম্রাজ্য পতনের প্রায় এক বৎসর লুকিয়ে থাকার পর বরমানের স্ত্রী এক ক্যাথলিক পাদ্রির সাহায্য নেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে আপন ডজনখানেক ছেলেমেয়েকে তাঁরই হাতে সঁপে দেন। এবং "নির্মমতম পরিহাস"—তাঁর বড় ছেলে ক্যাথলিক পাদ্রী হয়েছে।

২ এই দোস্ত হফ্‌মানকেই হিটলার পাঠিয়েছিলেন মস্কোতে, রিবেনট্রপের সঙ্গে, নাৎসি-কম্যুনিস্ট চুক্তি সই করার সময়—স্তালিন কি রকম লোক সে তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

এই যে এত শক্তিশালী বরমানকে লোকে খুঁজে পাচ্ছে না, কেন? আইষমান তাঁর অনেক নিচের নিচে কর্মচারী ছিলেন। তাঁকেও ইহুদীরা ধরতে পেরেছে। এঁকে পারছে না কেন?

যে বিখ্যাত মাসিকপত্রের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে এ প্রশ্নটির উল্লেখ নেই। যদিও হিটলার-বরমান নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেন তাঁদের সবাই এর উত্তর জানেন।

তার একমাত্র কারণ বরমান পাবলিসিটি বা খ্যাতি চাইতেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শক্তি, ক্ষমতা—মানুষের জীবনমরণের উপর অধিকার আয়ত্ত করা।

হেস্, গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস, হিমলার, রিবেনট্রপ, এমন কি হিটলারের আমীর-ওমরাহ চুনোপুঁটিরাও কাগজে-কাগজে যখন আপন আপন ফোটোগ্রাফ ছাপাচ্ছেন, যততত্র ভাষণ দিচ্ছেন, বেতারে তরো-বেতরো বক্তৃতা ঝাড়ছেন, মোকা-বেমোকায় কেতাব ছাপাচ্ছেন, পরব্-পার্টি ডে-তে চোখ-ঝলসানো য়ুনিফর্ম পরছেন, তখন বরমান হিটলারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে—তাও বাড়ির বাইরে জনসমাজে না—কলকাঠি নাড়ছেন, দিনের পর দিন আপন শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় জেনারেল সিভিলিয়ানরা যখন ডাঙর ডাঙর মেডেলের জন্য হিটলারের সামনে হুটোপুটি করছেন তখন বরমান তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন—'এ কী পাগলামি!'[১]

তাই জর্মন-অজর্মন সাধারণজন তাঁকে চিনতো না। তখনকার দিনে এবং আজও তাঁর ফোটোগ্রাফ দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং আছে।

হিটলার যখন তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে অর্থাৎ স্তালিনগ্রাদের পরাজয় তখনও তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়নি, সে সময় খানাপিনার পর হিটলার ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে গালগল্প করতেন। অবশ্য হিটলারই কথা বলতেন বেশী। বরমান তখন ব্যবস্থা করেন যে দুজন শর্টহ্যান্ড এককোণে বসে সেগুলো যেন লিখে নেন। পরে বরমান সেগুলো কেটেছেঁটে ধোপদুরস্ত করে দিতেন। এগুলো হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর 'টেব্ল্-টক' (table talk)

হিটলারের মৃত্যুর পর ইনি "হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' নামক একটি পুস্তক লেখেন। ইনিই হিটলারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তাঁর ফোটোগ্রাফ ল্যাবরেটরির অ্যাসিসটেন্ট শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে। আত্মহত্যা করার চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে হিটলার এফাকে বিয়ে করেন—পনেরো বছরের 'বন্ধুত্বে'র পর। এফাও একই সঙ্গে আত্মহত্যা করেন। উভয়কে একই চিতায় পোড়ানোর পর একই কবরে দেওয়া হয়। রাশানরা স্কেলিটনগুলো খুঁড়ে বের করে।

১ বরমান এতই গোপনে থাকতেন যে তাঁর সম্বন্ধে কেউই সবিস্তার কিছু লিখতে পারেননি। ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন বটে কিন্তু তথ্য বিশেষ কিছু দিতে পারেননি। এ ছাড়া আছে : ১) 'বরমান লেটার্স'—স্ত্রীকে লেখা বরমানের পত্রগুচ্ছ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। ২) ট্রেভার-রোপার লিখিত 'লাস্ট ডেজ্ অব্ হিটলার'। ৩) প্রাগুক্ত হফ্মান লিখিত, 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড। ৪) গেরহার্ট বল্ট্ কৃত 'ডি লেৎসতেন টাগে ড্যার রাইষ্স্কান্ৎস্লাই' (অর্থাৎ 'জর্মন প্রধানাবাসের শেষ কটি দিন')। এই বল্ট্ হিটলার ভবন (মাটির গভীরের এ্যার রেড শেলটার বা 'বুঙ্কার') ত্যাগ করেন হিটলারের মৃত্যুর মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে।

রূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগুক্ত বিশ্ববিখ্যাত মাসিকের প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, বরমান যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল so that he could know and fulfil Hitler's every whim. এ উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁর ছিল কিন্তু এই টেব্‌ল্‌-টক পড়লেই বোঝা যায় সেটা অত্যন্ত গৌণ। আসলে বরমান মনে করতেন হিটলার যা করেন যা বলেন তার চিরন্তন ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং পরবর্তী যুগের নাৎসী তথা বিশ্ববাসীর জন্য অমূল্য নিধি। নিধি হোক আর না-ই হোক—এ-কথা সত্য, যারা হিটলারকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে চিনতে চান তাঁদের পক্ষে হিটলারের স্বরচিত 'মাইন কাম্‌পুঁফ্‌' পুস্তকের পরেই এর স্থান। এসব ১৯৪১-৪২-এর কথা।

১৯৪৫ সালে হিটলার যখন আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন তখন বরমান হিটলারকে দিয়ে আবার কথা বলিয়ে নেন। এ-কথা সত্য, আত্মহত্যার কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত হিটলার জয়াশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেননি। তবু এই শেষ talk-গুলোতে হিটলার যেন আপন মনে চিন্তা করেছেন, কেন তাঁর পরাজয় হল? এবং শুধু তাই নয়, পরাজয় যদি নিতান্তই হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে ইয়োরোপ-আমেরিকার কি অবস্থা হবে, তখন জর্মন রাজনীতি কোন্ পন্থা অনুসরণ করবে সে সম্বন্ধেও হিটলার ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন। আশ্চর্য, তার অনেকগুলোর আজ ফলে যাচ্ছে। চীন যে চিরকাল জড় হয়ে পড়ে থাকবে এটা তিনি স্বীকার করেননি। বরঞ্চ বলেছেন, চীনের কোটি কোটি লোক ঐ দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, চীন আমেরিকা পানে ধাওয়া করবে (তার পূর্বে রুশ-মার্কিনে যুদ্ধ হয়ে আমেরিকা ছারখার হয়ে যাবে); চীন যে ভারতপানে ধাওয়া করবে সে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেননি।

বলতে গেলে এই টেব্‌ল্‌-টক্‌ও বরমানেরই 'অবদান'।

কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান মদ এবং কফি খেতেন না, পাতলা চা খেতেন এবং ক্বচিৎ কখনো মাংস খেতেন (drinking neither alcohol nor coffee, just weak tea, and eating sparingly of meat)'!

অর্থাৎ কাল যদি আপনি কলকাতায় (প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, he could be in Canada or Mexico—even in India), কিংবা কেউ যদি আর্জেন্টাইনে দেখে একটা লোক ঢাউস গেলাস-ভর্তি বিয়ারের সঙ্গে বিরাট একটা কট্‌লেট্‌ খাচ্ছে তবে তার বরমান হবার সম্ভাবনা নেই।

বস্তুত বরমান মাংস খেতেন প্রচুর। মদের তো কথাই নেই।

তবে প্রবন্ধ-লেখকের এ ভুল ধারণা এল কোথা থেকে?

সকলেই জানে হিটলার মাছ মাংস মদ খেতেন না। তিনি যখন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে খেতে বসতেন তখন তাঁর সামনে থাকতো নিরামিষ, এবং অন্যদের জন্য মাছ মাংস মদ। অবশ্য কেউ যদি হিটলারের মত নিরামিষ খেতে চাইত তবে তাকে সানন্দে তাই দেওয়া হত।

হিটলার-সখা হফ্‌মান—যাঁর পুস্তকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—বলছেন, 'গ্যোরিঙও এসব খানাতে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন না। তিনি বলছেন, "আহারাদির ব্যাপারে প্রভুর সঙ্গে আমার রুচির অমিল।" এবং এসব নিরামিষ অন্য কেউ কখনও খেতে চায়নি। এক বরমান ছাড়া। প্রভুকে খুশী করার জন্য সেই কর্তাভজাটা তার সঙ্গে

ঐ 'কচুঘেঁচু' খেত। এবং তারপর আপন কামরায় গিয়ে—সেটা কাজেই ছিল—পরমানন্দে শুয়োরের চপ্ (বিরাট মাংসের টুকুরো—এর সঙ্গে আমাদের আলুর চপের কোনও মিল নেই) বা বাছুর মাংসের কট্‌লেট্ গবগব করে গিলতো।[১]

প্রাগুপ্ত প্রবন্ধ-লেখক তাঁদেরই উপর নির্ভর করেছেন যাঁরা বরমানকে শুধু বাইরের থেকে দেখেছেন। তাই কবি বলেছেন, বাহ্যদৃশ্যে 'ভোলো না রে মন।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, হফ্‌মান আর বরমানে ছিল আদায় কাঁচকলায়। তাই তিনি দুশমনী করে এসব নিন্দে রটিয়েছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, যখন হফ্‌মানের বইখানি প্রকাশিত হয় তখন বরমানের প্রাইভেট সেক্রেটারি, স্টেনো, চাকর, প্রাপ্তবয়স্ক একাধিক ছেলেমেয়ে স্বাধীন ভাবে জর্মনিতে চরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউই কোনও আপত্তি জানাননি।

এবার মদের ব্যাপার।

হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙে দশ বৎসর রুশদেশে কারাবাস করে, ১৯৫৫ সালে খালাস পেয়ে দেশে ফিরে হিটলার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। হিটলার নাকি প্রায়ই তাঁকে বলতেন, 'দেখো লিঙে, রাত্রে আপন ঘরে তুমি যত খুশী মদ খেয়ে যেমন খুশী মাঁতলামো করো, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সমাজে সাবধানে খেয়ো।' বরমানও তাই সাবধানে মদ খেতেন।

আমার এই প্রবন্ধের দুই নম্বর ফুটনোট যে চার নম্বরের লেখকের নাম উল্লেখ করা তিনি বল্‌ট্।

পূর্বেই বলেছি হিটলার আত্মহত্যা করার ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে তিনি হিটলার আর সাঙ্গোপাঙ্গদের ভূগর্ভ-নিবাস (বুঙ্কার) ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচান। এই ভূগর্ভনিবাস বহু কামরায় বিভক্ত ছিল। তারই একটাতে থাকতেন তিনি আর তাঁর সহকর্মী লরিংহফেন্। হিটলারের আত্মহত্যার দুতিন রাত্র পূর্বে ভোরের দিকে তাঁর সহকর্মী তাঁকে জাগিয়ে বলেন, 'কান পেতে শোন্ কি সব হচ্ছে।' পাশের কামরায় তিন ইয়ার—বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ আর জেনারেল ক্রেব্‌স্[২] মদ্যপানের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন। রাশানরা তখন বার্লিনে ঢুকে গিয়েছে এবং কয়েকদিনের ভিতর যে তাদের জীবনমরণ সমস্যা দেখা দেবে সেটা জানতে পেরে বিশেষ করে বুর্গডর্ফের আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য

---

১ "Goering too was a rare guest. Hitler's culinary confections he declared was not to his taste. But the lick-spittling Borman dutifuly consumed raw carrots and leaves in his master's company—and then he would retire to the privacy of his own room and devour with relish his pork chop or a fine Wiener Schnitzel (calf cutlet) Hoffmann, P. 202.

২ অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, হিটলারের মৃত্যুর দুদিন পরে যখন বুঙ্কার রাশান সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয় তখন বুর্গডর্ফ এবং ক্রেব্‌স্ আত্মহত্যা করেন। বরমান পালান। গোড়ায় তাঁর সঙ্গে পলায়মান যাঁরা পরে বন্দী হন তাঁরা বলেন, বরমান রাশান দ্বারা নিহত হন। পরে নানা সন্দেহের অবকাশ দেখা দিল। তাই আজ জর্মন সরকার এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাঁর পলায়ন সম্বন্ধে সবিস্তর বর্ণনা, তিনি বেঁচে আছেন কিনা সে সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো আলোচনা পাঠক পাবে, ট্রেভার-রোপার লিখিত পুস্তকে, পৃঃ ২২১।

তিনি প্রধানত নাৎসি ও তার কর্তা বরমানকে দায়ী করছিলেন। বরমান আত্মপক্ষ সমর্থন করতে করতে বলছেন, 'এস, দোস্ত, আরেক পাত্তর হয়ে যাক'—বুর্গডর্ফ অধিকাংশ সময়ই মত্তাবস্থায় থাকতেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বল্‌ট্‌ তার পর ঘুমিয়ে পড়েন।

দুপুরের দিকে বল্‌ট্‌ তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে গেলেন মিলিটারি কনফারেন্‌স্‌ রুমে—বুঙ্কারের ক্ষুদ্র-পরিসর কামরাগুলোর মধ্যে এইটেই ছিল সব চেয়ে প্রশস্ত। সেখানে গিয়ে দেখেন, হিটলার, এফা এবং গ্যোবেলস বসে আছেন, আর সামনের তিনখানা সোফাতে হিটলারের তিন ওমরাহ—বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌স্‌—লম্বা হয়ে, পা ফাঁক করে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে, সোফার ফাঁকা জায়গাগুলো কুশন (তাকিয়া-বালিশ) দিয়ে ভর্তি করে ঘড়ঘড় করে প্রচুর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

পূর্বরাত্রির এবং সেই সকালের অত্যধিক সুমিষ্ট দ্রাক্ষারস পানের ধকল কাটিয়ে তখনও তাঁরা জেগে উঠতে পারেননি। মদ্যপানশেষে তিনি ইয়ার একসঙ্গে শোবার জন্য এই বড় ঘরটাই বেছে নিয়েছিলেন। বল্‌ট্‌ বলছেন, গ্যোবেলস তাঁর দিকে এগুতে গিয়ে এঁদের নিদ্রাভঙ্গ না করার জন্যে প্রায় সার্কাস খেলোয়াড়ের মত তাঁদের পা বাঁচিয়ে এক রকম ডিঙিয়ে এলেন। তাই দেখে এফা একটু মৃদু হাস্য করলেন।' (পৃঃ ৮১, ৮২)

এর পরও যদি প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেন বরমান মদ খেতেন না তাহলে আমরা সত্যিই নিরুপায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে বরমান যতক্ষণ না হিটলার ঘুমিয়ে পড়েন ততক্ষণ সচরাচর মদ খেতেন না। পাছে হিটলার ডেকে পাঠান। এমন কি স্বয়ং বরমানই তাঁর স্ত্রীকে লিখছেন (ফেব্রুয়ারি মাসে—হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫, অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়; হিটলারের ভ্যালে—খাস চাকর—লিঙের মতে ৩·৫০), 'ভাগ্যিস কাল রাত্রে এফার জন্মদিন পরবে আমি মদ্যপান করিনি, কারণ রাত সাড়ে তিনটেয় হিটলার আমাকে ডেকে পাঠালেন; আমি তাই সাদা চোখেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারলুম।'

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান হাল্কা চা খেতেন।'

সেও সর্বজনসমক্ষে, হিটলারকে খুশী করার জন্য যেমন তিনি 'কচুঘেঁচু' খেতেন তেন্নি। কারণ, আর সবাই যখন মদ্যপান করতেন তখন হিটলার ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাল্কা চা খেতেন,—চীনারা, রুশোরা, কাবুলীরা যে রকম করে থাকে।

বরমান যে মদ্যপান করেন সে-কথা হিটলারের অজানা ছিল না। বস্তুত বুঙ্কারের অনেকেই শেষের দিকে পরাজয় আসন্ন জেনে সুরাতে দুশ্চিন্তা ভোলবার চেষ্টা করছিলেন। সখা হফ্‌মান যখন হিটলারকে এপ্রিলের মাঝামাঝি শেষবারের মত দেখতে আসেন তখন তাঁর জন্য স্যাম্পেন অর্ডার দিয়ে হিটলার এই মন্তব্য করেন।

* * *

এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার এ নয় যে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করে বরমানকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করি। তদুপরি বরমানের এই বঙ্গদেশে আগমন অসম্ভব। ধরা পড়লে ভারত সরকার তাঁকে পয়লা প্লেনেই জর্মনি পাঠিয়ে দিতে কোন আপত্তি করবেন না। তিনি থাকবেন ঐ সব দেশেই যে সব দেশ আসামী বদলের চুক্তি জর্মনির সঙ্গে করেনি—অর্থাৎ নাৎসিদের প্রতি এখনও যাদের কিছুটা দরদ আছে। অবশ্য বরমান তার

প্রাপ্য শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পান সেটাও আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমার উদ্দেশ্য, এই সব চোদ্দ আর বাইশ ভাষায় প্রকাশিত মার্কিন কাগজগুলোকে যেন বঙ্গসন্তান চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস না করেন। বিশেষ করে যখন তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা প্রকারের উপদেশ দেয়।

কন্‌রাট আডেনাওয়ার

চার্‌চিল নাকি একদা বলেছিলেন, বিসমার্‌কের পরবর্তী যুগে জর্মনিতে মাত্র একটি রাষ্ট্রবিদ (স্টেট্‌সম্যান, রাষ্ট্রনির্মাতা) জন্মেছেন—তিনি কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার।

এ প্রশস্তি আডেনওয়ারের পক্ষে অবশ্য আনন্দদায়িনী (এবং আমরাও চার্‌চিলের সঙ্গে একমত), যদ্যপি এ তথ্যটি সর্বজনবিদিত যে স্বয়ং আডেনওয়ার ইংরেজ জাতটাকে আদৌ নেকনজরে দেখতেন না।

চার্‌চিলের মন্তব্যে কিন্তু একটা স্থূলাঙ্গুলির রূঢ় ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে।

তিনি বলতে চান, বিসমার্‌ক এবং আডেনাওয়ারের মাঝখানে রাজনীতির (স্টেট্‌সম্যানশিপের) শস্যশ্যামল ভূখণ্ড নেই, আছে সাহারার মরুভূমি। অর্থাৎ বহু বহু বৎসর ধরে জর্মন দেশে রাষ্ট্রনির্মাতার বড়ই অভাব। বিসমার্‌কের জন্ম ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৯৯৮। যদি ধরা হয়, তিনি রাজনীতি সংগ্রামে নামেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তা হলে বলতে হয় প্রায় একশ বছর ধরে জর্মনিতে একমাত্র রাষ্ট্রপিতা ছিলেন বিসমারকই। জর্মনির মত চিন্তাশীল তথা শক্তিশালী দেশের পক্ষে এই শতাব্দীতে মাত্র একজন রাষ্ট্রস্রষ্টা—এ যেন অবিশ্বাস্য। জর্মনি না কান্‌ট্‌, হেগেল, কার্ল মার্কসের দেশ! তাঁদের পরিকল্পনা কেউই বাস্তবে পরিণত করতে পারলো না?

এবং হিটলার?

এর উত্তর সুদীর্ঘ, কিন্তু সংক্ষেপে সারি। যে-ডিক্‌টেটারের মৃত্যুকালে তাঁর দেশের অধিকাংশ ভস্মস্তূপে পরিণত, যাঁর সংগ্রামনীতির ফলে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দেশেবিদেশে নিহত হয়েছে; যুদ্ধে বোমারু আক্রমণে আরও লক্ষ লক্ষ আহত রক্তাক্ত নরনারী চিৎকার করছে—তাঁকে নিশ্চয়ই অতিমানব, নরদানব সবই বলা যেতে পারে; শুধু বলা যায় না—রাষ্ট্রনির্মাতা, পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার যুগযুগ-ধাবিত যাত্রীর 'চিরসারথি' তাঁকে কিছুতেই বলা যায় না।

বিনষ্ট রাষ্ট্রের ভস্মস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে লোক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তাকে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রনির্মাতা বলা চলে না।

এমন কি কোনও রাষ্ট্রাদর্শও তিনি রেখে যেতে পারেননি যেটা ভবিষ্যদ্বংশীয়রা মৃন্ময় করে তুলতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রাদর্শ :—পররাজ্য জয় করে সে দেশের 'বর্বর' (উন্‌টর্‌মেন্‌ষ্‌) জনসাধারণকে দাসস্য দাস রূপে পরিণত করে—যে সুপরিকল্পিত পৈশাচিক শোষণ-সংহার পদ্ধতি দর্শনে আন্‌কল্‌ টম পর্যন্ত গোরশয্যায় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হবেন—আপন দেশের বিলাসব্যসনের জন্য অধিকতর শূকরমাংস, সূক্ষ্মতর

চীনাংশুক, অগণিত স্বতশ্চলশকট সংগ্রহ—সাতিশয় বস্তুতান্ত্রিক জড়ত্বের চরম আরাধনা।

এ-প্রসঙ্গে তাই বলে নিতে পারি যদিও এটা সর্বশেষের কথা, হিটলার বারো বৎসরে যে জর্মনিকে বিনাশ করেন, আডেনাওয়ার তাঁর ১৯৪৯—১৯৬৩ ব্যাপী 'রাজত্ব'কালে সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। শুধু পুনর্নির্মাণ নয় এবং চৌদ্দ বৎসরও নয়, আডেনাওয়ার দশ বৎসরেই জর্মনিতে যে সুখসমৃদ্ধি গড়ে তুললেন সেটা হিটলারের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে ১৯৪৫ সালে বাতুলতম আশাবাদীও কল্পনা করতে পারেনি। এবং বলতে কি, এহ বাহ্য, তিনি দিলেন এমন ধন যার উল্লেখ করে খ্রীষ্ট একদা বলেছিলেন—শুধু রুটি খেয়েই মানুষ জীবনধারণ করে না। সে-কথা পরে হবে, আগেই বলেছি।

* * *

কলন[১] শহরের নাম বিশ্ববিখ্যাত। আর কিছু না হোক পৃথিবীর সর্বত্রই Eau de Cologne জিনিসটি পাওয়া যায়, এবং আজকের দিনে ও দ্য কলন্ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নির্মিত হয়। কলন শহর যে 'কলন-জলে'র (Eau = Water, de = of, Colojne = Coloyne = koeln) আবিষ্কারক তাও নয়, কিন্তু কলনের ও দ্য কলন্ই এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কলন-জল।

কলন জর্মনির অন্যতম বৃহৎ নগর। এর গির্জাটি স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। গম্ভীর এবং মধুর উভয় রস এই বিরাট গির্জাতে সম্মিলিত হয়েছে। দূর-দূরান্ত হতে গির্জার শিখরদ্বয় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ নগরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি তার ওবার্‌বুরগার্‌মাইস্টার বা প্রধান লর্ড মেয়ার। কলন শহরের উপর তাঁর প্রভাব অসীম। বস্তুত তাঁকে কলনের 'রাজা' বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ভাইমারের পূর্ববর্তী যুগে কলনের লর্ড মেয়ার প্রতি পরবে কাইজার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হতেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আডেনাওয়ারের জন্ম এই কলন শহরে। আইন অধ্যয়ন করার পর তিনি এ শহরের লর্ড মেয়ারের দফতরে ঢোকেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং ওবার্‌বুগার্‌মাইস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থেকে তাঁর আপন শহরের সেবা করেন। এ-রকম একাগ্র সেবা তাঁর পূর্বে বা পরে কোনও মেয়রাই করেননি। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মনির প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েই তাঁকে সরাসরি ডিসমিস করে দেন।

আডেনাওয়ারের দীর্ঘ একানব্বুই বৎসরের জীবনকে যদি দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায় তবে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমাপ্তি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

জর্মনি, হিটলার তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁদেরই কৌতূহল আছে তাঁদের সকলের মনেই প্রশ্ন জাগবে হিটলার এঁকে ডিসমিস করলেন কেন? নাৎসি আন্দোলন যখন ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তখন আডেনাওয়ার তার উপর কি কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি?

---

১ এখানে রোমান জাত একটা কলনি স্থাপন করে ও নেরোর (যিনি রোম পুড়িয়েছিলেন) মা, মহারানী (Colonia) Claudia Ara Agrippinensisএর Colony (Colonia) নাম দেয়। এই Colonia থেকে ফরাসী ইংরিজি Cologne, জর্মনে Koeln.

জীবনের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৩৩ অবধি আডেনাওয়ার প্রকৃত পলিটিশিয়ান বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। লর্ড মেয়ারের পদ ছাড়াও তিনি কাইজারের রাজত্বে ও পরবর্তী ভাইমার রিপাবলিকে একাধিক সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করেন বটে কিন্তু কখনও রাইষটাগ বা জর্মন পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য জনসমাজের সম্মুখে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াননি। তিনি ক্যাথলিক সেন্টার পারটির সদস্য ছিলেন এবং সে দলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর কিন্তু সেটা প্রধানত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে ও প্রখ্যাত কলন শহরের লর্ড মেয়ারের পদমহিমায়। এবং ক্যাথলিক সেন্টার পারটির প্রতি হিটলারের ছিল ক্রোধ ও ঘৃণা।

কিন্তু ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৩ অবধি ক্ষমতালাভের জন্য যখন নাৎসি পারটি শহরে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায়, মদের দোকানে লড়াই চালাচ্ছে তখন যে-সব নাৎসিবিরোধী রাজনৈতিকদের নাম শোনা যায়, যেমন ফন পাপেন, হুগেনবুর্গ, শ্লাইষার, ব্রুনিঙ, ট্যালমান, টর্‌গ্‌লার, শ্রোডার—এদের ভিতর আডেনাওয়ারের নাম নেই। ১৯৭৪ পৃষ্ঠা জুড়ে শ্রীযুক্ত শাইরার 'নাৎসি আন্দোলনের উদয়াস্ত' সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন তাতে আডেনাওয়ারের নাম নেই।

অথচ আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু লোক—হিটলার যে ধর্মমাত্রকেই এবং বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্মকে, জর্মন টিউটন চরিত্রের সর্বনাশা শত্রুরূপে ঘৃণা করতেন সে তত্ত্ব তিনি কখনও গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি।[১] হিটলারের করাল ছায়া যে ক্যাথলিক গির্জা ক্রমেই ছেয়ে ফেলেছে সেটা আডেনাওয়ারের দৃষ্টি এড়ায়নি।

কিন্তু আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু, শিক্ষিত, বিদগ্ধ নাগরিক।

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। কলন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে; নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে যখন ফরাসী সেনা জর্মনিতে ঢুকলো তখন সারা জর্মনির শিক্ষাদীক্ষার উপর নামলো দুর্দিনের অন্ধকার। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলন বিশ্ববিদ্যালয়েরও দরজা বন্ধ হয়ে গেল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

আপ্রাণ চেষ্টা করে, লর্ড মেয়ারের সর্ব প্রভাব সর্ব কর্তৃত্ব বিস্তার করে কন্‌রাট আডেনাওয়ার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলনে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৩ বৎসর পরে।

বন্‌ শহর কলনের অতি কাছে। বন্‌-এর বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। আডেনাওয়ার বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বন্‌-কলনের পথে র‍্যোনডর্‌ফে তাঁর আবাস নির্মাণ করেন। এখান থেকেই তারো পরবর্তীকালে—হিটলারের পতনের পর—তিনি মোটরে করে রাজধানী বন্‌-এ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য সমাধান করতে যেতেন।

---

১ হিটলারের বিশ্বাস ছিল, ইহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বীর্য কাপুরুষের আশ্রয়স্থল খ্রীষ্টধর্ম ইয়োরোপের সর্বনাশ করেছে, এবং এ ধর্ম ইয়োরোপে ছড়ানোর পিছনে রয়েছে ইহুদীদেরই (!) এক অভিনব কৌশল। আবার হিটলার মনে করতেন খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে যে সব রোমান সৈন্য প্যালেস্‌টাইনে মোতায়েন ছিল খ্রীষ্ট তাদেরই কোনও একজনের জারজ সন্তান।

সেই ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে, বস্তুত প্রায় ষাট বছর ধরে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।[১] বন্-এর এত কাছে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খোলাতে বন্-এর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা হয়নি, কারণ বন্-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আডেনাওয়ারের সখ্য ছিল অবিচল। বস্তুত উত্তর রাইন অঞ্চলের (বন-কলন-ড্যুসেল্ডর্ফ্) প্রায় সব রকমের কৃষ্টি আন্দোলন তথা ক্যাথলিক ধর্মজীবন এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আডেনাওয়ার তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হিটলারের জন্মভূমি যদিও অস্ট্রিয়ায়, তবু তিনি বেভেরিয়ার ম্যুনিক শহর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে। সেখানে বিরাট বিরাট মিটিঙে হিটলার লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তেন, রাস্তায় রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থা করাতেন, এমন কি গুম্ খুন করাতেও তাঁর বাধতো না এসব পাঠক মাত্রই জানেন।

বেভেরিয়া প্রদেশের পরেই হিটলারের জনপ্রিয়তা ছিল উত্তর রাইনের কয়লা ও লোহা ব্যবসার জায়গা রূর অঞ্চলে—এবং কলনের পাশে এই উত্তর রাইনের ড্যুসেল্ডর্ফ্ শহরে বিশ্বপ্রপাগান্ডা সরদার ডকটর গ্যোবলসের জন্ম। রূরের গা ঘেঁষে কলন শহর এবং এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় নগর। গ্যোব্‌ল্‌স স্বভাবতই চাইতেন তাঁর বাড়ির পাশের কলন শহরে যেন প্রভু হিটলারকে উৎকৃষ্ট আসন তৈরী করে দিতে পারেন—হিটলারের কাশী যদি হয় ম্যুনিক তবে কলন হবে বৃন্দাবন।

কিন্তু বাদ সাধতেন আডেনাওয়ার। পূর্বেই বলেছি, ওবার্‌বুল্‌গার্-মাইস্টারের ক্ষমতা অসীম। তাই নামমাত্র আইন বাঁচিয়ে তিনি কলন অঞ্চলে এমন সব কলা-কৌশল করে রাখতেন যে হিটলার এমন কি রাইনের ছেলে স্বয়ং গ্যোব্‌ল্‌সও সেখানে সুবিধে করে উঠতে পারতেন না।

নাৎসি পারটির ক্ষমতা সঞ্চয় করে উদ্দেশ্য সফল করাতে বাধা দিয়েছিল প্রধানত দুইটি সঙ্ঘ : ক্যাথলিক এবং দ্বিতীয়ত প্রটেস্‌টানট্ যাজক সম্প্রদায়। কিন্তু ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রটেসটানট্‌দের তুলনায় শতগুণে সংঘবদ্ধ এবং পোপকে কেন্দ্র করে তাদের বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠান। হিটলারও বার বার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে বলেছেন, 'ঐ ক্যাথলিকদের সমঝে চলো—প্রটেস্‌টান্‌ট্‌রা এমনিতেই টুকরো টুকরো হয়ে আছে, তাদের খানখান করা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়।'

---

১ ঐ সময়ে আমি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি ও আডেনাওয়ারের খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সতীর্থদের কাছ থেকে বহু প্রশস্তি শুনতে পাই। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ খবরের কাগজে ও লোকমুখে এসে পৌঁছত সেগুলো ১৯৩৩ পর্যন্ত যাচাই করে নেওয়া যেত। ঐ বছরে হিটলার ক্ষমতা গ্রহণ করার ফলে প্রেসের স্বাধীনতা লোপ পায়। কাজেই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিটলার-বৈরীদের সম্বন্ধে কোনও পাকা খবর পাওয়া যেত না। যুদ্ধের পর শ্রীযুত ভাইমার আডেনাওয়ার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। সেখানা যোগাড় করতে পারিনি বলে আমার জানা তথ্য ও তত্ত্ব যাচাই করে নিতে পারছি নে। বিশেষ করে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত আডেনাওয়ার গোপনে নাৎসিদের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলেন সে-সব খবর নিশ্চয় এই বইয়ে আছে। আডেনাওয়ারের মৃত্যুর পর থেকে কলন রেডিয়ো মাঝে মাঝে ঐ বই থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। এ প্রবন্ধে আমি তার সাহায্য নিয়েছি।

কলন শহরে পোপের অন্যতম আর্চবিশপের বিরাট প্রতিষ্ঠান। আডেনাওয়ার সেখানে সুপ্রীম লর্ড মেয়ার। ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলের উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব—যদিও পূর্বেই বলেছি, তিনি সে রাজনৈতিক দলের টিকিট নিয়ে ভোটমারে কখনও নামেননি। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায় কেটেছে ম্যুনিসিপাল বা করপোরেশন পলিটিক্সে। ক্যাথলিক সংগঠনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তিনি নাৎসিদের প্রচারকর্মে বাধা দিলেন কলন তথা উত্তর রাইনের সর্বত্র। অথচ হিটলার তাঁকে ধরা-ছোঁওয়াতে পান না, কারণ তিনি রাজনৈতিক কোনও দলের নেতা, এমনি কি চারআনী সক্রিয় নিষ্ক্রিয় কোনও মেম্বারও নন। তিনি যদি ভোটমারে নামতেন তবে তাঁকে ভোটে হারিয়ে বিপর্যস্ত অপদস্থ করা যেত। নাৎসি ডন কুইক্সট্ তলওয়ার হানবার মত ড্র্যাগন খুঁজে পায় না—পায় উইন্ড্‌মিল্!

গ্যোব্‌ল্‌স্-এর প্রচারকর্মের একটা প্রধান উর্বরা জমি ছিল ইস্কুল-কলেজ-য়ুনিভারসিটি। কলনের অধিকাংশ স্কুল ক্যাথলিকদের তাঁবুতে—সেকুলার ভাইমার রিপাবলিক জর্মনির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সেকুলার করে তুলতে পারেনি কিংবা হয়তো সত্য সত্য তা করতে চায়নি—সেখানে আডেনাওয়ারের ধর্মবল অর্থবল দুইই রয়েছে। আর য়ুনিভারসিটির তো কথাই নেই। সোয়াশ' বছরের হারানো মানিক তার বিশ্ববিদ্যালয় ফের ফিরে পেয়েছে—আডেনাওয়ারের তপস্যায়, তখনও পুরো দশ বছর হয়নি। এটাকে কলনবাসী বাঁচিয়ে রাখবে সর্বপ্রকার কট্টরপন্থীর র‍্যাডিকাল ছোঁয়াচ থেকে। গ্যোব্‌ল্‌স কলনের কলেজে কক্কে পেতেন না।

ওদিকের বেকার সমস্যায় দিন দিন তার চরম সঙ্কটের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে—এবং সবচেয়ে বেশী মার খাচ্ছেন রূর কয়লাখনির শ্রমিক দল। তাই দেখা যায়—হিটলারের খাস পাইলট তাঁর পুস্তকে এর বর্ণনা দিয়েছেন—[1] হিটলার প্রচারকর্মের জন্য প্লেনে উড়ে যাচ্ছেন রূরের এসেন্ শহরে। পাশেই বিরাট কলন। কিন্তু তিনি সেটি বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছেন বন্-এর কাছে তাঁর প্রিয় গোডেসবের্গে নামক গণ্ডগ্রামে (এখন শহর এবং এখানেই পরবর্তী যুগে হিটলার প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন চেম্বারলনের সঙ্গে—চেকোস্লোভাকিয়ার সুডেটেন বাবদে)। নিশ্চয়ই হিটলারের এই কলন বর্জনে প্রতিবারই গ্যোব্‌ল্‌স লজ্জায় মাথা নিচু করেছেন। তাঁর সান্ত্বনা এইটুকু—এসেন্ তথা রূর তাঁর প্রতিবেশী, সেখানে তিনি প্রতিবারই হিটলারকে রাজাসনে বসাতেন।

* * *

হিটলার চ্যান্‌সেলার হয়েই আডেনাওয়ারকে ডিসমিস করলেন। এটা হবে আমরা জানতুম। কারণ নাৎসিরা বহুদিন ধরে তাঁর নিন্দা-কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছিল। তার একটা : 'আডেনাওয়ার তনখা টানেন বিরাট (রীজে)! তাঁর মাইনে ঢের ঢের কম হওয়া উচিত।' এবং সব চেয়ে মজার কথা, হিটলার যাঁকে লর্ড মেয়ার করলেন তিনি তাঁর মাইনে এক পাই তক না কমিয়ে টানতে লাগলেন আডেনাওয়ার যে তনখা নিতেন সেইটেই। এই মহাশয়ের নাম ছিল 'রীজে' (বাঙলায় আমরা বলব 'বিরাট' বাবু)। তখন

১ বাত্তর, "হিটলার'জ্ পাইলট"।

কলন-বন্-এ একটা শিবরামীয় পান্ চালু হল—'অডেনাওয়ার নিতেন বিরাট তনখা; এখন (মিস্টার) বিরাট নিচ্ছেন আডেনাওয়ার-তনখা!'

*   *   *

হিটলার কিভাবে জর্মনিকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার অবশ্যম্ভাবী শেষ ফল যে দেশের সর্বনাশ, সে সত্য আডেনাওয়ার দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন কিন্তু শান্ত-সমাহিত-স্বভাব ও আচরণ সম্পন্ন আডেনাওয়ার জানতেন, চীনা ঋষি লাওৎসের মতই জানতেন, জর্মন-নিয়তি রহস্যাবৃত তারই কোনও এক মানববুদ্ধির অগম্য 'কারণে'। জর্মনির উপর যে টর্নাডো বল্গামুক্ত করেছেন, সে যেন

"লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"

তাঁর সামনে দাঁড়ালে সেটাকে বন্ধ করা তো দূরের কথা, তিনিও মহাশূন্যে বিলীন হবেন। এটা ফরাসী সম্রাটের 'আপ্রে মোয়া ল্য দেলুজ' ('আমি মরে যাওয়ার পর বন্যা') নয়, এটা 'দেলুজ পুর শাঁকা আ ল্যাসতাঁ ('বন্যা এখনই, এবং সবাইকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে'!)

বরঞ্চ বন্যার পর ফের ঘরবাড়ি তুলতে হবে, খেতখামার করতে হবে—শিবের তাণ্ডব শেষ হলে অন্নপূর্ণার আবাহন।

পরাজয় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় হিটলার ততই অবিচারে, নির্বিচারে—শত্রুজন, নিরপেক্ষজন, এমন কি মিত্রজনকেও 'মরণ-থানায়' (কন্সান্ট্রেশন ক্যাম্পে) পাঠাতে লাগলেন—হ্যাঁ, ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্রকে, আগামেম্নন্ তাঁর প্রিয় কন্যা এফিগেনিকে দেবতার তুষ্টির জন্য বলি দিয়েছিলেন—কিন্তু আডেনাওয়ারের অদৃষ্টে 'মরণ-থানার' দুর্দৈব লেখা ছিল না। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁকে কিছুদিন কারাগারে, পরে তাঁর আপন গৃহে নজরবন্দী করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু তিনি শত্রুনির্বিশেষে এতই অসংখ্য জনের উপকার করেছিলেন যে তাঁরা কলাকৌশলে ছলে (হিটলারকে) বলে আডেনাওয়ারকে কারামুক্ত করেন।

"সাঙ্গ হয়েছে রণ,
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া শেষ হল আয়োজন"

"The fight is ended !
Cries of loss bewilder the sky"

১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জর্মনি 'বে-এক্তেয়ার' আত্মসমর্পণ করল। ঐ বছরেই জুলাই মাসে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক স্টিভ্ন্ স্পেন্ডারকে বিট্রিশ সরকার পাঠালে জর্মনিতে, সেখানকার ঝড়তিপড়তি ইনটেলেকচুয়েলদের চিন্তাধারার সম্বন্ধে খবর নিতে। সে-কর্ম সমাধান করে তারই বিবরণী তিনি প্রকাশ করেন 'ইয়োরোপীয়ান উইটনিস' নামক পুস্তকে।[১]

---

১. Stephen Spender, European Witness, 1946. মাসখানেক পূর্বে যখন কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা বেরলো যে মারকিন গুপ্তচর বিভাগ "Encounter" কাগজকে গোপনে অর্থসাহায্য করে, তখন তিনি কাগজের সম্পাদকপদ ত্যাগ করেন।

বীভৎস বই। কলনের রাস্তার পর রাস্তা, দুদিকে একটি মাত্র বাড়ি নেই—ধ্বংসস্তূপ, ভগ্নস্তূপ। তার তলায় এখনও হাজার হাজার মড়া পচছে গলছে। শহর-জোড়া দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। একরকম ক্ষুদে সবুজ পোকা এই সব হাজা-পচা লাশ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং শহরময় এমনই ঘন স্তরে ছেয়ে আছে যেন মনে হয় লন্ডনের ধুঁয়াশা। হাত দিয়ে মুখের সামনে থেকে তাড়াতে গেলে মুখে লেগে গিয়ে পিছলে আঠার মত চোখেমুখে সেঁটে যায়।

লড়াইয়ের শুরুতে কলনে বাস করতো প্রায় আট লক্ষ লোক। তারা ক' হাজার বাড়ি, ভিলা ফ্ল্যাটে বাস করতো তার হিসেব স্পেন্ডার দেননি। শুধু বলেছেন মাত্র তিনশ' খানা (!) তখনও বাসের উপযোগী। "Actually there are a few habitable buildings left in Cologne, three hundred in all (!)"

এ শহর তথা গোটা দেশের আর আর শহর গড়ে তুলবে কে, কারা?

দুষ্ট হোক শিষ্ট হোক যে-সব নাৎসি একদা নরওয়ে থেকে ইটালি, আতলান্তিক থেকে ককেশাস পর্যন্ত অধিকার করেছিল তারা কৃতবিদ্য, করিৎকর্মা, অভিজ্ঞ—নির্মাণ-ধ্বংস উভয় কর্মেই সিদ্ধহস্ত। তাদের কিছু মারা গেছে, অধিকাংশ মিত্রশক্তির শিবিরে শিবিরে বন্দী, কিছু পলাতক, অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড।

হিটলারের বৈরপক্ষের অধিকাংশ অন্যলোকে। হিটলার তার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। আডেনাওয়ার গোত্রের নির্মাণতৎপর নেতা অতিশয় বিরল,—মুষ্টিমেয়।

আডেনাওয়ার ভগ্নস্তূপের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। একদা চার্চিল যেরকম লন্ডনের ভাঙাচোরার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন—যদিও সে বিনাশ কলনের সংস্রাংশও ছিল না।

এখানে আমাকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হবে। এটি পড়ে নিলে আডেনাওয়ারের চরিত্রগুণটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট রেখায় ধরা দেবে। বিশেষত স্পেন্ডারের মত লোক যখন এ ছবিটি এঁকেছেন।

দু দফে অনুবাদ করে লাভ নেই, এবং বিবেচনা করি এ প্রবন্ধের পাঠক অন্তত আমার চেয়ে ভালো ইংরিজি জানেন।

এটা যুদ্ধবিরতির দু'তিন মাস পরের কথা। স্পেন্ডার বলছেন :—

Adenauer is a prominent Catholic in the Rheinland, who was Mayor of Cologne before Hitler came to power. It is now with a special personal emotion that he takes up the restoration of that Cologne which was a broken trayload of crokery when it was taken out of his hands. When he was last Lord Mayor he was in his fifties, he is now a man of seventy. He has an energetic, though somewhat insignificant appearance; a long lean oval face, almost no hair, small blue active eyes, little button-nose and a reddish complexion. He looks remarkably young and he has the quietly confident manner of a successful and attentive young man.

'There are two aspects of reconstruction which we consider of equal importance', he said, 'one, the material rebuilding of the city. But just as important is the creation of a new spiritual life. You can't have failed to

notice that the Nazis have laid German culture just as flat as the ruins of the Rheinland and the Ruhr. Fifteen years of Nazi rule have left Germany a spiritual desert, and perhaps it is more necessary to draw attention to this than to the physical ruins, for the spiritual devastation is not so apparent. There is hunger and thirst now for spiritual values in Germany. This is especially true of Cologne because here, in the past, we have had such a significant spiritual life and activity. Here it is possible to-day to do a great deal. Only the best should be our aim. We should have in Cologne the best education, the best books, the best newspapers, the best music.'

The point that Adenauer came back to again and again—his whole position rested on it—was that the German were really starving spiritually, and that it was therefore of the utmost importance to give their minds and souls some food.

এ বই যখন আমি পড়ি তখনও স্বাধীনতা পাইনি।

সে দুর্দিনে কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল, দশ-বারো বৎসর যেতে না যেতেই তিনি কলন তথা সারা জর্মনিতে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পোন্নতি, আত্মচর্চা, ধর্মজীবনে নব জাগরণ এনে দেবেন, যে হিটলার তাঁর গৌরবের মধ্যগগনেও সুদ্ধমাত্র সাংসারিক দিক দিয়েও এতখানি উন্নতি করতে পারেননি?

কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এ তত্ত্বটা আডেনাওয়ার জানতেন বলেই স্পেন্ডারকে বিদায় দেবার বেলা তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'The imagination has to be provided for.'

কবিগুরুর কথা মনে পড়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বার বার বলেছেন, 'আত্মার দিকটা অবহেলা করো না।' অধিকাংশ রাজনৈতিকরা তখন মুচকি হেসে বলতেন, 'আগে তো ইংরেজকে খেদাই।'

ইংরেজ তো বহুকাল হল গেছে। তবে?

আসলে আমাদের 'imagination', চরিত্র, আত্মা দেউলে।

এর পরের ঘটনাবলী হালে কাগজে কাগজে বেরিয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে সারি।

যুদ্ধশেষের পরই মার্কিন সেনাপতি আডেনাওয়ারকে কলনের লর্ড মেয়ার করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনরা কলন ইংরেজের হাতে দিয়ে সরে পড়ল। যে-ইংরেজ সেনাপতির হাতে কলনের ভার পড়লো তিনি ছিলেন একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ গাড়োল। আডেনাওয়ারকে নগর পুনর্নির্মাণ বাবদে এমন সব সর্বনেশে অবাস্তব জঙ্গীলাটী অর্ডার দিতে লাগলেন যে পরাজিত জর্মনির নগণ্য সরদার আডেনাওয়ার বিজয়মদে মত্ত 'প্রভুর' আদেশ পালন করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। এই নয়া হিটলার তখন তাঁকে স্রেফ ডিসমিস করে দিলেন। বিবেচনা করি সিপাহী বিদ্রোহের আমল হলে তাঁকে বাহাদুর শা'র মত বাকী জীবন জেলে কাটতে হত!

অনেকের বিশ্বাস, সেই যে আডেনাওয়ার ইংরেজের উপর চটে গেলেন, তার পর

তিনি জর্মনির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে লাগলেন মার্কিন ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'কাট্ হিম ডেড',—ইংরেজকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

জর্মনির নব সংবিধান নির্মাণের জন্য যে বৈঠক বসল বছর তিন পরে ১৯৪৮ সালে তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯-এ যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হল তার প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন আডেনওয়ার। কিন্তু তখন বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন, জর্মনির জন্মবৈরী ফ্রান্স কি এ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে স্বীকার করবে?

আডেনাওয়ার আজীবন ফ্রান্সের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করতেন। তিনি হাত এগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। যে-ফ্রান্স চিরকাল জর্মনিকে অবিশ্বাস করেছে সে পর্যন্ত বুঝে গেল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দম্ভী দ্য গল্ আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে। ইংরেজ মর্মাহত হল। জর্মন ফরাসীকে বিভক্ত রেখে, অর্থ-সংগ্রহার্থে দু দলকে লড়িয়ে দিয়ে, সে দাবড়াতো ইয়োরোপময়।

জর্মনি ইয়োরোপ আমেরিকার জাতিসমাজে আসন পেল।

যে জর্মন জনসাধারণকে বিশ্বজন নরাধম দানব বলে ধরে নিয়েছিল তারা ভদ্রজনরূপে স্বীকৃত হল।

পশ্চিম ইয়োরোপ তথা আমেরিকা যে-সব অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সন্ধিচুক্তি তৈরী করছিল তার সর্বোচ্চ স্তরের সব কটিতেই জর্মনি আসন পেল।

এবং আমরা—যারা—এ দেশে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে করি যে আডেনাওয়ারদের নেতৃত্বে পশ্চিম জর্মনি স্থান করে দিল তার আপন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, পূর্ব জর্মনি থেকে থেকে আগত এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে—তাদের জীবনমানে ও পশ্চিম জর্মনির জীবনমানে আজ আর এতটুকু পার্থক্য নেই, আমি স্বচক্ষে ১৯৫৮ এবং পুনরায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে দেখে এসেছি। কোনও লক্ষ্মীছাড়া দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস্তুহারাদের বাস্তুভিটে-ঘুঘু-রূপ ধারণ করতে হয়নি।

এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, এই, আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ গুরুভার আডেনাওয়ার এগিয়ে গিয়ে আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাষ্ট্রজনকরূপে, তেয়াত্তর বৎসর বয়সে।

এ যুগকে সমসাময়িক জর্মন ইতিহাসে বলা হয়, 'আডেনাওয়ার এ্যারা'—'আডেনাওয়ার যুগ'।

এবং এ যুগের এখনও শেষ হয়নি। বিসমার্ককে বিতাড়িত করার পর কাইজার তাঁর রাজনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন, ৮৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ (?) অবসর গ্রহণ করার পর যে দুজন চ্যান্সেলার পর পর নিযুক্ত হলেন তাঁরাও বৃদ্ধের কর্মাদর্শ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।[১]

অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ তিন খণ্ডে লেখেন তাঁর জীবনস্মৃতি। তৃতীয় খণ্ড প্রেসে পাঠানোর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি গত হন।

মৃত্যুর আটদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কীজিংগার

---

১ জর্মানগণ বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে ভক্তি ও ভালবাসা সহ ডাকনাম দেয় 'ড্যার আলটে (ওল্‌ড ম্যান), তাঁর পরের চ্যানসেলারকে সহাস্যে ডাকনাম দেয় 'ড্যার ডিকে' (ফ্যাট ম্যান)।

আডেনাওয়ারের শোকসভাতে বলেন, 'কয়েক দিন পূর্বেও র্‌যোনডর্‌ফ্ গ্রামে যান, "বৃদ্ধের" কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে।'[১] এই শেষ দর্শনের সময় তিনি কীজিংগারকে বিভক্ত জর্মনি সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষ কথা বলেন, 'আজ যে ধুলো আর কুয়াশাতে পৃথিবী ঢাকা সেটা যখন পরিষ্কার হবে তখন যেন কেউ না বলে, আমি আমার কর্তব্য করিনি।'

*   *   *

বিশ্বজন সম্পূর্ণ একমত যে :—

১) আডেনাওয়ার পদদলিত জর্মনিকে লুপ্ত-আত্মসম্মানবোধ এনে দেন ও ইওরোমেরিকার রাষ্ট্রসমাজে তার জন্য গৌরবের আসন নির্মাণ করেন,

২) চিরবৈরী ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করেন,

৩) এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি মাত্র একটি আশা সফল করতে পারেননি :—

দ্বিখণ্ডিত জর্মনিকে একত্র করতে পারেননি।

*   *   *

এস্থলে আমি শুধু দুইটি বিষয় উল্লেখ করবো :—

হ্যার ভাইমার স্বর্গত আডেনাওয়ারের উত্তম জীবনী লিখেছেন। আর পাঁচখানা বিদেশী বইয়ের মত এটিও আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতাদের 'কৃপায়'।

জর্মন বেতার এই উৎকৃষ্ট পুস্তক থেকে একাধিক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনায়।

তারই একটিতে আছে, আডেনাওয়ারের পুত্র উক্ত লেখককে বলেন, 'আমার পিতার মাথার উপর যখন সমস্ত জর্মনির দায়িত্ব তখন আমার মা গত হন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে করে আমরা আরও বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। এর পর থেকে সফরে গেলে আমাদের জন্য প্রতিটিবার সওগাৎ আনতে কখনও তাঁর ভুল হত না।'

আডেনাওয়ার আপন দেশকে বঞ্চিত করেননি, পরিবারের প্রিয়জনকেও বঞ্চিত করেননি।

যে উচ্চকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা তথা আত্মম্ভরিতার বিকৃত রূপ ধারণ করে, সে কখনওই কোনও প্রকারের ত্যাগ বরণ করতে পারে না, কিন্তু যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সেখানে প্রকৃত মহাপুরুষ সামান্য শিশুটির দাবির মূল্যও দিতে জানেন। 'রাজকার্য', 'সমাজসেবী', 'রাষ্ট্রের আহ্বান'—এসব গালভরা কথার দোহাই দিয়ে যারা

---

১ আডেনাওয়ার গত হন ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫-৫১ মিনিটে। যে জর্মন বেতার ভারতের জন্য প্রোগ্রাম দেয় সেটি আডেনাওয়ারের প্রিয় কলনেই অবস্থিত—সে ভারতের প্রোগ্রাম আরম্ভ করে বিকেল ৬-৫০ মিনিটে। আমি তখনই খবরটা শুনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পর, পর পর কয়েকদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দরুন হয় বিজলি বন্ধ হয়ে যায় বলে, নয় রিসেপশন খারাপ ছিল বলে ল্যুবকে, গার্‌স্‌টেনমায়ার তথা চ্যানসেলার কীজিংগারের বক্তৃতা ভালো করে বোঝা যায়নি। ২৫ এপ্রিল গোরের দিনও আবহাওয়া খারাপ ছিল।

তিনি জর্মনির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে লাগলেন মার্কিন ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'কাট্ হিম ডেড',—ইংরেজকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

জর্মনির নব সংবিধান নির্মাণের জন্য যে বৈঠক বসল বছর তিন পরে ১৯৪৮ সালে তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯-এ যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হল তার প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন আডেনওয়ার। কিন্তু তখন বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন, জর্মনির জন্মবৈরী ফ্রান্স কি এ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে স্বীকার করবে?

আডেনাওয়ার আজীবন ফ্রান্সের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করতেন। তিনি হাত এগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। যে-ফ্রান্স চিরকাল জর্মনিকে অবিশ্বাস করেছে সে পর্যন্ত বুঝে গেল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দম্ভী দ্য গল্ আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে। ইংরেজ মর্মাহত হল। জর্মন ফরাসীকে বিভক্ত রেখে, অর্থ-সংগ্রহার্থে দু দলকে লড়িয়ে দিয়ে, সে দাবড়াতো ইয়োরোপময়।

জর্মনি ইয়োরোপ আমেরিকার জাতিসমাজে আসন পেল।

যে জর্মন জনসাধারণকে বিশ্বজন নরাধম দানব বলে ধরে নিয়েছিল তারা ভদ্রজনরূপে স্বীকৃত হল।

পশ্চিম ইয়োরোপ তথা আমেরিকা যে-সব অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সন্ধিচুক্তি তৈরী করছিল তার সর্বোচ্চ স্তরের সব কটিতেই জর্মনি আসন পেল।

এবং আমরা—যারা—এ দেশে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে করি যে আডেনাওয়ারদের নেতৃত্বে পশ্চিম জর্মনি স্থান করে দিল তার আপন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, পূর্ব জর্মনি থেকে থেকে আগত এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে—তাদের জীবনমানে ও পশ্চিম জর্মনির জীবনমানে আজ আর এতটুকু পার্থক্য নেই, আমি স্বচক্ষে ১৯৫৮ এবং পুনরায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে দেখে এসেছি। কোনও লক্ষ্মীছাড়া দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস্তুহারাদের বাস্তুভিটে-ঘুঘু-রূপ ধারণ করতে হয়নি।

এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, এই, আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ গুরুভার আডেনাওয়ার এগিয়ে গিয়ে আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাষ্ট্রজনকরূপে, তেয়াত্তর বৎসর বয়সে।

এ যুগকে সমসাময়িক জর্মন ইতিহাসে বলা হয়, 'আডেনাওয়ার এ্যারা'—'আডেনাওয়ার যুগ'।

এবং এ যুগের এখনও শেষ হয়নি। বিসমার্ককে বিতাড়িত করার পর কাইজার তাঁর রাজনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন, ৮৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ (?) অবসর গ্রহণ করার পর যে দুজন চ্যান্সেলার পর পর নিযুক্ত হলেন তাঁরাও বৃদ্ধের কর্মাদর্শ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।[১]

অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ তিন খণ্ডে লেখেন তাঁর জীবনস্মৃতি। তৃতীয় খণ্ড প্রেসে পাঠানোর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি গত হন।

মৃত্যুর আটদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কীজিংগার

---

১ জর্মানগণ বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে ভক্তি ও ভালবাসা সহ ডাকনাম দেয় 'ড্যার আলটে (ওল্ড ম্যান), তাঁর পরের চ্যানসেলারকে সহাস্যে ডাকনাম দেয় 'ড্যার ডিকে' (ফ্যাট ম্যান)।

আডেনাওয়ারের শোকসভাতে বলেন, 'কয়েক দিন পূর্বেও র‍্যোনডর্‌ফ্‌ গ্রামে যান, "বৃদ্ধের" কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে।'[১] এই শেষ দর্শনের সময় তিনি কীজিংগারকে বিভক্ত জর্মনি সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষ কথা বলেন, 'আজ যে ধুলো আর কুয়াশাতে পৃথিবী ঢাকা সেটা যখন পরিষ্কার হবে তখন যেন কেউ না বলে, আমি আমার কর্তব্য করিনি।'

* * *

বিশ্বজন সম্পূর্ণ একমত যে :—

১) আডেনাওয়ার পদদলিত জর্মনিকে লুপ্ত-আত্মসম্মানবোধ এনে দেন ও ইওরোমেরিকার রাষ্ট্রসমাজে তার জন্য গৌরবের আসন নির্মাণ করেন,

২) চিরবৈরী ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করেন,

৩) এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি মাত্র একটি আশা সফল করতে পারেননি :—

দ্বিখণ্ডিত জর্মনিকে একত্র করতে পারেননি।

* * *

এস্থলে আমি শুধু দুইটি বিষয় উল্লেখ করবো :—

হ্যার ভাইমার স্বর্গত আডেনাওয়ারের উত্তম জীবনী লিখেছেন। আর পাঁচখানা বিদেশী বইয়ের মত এটিও আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতাদের 'কৃপায়'।

জর্মন বেতার এই উৎকৃষ্ট পুস্তক থেকে একাধিক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনায়।

তারই একটিতে আছে, আডেনাওয়ারের পুত্র উক্ত লেখককে বলেন, 'আমার পিতার মাথার উপর যখন সমস্ত জর্মনির দায়িত্ব তখন আমার মা গত হন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে করে আমরা আরও বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। এর পর থেকে সফরে গেলে আমাদের জন্য প্রতিটিবার সওগাৎ আনতে কখনও তাঁর ভুল হত না।'

আডেনাওয়ার আপন দেশকে বঞ্চিত করেননি, পরিবারের প্রিয়জনকেও বঞ্চিত করেননি।

যে উচ্চকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা তথা আত্মম্ভরিতার বিকৃত রূপ ধারণ করে, সে কখনওই কোনও প্রকারের ত্যাগ বরণ করতে পারে না, কিন্তু যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সেখানে প্রকৃত মহাপুরুষ সামান্য শিশুটির দাবির মূল্যও দিতে জানেন। 'রাজকার্য', 'সমাজসেবী', 'রাষ্ট্রের আহ্বান'—এসব গালভরা কথার দোহাই দিয়ে যারা

---

১ আডেনাওয়ার গত হন ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫-৫১ মিনিটে। যে জর্মন বেতার ভারতের জন্য প্রোগ্রাম দেয় সেটি আডেনাওয়ারের প্রিয় কলনেই অবস্থিত—সে ভারতের প্রোগ্রাম আরম্ভ করে বিকেল ৬-৫০ মিনিটে। আমি তখনই খবরটা শুনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পর, পর পর কয়েকদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দরুন হয় বিজলি বন্ধ হয়ে যায় বলে, নয় রিসেপশন খারাপ ছিল বলে ল্যুবকে, গার্‌স্টেনমায়ার তথা চ্যানসেলার কীজিংগারের বক্তৃতা ভালো করে বোঝা যায়নি। ২৫ এপ্রিল গোরের দিনও আবহাওয়া খারাপ ছিল।

শিশু, বৃদ্ধ, আতুর-অকর্মণ্য জনকে অবহেলা করে, তাদের আদর্শবাদ-এর অস্থিমজ্জা তাদের আপন স্বার্থপরতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে গঠিত।

শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রভু যীশু ইহজীবনের উচ্চতম আদর্শ, পরজীবনের চরম কাম্য নিয়ে যখন আলোচনা করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, তখনও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে শিশুরা তাঁর কাছে আসতে চায়। আদেশ দিলেন—'শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে।'

শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven ?"

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them.

* * *

হিটলারের আত্মহত্যার কাহিনী আমি অন্যত্র লিখেছি। তাঁর আত্মহত্যার পর কি হয়েছিল সেটা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়জনক বা কৌতূহলোদ্দীপক নয়, বিশেষত নরদানব মারটিন বরমান তার সঙ্গে বিজড়িত আছেন বলে। কিন্তু সে কাহিনী ভিন্ন এবং এখানেও আমি মাত্র সেইটুকুরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো যেটুকু আডেনাওয়ারের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন।

হিটলার যে সময়ে আত্মহত্যা করেন (বেলা ১৫-৩০/৪৫, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫), সে সময়ে রুশবাহিনী মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে তাঁর বাসভবনের চতুর্দিকে ব্যূহ নির্মাণ করেছে। এ ব্যূহ ভেদ করে মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছবার চেষ্টা করেন তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ এবং কর্মচারীবৃন্দ যাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। এঁদের ভিতর ছিলেন সেক্রেটারি বরমান, দুই মহিলা স্টেনো, পাচিকা, খাসচাকর লিঙে, দেহরক্ষীদল, সার্জন, শোফার ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের অন্যতম হিটলারের খাস পাইলট বাওর—সৈন্যবাহিনীতে তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল জেনারেলের। ইনি পালাবার সময় শুধু ধরা পড়েন তাই নয়, মেশিনগানের গুলিতে একখানা পা এমনই জখম হয় যে পরে সেটা কেটে ফেলতে হয়।

দীর্ঘ দশটি বৎসর রাশার খ্যাত কুখ্যাত বহু প্রকারের জেল, সেল্, বন্দী শিবিরে অবর্ণনীয় কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করার পর ইনি মুক্তি পান। পূর্বেই বলেছি দেশে ফিরে একখানা বই লেখেন যার নাম, "হিটলা'রজ পাইলট"। পূর্ণ দশটি বৎসর বাওর এবং অন্যান্য জর্মন বন্দীরা কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে সক্ষম হন তার বর্ণনা দেবার মত কল্পনাশক্তি, স্পর্শকাতরতা, কলমের জোর আমার কিছুই নেই। যে নিপীড়নে মানুষ হাঙারস্ট্রাইক করে, ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যার চেষ্টা দেয় তার বর্ণনা দিয়েছেন বাওর। আমার কাছে যেটা নিদারুণতম বলে মনে হয় সেটা—পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের তমিস্র অন্তহীন রজনী—'এ বন্দীদশা থেকে ইহজন্মে আমার মুক্তি নেই'।

এবং আমার মনে হয়, তার চেয়েও 'কষ্টের বিকৃত ভান ত্রাসের বিকট ভঙ্গি' যদি কিছু থাকে তবে সেটা ঐ 'অন্ধকারের ছলনার ভূমিকা'! কি সে ছলনা? মাঝে মাঝে খবর গুজোব রটে, বন্দীদের হয়তো বা মুক্তি দেওয়া হবে। আলেয়ার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে ক্ষণতরে—আবার সেই সুদীর্ঘ নিরন্ধ্র অমানিশা।

জর্মনিতে চিরকালই দুটি দল। একদল পূর্বপন্থী—রাশার সঙ্গে মৈত্রী কামনা করে।

আডেনাওয়ার পশ্চিমপন্থী, রুশবৈরী। বিশেষত যে রুশ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী জর্মনদের দশ বৎসর পরেও কিছুতেই মুক্তি দেবে না।

রুশ 'ঘোড়া-বিক্‌কিরী'র ব্যবসা করতে চায়। যুদ্ধবন্দী বাওর ইত্যাদি 'ঘোড়া'র বদলে সে চায় আডেনাওয়ার কর্তৃক রুশকে রাষ্ট্রহিসাবে স্বীকৃতিদান, এবং পূর্ব জর্মনিকেও সে পশ্চিম জর্মনির সঙ্গে সম্মিলিত হবে দেবে না। হয়তো এটা অন্যায় নয়। হিটলার রুশ দেশে যা করে গেছেন তার বদলে এ তো সামান্য। কিন্তু আডেনাওয়ার তো আর হিটলারের প্রিয়পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস রূপে পিতার সিংহাসনে বসেননি যে হিটলারের সর্ব অপকর্মের জন্য তার 'মূল্য' দেবেন। বরং হিটলার তাঁকে করেছিলেন লাঞ্ছিত অপমানিত কারারুদ্ধ।

এবং তার চেয়েও বক্র পরিহাস—যে নাৎসি পারটির মারফৎ তিনি আডেনাওয়ারকে কারারুদ্ধ করেছিলেন সেই পারটিরই বহু গণ্যমান্য সদস্য, জাঁদরেল, অ্যাডমিরাল, হিটলারের আপন বয়স্যসখা রয়েছেন এই যুদ্ধবন্দীদের ভিতর। আডেনাওয়ারকে নতিস্বীকার করতে হবে এদেরও মুক্তির জন্য! এবারে শুনুন বাওর কি বলছেন : "But the-then the much-abused (অর্থাৎ নাৎসি কর্তৃক অপমানিত-লেখক) Adenauer came to Moscow, and our camp was wild with rumours. Our hopes rocketed from zero to feverpoint–and then fell back again. This Latter was when Bulganin publicly proclaimed that we were the scum of the earth, and that our crimes had robbed us of human semblance. We cautiosuly but closely followed the course of Adenauer's hard-fought negotiations, and we could sense that even the Russians respected the determination and integrity of the old man." ('বৃদ্ধ' সাদরে বলা হল—লেখক)

সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝে কে? একদিন সত্য সত্যই খবর এল বাওরাদি অনেকেই মুক্তিলাভ করবেন। একদল বন্দী যাবেন মস্‌কো থেকে পশ্চিম জর্মনির ম্যুনিক—যেখানে বাওরের মা-বউ আছেন। এ-মুক্তি যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাওর বলছেন, 'the memory of the journey is like a film that keeps breaking off.' প্রতিটি জর্মন গ্রামের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় উল্লাসে উত্তেজিত জনতা ছুটে আসছে ট্রেনের দিকে, বাচ্চাদের হাতে রঙিন ফানুসের জ্বলন্ত মোমবাতি, গির্জায় গির্জায় চলেছে অবিরত হর্ষোল্লাসের ঘণ্টাধ্বনি। নার্সরা ছুটে আসছে খাবার নিয়ে—

থাক্। আমার কলম অতি সাধারণ; এসবের সার্থক বর্ণনা দিতে পারেন যাঁদের লেখনী অসাধারণ, কিংবা বাওরের মত লোক যাঁরা লেখক নন কিন্তু অভিজ্ঞতাটা আছে।

এবং এর করুণ দিকটা বাওর চেপে গেছেন। যেসব পিতা মাতা জায়া এসেছিল আপন আপন আত্মজনের প্রত্যাশায়—যদিও তাদের বলা হয়েছে যে, সেসব আত্মজনের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, কিংবা মিসিং, কিংবা মুক্তি পাবে কিনা স্থির নেই—এবং যারা ফিরেছে তাদের নাম উচ্চকণ্ঠে পড়া শেষ হয়ে গেলে যখন বুঝলো তাদের আত্মজন ফেরেনি, তখন—।

*　　　*　　　*

আডেনাওয়ারের কীর্তিকলাপ একদিন হয়তো বিশ্বজন ভুলে যাবে, কিন্তু বহু বহু জর্মন

পরিবার কি বংশপরম্পরা স্মরণে আনবে না—কে তাদের পিতা, পিতামহ, বা প্রপিতামহকে একদা ফিরিয়ে এনেছিল তার বিস্মৃতপ্রায় সুখনীড়ে, দারাপুত্র পিতামাতার মাঝখানে? যার অবশ্যম্ভাবী গোর ছিল সুদূর সাইবেরিয়ার অন্তহীন তুষারাস্তরণের নিম্নে, সে কার দৈববলে হঠাৎ একদিন ফিরে এসে মুছে দিল জননী জায়ার আঁখিবারি!

জুন, ১৯৬৭॥

বিদ্রোহী

ইংরেজ কবি পার্সি বিশ্ শেলির মধ্য-শব্দটি আমরা উচ্চারণ কবতুম বিশী, কারণ অন্তে রয়েছে 'e' অক্ষরটি এবং তাই আমরা বাল্যবয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির সাদৃশ্য দেখতে পেতুম। তিনি মোলায়েম প্রেমের কবিতা লিখতেন, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার ছিলেন মাহমুদ বাদশার মত প্রতিমাবিনাশধর্মী—এ সংসারে যত প্রকারের false idols, false ideals, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তিভরে কুমড়ো গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না—তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ। তাই তিনি কবিতাগুলিকে পরাতেন প্রাচীন আসামের ছদ্মবেশ। নজরুল ইসলাম তখন সবে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহী কাজীকবি পরশুরাম হলে (ক্ষত্রিয়, ফিরিঙ্গি বিনাশার্থে তাঁর অবতরণ) প্রমথনাথ তাঁরই অনবচ্ছিন্ন পূর্ববর্তী বামনাবতার। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই হয়ে যান বারনারড শ'র প্রতি আসক্ত। এখনও আরও একটি সাদৃশ্য পাঠক পাবেন। বারনারড শ' ছিলেন প্রতিমাবিনাশী। তাঁর আদর্শ চরিত্র, সেই ব্ল্যাক গার্ল ওলড টেসটামেনটের দেবতাগুলোকে তার ডাণ্ডা দিয়ে ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে শাশ্বত ভগবানকে।

প্রমথনাথ তাঁর ডাণ্ডা—নব্‌কেরি নিয়ে আক্রমণ করতেন—প্রধানত বাঙালীর জড়ত্বকে। শান্তিনিকেতন আশ্রমও রেহাই পেত না।

এটা এল কোথা থেকে!,

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে যে-সব অন্ধস্তাবক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় কর্তাভজাদের গুরুর আসনে বসাতে চাইতেন তার বিরুদ্ধে ছিল কিশোর প্রমথর ঘোরতর 'উষ্মা'। এদেরও ছাড়িয়ে যেতেন বাইরের থেকে—প্রধানত কলকাতা থেকে—আসতেন যে-সব স্তাবক সম্প্রদায়। এঁদের কেউ কেউ বিলিতি ডিগ্রীধারী, জামাকাপড় চোস্তদুরুস্ত—কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো।

এদেরই মুখ দিয়ে ডি এল রায় বলিয়েছিলেন, কবিগুরুর উদ্দেশে :

'মর্তভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে
কে তুমি হে মহাপ্রভু নমস্তে নমস্তে!'

কিন্তু এর পর-পরই রায় করলেন ভুল; রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলালেন ঝুট কথা :

'আমি একটা উচ্চ কবি, এমনিধারা উচ্চ,
শেলি ভিক্টোর য়্যুগো মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ!'

এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ তো পোষণই করতেন না—বলা দূরে থাক্। তিনি ছিলেন শেলির ভক্ত। বস্তুত তিনি বার বার আমাদের পড়িয়েছেন শেলির কবিতা। আমার বিশ্বাস,

রবীন্দ্রনাথই বিশীদাকে শেলির প্রতি অনুরক্ত হবার পথ দেখিয়ে দেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধস্তাবকদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটলো তখন দুর্ভাগ্যক্রমে একাধিক সত্য গুণগ্রাহীকেও তাঁর কাছ থেকে অযথা কটুবাক্য শুনতে হল। ইরাণী কবি তাই বলেছেন :

দাবানল যবে দগ্ধদাহনে বনস্পতিরে ধরে
শুষ্কপত্রে, আর্দ্রপত্রে তফাৎ কিছু না করে।

পাঠকের স্মরণে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণ—যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহুলোক শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আমার যতদূর জানা, বালক প্রমথনাথ সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অন্ধস্তাবকদের চিনতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। কারণ এঁদের কেউ কেউ—বিশেষত বিলেতফের্তারা, শর ভাষায় উয়েল শেভ্‌ড্‌ এন্ড উয়েল সোপ্‌ড্‌, আসতেন আমাদের মত ডর্মিটারীবাসী নিরীহদের উপর ফপরদালালী করতে। তখন অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যেত, শব্দসমন্বয় দ্বারা যে আলিম্পন সৃষ্ট হয়ে লিরিক উচ্ছ্বসিত হয় সে রসে তাঁরা বঞ্চিত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর এবং কথা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অভূতপূর্ব সমন্বয়জনিত রসসৃষ্টি করেছে যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জড়ভরত। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আবার পয়লা-নম্বরী ব্লাফমাস্টার। তিনি যে অন্ধস্তাবক নন সেইটে বোঝাবার জন্য একজন আমাকে বলেন, "পূব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি—এই 'মরি মরিটা' কেমন যেন বস্তা-পচা বলে মনে হয় না।" আমি বিস্ময়ে নির্বাক। অতি মহৎ কবিই যে হ্যাকনিড ক্লিশের নূতন ব্যবহার করে নবীন রস সৃষ্টি করেন এ তত্ত্বটা ফিরিঙ্গি-মার্কা গ্র্যাজুয়েট জানে না? আমার তো মনে হত, এস্থলে 'মরি মরি' ভিন্ন অন্য কিছুই মানাতো না।

কিন্তু বিশীদা ছিলেন কালাপাহাড়। আশ্রমের সে সময়কার ভাষায় এদের হুট্ করে দিতে তাঁকে অতিমাত্রায় বেগ পেতে হত না। তাঁকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হত আশ্রমের ভিতরকার অন্ধস্তাবকদের নিয়ে। বিশেষ করে বিচারসভায় অর্থাৎ আশ্রম পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের বয়স তখন কত? একুশ-বাইশের মত। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনও ট্রাডিশন, ঐতিহ্য, আচার নির্মিত হতে পারে না। বিশেষত গুরু রবীন্দ্রনাথই করে যাচ্ছেন নানা প্রকারের এক্সপেরিমেন্ট। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আশ্রম প্রবর্তনের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একই পংক্তিতে ভোজন করতো না, কিছুদিন পরে একজন কায়স্থ শিক্ষক আসছেন শুনে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত, ব্রাহ্মণ শিষ্য এই অব্রাহ্মণ গুরুর পদধূলি প্রতি প্রাতে নেবে কিনা! তারই পনেরো বৎসর পর আমি যখন পৌঁছলুম তখন সে-সব সমস্যা অন্তর্ধান করেছে। ইতিমধ্যে মৌলানা শওকৎ আলী সাধারণ ভোজনালয়ে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ব্রাত্য সকলের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে গেছেন।

তবু হিন্দু মন সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করে আচারের সন্ধানে। সে চায়, সর্ব সমস্যার সামনে সে যেন নজীর দেখাতে পারে, 'এটা পূর্বে এ রকম পদ্ধতিতে হয়েছে, অতএব এবারেও সেই রকম হওয়া উচিত—এটা এ রকম হয়নি, অতএব এবারে হবে না', তাতে করে নবাগত ছাত্রের অসুবিধা হোক আর না-ই হোক। মুসলমান যে এ বাবদে দুর্দান্ত প্রগতিশীল

পরিবার কি বংশপরম্পরা স্মরণে আনবে না—কে তাদের পিতা, পিতামহ, বা প্রপিতামহকে একদা ফিরিয়ে এনেছিল তার বিস্মৃতপ্রায় সুখনীড়ে, দারাপুত্র পিতামাতার মাঝখানে? যার অবশ্যম্ভাবী গোর ছিল সুদূর সাইবেরিয়ার অন্তহীন তুষারাস্তরণের নিম্নে, সে কার দৈববলে হঠাৎ একদিন ফিরে এসে মুছে দিল জননী জায়ার আঁখিবারি!

জুন, ১৯৬৭॥

বিদ্রোহী

ইংরেজ কবি পার্সি বিশ্ শেলির মধ্য-শব্দটি আমরা উচ্চারণ কবতুম বিশী, কারণ অন্তে রয়েছে 'e' অক্ষরটি এবং তাই আমরা বাল্যবয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির সাদৃশ্য দেখতে পেতুম। তিনি মোলায়েম প্রেমের কবিতা লিখতেন, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার ছিলেন মাহমুদ বাদশার মত প্রতিমাবিনাশধর্মী—এ সংসারে যত প্রকারের false idols, false ideals, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তিভরে কুমড়ো গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না—তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ। তাই তিনি কবিতাগুলিকে পরাতেন প্রাচীন আসামের ছদ্মবেশ। নজরুল ইসলাম তখন সবে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহী কাজীকবি পরশুরাম হলে (ক্ষত্রিয়, ফিরিঙ্গি বিনাশার্থে তাঁর অবতরণ) প্রমথনাথ তাঁরই অনবচ্ছিন্ন পূর্ববর্তী বামনাবতার। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই হয়ে যান বারনারড শ'র প্রতি আসক্ত। এখনও আরও একটি সাদৃশ্য পাঠক পাবেন। বারনারড শ' ছিলেন প্রতিমাবিনাশী। তাঁর আদর্শ চরিত্র, সেই ব্ল্যাক গার্ল ওলড টেসটামেনটের দেবতাগুলোকে তার ডাণ্ডা দিয়ে ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে শাশ্বত ভগবানকে।

প্রমথনাথ তাঁর ডাণ্ডা—নব্‌কেরি নিয়ে আক্রমণ করতেন—প্রধানত বাঙালীর জড়ত্বকে। শান্তিনিকেতন আশ্রমও রেহাই পেত না।

এটা এল কোথা থেকে!,

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে যে-সব অন্ধস্তাবক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় কর্তাভজাদের গুরুর আসনে বসাতে চাইতেন তার বিরুদ্ধে ছিল কিশোর প্রমথর ঘোরতর 'উষ্মা'। এদেরও ছাড়িয়ে যেতেন বাইরের থেকে—প্রধানত কলকাতা থেকে—আসতেন যে-সব স্তাবক সম্প্রদায়। এঁদের কেউ কেউ বিলিতি ডিগ্রীধারী, জামাকাপড় চোস্তদুরুস্ত—কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো।

এদেরই মুখ দিয়ে ডি এল রায় বলিয়েছিলেন, কবিগুরুর উদ্দেশে :

'মর্তভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে
কে তুমি হে মহাপ্রভু নমস্তে নমস্তে!'

কিন্তু এর পর-পরই রায় করলেন ভুল; রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলালেন ঝুট কথা :

'আমি একটা উচ্চ কবি, এমনিধারা উচ্চ,
শেলি ভিক্টোর য়্যুগো মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ!'

এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ তো পোষণই করতেন না—বলা দূরে থাক্। তিনি ছিলেন শেলির ভক্ত। বস্তুত তিনি বার বার আমাদের পড়িয়েছেন শেলির কবিতা। আমার বিশ্বাস,

রবীন্দ্রনাথই বিশীদাকে শেলির প্রতি অনুরক্ত হবার পথ দেখিয়ে দেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধস্তাবকদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটলো তখন দুর্ভাগ্যক্রমে একাধিক সত্য গুণগ্রাহীকেও তাঁর কাছ থেকে অযথা কটুবাক্য শুনতে হল। ইরাণী কবি তাই বলেছেন :

দাবানল যবে দগ্ধদাহনে বনস্পতিরে ধরে
শুষ্কপত্রে, আর্দ্রপত্রে তফাৎ কিছু না করে।

পাঠকের স্মরণে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণ—যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহুলোক শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আমার যতদূর জানা, বালক প্রমথনাথ সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অন্ধস্তাবকদের চিনতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। কারণ এঁদের কেউ কেউ—বিশেষত বিলেতফের্তারা, শর ভাষায় উয়েল শেভ্‌ড্ এন্ড উয়েল সোপ্‌ড্, আসতেন আমাদের মত ডর্মিটারীবাসী নিরীহদের উপর ফপরদালালী করতে। তখন অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যেত, শব্দসমন্বয় দ্বারা যে আলিম্পন সৃষ্ট হয়ে লিরিক উচ্ছ্বসিত হয় সে রসে তাঁরা বঞ্চিত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর এবং কথা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অভূতপূর্ব সমন্বয়জনিত রসসৃষ্টি করেছে যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জড়ভরত। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আবার পয়লা-নম্বরী ব্লাফমাস্টার। তিনি যে অন্ধস্তাবক নন সেইটে বোঝাবার জন্য একজন আমাকে বলেন, "পূব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি—এই 'মরি মরিটা' কেমন যেন বস্তা-পচা বলে মনে হয় না।" আমি বিস্ময়ে নির্বাক। অতি মহৎ কবিই যে হ্যাকনিড ক্লিশের নূতন ব্যবহার করে নবীন রস সৃষ্টি করেন এ তত্ত্বটা ফিরিঙ্গি-মার্কা গ্র্যাড়ুয়েট জানে না? আমার তো মনে হত, এস্থলে 'মরি মরি' ভিন্ন অন্য কিছুই মানাতো না।

কিন্তু বিশীদা ছিলেন কালাপাহাড়। আশ্রমের সে সময়কার ভাষায় এদের হুট্ করে দিতে তাঁকে অতিমাত্রায় বেগ পেতে হত না। তাঁকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হত আশ্রমের ভিতরকার অন্ধস্তাবকদের নিয়ে। বিশেষ করে বিচারসভায় অর্থাৎ আশ্রম পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের বয়স তখন কত? একুশ-বাইশের মত। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনও ট্রাডিশন, ঐতিহ্য, আচার নির্মিত হতে পারে না। বিশেষত গুরু রবীন্দ্রনাথই করে যাচ্ছেন নানা প্রকারের এক্সপেরিমেন্ট। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আশ্রম প্রবর্তনের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একই পংক্তিতে ভোজন করতো না, কিছুদিন পরে একজন কায়স্থ শিক্ষক আসছেন শুনে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত, ব্রাহ্মণ শিষ্য এই অব্রাহ্মণ গুরুর পদধূলি প্রতি প্রাতে নেবে কিনা! তারই পনেরো বৎসর পর আমি যখন পৌঁছলুম তখন সে-সব সমস্যা অন্তর্ধান করেছে। ইতিমধ্যে মৌলানা শওকৎ আলী সাধারণ ভোজনালয়ে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ব্রাত্য সক্কলের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে গেছেন।

তবু হিন্দু মন সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করে আচারের সন্ধানে। সে চায়, সর্ব সমস্যার সামনে সে যেন নজীর দেখাতে পারে, 'এটা পূর্বে এ রকম পদ্ধতিতে হয়েছে, অতএব এবারেও সেই রকম হওয়া উচিত—এটা এ রকম হয়নি, অতএব এবারে হবে না', তাতে করে নবাগত ছাত্রের অসুবিধা হোক আর না-ই হোক। মুসলমান যে এ বাবদে দুর্দান্ত প্রগতিশীল

তা নয়, সেও ইনোভেশনকে ডরায় এবং তাকে বলে 'বিদাৎ', কিন্তু ইসলাম মাত্র ১৩০০ বছর পুরনো বলে অতখানি লোকাচার দেশাচারের দোহাই দেয় না।

প্রমথনাথ বিশী ছিলেন এই ট্র্যাডিশন নামক প্রতিষ্ঠানটির দুশমন। বিচার সভা তথা অন্যান্য স্থলে তিনি প্রিসীডেনসের দোহাই শুনতে চাইতেন না। তাঁর বক্তব্য—এবং সেটা সব সময়ই উত্তেজিত কণ্ঠে, পঞ্চমে, তদুপরি তাঁর কণ্ঠস্বরটি ঠিক আব্দুল করীম খানের মত নয়—শুনে আমার মনে হত, তাঁর নীতি;—নূতন সমস্যা যখন এসেছে তখন তার নূতন সমাধান খুঁজতে হবে—এবং যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে—পূর্বে হয়নি, তাই এখন হবে না এটা কোনও কাজের কথা নয়। অবশ্য তিনি যে সব সময় 'রেশনালিটি এবাভ্ অল' সচেতন ভাবে ভলতেরের মত নীতিরূপে গ্রহণ করতেন তা নাও হতে পারে। এমন কি গুরু রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতাও তিনি করেছেন। এই নিয়ে বোধ হয় গুরুশিষ্যে মনোমালিন্যও হয়েছে। তবে নিশ্চয় চিরস্থায়ী তো নয়ই, দীর্ঘস্থায়ীও নয়।

প্রমথনাথ জাত সাহিত্যিক। শান্তিনিকেতনে যখন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ স্থাপিত হল—সাধারণ জন একেই বিশ্বভারতী বলে, যেন গোড়ার ইস্কুলটি বিশ্বভারতীর সোপান নয়—তখন রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্বাচার্যদের। তাঁরা এসে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করলেন, প্রধানত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা (এবং সর্বপ্রধানত ইন্ডলজি)—চীন, তিব্বতী ভাষাও বাদ গেল না, এবং লাতিন, ফরাসী, জর্মন ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা চর্চা। সবাই সেই দয়ে মজলেন। বাঘা বাঘা পণ্ডিত যেমন বিধু শাস্ত্রী, ক্ষিতি শাস্ত্রী, সাহিত্যিক অমিয় চক্র, এস্তেক ক্ষিতিমোহনের সহধর্মিণী 'ঠানদি'—কেউ ফরাসী, কেউ জর্মন, কেউ চীনা, কেউ বা তিব্বতী শিখছেন মাথায় গামছা বেঁধে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নোটবই হাতে নিয়ে লেভির ক্লাসে শিখছেন একাক্ষরপারমিতার ঠিকুজি আর অহিবুধনিয় সংহিতার কুলজি।

শুধু শ্রীপ্রমথ নিশ্চল নির্বিকার। তিনি বেঙ্গল লিতেরাতোর পার একসেলাঁস (litterateur par excellence) বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর কোন প্রয়োজন রজত কাঞ্চন'? এমন কি সংস্কৃত ব্যাকরণ ঘাঁটতেও তিনি নারাজ। হরিবাবু ইস্কুলে যেটুকু শিখিয়ে দিয়েছেন তারই প্রসাদাৎ তিনি কালিদাস শুদ্রক পড়ে নেবেন'খন। শুনেছি লক্ষ্ণৌয়ের খানদানী ঘরের ছেলেকে উর্দু ভিন্ন অন্য কোন ভাষা বলতে দেওয়া হয় না—পাছে বিজাতীয় ভাষা বলতে গিয়ে উর্দুর তরে বিধিনির্মিত তার মুখের ডৌল অন্য ধ্বনির খাতিরে এডজাসটেড হয়ে বিকৃত হয়ে যায়!

বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগকে (কলেজকে) এহেন নিরঙ্কুশ বয়কট করার পিছনে বিশীদার হৃৎ-কন্দরে সেই 'বিদ্রোহ' ভাব ছিল কিনা হলফ করে বলতে পারবো না।

কিন্তু বি. এ. এম. এ. তো পাস করতে হয়; নইলে গ্রাসাচ্ছাদন হবে কি প্রকারে?

অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি কলকাতার কলেজে ঢুকলেন। তাঁর কলেজ-জীবন সম্বন্ধে আমি বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত জানি নে। এই মর্মান্তিক অধ্যায় তিনি বোধ হয় তাঁর জীবন-পুঁথি থেকে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তবে আমি নিঃসন্দেহ, প্রক্সি-প্রতিষ্ঠান-প্রসাদাৎ তিনি তাঁর কলেজ-জীবনের ন'সিকে কাটিয়েছেন চায়ের দোকানে, মেসের রকে এবং ইহলোক পরলোকের সর্ববিশ্ববিদ্যালয়কে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ্য অভিসম্পাত অনবরত দিতে দিতে। এবং আমি তার চেয়েও নিঃসন্দেহে, এম. এ. পাস করার পর তিনি বঙ্গভাষাসাহিত্য ও তজ্জড়িত তত্ত্ব ও তথ্য ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ার্জিত—সাতিশয় ও বিতৃষ্ণা ও চরম

জুগুপ্সাসহ অর্জিত—'জ্ঞানগম্যি' শেষনাগের মত, প্রাগুক্ত অহিবুধনিয় সংহিতার অহির বাৎসরিক ত্বকবর্জনন্যায় অক্লেশে পরম পরিতোষ সহকারে ত্যাগ করেছেন—চিরকালের তরে। লোকে যখন শুধোয়, কালচার কি—উত্তরে গুণীজন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ 'জ্ঞানগম্যি' বিস্মৃত হওয়ার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেই কালচার। কিন্তু, প্রমথনাথের কালচার অত্যন্ত কনসানট্রেটেড—নির্যাসেরও নির্যাস। মাত্র একবার, তাও অযত্নে ডেসটিল করা গৌড়ী (rum) বা মধ্বী (mead, meth) খেয়েই মানুষ হয় গড়াগড়ি দেয় নয় ল্যাম্পপোস্ট ধরে চুমো খায়—যেন লঙ লস্ট ব্রাদার। রাজা জহানগির খেতেন 'ডবল ডেসটিল্ড এরেক'। প্রমথনাথের ব্রুয়ারিতে পাক বড় কড়া—শতগুণে কড়া।

কিন্তু সেই বিদ্রোহীর কি হয়?

শ'র 'কৃষ্ণাও' একদিন হৃদয়ঙ্গম করলো, 'এলোপাতাড়ি লাঠির বাড়ি ধুপুস-ধাপুস মারাতে' .কোনও তত্ত্ব নেই। নিছক 'বর্বরস্য শক্তিক্ষয়'। প্রমথ তাই প্রমথেশের মত ধ্যানতাণ্ডবে সম্মেলন করছেন।

কিন্তু বিদ্রোহী থাকবেই।

কেন?

প্রমথর প্রিয় কবি শেলি। তাঁর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ নায়ক প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউন্ড। তিনি দেবাদিদেব দ্যোঃ পিতর, জুপিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বর্গলোক হতে অগ্নি নিয়ে এসে মানবসন্তানকে উপহার দেন—যার জন্য তাবৎ সভ্যতাসংস্কৃতির সৃষ্টি। প্রমথগণ ধূর্জটির অনুচর বা 'ইয়েস-মেন' বটেন কিন্তু প্রমথগণ অগ্নিবাহ রূপেও পরিচিত —এঁরা মরীচির পুত্র ও সপ্ত পিতৃগণের প্রমথ। তাই প্রমথ অগ্নির পুত্র। অপরঞ্চ গ্রীক পুরানে আছে প্রমিথিয়ুস নলের (reed,—এবং স্যাকরারা এখনও নল ব্যবহার করে, তথা অগ্ন্যস্ত্র অর্থে নালাস্ত্র, নালিকও ব্যবহৃত হয়) মাধ্যমে পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করেন। এবং আমাদের কাহিনীতে আছে, নলরাজ ইন্ধন প্রজ্বালনে সুচতুর ছিলেন।[১] এবং এই নলের বিরুদ্ধ দেবতারা যে-রকম লেগেছিলেন (প্রমিথিয়ুসের বিরুদ্ধে জুপিটার) অন্য কারও বিরুদ্ধে না; আমার পুরাণাদির জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ, তাই শপথ দিতে পারছি না, অন্য কোনও মানবীর স্বয়ংবরে দেবতারা সপত্নরূপে অবতরণ করেছিলেন কিনা—দময়ন্তীর বেলা যে রকম করেছিলেন। এবং নলের অন্য নাম প্রমন্থ।[২]

প্রাচীন গ্রীকেরা প্রমিথিয়ুস শব্দের অর্থ করতেন : পূর্বে (প্র) + মতি, চিন্তাকারী (methe), কিন্তু অধ্যাপককুল প্রমিথিয়ুস নিয়েছেন সংস্কৃত 'প্রমন্থ' = অরণি বা সমিধ অর্থে; যে দণ্ড মন্থন, ঘর্ষণ করে অগ্নি জ্বালানো হয়। দ্বিতীয়টিই শুদ্ধ। কারণ metheus— থেকে মথ, মন্থ। নইলে th = থ-এর অর্থ হয় না।

প্রমিথিয়ুস, নল—প্রমথ কখনও বিদ্রোহ করেন, কখনও বশ্যতা স্বীকার করেন। আমাদের প্রমথ শেষ পর্যন্ত কি করেন তার জন্য অত্যাধিক অসহিষ্ণু না হয়ে বলি।

শতং জীব, সহস্রহং জীব।

---

১ 'তিনি (নল) এক মুষ্টি তৃণ গ্রহণপূর্বক সূর্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।' দময়ন্তী সকাশে সৈরিন্ধ্রী কেশিনীর প্রতিবেদন। বন পর্ব

২ এ তত্ত্বটি আমার গুরু আমাকে বলেন কিন্তু আমি এটি কোথাও পাইনি। কেউ জানাতে পারলে বাধিত হব।

প্রোটকল

শ্রীল শ্রীযুক্ত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাত্মন,

স্বভাবতই সর্বপ্রথম প্রশ্ন উঠবে, উপরিস্থ পদ্ধতিতে আপনাকে সম্বোধন করবার হক্ক আমার আছে কিনা? অর্থাৎ এটিকেটে বাধে কিনা? আরও সরল আন্তর্জাতিক পরিভাষা ব্যবহার করতে হলে বলবো, আমার এ আচরণ 'প্রোটকল'-সম্মত কিনা।

ভয় নেই। আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে অযথা মাথা ফাটাফাটি করবো না। সামান্যতম যেটুকু নিতান্তই না হলে চলে না তারই দিকে আপনার তথা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ভোজনারম্ভে তিক্তবস্তুর ন্যায় যৎসামান্য।

কোনও কোনও শব্দের পরিধি পরিব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে যায়—কোনওটার আবার কমে। এই ধরুন না, 'কনটাক্ট' শব্দটি একদা বোঝাত নিতান্ত স্থূল ভাবে শারীরিক সংস্পর্শে আসা।

সে আমলে যদি কেউ লিখত 'উপমন্ত্রী সুশীলাবালা দাসী গত রাত্রে শ্রীযুক্ত নটবর নায়ককে কনটাক্ট্ করেছেন' তবে সেটা প্রায় অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে যেত। আজ স্বচ্ছন্দে বলি, 'প্রাচীর নব্যন্যায় অধুনা প্রতীচীর এপি্স্-টমলজির কন্টাক্টে আসাতে উভয়ই উপকৃত হয়েছেন।' অবশ্য তার অর্থ কি, আল্লায় মালুম।

প্রোটকল শব্দটির বেলাও তাই হয়েছে। একদা গ্রীক ভাষাতে বোঝাতো;—যেমন ধরুন, আপনার একখানা টাইম-টেবিল আছে। হঠাৎ ইশ্টিশানে পেয়ে গেলেন, হ্যান্ড-বিল-পারা একখানা নোটিশ। তাতে ট্রেনের সময় পরিবর্তনের নবীন ফিরিস্তি রয়েছে। আপনি সেটি আপনার টাইম-টেবিলের যথাস্থানে গঁদ দিয়ে সেঁটে দিলেন। তখন এই কাগজের টুকরোটি পেয়ে গেলেন পৈতে। হয়ে গেলেন প্রোটকল। গেরেমভারী নাম। এ-পাড়ার মেধো হয়ে গেলেন ভিন্পাড়ার মধুসূদন।

সরকারি না-হক্ক ট্যাকশো যে রকম বাড়তে বাড়তে পর্বতপ্রমাণ হয়ে যায় এ শব্দটিও আড়াই হাজার বছর ধরে বাড়তে বাড়তে তার 'তনু'টিকে অদ্যকার 'বপু' করে তুলেছে। বেশ এক যুগ পূর্বে এটিকেটের মহানগরী প্যারিসে পররাষ্ট্র বিভাগ বা ফরেন আপিসে একটি ভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে; তার নাম 'প্রোটকল বিভাগ'। একটা পুরো পাক্কা আস্ত ডিপারট্মেন্ট্।

রাজ্যচালনার কোন্ গুরুভার এঁদের স্কন্ধে সমর্পিত হয়েছে?

বহুবিধ। এমন কি আমার মত লোক না পারলেও আপনি এদের সাহায্য তলব করতে পারেন। অবশ্য কলকাতাতে এরকম পুরো-পাক্কা প্রোটকল বিভাগ আছে কিনা, আমি সঠিক জানি নে। ধরুন আছে। আরও ধরুন, আপনি, সম্পাদক মশাই, কোনও পারটিতে নর্থ পোলের কনসাল জেনরেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল তিনি ভারতীয় ফিলমে বড়ই ইনটেরসটেড। পরিচয় নিবিড়তর হল। ইতিমধ্যে তিনি আপনাকে একটি খাসা ডিনারও খাইয়ে দিয়েছেন। সেটি রিটার্ন্ করতে হয়। কনসাল্

বিপত্নীক। একটি অবিবাহিত মেয়ের বয়স একুশ—অর্থাৎ 'সোসাইটি করা'র বয়স হয়েছে। অন্য মেয়েটি পল্টনের কেপটেনকে বিয়ে করেছেন। তিনি একা এসেছেন কলকাতায়, বাপের কর্মস্থলে। ওদিকে আপনি সাউথ পোলের কনসুলেট জেনরেল শার্জে দাফেরকেও ঐ দিনই নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর ভাগিনী ও এক কন্যাও সঙ্গে আসছেন। কন্যাটির স্বামী ছিলেন। তিনি স্বামীর কাছ থেকে সেপারেশন নিয়ে পিতার সঙ্গে বাস করেন। ডিনারে আরও ইনি উনি তিনি আসবেন।

এইবারে আমরা আসছি—ইংরিজিতে যাকে বলে—থিক্ অব্ দ্য বেট্ল-এ অর্থাৎ মূল সমস্যায়। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন প্রিসীডেনস বস্তুটি সাংঘাতিক। আপনি ড্রইংরুমে ককটেলাদি পান করার শেষের দিকে যখন বাটলার এসে আপনার স্ত্রীর সামনে বাও করবে তখন তিনি মুচকি হাসবেন প্রধান অতিথির দিকে। সেই মসিয়ো ল্য কন্স্যুল জেনরেল্ যেন পবনে ভর করে আপনার স্ত্রীকে এসে দান করবেন তাঁর দক্ষিণ বাহু। তারই উপর 'নির্ভর' করে দুজনাতে এগোবেন খানা-কামরার দিকে। এরপর যাবেন আপনি। কিন্তু দক্ষিণ বাহু দান করবেন কাকে? সাউথ পোলের শার্জে দাফেরের স্ত্রীকে, না নর্থ পোলের অবিবাহিতা কন্যাকে, না কেপটেনের স্ত্রীকে, না কর্নেলের তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে?...এবং তারপর আসবেন কোন্ জোড়া, তারপর, ইত্যাদি।

তাই আপনি সুবুদ্ধিমানের মত পূর্বাহ্ণেই ফোন করেছেন, শ্যাফ্ দ্য প্রোটকলকে—অর্থাৎ প্রোটকলের বড় কর্তাকে। অতি অমায়িক লোক। তদুপরি আপনি সম্মানিত কাগজের তারই মত শ্যাফ্, বড় কর্তা। কে কতখানি সম্মান পাবেন, তাদের দফতর ফিস্তি দিলে আপনার প্রিসীডেনস কি—অর্থাৎ কার আগে কার পরে আপনি খানা-কামরায় ঢুকবেন—তার প্রোটকলে আপনার নাম উঁচুর দিকে। অতএব একগাল হেসে বলবেন,—'সে কি মসিয়ো—(ভুললে চলবে না, আন্তর্জাতিক প্রোটকলের ভাষা এখনও ফরাসিস্!)—আপনি অতখানি আঁবায়াসে (এমবারাস্ট্) হচ্ছেন কেন? এ যে একেবারে ডিমের খোসায় কালবৈশাখী। আপনি তো আর অফিশিয়াট ডিপ্লোমেটিক ডিনার দিচ্ছেন না। কি বললেন? না, না, না—পারদোঁ, আমি আপনার ব্যান-কুয়েটটাকে মোটেই হেনস্থা করছি নে। তবু বলছি, ওটা তো—'

ঐ আনন্দেই থাকুন, সম্পাদক মশাই, ওঁকে বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন।

যতই 'ঘরোয়া' 'বাড়ির ব্যাপার' 'ফেমিলি ওয়ে' বলে নেমন্তন্ন করুন না কেন,—এবারে খাঁটি দিশী তুলনা দিচ্ছি—সেখানে যদি মাছের মুড়োটা আপনার দিদির শ্বশুরকে না দিয়ে দেওয়া হয় আপনার ভাগ্নের শ্যালাকে, তদুপরি উনি কুলীনস্য কুলীন, আর কালো ছোকরা মৌলিকস্য মৌলিক, তা হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে? আমি বলছি না, শ্বশুরমশাই বাড়ি ফিরে এ্যাট হিজ আরলিএস্ট কনভিনিয়েন্স্ আপনার দিদির পিঠে—ছি, ছি, তিনি আবার বৌমা—দু ঘা, না না, তা বলছি নে।

প্রোটকলের শ্যাফ্ সবিশেষ অবগত আছেন যে আপনি তার স্তোকবাক্য সিরিয়সলি নেননি। তিনিই বলবেন।

'সে তো হল। কিন্তু ঐ যে বললেন সাউথ পোলের ডিভোর্স কন্যা—স্বামী ছিলেন কর্নেল—তিনি এখন কি নামে পরিচয় দেন? ঠিক ডিভোর্স তো হয় নি—হয়েছে সেপারেশন।'

'সেটা কি ইমপরটেন্ট?'

'ভেরি, ভেরি। মহিলাটি যদি স্বামীর নাম ত্যাগ করে পুনরায় তাঁর মেডেন (কুমারী) নাম, অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম গ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি পাবেন সেই পরিবারের র‍্যাঙ্ক, নইলে পাবেন কর্নেলের বিবাহিতা স্ত্রীর র‍্যাঙ্ক। তার পর দেখতে হবে—'

ততক্ষণে আপনার মাথাটি তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। ভাবছেন, এবারে আর ডিমের খোসাতে টর্নাডো নয়, আপনার কানের টিম্‌পেনামে চলেছে মহাবেগে যুগ্ম রুশমার্কিন নির্মিত স্পুটনিক।

আম্মো ভাবছি আজ যদি ডাচেস অব উইনজর তৃতীয় বারের মত যদি, মানে, ইয়ে হয়ে যান তবে তাঁর নাম কি হবে? শুনেছি, হালে নাকি তিনি লন্ডনে 'জলচল' হয়ে গেছেন। ড্যুককে বয়ের পূর্বে মিসেস সিমসন অবস্থাতে তিনি রজবাড়িতে দাওয়াৎ খেয়েছেন—যদ্যপি রাজমাতা মেরি সে দাওয়াৎ বর্জন করেন। তাঁর সে 'বামনাই' নাকি প্রোটকল-নিন্দিত অপকর্ম হয়েছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এখন প্রশ্ন, ডাচেস যদি আরেকটা ডিভোর্স নেন তবে তিনি লন্ডনে সাধনোচিত ধাম পাবেন কিনা, অর্থাৎ বকিংহম ধামে নিমন্ত্রিত হবেন কিনা?

হাসছেন? হাসবার জিনিস মোটেই নয়। চাকরি যেতে পারে। রুটি মারা যেতে পারে।

নিন্ হিটলারের যে কোনও প্রামাণিক জীবনী। পড়ুন ঘটনাটা। হিটলার গেছেন ইতালি—স্টেট ভিজিটে। সঙ্গে গেছেন ফরেন আপিসের শ্যাফ্ দ্য প্রোটকল। শ্যাফটি সাতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে। পোষা বেরালটাকে আগে দুধ দিতে হয়, না কুকুরটাকে হাড্ডি—সে প্রোটকল তিনি সাত বছর বয়সেই পারিবারিক কাস্‌লে যুক্তিতর্কসহ সপ্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

ইতালির রাজা সর্বান্তঃকরণে ঘেন্না করতেন হিটলারকে—অবশ্য অনুভূতিটা ছিল উভয়পক্ষীয়, সাতিশয় 'বরাবরেষু'! রাজা পাতলেন ফাঁদ, হিটলারকে অপদস্থ করার জন্য। শেষ মুহূর্তে কি একটা হয়ে গেল রদবদল। যার ফলে হিটলার উপস্থিত হলেন কি এক পরবে সিভিল ড্রেস পরে, যেখানে আর সবাই য়ুনিফর্মে। কিংবা উল্টোটা।

বিশ্বসংসার জানে হিটলার ছিলেন অত্যন্ত বদ-মেজাজী লোক—যদিও একথাও সত্য যে মিষ্টি ব্যবহার করতে চাইলে তিনি পারমিট-প্রার্থী মেবারবাসীকে তিন লেনথে হারাতে পারতেন—দুষ্টলোকে বলে, তিনি তখন মেঝেতে শুয়ে পড়ে কারপেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাঁকে নাকি বলা হত The Carter-Eater!

প্রোটকল শ্যাফ্ বরখাস্ত হয়ে প্রথমতম ট্রেনে নামল বরাবর আপন গাঁয়ে। হিটলার তাঁর মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি।

অবশ্য এর সরস দিক নিয়েও একাধিক কাহিনী আছে। বাল্যকালে হিটলার যে অস্ট্রিয়ার নগণ্য প্রজা ছিলেন সেই বিরাট অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির মহিমান্বিত সম্রাট ছিলেন কাইজার ফ্রানৎস য়োজেফ। তাঁর 'ভাব-ভালবাসা' ছিল সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী শ্রাটের সঙ্গে! তিনি প্রায়ই কাইজারকে বলতেন, 'আপনি স্টেজের উপর গিরার্ডির রসিকতা শুনে হাসতে হাসতে কাত হয়ে পড়েন। স্টেজে আবার রসিকতা করার সুযোগ পান গিরার্ডি কতটুকু? পাব্-এ, বার-এ, স্টেজে মজলিসে তিনি যা একটার পর একটা ছেড়ে যান তার তুলনায় কেউ কখনও করতে পেরেছেন বলে কোনও কিংবদন্তী পর্যন্ত এই বিরাট ভিয়েনা

শহরে নেই।' তাই গিরার্ডিকে কফি পানে নিমন্ত্রণ করা হল। কাইজার তো এলেন বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে। ওদিকে কী আশ্চর্য! গিরার্ডির কোটের বোতাম ওপরবাগে উঠতে উঠতে যেন তাঁর ঠোঁট দুটোকেও বোতামিত করে দিয়েছে! নিজের থেকে কথা কন না আদৌ, প্রশ্ন শুধোলে মহা সসম্ভ্রমে যেটুকু বলেন সেটি তার গোঁপের ছাঁকনিতেই আটকা পড়ে যায়।

কফি পান খতম হতে চলেছে। শেষটায় থাকতে না পেরে হতাশ কাইজার ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'মাই ভেরি ডিয়ার গিরার্ডি! আপনার মজলিস-জমানো কথার ফুলঝুরি সম্বন্ধে আমি কত মুখে কতই না বেহদ্দ তারিফ শুনেছি—আর এ কি?'

রুমাল দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে একেবারে গ্রাম্য ভাষায় গিরার্ডি বললেন, 'কফি খাইতে বইয়া দ্যাহেন্ না!'

বেচারি গিরার্ডি প্রোটকলকে কনসল্ট করে কফি খেতে এসেছিলেন!

তাঁর শেষ বাক্যটি ঠিক প্রোটকলসম্মত কিনা সে নিয়েও আমার মনে ধোঁকা আছে।

একদম হালের ঘটনায় চলে আসি।

এই গত ৯/১০ই জুন তারিখে আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ইজরাএল সকলেই যখন অস্ত্রসম্বরণ (সীস ফায়ার) করতে রাজী হয়ে গেছেন তখন রাশা ইউনাইটেড নেশনের সিকুরিটি কৌনসিলে বিশেষ জরুরী সভা ডাকার জন্য প্রস্তাব পাঠালে; তার অভিযোগ, ইজরাএল সীস ফায়ার করেনি—ক্রমাগত সিরিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সীটিং বসলো সকাল ন'টা-দশটায়। এদেশে তখন রাত বারোটা। মিটিঙে বসানো মাইকের মারফত তার প্রত্যেকটি বাক্য ভইস অব আমেরিকার নিউজ রুমে আসছে। সেইটে ফের বেতারিত হয়ে রিলের পর রিলের মারফত ভারতে পৌঁচচ্ছে। অধমের অনিদ্রা ব্যাধি আছে।

এই সিকুরিটি কৌনসিলের কর্মপদ্ধতি অতিশয় ছিমছাম। যে যার বক্তব্য বলে যান সাধারণত অতিশয় শান্ত-কণ্ঠে। কেউ কাউকে বাধা দিয়ে আপন কথা বলতে চায় না—অতি দৈবসৈবে কেউ যদি কখনও করে তবে বার বার মাফ চেয়ে, ও বাধাপ্রাপ্ত বক্তাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান। চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের কথাই ওঠে না।

প্রেসিডেন্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি এখন সোভিয়েত রাশিয়ার মহামান্য ('ডিস্‌টিংগুইসট' শব্দটি প্রতিবার প্রতি মেম্বারের উল্লেখ করবার সময় ব্যবহার করাটা প্রোটকলানুযায়ী নিরঙ্কুশ বাধ্যতামূলক) ডেলিগেটকে ''ঘরের ফ্লর'' ছেড়ে দিচ্ছি।' অর্থাৎ তখন ঘরের ফ্লর—মেঝেটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলার হক্ক সোভিয়েত ডেলিগেটের। অবশ্য তিনি ফ্লর গ্রহণ নাও করতে পারেন।

মহামান্য রাশান ডেলিগেট দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্পাসিব'—কিংবা 'ব্লাগোদারিয়ু ভাস'ও বলে থাকতে পারেন। অর্থ একই; 'থ্যাঙ্ক্যু'। অর্থাৎ তিনি ফ্লর গ্রহণ করলেন।

তারপর এখন যে বিবৃতি নিবেদন করছি সেটা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে। 'সন্দেশপিচেশ' পাঠক আমার অত্যল্পই। তাঁরাও ঐ সময়কার খবরের কাগজ পড়ে চেক-অপ করে নিতে পারবেন, তাঁদের হাত দিয়ে আমি দা-কাটা তামাক অর্থাৎ সাতিশয় স্থূল ভুল—খেয়েছি কিনা। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে সারছি।

রুশ : 'থ্যাঙ্কু, মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি বলতে চাই, এই সম্মানিত কৌনসিল আরব এবং ইজরাএল উভয়কে আদেশ দিয়েছে সীস-ফায়ার মেনে নিতে। সিরিয়ার মহামান্য ডেলিগেট বলেছেন, সীস-ফায়ার মেনে নেওয়া সত্ত্বেও ইজরাএল সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়িসহ ক্রমাগত রাজধানী দিমিশকের (ডিমেস্কাস্, দামা, ডামাস্কুস) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বোমারু বিমান অনবরত রাজধানীর উপর বোমাবর্ষণ করছে। আমি প্রস্তাব করি, কৌনসিল সর্বসম্মতিক্রমে ইজরাএলের এ আচরণের নিন্দা করুক। ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট!'

(বক্তৃতা শেষ করে কোনও কোনও সদস্য ভবিষ্যতে তাঁর বক্তৃতার কি ভাষ্য হবে না হবে সে বাবদে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী জানান। পক্ষান্তরে বক্তব্য স্পষ্ট 'হ্যাঁ' 'না' বা নিতান্ত দ্ব্যর্থহীন হলে সে অধিকার যে রাখছেন না, সে-কথাও বলে দেন। এটার প্রয়োজন এই কারণে যে কৌনসিলের বাহান্ন রঙের নানান চিড়িয়া নানান বুলি কপচান। অনুবাদ নিয়ে পরে তাই নানা হক্ক না-হক্ক তর্ক ওঠে)।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি এখন ইজরাএলের মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর ছেড়ে দিচ্ছি।'

ইজরাএল ডেলিগেট : 'আমার মহামান্য সরকার যখন সীস-ফায়ারের স্বীকৃতি দেন তখন তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমরা সীস-ফায়ার মানবো, কিন্তু শর্ত (অন কন্ডিশন) যে আরবরাও তাই মানবে।" অতএব সীস-ফায়ারটা ম্যুচুয়াল করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার মহামান্য সরকার তাঁর সেনাবাহিনীতে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন।'

এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে হয়তো বা রুশ ডেলিগেট নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারেন। সে-সম্ভাবনা দেখে প্রেসিডেন্ট ফের রুশকে ফ্লর দিলেন।

রুশ : (অতি সামান্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে) 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! এ তো বড় তাজ্জবকী বাত! এই "মুচ্যুয়াল সীস-ফায়ার" রহস্যটা কি? মহামান্য ইজরাএল ডেলিগেট কি বলতে চান, প্রথমে, পয়লা, সিরিয়া সীস-ফায়ার করবে, তবে ইজরাএল অস্ত্রসংবরণ করবেন? তদুপরি, মিঃ প্রেসিডেন্ট, 'ম্যুচুয়াল' শব্দটাই আমাদের অনুশাসনে নেই। এবং আসল তত্ত্ব, ইজরাএলই আক্রমণ করেছে প্রথম। সীস-ফায়ার করতে হবে তাকেই প্রথম। আচমকা ঐ ম্যুচুয়াল শব্দ আমদানি করে ইজরাএল কথার মারপ্যাঁচ (কজিস্ট্রি) আরম্ভ করে মূল সত্য এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? (তারপর অতি সামান্য ব্যঙ্গের সুরে—লেখক) এরপর বুঝি সফিস্ট্রি আরম্ভ হবে! (কথার প্যাঁচে সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণের ভদ্র নাম সফিস্ট্রি—রুশ সদস্য ফেদেরেন্‌কো 'কজিস্ট্রি' ও 'সফিস্ট্রি' দুটো শব্দই ব্যবহার করেছিলেন যৎসামান্য ব্যঙ্গের সুরে—কারণ ইজরাএল সদস্য যে সত্যিসত্যিই পাঁকাল মাছের গা মোচড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছেন সেটা ততক্ষণ শত্রুমিত্র সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—লেখক)। মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি আদৌ অবিশ্বাস করছি নে যে, ইজরাএল সরকার তাঁর সেনাবাহিনীকে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু মহামান্য ইজরাএল সদস্য বলুন তারা সেটা মেনে নিয়েছে কিনা, তিনি বলুন, তারা সিরিয়ায় ক্রমাগত আরও অনুপ্রবেশ করছে কিনা? থ্যাঙ্ক্যু মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্ট : 'আমি মহামান্য ইজরাএলের ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শোনা গেল ফের প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর : 'আমি মহামান্য বুলগেরিয়ার ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।' স্পষ্ট বোঝা বেল মহামান্য ইজরাএল 'ফ্লর গ্রহণ' করলেন না। প্রোটকলানুয়ায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁকে হুকুম দিতে পারেন না।

বুলগেরিয়া (ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে—বস্তুত একমাত্র ইনিই কিঞ্চিৎ উত্তেজনা দেখান—যদিও সর্বভদ্রতা বজায় রেখে। ইজরাএল কথা বলেছে স্বভাবতই বিজয়ীর গর্বিত কণ্ঠে, সিরিয়া করুণ ফরিয়াদভরা সুরে—আর ইজরাএলের জয়ে খুশীতে ডগমগ মার্কিন তথা তার ফেউ ইংরেজ করেছে, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ) : মিঃ প্রেসিডেন্ট! ইজরাএল উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমি শুধু জানতে চাই, ইজরাইল বাহিনী এখন কোথায়? সিরিয়াতে? "হ্যাঁ, কি "না" তিনি যদি না বলেন তবে আমরা ভেবে নিয়ে জেনে যাবো।' (ডিলেমাটি সুন্দর "If Israel speaks, we shall speak; if Israel does not speak we shall know,"—লেখক)

প্রেসিডেন্ট পুনরায় ইজরাএলকে ফ্লর দিলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

প্রেসিডেন্টের গলা : 'আমি মালির মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, 'ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করেননি, করতে চানও না। এরপর বোধ হয় কর্মসূচীতে মালি রাষ্ট্রের নাম ছিল।

মালি : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমরা সবাই এখানকার সদস্য। এক সদস্য যদি অন্য সদস্যের কাছে কিছু জানতে চান তবে আপনি তাঁকে সেটা শুধোচ্ছেন না কোন্ বিধি অনুসারে? থ্যাঙ্ক্যু! (বা ঐ ধরনের)

প্রেসিডেন্ট : 'আমি সম্মানিত মালি সদস্যের কাছে জানতে চাই, আমি যে সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে সম্মানিত রুশের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো তা কোন্ বিধি অনুয়ায়ী?' মালি কোন উত্তর দিতে চান কিনা ঠাহর হল না। কারণ ইতিমধ্যে রুশ সদস্য ফ্লর চাইলেন। প্রেসিডেন্ট সসম্মানে তাই দিলেন।

রুশ : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! সভার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্য আমরা ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট মেনে নিয়ে থাকি। সেই অনুযায়ী যে কোনও সদস্য যে কোনও খবর যে কোনও সদস্যের কাছে চাইতে পারেন। এই তো আমরা সভার সদস্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্তকে অনুরোধ করলুম সিরিয়া থেকে তাজা খবর আনিয়ে দিতে। তিনি দিলেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৎসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে প্রশ্নটি শুধোলেন না। তিনি কিন্তু একাধিক বার তাঁকে সসম্মানে ফ্লর ছেড়ে দিলেন। ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করলেন না।

তবেই বুঝুন, সম্পাদক মশাই, প্রোটকলের ঠেলা কী চীজ!

কিন্তু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন : প্রেসিডেন্ট—থুড়ি—সম্পাদক মশাই (ক্ষণতরে ভাবছিলুম, আমি বুঝি সেকুরিটি কৌনসিলে পৌঁছে গিয়েছি!) এটা কিছু নতুন তত্ত্ব নয়। আমি প্রাচীনপন্থী পদি পিসির অপজিট পুংলিঙ্গ। যা নাই ভারতে—! খুলে বলি।

সেকুরিটি কৌনসিলের কার্যকলাপ যখন আমি সরাসরি বেতার শুনছি তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল এই রকমই একটি ধুন্ধুমার যেন আমি সশরীরে কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ ধুন্ধুমার কথাটাই সব মনে করিয়ে দিল। যে মধুকৈটভ-নিধন শ্রীবিষ্ণুকে

আর্যভদ্রগণ সায়ংপ্রাতঃ স্মরণ করেন সেই বিষ্ণু তথা অন্যান্য দেবাদ্দিকে প্রচণ্ড নিপীড়ন আরম্ভ করে মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধুমার এবং অবশেষে নৃপতি কুবলাশ্ব কর্তৃক নিহত হয়। মহাভারতের আপ্তবাক্যমধ্যে সেটি লিপিবদ্ধ আছে।

ধুন্ধুমার স্মরণ করিয়ে দিলে সেই সভা, যেখানে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। আমি জাতিস্মর। আমি সে-সভায় উপস্থিত ছিলুম তখনকার দিনের পি-টি-আই চীফ রিপোর্টার মূলগায়েন সঞ্জয়ের দোহার রূপে।

পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে দুইটি নিরপরাধ ব্যক্তি যেভাবে আত্মসমর্থন করেছেন তার তুলনা আজও ইহসংসারে অলভ্য। ঐতিহাসিক যুগে সোক্‌রাতেস, তার বহু পূর্বে দ্রৌপদী।

কিন্তু অবিস্মরণীয় তত্ত্ববাক্য :—সোকরাতেস জাত দার্শনিক, পাঁড় তার্কিক। তিনি যে আত্মপক্ষ সমর্থনকালে শাণিত শাণিত তর্কবাণে অ্যাথিন্‌স্ নগরীর নভোমণ্ডল দিবাভাগে তমসাচ্ছন্ন করে দেবেন তাতে আর বিচিত্র কি? সেকুরিটি কৌনসিল প্রসঙ্গে পূর্বেই নিবেদন করেছি রুশ প্রতিনিধি ফেদেরেনকো ইজরাএলকে 'সফিস্‌ট্' আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। সোকরাতেস এই সব সফিস্‌ট্‌দেরই নগরীর মুক্ত হট্টে বাক্যেতর্কে নিত্য নিত্য অম্লতক্র পান করাতেন। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন অত্যাশ্চর্য অবিস্মরণীয় হলেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়।

কিন্তু একবস্ত্রা যাজ্ঞসেনী আত্মসমর্থনহেতু দুর্যোধনের সভামধ্যে যে যুক্তিজাল বিস্তার করে কতিপয় সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্মুখে তদানীন্তন ভারতের গুণীজ্ঞানী শূরবীর সমন্বিত সর্ববৃহৎ সভা নিরঙ্কুশ নিরুত্তর। অসূর্যম্পশ্যা কৃষ্ণা যে আইনকানুন প্রোটকল সম্বন্ধে কতখানি অনভিজ্ঞা ছিলেন তা তাঁর সভামধ্যে রোদনের সময়ই ধরা পড়েছে : 'হায়, আমি স্বয়ংবরকালে রঙ্গমধ্যে ক্রমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপাতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, যাহাকে পূর্বে বায়ু ও আদিত্য পর্যন্ত দেখিতে পান নাই...' (আমরা বলি) তিনি যে সোক্‌রাতেসের মত সেকালের কোন প্রটো-আকাডেমির সদস্যা ছিলেন না অথবা ডক্টরেট অব্ জ্যুরিসপ্রুডেন্স পাস করেননি সে বাবদে আমারা স্থিরনিশ্চয়, দৃঢ়প্রত্যয়। তাই পাঞ্চালীর ডিফেন্‌স্ আমাদের কাছে 'ঘৃত-লবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনসমস্যাহীন কলিকাতা মহানগরীর' মত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এ যেন সেকুরিটি কৌনসিলের ঠিক উল্টো পিঠ। হেথায় তাবৎ সভা কা কা রবে চিৎকার করছে ডিসটিংগুইশ্‌ট্ ইজরাএল প্রতিনিধি নিশ্চুপ, নীরব। অথচ তাঁর জিভে ফোস্কা পড়েনি, তাঁর টনসিলে বাত হয়নি। সভায় ৯৫ নয়া পয়সা মেম্বার কোনও প্রোটকল খুঁজে পাচ্ছেন না যেটা গজাঙ্কুশের মত প্রয়োগ করে ইজরাএলের দাঁতকপাটি খুলতে পারেন।

আর হেথায় দ্রুপদতনয়া বারংবার একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, ধর্মরাজ দ্যূতক্রীড়ায় 'অগ্রে আমাকে কি নিজেকে বিসর্জন করেছেন?' (ইজরাএলকেও মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'ইজরাএলি বাহিনী এখন কোথায়?') যুক্তিটি অতি সুস্পষ্ট। ধর্মরাজ যদি নিজেকে স্টেক্ করে আগেভাগেই খুইয়ে ফেলে দুর্যোধনের দাস হয়ে গিয়ে থাকেন তবে যেহেতু দাসের কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকতে পারে না, অতএব 'দাস'

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে স্টেক করতে পারেন না (দাস হবার পূর্বেও তিনি মাত্র ২০% মালিক—কিন্তু এ ল'পইনট্ বোধ হয় তখন ওঠেনি)।'[১]

তা সে যা-ই হোক, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরই তিনি পাচ্ছেন না। এবং হা অদৃষ্ট! কোনও প্রোটকলও খুঁজে পাচ্ছেন না যার চাপে তিনি সভাসদদের মুখ খোলাতে পারেন। বরঞ্চ ভীষ্ম যে প্রোটকল উত্থাপিত করলেন তার মোদ্দা : ডিস্‌টিংগুইশ্‌ট্ দ্রুপদতনয়া তাঁদের প্রশ্ন শুধিয়েছেন (ইংরিজিতে এস্থলে বলে 'বার্কিং আপ দি রং ট্রী')। তাঁর উচিত তাঁর স্বামী ধর্মরাজকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। তিনিই বলতে পারেন, কৃষ্ণা 'জিতা বা অজিতা'।

কিন্তু বিদুর যে জিনিসের আশ্রয় নিলেন, সেটাকে প্রীসিডেনস, নজীর বা হদিস বলা যেতে পারে, ঠিক প্রোটকল নয়। তাঁর মতে মহর্ষি কশ্যপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদকে অনুশাসন দেন 'হে প্রহ্লাদ, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে তাহারা সহস্র সংখ্যক বারুণ-পাশ দ্বারা বন্ধন পায়।'[২] অর্থাৎ silence সর্বাবস্থায় golden নয় (অবশ্য এস্থলে gold is silent, কারণ সভাসদদের প্রায় সকলেই দুর্যোধনের gold পেয়ে silent !)।

কিন্তু এ নজীর ধোপে টিকল না। মহাভারতকার বলছেন, বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ পার্থিবরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না!!!

কিন্তু এ সব চুলচেরা বাগ্‌বিতণ্ডার মূলে কে?

দ্রৌপদী যে প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন সেটা তো কেউ সেকেন্ড করবে। নইলে সেটা উলট্রা ভিরেস, নাকচ।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সেকেন্ড করে বসল দুর্যোধনের ছোট ভাই চ্যাংড়া অর্বাচীন বিকর্ণ! তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, 'যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ইঁহারা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন।' তারপর তিনি যখন দেখলেন, 'সভাসদবর্গের কোনও ব্যক্তিই সাধু অসাধু কিছুই কহিলেন না' তখন হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, অর্থাৎ অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে রায় দিলেন, 'এইসকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

সর্বনাশ! আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে এ যেন নিতান্ত চ্যাংড়া ঘানা বা মালি রাষ্ট্র সেকুরিটি কৌনসিলে বলে বসল, 'এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে (অর্থাৎ যেহেতু ইজরাএলই প্রথম আক্রমণ করেছে) সাইনাইকে ইজরাএলের) প্রাচীন দিনের ভাষায় দুর্যোধনের) জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

ধুন্ধুমার লেগে গেল সভায়, মহাভারতের ভাষায় 'সঙ্কুলরবে' (একসুরে) 'তুমুল

---

১ ইসলামে দাস যেমন আইনত পূর্ণ নাগরিক নয় (সেখানেও সে কোনও কিছু স্টেক করতে পারে না) ঠিক তেমনি সে কোনও আইনভঙ্গ করলে (চুরি, ডাকাতি) তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয় না। খেসারতি দিতে হয় মুনিবকে।

২ জ্বর-জ্বালাদি রোগকেও 'পাশ' বলে ধারণা করা হত বলে অথর্ববেদে ঋষি পাশমুক্তির জন্য বরুণদেবকে আহ্বান জানাতেন।

নিনাদ' উঠলো সভাস্থলে। এখানে আমার বলা উচিত যে, বিদুরাদি কেউ কিছু বলার পূর্বেই বিকর্ণ আপন রায় দিয়ে বসে আছেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, প্রবীণরা নীরবতা দিয়ে দ্রুপদনন্দিনীর প্রশ্নটি পিষে ফেলবেন—'নীরবতা' যে শুধু মাত্র 'হিরণ্ময়' তাই নয়, সরব প্রশ্নকে নিধন করার মরণাস্ত্রও বটে।

অনেকেই বিকর্ণের পক্ষে সায় দিচ্ছেন দেখে কর্ণ 'ফ্লর' গ্রহণ করলেন। বললেন, 'হে বিকর্ণ' এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে—'

আমরাও বলি, 'সেই কথাই কও।' 'বিকৃতি' মানে প্রোটকল-সম্মত নয়!

কর্ণ বললেন, 'তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য হইয়া স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, পর্ব বিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞ হও নাই—'

এইবারে কর্ণ মারলেন পেরেকটার ঠিক মাথার উপর মোক্ষম ঘা। এই পর্ব বস্তুটি কি? কারণ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের যে নির্ঘণ্ট আছে তার প্রথমটার মতে বিকর্ণের নম্বর আট, দ্বিতীয়টির মতে উনিশ।

আর 'পর্ব' অর্থই হচ্ছে 'নির্দিষ্ট'—আমাদের 'পরব' মাত্রই হয় নির্দিষ্ট দিন ক্ষ্যাণে। তাই 'পর্ব'ই হচ্ছে প্রোটকল। যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যার থেকে নড়চড় নেই। বিকর্ণ সেই প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর ও দ্রৌপদীর কার্যোদ্ধার অংশত হয়ে গেছে। ওদিকে আবার কর্ণ স্বয়ং করে বসেছেন প্রোটকলে গলদ!

কারণ সভারম্ভেই মিঃ প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন প্রোটকল ধার্য করে দিয়েছেন—কর্ণ যাকে 'পর্ব' বলেছেন—যে, 'কৌরবগণ দ্রৌপদীর সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন।' অর্থাৎ তিনি ফ্লর দিয়েছেন কুরু সদস্যদের। অপিচ কর্ণ আইনত (ডে জুরে) রথচালক শ্রেণীর লোক—আজকের ভাষায় 'শোফার সর্দারজী ক্লাস' [যদ্যপি প্রকৃতপক্ষে (ডে ফাক্‌টো) তিনি কুন্তীনন্দন প্রথম পাণ্ডব;] কিন্তু সদস্যগণ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে এ-বিবেচনা এস্থলে উঠতে পারেনি, কস্মিনকালে ওঠেওনি। তিনি ফ্লর গ্রহণ করতে পারেন না। তবে বিকর্ণ যে প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন সেটা হয়তো তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন—কারণ পইন্‌ট্ অব্ অরডার সভাসীন যে-কোনও সদস্য যে-কোন সময়ে তুলতে পারেন! কিন্তু তারপর কর্ণ যখন বললেন, 'দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই শকুনি ধর্মত জয় করিয়াছেন' তখন তিনি বিলকুল আউট অব্ প্রোটকল কারণ প্রেসিডেন্ট রুলিং দিয়েছেন, উত্তর দেবেন কৌরবরা।

অতএব দ্রোণ যে ফ্লর গ্রহণ করেননি সেটাও অতিশয় করেক্‌ট্। কারণ তিনি ও অন্যান্য কৌরবেতররা অবগত আছেন ব্যাপারটা বহুলাংশে কুরুপাণ্ডবের ঘরোয়া ব্যাপার। যে শকুনি সর্বস্ব জয়লাভ করেছেন তিনিও তাঁর হক্কের দাবী করে ফ্লর চাননি।

বস্তুত সভাপতিরূপে ডিস্‌টিংগুইশ্‌ট্ প্রেসিডেন্ট মিঃ দুর্যোধনের আচরণ অক্ষরে প্রোটকলসম্মত। তিনি কুরুকুলকে ফ্লর দিয়েছেন কিন্তু কী ভীষ্ম বিদুর কাউকে কিছু বলার জন্য কোনও চাপ দিচ্ছেন না।

অবশেষে তুমুল বাগ-বিতণ্ডার পর প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে কুরুকুলের কেউই আপন সুচিন্তিত অভিমত দিচ্ছেন না, যাজ্ঞসেনী যে 'জিতা' সে রায় দূরে থাক (কর্ণের রায়ের মূল্য নেই, এবং দুঃশাসন তখন 'প্রতিহারী' বা 'বেলিফ' বা সভার 'মারশাল'; এবং তিনিও সুদ্ধমাত্র দ্রৌপদীকে অপমানার্থে 'দাসী দাসী' বলে সম্বোধন

করছেন, যুক্তিতর্ক দ্বারা শকুনির লিগেল-রাইট্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তখন তিনি যে রুলিং দিলেন সেটাও অতিশয় ন্যায্য। তিনি জানতেন যে যদিও তিনি আইনত প্রেসিডেন্ট, তবুও এ-তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কুরুকুলের সর্বোচ্চ আসন ধরেন। তিনি যখন স্পষ্ট বলেছেন, স্বয়ং ধর্মরাজ এর মীমাংসা করুন তখন এ-সিদ্ধান্ত এক হিসাবে তাবৎ কুরুবংশের সিদ্ধান্ত। এবং যেহেতু দুর্যোধন সভারম্ভেই বলেছেন কুরুকুল উত্তর দেবেন তখন যুক্তিযুক্তভাবেই শেষ উত্তর দিলেন, কুরুকুলের সিদ্ধান্ত; ধর্মরাজ উত্তর দেবেন। কিন্তু ধর্মরাজ যখন ফ্লর গ্রহণ করলেন না, তখন তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, (ধর্মরাজ যখন ফ্লর নিচ্ছেন না তখন প্রোটকলানুযায়ী তাঁর কনিষ্ঠেরা ফ্লর পাবেন—হুবহু যেরকম অপর পক্ষে বিকর্ণ পেয়েছিলেন, 'হে যাজ্ঞসেনী, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের মত-ই আমার মত।'

এবং এঁরাও ফ্লর গ্রহণ করলেন না। অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন না।

এখানেই সভা শেষ।

সম্পাদক মহাশয়, যতই চিন্তা করি, পুনরায় মহাভারত অধ্যয়ন করি, পুনরায় চিন্তা করি, তখন দেখি, সেই অতি প্রাচীনকালে আমরা কতখানি ন্যায়-ধর্ম ও প্রোটকল মেনে সভা চালাতুম! যদি দুঃশাসনের অনার্যাচরণের কথা তোলেন তবে বলবো সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়, দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীকে 'উরুমধ্য' প্রদর্শন অনুচিত কিন্তু সেগুলো 'ইনট্রিগেল পার্ট অব দি প্রসীডিংস অব দ্য মিটিং' নয়, 'সভার কর্মসূচীর অন্তর্গত অবর্জনীয় অংশ' নয়। দুঃশাসন ও দুর্যোধন শুধু অতিশয় রূঢ় পদ্ধতিতে দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মতে দ্রৌপদী জিতা। সভার কার্যকলাপে প্রোটকল আদৌ লাঞ্ছিত হননি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয়, সে-যুগে ফিলিম ছিল না, তার মাসিক ছিল না, তস্য সম্পাদক ছিলেন না। কাজেই তাঁকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় সে-বাবদে কোনও প্রোটকল খুঁজে পেলুম না। তবু খুঁজছি, কারণ 'দুধ' না পেলেও 'পিটুলি' পাব নিশ্চয়!!

পপ্লারের মগডালে

দুই মহা 'চাণক্যে' বিশ্রম্ভালাপ হচ্ছিল। নিদাঘের মধ্যরাত্রি আসন্ন। প্রচুর সুরা পান হয়েছে। ফলে সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র স্বেদ ও তজ্জনিত বাষ্প বিনির্গত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সেই স্টীম থেকে যে স্পিরিট বেরুচ্ছে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সামান্যতম স্পর্শ পেলেই দপ করে জ্বলে উঠবে বলে চাণক্যদ্বয় সিগার ধরাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একজন গভীরতম চিন্তায় নিমজ্জিত থাকার পর দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলেন, "একটা সমস্যা নিয়ে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, ভ্রাতঃ! ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি নে। মার্শাল থেকে শুমপেটার হয়ে কেইনস রবিন্স সবাইকে চষেছি—বেকার বেকার। তা আপনার কাছে তো কিছুই অজানা নেই—"

"হুম।"

"এই ডাক-বিভাগটা চলে কি প্রকারে? অত অঢেল টাকা পয়সা কোথায়? ভাবুন দিকিনি, বিরাট বিরাট মাইনের ডাঙব ডাঙর আপিসাররা রয়েছেন, দশাসই সব আপিস

দপ্তর, অগুনতি ভ্যান, লম্বা দৌড়ের রেলগাড়ি হলেই তার আধখানা জুড়ে ডাকের জন্য খাস ব্যবস্থা—এ তো আর ফোকটেমুফতে হয় না! হ্যাঁ, মানলুম, তারা কোটি কোটি টাকার ডাকটিকিট বেচে। কিন্তু ওটাকে তো আর ব্যবসা বলা চলে না। ১০ পয়সার ডাকটিকিট বেচে ১০ পয়সায়, ১৫ পয়সার টিকিট বেচে ১৫ পয়সায়, কুড়ির কুড়ি পয়সায়ই। এক কানাকড়িও তো মুনাফা নেই ওতে,—যা দর তাতেই বিক্রি! লাভ রইল কোথায়? তা হলে ডাক-বিভাগটা চলে কি করে?"

"অতি হক কথা কয়েছেন, আমিও সানন্দে স্বীকার করছি। টিকিট বিক্রি করে ডাক-বিভাগের রত্তিভর মুনাফা হয় না। যে দাম আছে, তাতেই সে বিক্রি করতে বাধ্য। কিন্তু জানেন তো, দাদা, বড় বড় মুনাফার ব্যবসা মাত্রেই লাভের পথটা থাকে লুকানো—যেদিকে সরল জনের নজর যায় না, তার মনে কোনও সন্দেহই হয় না। আচ্ছা! এইবারে দেখুন, সমস্যাখানার রহস্য। পনেরো গ্রাম ওজনের খামের জন্য পোস্টাপিস চায় পনেরো পয়সা টিকিট—নয় কি? এইবারে আপনাকে আমি শুধোই—হক্ক কথা কন। প্রত্যেকখানি চিঠির ওজনই কি টায়-টায় পনেরো গ্রাম? হাজারখানার ভিতর একখানারও হয় কি না হয়—এ তো কানায়ও দেখতে পায়। একটার ওজন হয়তো বারো গ্রাম, কোনওটার আট, কোনওটার বা তেরো। এইবারে বুঝলেন তো, এই যে তফাতটা—এই যে ফারাকটুকু, এর থেকেই ডাকবিভাগের নিরেট লাভ—ঐ দিয়ে তার দিব্যি চলে যায়।"

পাঠক ভাবছেন, আমি অর্থশাস্ত্রের জটিলতম সমস্যায় কণ্টকিত এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত করলুম কেন? আমিও তাই ভাবছি। বস্তুত আমি মেহতা-চৌধুরী-জনসুলভ এই পঞ্চতন্ত্র কাহিনীটি যখন শ্রবণ করে কৃতকৃতার্থ হই তখন, কিংবা আমার বাতুলতম মুহূর্তেও আমি ওহেন সম্ভাবনার কণামাত্র আভাস পাইনি যে, ইটি একদিন আমার কাজে লাগবে।

লেগেছে। টায়-টায় না হলেও হরেদরে। সর্ব কাহিনী, তাবৎ উপমাই দাঁড়ায় তিন্ ঠ্যাঙের উপর ভর করে। চার পায়েই যদি দাঁড়ায়, তবে তো সব হুবহু একই বস্তু হয়ে গেল। উপমা রূপক, প্রতীক হতে যাবে কেন?

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দেখি, এক দরদী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বিকট চিৎকার করে চিল্লি দিয়ে কেঁদে উঠেছেন, বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য। হায় হায় হায়, এদের কি হবে? এরা কোজ্জাবে, মা!

কান্নার বহর দেখে মনে হল, এঁরা যেন ফুটপাথের পুরনো বই বিক্কিরীওলাদের চেয়েও বিকটতর বিপাকে পড়েছেন। এদের দুরাবস্থা (প্রেস! হ্যাঁ, আমি আকার দিয়ে দুরাবস্থাই লিখছি) দেখে সেই সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলছেন।

আম্মো দরদী। কিন্তু এই ডুকরে-ওঠা, চিল-চ্যাঁচানো মড়া-কান্না শুনে আমার হৃদয়ে 'মিলক অব হ্যুমেন কাইন্ডনিস' না বয়ে লেগে গেল সেথায় অন্য ধুন্ধুমার। খাঁটি মড়া-কান্না আমি বিলক্ষণ চিনি। আমার বসত-বাসা শ্মশানের লাগোয়া।

*　　　*　　　*

মহাকবি হাইনরিষ হাইনের মরমিয়া প্রেমের গীতি কবিতা সম্বন্ধে একাধিকবার লেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। ইনি সাক্ষাৎ চণ্ডীদাস। পাঠককে শুধোই, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু', 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' শুনে কি তোমার কখনও মনে হয়েছে, এ কবি '...চিঠির' মত (এ-মাসিকের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত

কোনও ফরিয়াদ নেই—অস্মদ্দেশে শত্রু মিত্র উভয় ভাবেই পুজো করার পদ্ধতি ঐতিহ্যসম্মত) কিংবা কংগ্রেস কম্যুনিস্টের মত কটুকাটব্য কস্মিনকালেও করতে পারে?

তাই যখন বিঘ্নসন্তোষী, পরশ্রীকাতর একপাল (লুমপেন-পাক) ফেউ লাগলো হাইনের পিছনে তখন তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। সবাই ভাবলে, যার মুখ দিয়ে সদাই মধু ঝরে সে আবার এসব বেতালা বদখদ বেত্তমীজী বাতের কীই বা জবাব দেবে। ভুল ভুল! সব্বাই করলেন ক্ষ-তে গলদ।

একদিন তাঁর হল ধৈর্যচ্যুতি।

কি যেন একটা—আমার ঠিক স্মরণে আসছে না—ভ্রমণ-কাহিনী না কি যেন কিসে মোলায়েম প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে দিতে তিনি বললেন, সবাই জানেন, আমি সাতিশয় সাধারণ কবি, তাই আমার খাঁইও অতিশয় সাধারণ। কবি মানুষ, দয়াময় ভগবান যদি নদীপারে আমাকে একখানা কুঁড়েঘর দেন, তা হলেই আমার দিব্যি চলে যাবে। আর ঘরের তৈরি সাদামাঠা কিঞ্চিৎ রুটি—শহুরে বান, ক্রোআঁশা[১] কিসসুটি না—আর ঘরেই তৈরি মাষা পরিমাণ মাখম, ব্যস। তদুপরি দয়াময় ভগবান যদি আমাকে আরও খুশী করতে চান, তবে তিনি যেন ঐ নদীপারে উঁচাসে উঁচা একসারি পপ্‌লার লাগিয়ে দেন। সর্বশেষে, তাঁর অসীম করুণাবশে যদি দয়াময় আমাকে পরিপূর্ণ কৈবল্যানন্দ দিতে চান, তবে তিনি যেন আমার পিছনে যারা লেগেছে ঐ দুশমনদের পপ্‌লারের মগডালে ফাঁসি দেন। অন্তবিহীন আনন্দরসে ভরপুর হৃদয় নিয়ে, কুটিরের দাওয়ায় বসে আমি তখন উপরপানে তাকিয়ে দেখব, সাতিশয় মনঃসংযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবো, আহা কী রমণীয় দৃশ্য! দুশমনদের পাগুলো মৃদুমন্দ পবনে দুলছে—দোদুল দোলায় হিল্লোল লাগিয়ে।[২] হ্যাঁ, আলবৎ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আদেশ দিয়েছেন[৩]। শত্রুকে ক্ষমা করবে, তাকে প্রেম দেবে। নিশ্চয় করব, নিশ্চয়ই দেব—আমার সর্বসত্তা উজাড় করে, কিন্তু ঐ যে বললুম, ওদের ফাঁসি হয়ে যাবার পর।"

* * *

কিন্তু যে গল্পটা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেটা গেল কোথায়?

যাঁরা বিদেশী বই বেচনেওলাদের তরে ঘটি ঘটি অশ্রু বর্ষণ করছেন তাঁদের একজনের ভাবখানা অনেকটা : পাঁচ শিলিঙের বই যদি তারা তারই ন্যায্য এক্সচেঞ্জে ভারতীয় টাকায় বেচে, তবে তাদের মুনাফা রইল কোথায়? এক ডলারের দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা (কথার কথা কইছি, আমি সঠিক ভাও জানি নে), যদি সাত টাকা পঞ্চাশেই বেচে, তবে

---

১ ক্রোআঁশা = ক্রেসেন্ট—অর্ধচন্দ্রের ন্যায় দুধেমাখম তৈরি ফিনসি রুটি। তুর্করা ভিয়েনা যুদ্ধে পরাজিত হলে পর, ভিয়েনাবাসী, তুর্কদের পতাকা-লাঞ্ছন অর্ধচন্দ্র আকারে রুটি বানিয়ে তাদের জয় সেলেব্রেট করে। আজ যদি ইস্টবেঙ্গল একটি কেকের উপর মার্শপেনের "বাগান" বানিয়ে সেটা খায়—অনেকটা সেই রকম! আমি কিন্তু মোহনবাগানী।

২ যাঁরা আর্ট হিষ্ট্রির চর্চা করেন, তাঁদের স্মরণে আসবে গোয়ার ছবি, যেখানে গাছে ঝোলানো শত্রুকে পর্যবেক্ষণ করছেন এক অফিসার—টেবিলে কনুই রেখে হাতে আরামসে মাথা রেখে। বস্তুত এ ছবি বেরোবার (১৮১০-১৩) কয়েক বছর পরই হাইনে তাঁর প্রবন্ধ লেখেন।

৩ হাইনে ইহুদি। ইহুদিরা খ্রীস্টকে স্বীকার করে না।

লাভ রইল কোথায়—ঐ সেই ডাকটিকিট বিক্রির মত!

তিনি তারপর আরেক ঘটি এক্‌স্ট্রা চোখের জল ফেলে বলছেন, তাদের কত খরচা। চিঠি লিখতে হয় (মরে যাই!), ডাকমাশুল দিতে হয় (ও বাছারে!) এবং তারপর আর কি সব ধানাইপানাই করেছেন আমার মনে নেই। কিন্তু এইবারে অসহিষ্ণু পাঠক, ক্ষণতরে মেহেরবানী করে তুমি নিচের মোক্ষম তত্ত্বটি মনোযোগ সহকারে পড়ো।

উপরের উল্লিখিত ঐ একজনই না, যাঁদের হাত দিয়ে বিলিতি বইওলারা তামাক খাচ্ছেন তাঁদের কেউই তো বলছেন না (কিংবা আমার হয়তো চোখে পড়েনি)—অন্তত সেই সরল বিপ্রসন্তান (ইনি পণ্ডিত তথা বিপ্র—এ দুয়ের সংযোগে মানুষ বড় সরল, neif হয়) বলেননি—

বিলিতি বইওয়ালা কত কমিশন পায়?

আমানউল্লার মাতা রাণীমার আদেশে তাঁর বন্দী চাচা নসরউল্লাকে খুন করা হয়। সর্বত্র খবর রটলো, কফি খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদদাতা বিলকুল ভুলে গেলেন মাত্র একটি সামান্যতম তথ্য পরিবেশন করতে। কফিতে ছিল সেঁকো বিষ।

এঁনারা সেই সেঁকো বিষ অর্থাৎ কমিশনটির বাৎ বেবাক ভুলে যাচ্ছেন।

কত কমিশন পায়? জানি নে। তবে বঙ্গসন্তানদের ধারণা ২৫% ৩০%-এর বেশী হবে না, কারণ বাঙলা পুস্তক বিক্রেতা সচরাচর এর বেশী পায় না (হালে জনৈক প্রখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা গুদোম সাফ করার জন্য শতকরা ৪০/৫০ দিচ্ছেন বলে—পাঠক পরম পরিতোষ পাবেন, ওর মধ্যে আমার বইও ছিল—বাঙলা বইয়ের বাজারে ধুন্ধুমার লেগে যায়)। তাই প্রশ্ন, যে স্থলে বাঙালী প্রকাশক দু' হাজার বই ছাপিয়ে শতকরা ২৫/৩০ কমিশন দেয়, সে স্থলে মার্কিন ইংরেজ এক ঝটকায় পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ ছাপিয়ে কত দেয়? কুইক টার্নঅভার নামক একটি বস্তুও আছে। শুনেছি এরা ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত দেয়। আমি বলতে যাচ্ছিলুম আশী। তা বলবো না কেন? তোমরা যখন এই জীবনমরণ ভাইটাল তত্ত্বটি চেপে যাচ্ছ। দেখাও না কাগজপত্র। আমি অবশ্য বিশ্বাস করবো না। তোমরা সব পারো।

ঈশ্বর সাক্ষী, স্বরাজ লাভের পর থেকে সরকার বিস্তর বিস্তর আইন পাস করেছেন—আমি চাঁদপানা মুখ করে সব সয়েছি, রা-টি কাড়িনি। কিন্তু সরকার যখন এই কমিশন ব্যাপারের গুহ্য, সযত্নে লুক্কায়িত কমিশন তত্ত্বটি জানতেন বলে হুকুম দিলেন, "বাপধনরা যখন দশ টাকার বই চার টাকায় পাচ্ছ তখন আর লাভ করতে যেয়ো না, শিলিঙের দাম ১.০৫, এক পাঁচেই বেচো, কিনছ তো অষ্ট গণ্ডা পোহা দিয়ে—" তখন উল্লাসে নৃত্য করে উঠলুম। আহা হাহা হা! কী আনন্দ, কী আনন্দ!

সস্তায় বই পাব বলে? মোটেই না। বই এমনিতে পাব না অমনিতেও পাব না। ডিভ্যালুয়েশনের পূর্বেও পাইনি, এখনও পাব না। শুনবেন, কেন? বছর দুই ধরে আমি ধন্না দিচ্ছি, কয়েকখানা ফরাসী ও জর্মন বইয়ের জন্য (হিটলারের জীবনীটি সম্পূর্ণ করবো বলে। যুদ্ধের কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে ১৯৩৪ থেকে ১৯৬৪ অবধি আমি এ-বিষয়ে বই কিনেছি—কয়েক হাজার টাকার)। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে এক ঝাণ্ডু শ্রী—রায় (ইনি এম-এ, সুশিক্ষিত সুপণ্ডিত) আমাকে জানালেন, আমি যদি প্রত্যেক বইয়ের—অর্থাৎ একই বইয়ের—পাঁচখানা করে কপি কিনি (!), তবে বিলিতি বইয়ের

বুকসেলার আমাকে আমার প্রার্থিত বই আনিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর 'যুক্তি', একসঙ্গে পাঁচখানা বই না কিনলে বুকসেলার কমিশন পান না!

এ প্রস্তাবটি এমনই উন্মাদের বাতুলতা যে, কোনও পাঠকই এটা বিশ্বাস করবেন না। একই বইয়ের পাঁচখানা করে কপি নিয়ে আমি করবো কি? পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামীই যদি একই রবর স্ট্যাম্পের পঞ্চলাঞ্ছন, পাঁচ এ্যানকোর হতেন তবে তিনিও যে খুব সন্তুষ্ট হতেন না, অনুমান করা যায়। পাঁচ কেন, দুটো হলেই চিত্তির। আমার শোনা মতে এক রমণীর বিয়ে হয়, যমজ ভাইয়ের একজনের সঙ্গে। ভাশুর ভাদ্রবধূ উভয়ই সন্ত্রস্ত। শেষটায় সাবধানী ভাশুর আরম্ভ করলেন টিকিটিতে পুজোর সময় একটি জবা ফুল বেঁধে নিতে। শয্যায় পদ্মনাভকে স্মরণ না করা পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে চৈতনপ্রত্যন্তে হাত বুলিয়ে চেক অপ করে নিতেন, ফুলটি স্থানচ্যুত হয়নি তো! কাহিনীটি শুনে 'ইন্দ্রজিৎ' শিব্রামীয় একখান 'পান' ছেড়ে মন্তব্য করলেন, 'টিকিতে ফুল! তাহলে স্বামী নিয়ে fooling বন্ধ হল।"

পাঁচখানা বই—একই বই (পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়, যে-ব্যবস্থাতে তো আমি হরবকৎ রাজী)—না কিনলে নাকি বাবুরা কমিশন পান না!

তবে আইস পাঠক, শৃণ্বন্তু বিশ্বে—

কারণ বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে-পড়া একটি মাসিক থেকে (জুলাই, ১৯৬৮) বিজ্ঞাপনটি তুলে দিচ্ছি :

"Published in England at Rupees 105.00 you have the chance of buying them (the book is in six volumes)—under our NO-RISK money-back guarantee for a mere Rs. 72.00—a saving of 30% on the published price."

অস্য বিগলিতার্থ—সাদামাটা খদ্দের হিসাবেই তুমি ৩৫% কমিশন পাবে; এবে শুধোই—অনাথা, অবলা বিলিতি বুকসেলাররা কত পাবেন? যে দিশী কোম্পানি বোম্বায়ে বসে, বিলেত থেকে প্রাগুক্ত বই আনিয়ে এ-দেশে বিক্রি করছেন, তিনি বুঝি আলা খয়রাতি হাসপাতাল খুলেছেন। তা হলে সাধু! সাধু!! সাধু!!!

বিস্ময়ে অধম নির্বাক! তবু অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ চিঁ করে বলছি অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু—আপনাকে শ্রীরায়ের তন্বী মাফিক একই বইয়ের পঞ্চগব্য খেতে হবে না,—হল না—পাঁচ ঢালা গোবর খেতে হবে না—একই বইয়ের পাঁচ কপি কিনতে হবে না।

এস্থলে আরেকটি নিবেদন—বিলিতি পুস্তক-বিক্রেতার বিরুদ্ধে আমার পুঞ্জীভূত বহুবিধ আক্রোশ আছে, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জমে উঠেছে ঘোরতর বিতৃষ্ণা এবং আমি তাই আদৌ নিরপেক্ষ নই, আমি প্রাইভেট এবং পাবলিক প্রসিকিউটর উভয়ই—দিশি পুস্তক বিক্রেতা ২৫% কমিশন পেয়ে, রোক্কা টাকা ঢেলে বই কিনে নিয়ে যায় আপন রিস্‌কে; সে-বই বিক্রি না হলে তার পুরোপুরি সমূচহ লোকসান। প্রকাশক বই ফেরত নেবে না। বিলিতি বাবুরা অর্ডার নিয়ে, কোনও কোনও স্থলে পুরো দাম বায়না পকেটস্থ করে করে বইয়ের জন্য বিদেশে অর্ডার দেন। সিকি কানাকড়ির রিস্‌ক নেই। এ যে কত বড় ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য সে জানে বিক্রেতা।

* * *

এবারে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন; একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে—যাঁরা আমার অক্ষম লেখনীপ্রসূত মন্দ-ভালো পড়েন। তাঁরাই বলুন, এই যে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে আমি লিখছি, কখনও দলাদলিতে ঢুকেছি? কখনও কাউকে আক্রমণ করেছি? এমন কি আমি যখন আক্রান্ত হয়েছি, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি? হ্যাঁ, দু'একবার বাদ-প্রতিবাদে নেমেছি, যখন দেখেছি কোনও নিরীহ, বেকসুর, অখ্যাত লেখক আক্রান্ত হয়েছেন কোনও 'বুলি' দ্বারা, যিনি তাঁর নামের পেছনে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর সবকটা ডিগ্রীর ফিরিস্তি যাতে করে সাধারণ পাঠক, প্রাগুক্ত নিরীহ লেখক এবং সম্পাদক স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং সর্বোপরি আতঙ্কিত হন—সেই নিরীহের পক্ষ সমর্থন করে। তখন সেই ফিরিস্তি-পুচ্ছধারী হামলা করেছেন আমার প্রতি। আমি তদ্দণ্ডেই নিরুদ্দেশ, কারণ, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনও প্রয়োজনবোধ করিনি, সেকথা পূর্বেই সবিনয় নিবেদন করেছি। ইতিমধ্যে সেই নিরীহ কিছুটা সান্ত্বনা পেল যে এ-দুনিয়ায় অন্তত আরেকটা মূর্খ আছে, যে তার মতে সায় দেয়।

কেন নামিনি? আমার কলমে বিষ নেই?

কিন্তু এবারে নামতে হল। ১৯২১ সালে যখন সর্বপ্রথম জর্মন ফরাসী পাঠ্যপুস্তক কিনতে গিয়েছি, তখন বিলিতি বই বিক্রি করতো শুধু বিলিতিরা, এবং তারা কান পাকড়কে নিয়েছে ঢালাও হিসেবে এক শিলিঙের জন্য এক টাকা। তখন বোধ হয় শিলিঙের দাম ছিল দশ আনা। এটা নিশ্চয়ই 'দুর্নীতি' নয়। সেই সবল বিপ্রসন্তান বলেছেন, 'এতদিন পর্যন্ত বই-এর ব্যবসার মধ্যে দুর্নীতি ছিল না বললেই হয়।' মোক্ষম তত্ত্ব এবং তথ্য। কারণ সে যুগে, এবং এই পর্শুদিনতক সরকার পুস্তকের ব্যাপারে কোনও নিরিখ, প্রাইস-শেডুল বা কেনা-বেচার সময় এক শিলিঙের জন্য কত ভারতীয় মুদ্রা নেবে তার কোনও আইন করে দেননি (controlled price)। কাজেই 'দুর্নীতির' কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু সাধারণ গেরস্ত এ নীতিটি মানবে কি? তুলনা দিয়ে শুধোই, আজ মাছের বাজারে আর কন্ট্রোল নেই; মাছওলা যদি কাদা চিংড়ির জন্য দশ টাকা কিলো চায় তবে তো সেটা 'দুর্নীতি' নয়—মানবে গেরস্ত? দমদমা তো মানছে না! তাদের উপর এ-বৃদ্ধের আশীর্বাদ রইল।

তখন কলকাতায়, বিলিতি বইয়ের ব্যবসাতে প্রাক্তন 'সুনীতিতে' টেটম্বুর টাকার হরিন্নুট দেখে সে-বাজারে নামলেন 'লেটিভ'রা।

কিন্তু সেই ১৯২১ থেকে ১৯৬৬-র ইতিহাস লিখতে হলে তো এক কিস্তিতে হবে না। তবে লিখব।[১]

---

১ এস্থলে নিবেদন, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা তথা দুর্বলতাবশত আমাকে মাঝে মাঝে পত্রিকায় 'পঞ্চতন্ত্র' বন্ধ করতে হয়। সাতিশয় শ্লাঘা সহকারে স্বীকার করছি তখন কোনও কোনও পাঠক সম্পাদকও আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে কখনও মিঠে কখনও কড়া চিঠি লেখেন। (যে সব বিচক্ষণ জন আমার লেখা অপছন্দ করেন, তাদের সান্ত্বনার্থে বলি, I am a fool; এবং প্রবাদ আছে "One fool raiseth a hundred")। কাজেই পরের কিস্তির গ্যারান্টি দিতে পারি না বলে আমি সন্তপ্ত।

এ-সুবাদে সদাশয় সরকারকে আবার বলি তোমার রেশনের চাল অখাদ্য, তুমি ভেজাল কালোবাজার ঠেকাতে পারছ না, বিদেশ গিয়ে দু'মাসের জন্য রিসার্চ করে আমার দুখানা বই শেষ করার জন্য কুল্যে দু হাজার মার্ক চেয়েছিলুম তুমি দাওনি, বিদেশী বই কেনার জন্য তুমি ক্রমাগত একসচেঞ্জ কমাচ্ছ (এবং যা দিচ্ছ সেও ছুতোর-কামারের টেকনিকাল বই আর পাঠ্য পুস্তকের জন্য—আমার কাজে লাগে না), ফলে মৃত্যুর পূর্বে আমাকে তুমি বিদেশী বইয়ের দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে অন্নহীনবৎ মারছ—আমি রাত্তিভর প্রতিবাদ করিনি, করছি না, করবোও না। কিন্তু তুমি যে সেই বিদেশী বইয়ের দাম কন্ট্রোল করছ, তার জন্য আমি তোমাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করি। শঙ্কর তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

ভেবো না আমি স্বার্থপর। আমি পাব না, এমনিতে না, অমনিতেও না। তুমি অঢেল হার্ড কারেন্‌সি ছেড়ে দিলেও না, না ছেড়ে দিলেও না। কেন, তার ইঙ্গিত বক্ষ্যমাণে দিয়েছি। বারান্তরে সবিস্তর।

হায়! কোথায় সেই কুটির আর সামনের সুদীর্ঘ পপলার গাছ! সরকার না একবার বলেছিলেন, তাঁরা কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন! পপলার গাছ অনেক ভালো। অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। যদ্যপি আমি বৃদ্ধ এবং শঙ্কর খেদ করেন, 'বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন' আমি কিন্তু 'তরুণে আরক্ত'। তাদের প্রতি এই সুবাদে একটি সদুপদেশ দিই; দুষ্টেরা তোমাদের বিদেশী ভাষা শেখার জন্য উপদেশ দেবে; সরল কনস্যুলেটগুলো তাদের জন্য ব্যবস্থা করবে এবং করছে। কিন্তু অমন কম্মটি কোরো না। বিদেশী বই না কিনতে পারলে বিদেশী ভাষা শিখে তোমার লাভ? এ যেন একগোচ্ছা চাবি নিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছ—সিন্দুক কিন্তু একটাও নেই! এ যেন রশি নিয়ে হাওয়ায় কোমর বাঁধার মত বন্ধ্যাগমন। এবং পারলে বাঙলাটাও শিখবে না। বলা তো যায় না, সে-বাজারেও কোনদিন কি হয় না হয়! হয়তো একই বই পাঁচ কপি কেনবার জন্য সাত টাকা চাইবেন। আগের থেকে সাবধান হওয়া বিচক্ষণের কর্ম। কেন, নিরক্ষরদের দিন কাটে না এদেশে? টিপসই দিয়ে চালাবে।

আমি ভালো করেই জানি, এ প্রবন্ধ ইংরিজিতে লিখলে ধুন্ধুমার লেগে যেত। কারণ, তাহলে হয়তো বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের চাঁই, বোম্বাইবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত সদানন্দ বিটকল এটি পড়তেন (শুনেছি, বোম্বাইওয়ালারা নাকি এ বাবদে কলকাতাকে কল্কে দেয় না—বড় আনন্দ হল)। যাঁরা বাঙলা জানেন, তাঁরা যদি হুহুঙ্কার সচিৎকার 'যুদ্ধং দেহি' রব ছেড়ে আসরে নামেন তবে আমি প্রস্তুত।

শুধু দয়া করে পরের হাত দিয়ে তামাক খাবেন না।[১]

সুপণ্ডিত বিপ্রসন্তানকে ডোবাবেন না। অবশ্য তাঁর যদি ব্যবসাতে শেয়ার থাকে তো আলাদা কথা। আমার বিশ্বাস তাঁর নেই।

---

১ যেসব ভারতীয় বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটি আপ্ত বাক্য প্রযোজ্য। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে এসেছেন এক সদ্য বিলেত-ফের্তা—ইভনিং জ্যাকেট, বয়েলড শার্ট গরে। অতি কষ্টে পিঁড়িতে বসতে বসতে বললেন, 'মুশকিল, বাঙলাটা ভুলিয়া গেইছি।' রবিঠাকুর নাকি শুনে বললেন, 'সত্যি মুশকিল হে ভড়, ইংরিজিটাও শিখলে না; বাঙলাটাও ভুলে গেলে!'

আর সরকার যদি শেষটায় কন্ট্রোল তুলে নেন—মাছের বেলা যা হয়েছে—তা হলে আম্মো শেয়ারের সন্ধানে বেরুব। টাকা নিয়ে কথা, মশাই। তার আবার সুনীতি দুর্নীতি কি?

ঝুলবই না হয় একদিন পপলারের মগডালে। ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের দু দিকে আরও কে যেন দুজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল।

হাতে কমণ্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি

প্রবাসের লোক বড়ই অনাড়ম্বর। তাই স্যুটের বড়ফাট্টাই নিয়ে সেকানে মস্করা জমে ভালো।

স্যুট বাবদে একদা মহামুশকিলে পড়েছিলেন লর্ড কার্জন।

আমি জানি আমার নগণ্যতম—অর্থাৎ আমার প্রিয়তম পাঠকও প্রত্যয় যাবেন না যে, লর্ড কার্জনের মত বিলেতের খানদানী পরিবারের নিকষ্যি কুলীন স্যুটের মত ডালভাত—সরি, আই মীন বেকন-আণ্ডা—নিয়ে গর্দিশে পড়তে পারেন। টাকাকড়ির অভাব এমনিতেই ছিল না, তদুপরি বিয়ে করেছিলেন মার্কিন কোটিপতির দুহিতা—নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় (আবার ভুল করলুম, মার্কিনিংরেজ মেয়ে শাদি করে শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীকে সেখান থেকে ছোঁ মেরে শিকার করে ঘর বাঁধে অন্য মোকামে) পিতাকে উত্তমরূপে দোহন করেই এসেছিলেন। তাই স্বীকার করে নিচ্ছি গল্পটি অন্য কারও বাবদে হতে পারে এবং ডিটেলে ভুল থাকবে এন্তের। কিন্তু আমার নিপীড়িত কর্মক্লান্ত স্মৃতিশক্তি তবু যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বার বার অভিমানভরে বলছে, এটা লর্ড কার্জন অব্ কিডলস্টনেরই কাহিনী— কার্জনের মুসলমানপ্রীতি দেখে অনেকেই বলতেন লর্ড কার্জন অব্ খিদিলস্তান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কীকে কচুকাটা করা হল সেভ্‌র্-এর সন্ধিচুক্তিতে (তখনই এ-দেশে খেলাফত আন্দোলনের দানা বাঁধে), কিন্তু ঐ সময় উদয় হল মুস্তফা কামাল পাশার, (পরে আতা তুরক) এবং তিনি সে সন্ধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে খেদিয়ে বার করে দিলেন গ্রীকদের তুর্কী থেকে। তখন আবার নয়া করে সন্ধিপত্র তৈরী করতে হবে। ইউরোপময় হাহাকার রব উঠেছে, 'বর্বর' মুসলমান তুর্ক 'সুসভ্য' খ্রীষ্টান গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছে তার 'হক্‌কের' (বে-) দখলী জমি থেকে—নূতন সন্ধিতে এটা মানা চলবে না (ফ্যাতাঁকঁপ্লি নয়)। তাই নয়া সন্ধিটা যাতে চোস্ত-দুরস্ত হয় সেজন্য লজান বৈঠকে পাঠানো তামাম ইওরোপের কুটিলস্য কৌটিল্য মহামান্য কার্জনকে।

গণ্ডা দশেক স্যুটকেশ ট্রাঙ্ক নিয়ে নামলেন পরমপ্রতাপান্বিত কার্জন লজান শহরে। দুনিয়ার রিপোর্টার জড় হয়েছে তাঁর অবতরণভূমিতে।

মালপত্র যখন নামছে তখন দেখা গেল, সেই বাষট্টি ভাজা লগেজের সঙ্গে আলাদা করে অতি সন্তর্পণে নামানো হল একখানি ছোট্ট ফুট-স্টুল—লর্ড কার্জন মিটিং-মাটিং সর্বত্রই এই জিনিসটার উপর পা না রেখে দু'দণ্ড বসতে পারেন না। ঐটে দেখা মাত্রই এক ঠোঁট-কাটা ফরাসী সাংবাদিক টিপ্পনী কাটলে—"ভোয়ালা ল্য ত্রোন দ্য দামা!" (Voila le trone de Damas!)—"ঐ হেরো, দামাস্কাসের সিংহাসন"—অর্থাৎ নয়া মাহমুদ

কার্জনের 'চলচৌকি' পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগর (স্থান পরিবর্তন না করে একটানা এক জায়গায় আছে) দমস্কের সমতুল্য।...তা সে যাক্ গে, এটা ঈষৎ অবান্তর।

তুর্কীর পক্ষ থেকে এসেছেন জেনারেল ইসমেৎ পাশা (পরে প্রেসিডেন্ট ইনেন্যু)।

জোর কনফারেন্স, জোরালো উপ-কনফারেন্স, সাবকমিটি আরও কত কী। কার্জন বজ্রনির্ঘোষে—থানডারিং—লেকচার ঝাড়লেন টেবিল থাবড়ে। ইসমেৎ দিব্য ইংরিজি বোঝেন,—ভান করলেন বোঝেন না, তদুপরি তিনি কানে খাটো। থানডারিং লেকচারের প্রতিটি তাঁর কানের কাছে অনুবাদ করে দিতে হয়—থান্ডার ততক্ষণে ঠাণ্ডা। গরমাগরম উত্তর দিতে হল। সেপাই ইসমেৎ পারবেন কেন অরেটর কার্জনের সঙ্গে? তবু চললো লড়াই।[১]

সন্ধ্যেবেলা এঁরা সবাই একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করে নিতেন। আজ এখানে ডিনার, কাল সেখানে ডান্স, পরশু জীনিভা হ্রদে নৈশভ্রমণ।

এক সন্ধ্যায় কার্জনের ভ্যালে তাঁকে যথারীতি অত্যুত্তম ডিনার স্যুট পরিয়ে দিয়ে, সাদা বো-টি নিখুঁত বেধে দিলে পর সদাশয় লর্ড বললেন, "আজ আর তুমি আমার জন্যে জেগে থেকো না; ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি কোনও রকমে ম্যানেজ করে নেবো'খন।" এ যে কত বিরাট সদাশয়তা সেটা সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন না। এসব লর্ডরা ভ্যালে-র সাহায্য বিনা জামা-কাপড় পরতে তো পারেনই না—আর বো বাঁধার বেলা তো ৯৯% স্রেফ ঘায়েল—ছাড়তে পর্যন্ত পারেন না।

ভ্যালেটি ছিল কার্জনের চেয়েও খানদানী—অবশ্য তার আপন ভ্যালে সম্প্রদায়ে। বো বাঁধাতে তার ছিল বিশ্ব রেকর্ড। ১১ সেকেন্ডে সে যা বো বাঁধতো, মনে হত, একদম মেশিনে তৈরী, রেডিমেড বো। অন্য লোক এ স্থলে সে সন্দেহ এড়াবার জন্য বো-টি একটু ট্যারটা করে নেয়। খানদানী কার্জনের বেলা অবশ্য এ সন্দেহ করতে যাবে কে? বহু বৎসর পরে হিটলারের ভ্যালে লিঙে এর কাছাকাছি অর্থাৎ ১২ সেকেন্ডে আসতে পেরেছিলেন। লিঙে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, হিটলার প্রতিবার চোখ বন্ধ করে এক, দুই গুনতেন এবং লিঙের বো বাঁধা হলে সোল্লাসে বলতেন, "লিঙে, এবার কেল্লা ফতে করেছ—মাত্র বারো সেকেন্ড!"...উপস্থিত এ বো অনুচ্ছেদ থাক।

কার্জন তো গেলেন ব্যানকুয়েটে wined and dined হতে—সঙ্গে 'ত্রোন দ্য দামা' বা 'দিমিশ্‌কের ময়ূর সিংহাসন' বগলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ইংরেজী এনসাইক্লপীডিয়া, ফরাসী লিত্রে, জর্মন ব্রকহাউস—চরম পরিতাপের বিষয়—সবাই নীরব। বিবেচনা করি নিমন্ত্রণ-কর্তাই সেটি সাপ্লাই করেছিলেন। কিন্তু সে রাত্রে কিসে যেন কি হয়ে গেল, কার্জন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং রাত দশটা-এগারোটার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলে ঢুকতেই দেখেন বিরাট হল জুড়ে লেগেছে ধুন্ধুমার নৃত্য—সে রাত্রে সে হোটেলে ছিল গ্যালা ড্যান্স। তারই এক পাশ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠতে হবে লিফ্‌টে। যেতে যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন—কে ঐ লোকটি? বড্ডই যেন চেনা-

---

১ কার্জন-ইসমেতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইসমেতের শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ জয় হলে পর সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। অতিশয় সবিনয় তিনি নিবেদন করেন, "না, না, আমার আর কী কীর্তি! আমি কালা—আল্লাকে অসংখ্য শোকরীয়া ধন্যবাদ।"

চেনা মনে হচ্ছে। উৎকৃষ্টতম স্টাইলের নিখুঁত ফুল ডিনার-ড্রেস পরে সাতিশয় রুচিসম্মত পদ্ধতিতে নাচছে একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতীর সঙ্গে।

সর্বনাশ! ও গড!! এ যে তাঁরই ভ্যালে!! নাচছে তাঁরই ইভনিং ড্রেস পরে।

আহা, সদয় সহৃদয় পাঠক, তুমিও আমার সঙ্গে সবেদন কণ্ঠ যোগ দিয়ে বলবে, আহা, বেচারী ভেবেছিল কত্তার ফিরতে যখন দেরি হবে তখন সে-ই বা দুচক্কর নেচে নেয় না কেন?

কিন্তু এ যে ডবল মহাপাপ—খাস বিলেতে নিশ্চয়ই, এ স্থলে ডবল ফাঁসির চেয়েও কড়া আইন আছে।

তুলনা দিয়ে কি প্রকারে বোঝাই? কোনও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যদি হঠাৎ কোন এক পরিচিতের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁরই এক চেনা চাঁড়াল তাঁরই গরদ পরে বামুন সেজে পূজোর ঘণ্টা বাজিয়ে ধুমধাম লাগিয়েছে আর বউ-ঝিরা তাকে টিপটিপ করে পেন্নাম করছে তা হলে তাঁর মনের অবস্থাটা কোন্ রস দিয়ে বর্ণাতে হয়?

* * *

কার্জন হুকুম জারি করলেন, ব্যাটাকে যেন অতি ভোরের ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—নাক বরাবর লন্ডন। একটা ঠিকে ভ্যালে যেন তদ্দণ্ডেই যোগাড় করা হয়।

এখানেই শেষ? আদৌ না। এ তো সবে শুরু।

পরদিন সকালে কার্জন খাটে শুয়ে শুয়ে দেখেন, ঠিকে ভ্যালে ওয়ার্ডরোবের দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকোচ্ছে। অচেনা, নয়া ঠিকে—কার্জনও দরদী-দিল আদমী শুধোলেন, "কি হল?"

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "হুজুর, সঠিক ঠাহর হচ্ছে না। পাতলুনগুলো গেল কোথায়!"

লম্ফ মেরে কার্জন গিয়ে দেখেন, সত্যিই তো, পাতলুনগুলো গেল কোথায়? আছে বটে অনেকগুলো, কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্ অর্থাৎ ডোরাকাটা পাতলুনগুলো কোথায়? সেগুলোর যে এক জোড়াও নেই। আর সেই পরেই তো তিনি যাবেন দুপুরের কনফারেন্সে। খাঁটি ফুল মর্নিং ড্রেস। সামনের দিকে ট্যারচা করে কাটা হাঁটুঝুল কোট, সেই কাপড়েরই তৈরী ম্যাচ করা কিংবা ফেনসি ওয়াসকিট—এই ওয়াসকিটেই সাদা পাইপিং লাগাবেন কিনা তাই নিয়ে জীবনমরণ সমস্যায় পড়েছিলেন আমার সুবন্ধু স্যার সিরিল হবজন-জবসন ফর্বস-রবার্টসন লন্ডনে—এবং তাঁর সঙ্গে সাদায় কালোয়, কিংবা ঈষৎ ধূসর রঙের ডোরাকাটা স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারজ—তার তো কোন চিহ্নই নেই।

সর্বনাশ! এখন উপায়?

গাঁইয়া পাঠক—যতই ধানাইপানাই করি না কেন, আম্মো এখনও তাই—তুমি বলবে, কেন, অন্য পাতলুন পরে গেলে হয় না? নিশ্চয়ই হয়। যান না আপনি নিচে কপ্নিন, উপরে দুশালা-শাল, মাথায় তুর্কী টুপি, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে আধুনিকদের ব্যুফে লানচ পার্টিতে টালিউডে—কে বারণ করছে? সে কথা থাক।

কিন্তু ব্যাটা ভ্যালের চুরি করারই যদি মতলব ছিল তবে কোর্ট-ওয়েসকিট ম্যাচিং-টাই-কলার পেটেন্ট-লেদার জুতো মায় স্প্যাটস এগুলো ফেলে গেল কেন? এস্তেক ডাইমন্ড পিনও যথাস্থানে রয়েছে। উঁহু, তা নয়। নিশ্চয়ই সুদ্ধমাত্র তাঁকে রাম-ইডিয়েট বানাবার জন্য।

ঝাড়ো টেলিগ্রাফ। পাক্‌ড়ো রাসকেলকো কঁহী ভী হোয় টেরেন্‌ মে—চাহে প্যারিস, চাহে লনদন!

সে না-হয় হল। কার্জনের রোআবে বাঘের দুধের অর্ডার আকছারই যায় টেলিগ্রামে। কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্‌ ট্রাউজারজ তো আর বাঘের দুধ নয়, বাঘিনীরও দুধও নয়। আপাতক সে বস্তু মেলে কোথা? ওদিকে প্লেনারি কনফারেন্সের সময় যে ঘনিয়ে আসছে। হে ভগবান! প্রতি মুহূর্তের এ কী গব্বযন্ত্রণা!

*   *   *

এমন সময় করিডোরে শতকণ্ঠে বাইশটে ভাষায় চিৎকার হই-হুল্লোড়।

পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! কোথায়? কোথায়?

যে মেয়েটি ভ্যালে, চাকরবাকরদের কুটুরিগুলোতে তাদের বিছানাপত্র ঝেড়েঝুড়ে দেয়, সে কার্জনের ভ্যালের তোশক ঝাড়তে গিয়ে দেখে তার নিচে পরিপাটিরূপে টান-টান করে সাজানো চার জোড়া স্ট্রাইপ্‌ট্‌ পাতলুন। আমরা, গরিব দুঃখীরা যাদের বাধ্য হয়ে মাঝেমধ্যে স্যুট পরতে হয়, তারা জানি, পাতলুনের ক্রীজ দুরস্ত করার জন্য এর চেয়ে মহত্তর মুষ্টিযোগ নেই।

কিন্তু সর্বজ্ঞ কার্জনের সেদিন নবীন জ্ঞানসঞ্চয় হল।[১]

ভূতের মুখে রাম নাম

যে কোনও ভদ্রসন্তান স্তম্ভিত হবে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঝাড়া দশটি মিনিট গা-গা রব ছাড়বে। অপেক্ষাকৃত রোগাপটকা ভিরমি যাবে। খবরটা এমনই অবিশ্বাস্য।

মানুষের তৈরী বেঙ্গল ফ্যামিনের সময় এক অজানা কবি রচেন,

দেখো না আজব হ্যায়,
এ হেন ভূতের পায়
স্বস্তিবাচন
করা নিবেদন।
এ যেন প্রেতের গায়
উম্‌দা উম্‌দা আতর মাখানো ভুরভুরে খুশবায়।
এ যেন দুখিনী মায়
Ameryর কাছে শিশুটির তরে
ভিক্ষার চাল চায়।

খবরটা এর চেয়েও বিৎকুটে।

ফ্রান্‌সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্লোবেরের[২] বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস মাদাম বভারি ফ্রান্‌সে

---

১ কাহিনীটি যিনি আমাকে সর্বপ্রথম বলেন তাঁর মতে লিটন স্ট্রেচিই নাকি ইটি সকলের পয়লা লিপিবদ্ধ করেন। আমি ভিন্ন ভিন্ন কীর্তন শুনেছি।

২ উচ্চারণ ফ্লো, তারপর ব্যার। ফ্ল্যোবার লিখলে সাধারণ বাঙালী ফ্ল্যোব্‌ব্যার পড়ে বসতে পারে; সেটা হবে ভুল। ঐটে বাঁচাবার জন্য পূর্বসুরিগণ লিখতেন ফ্লোবারের বা ফ্লোবের।

এখন থেকে ছাপা যাবে, বেচা যাবে বটে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া তথা বইয়ের দোকানে পেটি রেখে খদ্দের আকৃষ্ট করা বেআইনি!

কেন?

বইখানা এ্যামরাল, ইমরাল (immoral) অর্থাৎ দুর্নীতিপূর্ণ, এক কথায় অশ্লীল। বইখানা লিখতে ফ্লোবেরের লেগেছিল পূর্ণ চারটি বৎসর—কিঞ্চিৎ অধিক—১৮৫২ থেকে ১৮৫৬। প্লটটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তার পূর্বে তিনটি বৎসর। এই ছোট বইখানা লিখতে ফ্লোবারের এতখানি সময় লাগলো কেন? তার প্রথম কারণ, তিনি ছিলেন মাত্রাধিক পিটপিটে পারফেক্‌শনিস্ট। বাস্তব জগতের পরিবেশ যেমন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, (অন্য উপন্যাসে একটি রোমান ভোজের নিখুঁত বর্ণনা দেবার জন্য তিনি নাকি প্রাচীন ক্ল্যাসিক্‌স ঘাঁটেন কেউ বলে ছ'মাস, কেউ বলে দুবছর)[১] ঠিক তেমনি তাঁর স্বপ্নলোক কাগজকলমে মৃন্ময় করার সময় তিনি চাইতেন সেটা যেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হয়, এবং সর্বশেষ প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি সেন্‌টেন্‌স্ যতক্ষণ না তার নিখুঁত ভারসাম্য পায়, তার প্রত্যেকটি শব্দ অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে মিলে গিয়ে যতক্ষণ না উন্নয়নাতীত হয়, নিটোল সুডৌল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরের সেন্‌টেন্‌সে যেতেন না, কিংবা বলবো, যেতে পারতেন না, যেন আগের সেন্‌টেন্‌স্ তাঁকে জোর করে আঁকড়ে ধরে বলছে, আমাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিয়ে তবে তুমি এগোও।'

এমন দিন বহুবার গেছে, যে দিন ফ্লোবের মাত্র একটি ছত্রের বেশী লিখতে পারেননি! এটা কিংবদন্তী নয়। নইলে চারশ' পাতার বই লিখতে চারটি বৎসর লাগবার কথা নয়। এবং স্মরণ রাখা উচিত, ফ্লোবের যখন কোনও বই লিখতে আরম্ভ করতেন, তখন সেইটে নিয়েই অষ্টপ্রহর মেতে থাকতেন। পেটের ধান্দা তাঁর ছিল না, তাঁর দেখভাল করার জন্য লোকের অভাব ছিল না, তিনি চিরকুমার, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লেখার টেবিলে বসতেন, বাড়ি ছেড়ে পারতপক্ষে রাস্তায় পর্যন্ত নামতেন না, অথচ চল্লিশ বৎসর সাধনার ফলস্বরূপ তিনি লিখেছেন মাত্র খান-আষ্টেক বই।

মোটামুটি ভালো বই হলেই আমরা সেটাকে বলি 'রসোত্তীর্ণ', খেয়াল না করেই বলি 'পীস অব আর্ট', কিন্তু সত্য সত্য যদি কোনও একখানি বইকে শব্দার্থে পীস অব আর্ট বলতে হয় তবে সে মাদাম বভারি। এর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচিতি লিখেছেন ফ্লোবেরের পুত্রপ্রতিম প্রিয়শিষ্য মোপাসাঁ। তাঁর ভুবনবিখ্যাত 'নেকলেস' গল্পে পাঠক ফ্লোবেরের প্রভাব দেখতে পাবেন। বস্তুত বভারি বেরুবার পর সে যুগের ফরাসী কৃতী লেখকদের বড় কেউই এর প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাননি। একমাত্র এরকম বইকেই পীস অব আর্ট বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের বছরে এই 'কাব্য' প্রকাশিত হয়—আজও নবীন লেখক নবীন পাঠক এ-পুস্তকের শরণ নেন।

মোপাসাঁ তাঁর গুরু সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আজও যাঁরা ফ্লোবের নিয়ে

---

১ এদেশের উপন্যাসে প্রায়ই পড়ি, বিলিতি বড়সাহেব বা বিলেতফের্তা ন'সিকে এটিকেট-দুরস্ত সাহেব 'জুতো মস্ মস্ করে চলে গেলেন।' জুতো জোড়া মস্ মস্ করলে এদেশের ট্যাশসাহেবও সেটা ভেজাছালার উপর রাতভর পেতে রাখে। সামান্যতম মস্ করলেও বন্ধুজন মস্করা করে বলে, 'দাম দাওনি বুঝি! বেচারী যে চিৎকার করে করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।'

আলোচনা করেন তাঁরা এ দুটি প্রবন্ধের বরাত না দিয়ে পারেন না।[১] এ ছাড়াও তিনি কাগজে-কলমে ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর তাঁর হয়ে একাধিক লড়াই দিয়েছেন। এসব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আইস, পাঠক, প্যারিস যাই।

কিন্তু প্যারিসের বর্ণনা দেবার মত কোথায় আমার বীর্যবল, কীই বা অধিকার! তাই আমার যেটুকু দরকার সেটুকু নিবেদন করি।

সেই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্যারিস যত না কাজ করেছে তার চেয়ে বেশী চেঁচিয়ে দুনিয়া ফাটিয়েছে, লিবেরতে (liberty), লিবেরতে, তুজুর (চিরন্তন) লা লিবেরতে। সে চিৎকারে মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন গোটে থেকে শুরু করে মিশর-ইন্ডিয়া পেরিয়ে চীন দেশের সুন ইয়াট সেন পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে তার বিকৃত রূপ দেখা দিল তার সামাজিক জীবনে তার আমোদ-আহ্লাদে। পুরীর নুলিয়ারা যে বহ্বাড়ম্বর পরিপূর্ণ বহ্বাভরণ পরিধান করে সমুদ্রে নামে, কিংবা আমাদের জেলেরা মাছ ধরার সময়, সেই পরে মেয়েরা প্যারিসে নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। এবং শুধু যে আপন-ভোলা নটরাজের জটার বাঁধন খুলে যায় তাই নয়, দিব্য সচেতন অবস্থায়—যাক্ গে, পূর্বেই বলেছি, যতখানি 'জ্ঞাতাস্বাদো বিপুল-জঘনাং' হলে পর প্যারিস বর্ণনের শাস্ত্রাধিকার জন্মে, আমার ততখানি নেই।

এই বাতাবরণের মাঝখানে ফ্লোবের এতই সংযত সমাহিত যে, আজকের দিনের 'মডার্ন'রা তাঁকে রীতিমত চেঁচিয়ে গালাগাল দেবেন, কাপ্রুs তোমার sাহs নেই (কাপুরুষ! তোমার সাহস নেই—পাঠক 'সামবাজারের সসীবাবুর' মত 'স'-গুলো উচ্চারণ করবেন!)।

বইখানা পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে বেরিয়ে পুস্তকাকারে ছাপা হবে এমন সময়

---

১ প্রবন্ধ দুটি বেরোয় মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটির (করেস্‌পঁদাস্) সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারে। এ-পুস্তকে পাঠক পাবেন মোপাসাঁর অন্যান্য রচনা সংগ্রহ। গল্প-লেখক মোপাসাঁর খ্যাতি 'ব্যাল লাৎরিস্‌ৎ' ('রম্যরচনা' তথা প্রবন্ধ -লেখক) মোপাসাঁকে এমনই ম্লান করে দিয়েছে যে, ফ্রান্‌সের বাইরে কেউ মোপাসাঁর এসব লেখার সন্ধান বড় একটা করে না। এ পুস্তকে পাঠক পাবেন, বালজাক, জোলা, তুর্গেনিফ (একাধিক), সুইনবার্ন এবং অন্যান্য সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ। এবং সব চেয়ে কৌতূহল-উদ্দীপক—পাঠক এতে পাবেন, মোপাসাঁ কোন্ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেন। জোলার গ্রামের বাড়িতে একদিন গল্প বলার আর্ট, এবং সে আর্টের রাজা তুর্গেনিফ ও মেরিমে (চারু বাঁড়য্যে এঁর বই 'কলবাঁ' 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর হল অনুবাদ করেন), সম্বন্ধে কথা উঠলে জোলা প্রস্তাব করেন, সে-মজলিশের সবাইকে একটি একটি করে গল্প বলতে হবে। গল্প বলেন জোলা, হ্যোসমান্‌স সেআর, এনিক এবং সব চেয়ে বড় কথা মোপাসাঁ স্বয়ং। সেই তাঁর প্রথম গল্প। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় অন্যান্য গল্প-লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহের সঙ্গে। যেহেতু জোলার বাড়ি মেদাঁতে গল্পগুলো বলা হয়, চয়নিকার নাম হয় 'মেদাঁর সোয়ারে'। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি মোপাসাঁ ফ্রান্‌সে বিখ্যাত হয়ে যান। ফ্লোবের তখনও বেঁচে। আন্তরিক অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালেন তরুণ লেখককে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, জোলার চাপে না পড়লে কি হত! কারণ এর পূর্বে মোপাসাঁ নিজেই জানতেন না, কথাসাহিত্যে তিনি কী অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটি ও প্রবন্ধাবলীর পরিচয় আমি অন্যত্র অতি সংক্ষেপে দিয়েছি। এ বাবদে দুটি সংকলন আছে এবং যেহেতু এ-দুটির ইংরিজি অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি, তাই পুনরুল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি :

ঘটলো বিপর্যয়।

আল্লায় মালুম কোন্ শুকদেব ঠাকুরের সুপরামর্শে—তখনও তো দ্য গল্ জন্মান নি—ফরাসী সরকার লাগিয়ে দিলেন ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ—মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌সট্রাকশন, ওই সময় থেকেই বোধ হয় প্যারিসের যদো-মেধো ওর নাম দেয়, মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ডিস্‌ট্রাক্‌শন।

ফ্লেবেরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি বভারি পুস্তকের মাধ্যমে দেশের দশের নীতিধর্মের সর্বনাশ করছেন! সোজা বাংলায় তাঁর বইখানা অশ্লীল, কদর্য!!

'অশ্লীল' শব্দটা এ-কথা শুনে হেসে উঠলো না তো?

সেই যে-রকম ঢাকাতে সোয়ামি কম ভাড়া হাঁকলে রসিক কুট্টি কোচম্যান ফিসফিস করে বলে, 'আস্তে কন, কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো!'

এবং কার মুখে এই অভিযোগ?

প্যারিসের মুখে! তাজ্জব, তাজ্জব! গুজব, গুজব!!

প্যারিসীনির পরনে তখন কি? A la নুলিয়া নয় তো?

তাই বলছিলুম,

এ যেন প্রেতের গায়
শানেল আর উ (h) বিগাঁ মাখানো
ভুরভুরে খুশবায়!

কিংবা রাষ্ট্রভাষা :

আরে তেরা লড়কেকা
আজব তরেহ্ কা খেল
ছুচ্ছুন্দর কা সিরপর
চামেলী কা তেল!

("তোর ছেলেটার আজব কীর্তি! ছুঁচোর গায়ে মাখিয়েছে চামেলির তেল।" কি রকম চামেলি? 'বাদল শেষে করুণ হেসে, যেন চামেলি কলিয়াঁ!')

পাঠক ভাবছেন, আমি রগড় দেখে, the utter absurdity of it ভূতের মুখে রামনাম শুনে বে-এক্তেয়ার হয়ে উচ্ছ্বসিত গঞ্জিকা বিলাস করছি?

আদৌ না। আর করলেও আমি আছি সৎসঙ্গে, ইন গুড কামপনি!

মোপাসাঁ মোকদ্দমার সাতাশ বৎসর পরে মস্‌করা করে বলেন, "সরকারী পক্ষের উকীল যে-ভাবে ফ্লোবেরকে আক্রমণ করে বজ্রনির্ঘোষ 'বক্তিমে' ঝাড়েন, একমাত্র সেই কারণেই তাঁর নাম মার্কা-মারা (marque) হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, উকিল মসিয়োটি

---

* 1. Rene Dumesnil, chroniques, Etudes, Correspondance de Guy de Maupassant, publiees pour la premiere fois avec de de nombreux documents inedits, Gruend, Paris, 1938.

2. Artine Artinian & Edouard Maynial, Correspondance inedite de Guy de Maupassant Wapler, Paris, 1951.

মোকদ্দমার আরম্ভের প্রাক্কালে তাঁর নাম—Pinard-টি—বদলালেন না কেন?"[৪]

পিনার এক রকম মদ।

মোপাসাঁর বক্তব্য : বক্তিমে ঝাড়বি ঝাড়। হামলা করবি, কর। কিন্তু দোহাই ধর্মের, সাদা চোখে কর। পিনার—হুঁ—শুঁড়ি এলেন শ্লীলতা বাঁচাতে! এ যে দুঃশাসন এল নুলিয়াকে জোব্বা পরাতে।

এর পরও মোপাসাঁ আরেকখানা সরেস মাল ছেড়েছেন। কিন্তু হায়, সেটা তুলে দিলে লালবাজার চোখ লাল করেই ক্ষান্ত হবে না!! দে উইল বি আফটার মাই রেড্ ব্লাড !!!

"শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায়"

স্বাধীনতা বলুন, উচ্ছৃঙ্খলতা নাম দিন, প্যারিস একটি সৎ গুণের জন্য বিখ্যাত। সে চিরকালই স্বাধীন চিন্তা, তথা পীড়িত বিদ্রোহী জনকে আপন নগরে আশ্রয় দিয়েছে। জর্মন কবি হাইনের প্রগতিশীল মতবাদ কাইজার সহ্য করতে পারেননি বলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হল প্যারিসে—এবং জীবনের বেশীর ভাগই তিনি কাটান সেখানে। আর এই বছর পঞ্চাশ পূর্বেই বীর সাবরকরকে ফ্রান্সভূমি থেকে ইংরেজ ধরে নিয়ে যায় বলে ফরাসী সরকার তারস্বরে প্রতিবাদ জানায়।[১]

এ শতকে আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় আরামদায়ক তত্ত্ব-কথা ছিল এই যে, যেসব কূপমণ্ডুক দেশ কোনও বিশেষ ধরণের বই ছাপতে দিত না, সেগুলো ছাপা হত প্যারিসে। তার কিছুটা পাচার হত—যেমন ধরুন লেডি চ্যাটার্লি—ইংলন্ড, আমেরিকা, ভারত ইত্যাদিতে, আর বাদবাকিটা ফ্রান্সাগত ইংরিজি পড়নেওয়ালা টুরিস্ট গিলত গোগ্রাসে। তখনকার দিনে রোক্কা একটি টাকাতে উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাওয়া যেত। এদেশে যারা বিলিতি বই বিক্রি করে, তারা চিরকালই ছিল শাইলকের বাবার বাবা (আশা করি শাইলক জীবিত থাকলে অপরাধ নেবেন না)। 'ওয়ান সিনার রেইজেৎ এ হানড্রেড'—'এক পাপীকে দেখে একশ জন পাপ পথে যায়' আমিও তাই তাদেরই

---

৪ ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর জর্জ সান্ড্ (George Sand)-কে লিখিত তাঁর পত্রাবলীর ভূমিকারূপে মোপাসাঁ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন; উদ্ধৃতিটি সেই প্রবন্ধ থেকে।

সান্ড্ সাঁড, সাঁদ—এ তিনটেই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু দিল্লীবাসীর সদম্ভপ্রদত্ত ফতোয়া যে ইটি স্যান্ড্—কোথাও নেই। সাদামাটা "a" হরফটির উচ্চারণ একমাত্র ইংরিজি ছাড়া কোনও ভাষাতেই এ্যা হয় না। অবশ্য ai, au, ae বা a-র উপর দুটি ফুটকি থাকলে (উমলাউট) ভিন্ন কথা।

১ সাবরকরকে যখন বন্দী করে ইংরেজ ভারতে পাঠাচ্ছে, তখন তিনি ফরাসী বন্দরে পালিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠেন। ইংরেজ সেলার তাড়া করলে সাবরকর ফরাসী পুলিসম্যানকে বোঝাতে পারলেন না যে, তিনি রাজনৈতিক বন্দী—ফরাসী ভাষা জানতেন না বলে। সাধারণ খুনী আসামী ভেবে পুলিস তাকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে। পরে ইংরেজ বলে, ফরাসী পুলিস ফরাসী সরকারের প্রতিভূরূপে সাবরকরকে ইংরেজের হাতে যখন সমর্পণ করেছে, তখন পরে ফরাসী সরকারের আপত্তি করার কোনও হেতু নেই।...এ সব কিন্তু আমার শোনা কথা।

অনুকরণে, যত পারি এসব বই পাচার করে দেশে নিয়ে আসতুম। আমার পক্ষে প্রক্রিয়াটি কঠিন ছিল না। আমি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কস্টম কর্মচারী সে-যুগে সচরাচর হত গোয়ানীজ ক্যাথলিক। আমি ট্রাঙ্কের সর্বোচ্চ স্তরে রাখতুম একখানা ক্যাথলিক প্রেয়ার বুক এবং একটি মনোহর রোজারি—অর্থাৎ ক্যাথলিক জপমালা। ম্লেচ্ছ মুসলমানদের খ্রীষ্টপ্রীতি দেখে ক্যাথলিক কর্মচারী বে-এক্তেয়ার।

সেই প্যারিস মহানগরীতে শত বৎসর পূর্বে ডকে উঠলেন ফ্লোবের—মাদাম বোভারি বগলমেঁ। অভিযোগ! তিনি "ইমরাল" (দুর্নীতি প্রচারকারী), অশ্লীল কেতাব লিখেছেন। সরকার পক্ষের উকীল গাঁটের ছ পণ খেয়ে যে বক্তৃতা ঝাড়লেন, সেটা শুনে সকলেরই মনে হল, গাঁয়ের পাদ্রীকে বউবাচ্চাসহ খুন করে ঐ গাঁয়ের যে একটিমাত্র কুয়ো আছে, তাতে সে লাশগুলো ফেলে দিয়ে জল বিষিয়ে দিলেও বুঝি ফ্লোবেরের অপরাধ এর তুলনায় সোনার পাথর বাটিতে আকাশকুসুম সাজানোর মত হত।

মোপাসাঁ লিখলেন, "ধন্য ধন্য এডভোকেট জেনারেল পিনার! (শুঁড়ি মশাই—অবশ্য তিনি মীন করেছেন "শুঁড়ির শালা চামার!")। ফ্রান্সের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে রইলে!"

ফ্লোবের খালাস পেয়েছিলেন। আদালতের উপর জনমত হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ শুধু ফ্রান্স নয়, ফ্রান্সের বাইরেও তখন ঐ বই এমনই চাঞ্চল্য জাগিয়েছে যে, তার পূর্বে বা পরে এমনতরো কবার হয়েছে সেটা আঙুলে গুনে বলা চলে। গুণীরা বললেন, "যা বলো, যা কও, বইখানা নিঃসন্দেহে পীস অব আর্ট, শেফ দ্যভ্‌র, মাস্টারপীস।"

মোপাসাঁ অতিশয় সবিনয় লিখলেন, "সাহিত্যে নীতি? সে আবার কী চীজ? বেরুলুম সেই চীজের সন্ধানে যাঁরা মহামানব, যাঁরা সাহিত্যাচার্য তাঁদের কাছে। আরিস্তোফানেস, তেরেনৎস, প্লাউটস, আপুলেয়ুস, ওভিড, ভের্গিল, শেকসপীয়ার, রাবলে, বক্কাচ্চো, লা ফঁতেন, স্যাঁতামাঁ, ভলতের, জ্যাঁ জ্যাঁক রুসো, দিদেরো, মিরবো, গোতিয়ে, ম্যুসে[২] ইত্যাদি ইত্যাদি—একটিমাত্র উদাহরণও পেলুম না এঁদের কাছে।"

ফিরিস্তিটা উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নেই। গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ইংরেজ এবং সর্বোপরি ফরাসী—কারণ মোপাসাঁ স্বয়ং ফরাসিস—মহারথীরা এতে রয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, চীনা কোনও মহারথীর নাম তিনি করেননি। আরব্য রজনী পর্যন্ত না। কিন্তু আমার আশ্চর্য বোধ হয়, ওল্ড টেস্টামেন্টটির কথা মোপাসাঁর স্মরণে এলো না কেন? যদিও আশ্চর্য হবার বোধ হয় কোনও কারণ নেই। অধুনা আমি আঁদ্রে জিদ-এর "জুর্নাল" বা রোজনামচাখানা ফের উল্‌টে-পাল্‌টে দেখছিলুম, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত।[৩]

---

২ Aristophanes, Terence, Plautas, Apleus, Ovid Virgil, Shakespeare, Rabelais, Boccacio, La Fontaine, Saint Amant, Voltaire, J. J. Rousseau, Diderot, Mirabeau, Gautier, Mussec etc. etc.

ফরাসী জাতটা বিদেশী নাম বিকৃত করতে ওস্তাদ—অনেকটা বাঙালীর মত কিংবা বলতে পারেন, পরকে "আপনাতে" জানে।

৩ অধুনা এদেশে নাকি "তুলনাত্মক সাহিত্যচর্চা" পড়ানো হয়। এ চর্চাতে যাদের হাতখড়ি হচ্ছে, তাদের স্মরণ করিয়ে দি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক লোকই রোজনামচা লেখেন।

পুস্তকান্তের নিঘণ্টুতে দেখি, জিদ প্রায় ছ'শ জন লোকের নাম করেছেন। শতকরা আশিজন সাহিত্যস্রষ্টা। প্রাচ্যদেশীয় একজন লেখকের নামও তাঁর আত্মচিন্তায়, বন্ধু মিলনে, সাহিত্য পাঠে উল্লিখিত হয়নি। অথচ গুণগ্রাহী এই জিদই 'গীতাঞ্জলি'' অনুবাদ করেন। ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবদের কথা হচ্ছে না; ম্যাক্সম্যুলার, লেভি, উইনটারনিৎস, সাষাও (অলবীরুনীর অনুবাদক) এঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যাঁরা সাহিত্য-রস, কলাসৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের অল্পজনই সে-সব বস্তুর জন্য অস্তাচলে বসে পূর্বাচলের পানে তাকান—গ্যোটে রোলাঁ (তিনিও সুন্দরের চেয়ে সত্যের সন্ধান করেছেন অধিকতর) বড়ই বিরল। প্রতিদিন বিরলতর হচ্ছে। কিছুদিন পরে অবশ্য এঁদের সম্বন্ধে আমরা আর কোনও খবরই পাব না। বিদেশী বই আসবে না। বিজলি বন্ধ হয়ে গেলে রেডিয়ো সেটের মত অবস্থা হবে আমাদের।

মূল কথায় ফিরে যাই : মোপাসাঁ লিখছেন, "রীতিমত চটে যেতেন ফ্লোবের, যখন আর্ট সমালোচকরা সাহিত্যে "নীতি" "সাধুতার" দোহাই পাড়তেন। তিনি (ফ্লোবের) নিজেই বলেছেন, 'যবে থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে, সর্বমহান লেখকই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে এই সব ক্লীবদের 'সদুপদেশের' (উদ্ধৃতি চিহ্ন অনুবাদকের) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।'

("Depuis qu'existe l'humanite, disait-il, tous les grands ecrivains ont proteste per leurs oeuvres contre ces conseils d'impuissants")[৪]

গুরুদত্ত এই আপ্তবচনটি সসম্মান উদ্ধৃত করে মোপাসাঁ বলছেন, "সুষ্ঠু, প্রতিষ্ঠিত সমাজজীবনের জন্য সুনীতি তথা সাধু আচরণ অপরিহার্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের তো কোন সম্পর্ক নেই। ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো বর্ণনা করা—তা তার প্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তিই হোক আর কুপ্রবৃত্তিই হোক। নীতিগর্ভ উপদেশ বিতরণ করা কিংবা অভিসম্পাত দেওয়া, অথবা তত্ত্বতথ্যের প্রচার করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা তো তার কর্ম নয় (অর্থাৎ এসব প্রচারকর্মের 'মিশনারি'

এদের ভিতর একজন ফরাসী—জিদ, দ্বিতীয়জন জর্মন—য়ুঙার (স্ট্রালুঙেন) এবং তৃতীয়জন স্যুইস—ফ্রিশ (টাগেবুখ)—যদিও যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তবু তার মূল Weltanschauuang যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ধ্বংসকে কেন্দ্র করে। এঁরা তিন দেশের সর্বোত্তম না হলেও তারই কাছাকাছি লেখক।...পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন, ফরাসী জিদ কী মৈত্রীর চোখে জর্মনদের এবং জর্মন য়ুঙার ফরাসীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন! এর সঙ্গে পাঠক আইজেনহাওয়ারের ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ মিলিয়ে পড়লে উপকৃত হবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি, শেষের ইংরিজি বই ভিন্ন বাদবাকি তিনখানা বই আমি এদেশের বিদেশী-পুস্তকবিক্রেতাদের 'কেরপায়' পাইনি। ঈশ্বরাদেশে যারা পপলার গাছ পোঁতে, তাদেরই একজনের বদান্যতায়। তা সে যাক গে। কিন্তু এই সুবাদে আমি আমার বিশেষজ্ঞ পাঠকদে শুধোই—আমার বাস মফস্বলে—আচ্ছা আজ যদি কোনও বন্টু বা হটেনটট বিদেশী বই কিনতে চায়, তবে তাকেও কি এক্সচেঞ্জের জন্য পন্টকদের পায়ে তেল দিতে হয়? বোধ হয় না। কারণ তারা যে বর্বর। আর আমরা সভ্য। "মহামানবের তীরে" বাস করি।

৪ Dumesnil, Correspondance, পৃ: ১০৯।

সে নয়)। এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক কোনও গ্রন্থই আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে না।

তৎসত্ত্বেও কোনও সার্থক গ্রন্থ যদি সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়, তবে সেটা লেখক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে নয় (সেটা 'malgre l'auteur' 'inspite of the author', সেটা লেখকের ইচ্ছা—এমন কি অনিচ্ছাবশত নয়), তিনি যে-ভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সে সেই সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়েছে।"

অর্থাৎ "আন্‌কল টমস্ ক্যাবিন" যদি দাসত্ব প্রথাকে নির্মম আঘাত দিয়ে থাকে, যদি এমিল জোলার 'জাঁ ক্যুজ' ('আই একুজ'='আমি ফরিয়াদ জানাই')[৫] মিলিটারি স্বৈরতন্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকে, তবে তার কারণ, পুস্তকদ্বয় অনুভূতি সঞ্চারণে এমনই কৃতকার্য হয়েছিল যে, এগুলি তখন আর্টের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছে!

মোপাসাঁ বিশুদ্ধ আর্ট, আর্টে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে আরও অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো উপস্থিত থাক।

ছুঁৎবাই রোগে আক্রান্ত 'পদি পিসি' সব দেশেই আছেন—তবে ফ্লোবের-মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে ফ্রান্সের পদি পিসিরা বড়ই মুষড়ে যান। বস্তুত ফ্লোবের-শতাব্দীর শেষের দিকে পেন্ডুলাম অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের যে মিনিস্‌ট্রি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন একদা ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিলেন, তাঁরাই তখন আইন করেছেন, যে-সব পুস্তকে ভগবানের উল্লেখ থাকবে, মিনিস্‌ট্রি সেগুলো তাঁদের পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কিনবেন না। সে খবর শুনতে পেয়ে কট্টর জাত-নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "এ আবার কি রকমের লিবার্টি—যে লিবার্টি মানুষকে ভগবানের নাম প্রচার করতে দেয় না?"

বভারি মোকদ্দমার একশ' বছর পর আবার পেন্ডুলাম অন্য প্রান্তে গেছে। টপ্‌লেস ডাইনি পোড়াবার জন্য ফ্রান্সেই এখন সব চেয়ে পুলিসের দাপট, নাইটক্লাব টাইট দেওয়াতে এদের উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই। আমাদের অবশ্য তাতে কিচ্ছুটি বলবার নেই।

কিন্তু একশ' বছর পূর্বে যে বভারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে মার খেল ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সই চেষ্টা করছে এখন, আবার মাদাম বভারির সর্বাঙ্গে বোরকা চাপিয়ে তুর্কীপাশার হারেমবদ্ধ করতে! হিটলার যখন 'পবিত্র' জর্মন ন্যাশনালিজমের দোহাই কেড়ে ইহুদি বই পোড়াতে আরম্ভ করেন তখন এক মার্কিন গুণী বলেছিলেন, 'জর্মনী পুটস দি ক্লক ব্যাক!" ফ্রান্সে যে তারই পুনরাবৃত্তি! এ-ও এক নয়া নাৎসিবাদ।

দ্য গল্ লোকটিকে আমার খুব পছন্দ নয়। যদ্যপি গত যুদ্ধের সময় তাঁর আদর্শ এবং চার্চিলের আদর্শে কোন পার্থক্য ছিল না, তবু চার্চিল পদে পদে দ্য গলের দম্ভ দেখে অতিষ্ঠ হতেন। প্রধান অভিনেত্রী বা প্রিমা দন্নার মত তিনি এমনই অতি অল্পেতে ঠোঁট ফোলাতেন,

---

৫ বইখানা অবশ্য মোপাসাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়ে শুধু ফ্রান্সে নয়, সর্ব সভ্য বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি বিশেষ করে এ-বইখানা যে উল্লেখ করলুম তার কারণ, প্রবাদে আছে "পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সর্ড" "লেখনী তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী"—এবং এই বইখানি তৎকালীন ফরাসী সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী মদমত্ততাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে প্রবাদবাক্যটি সপ্রমাণ করে। আমার জানামতে এটি লেখনী তরবারিতে একমাত্র সরাসরি যুদ্ধ।

গোসাঘরে আশ্রয় নিতেন[৬] যে, আইজেনহাওয়ারের মত মাথা ঠাণ্ডা মানুষ পর্যন্ত—যিনি কিনা মন্টীর মত দেমাকি লোককেও সামলাতে পেরেছিলেন—তাঁর এদিকটা লক্ষ্য করে লেখেন "We felt that his qualities were marred by hypersensitiveness and an extraordinary stubbornness in matters which appeared inconsequential to us. My own wartime contacts with him never developed that heat that seemed to be generated frequently in his meetings with many others."[৭]।

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সী পড়ে তাঁতী। চিতে বাঘের চিত্তির মুছতে লেগে গেছেন মঁসিয়ো ল্য জেনারেল শার্ল দ্য গল্। না হলেই তো 'চিত্তির'! তবে শুনেছি, এ রবির পিছনেও নাকি একটি বিরাট ছায়া আছে। তিনি নাকি মাদাম। তিনিই নাকি ফ্রান্সের নব জোয়ান অব আর্ক পদি পিসি।

এ-সুবাদে আমার মনে পড়লো, এমিল জোলারও নাকি কয়েকটি পদি পিসি দোস্ত ছিলেন। তাঁরা নাকি একাধিকবার বায়না ধরে তাঁকে বলেন, "ভাই, তুমি লেখো ভালো; কিন্তু তোমার কোন বই-ই নিঃসঙ্কোচে পুত্রকন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায় না। একখানা 'ক্লীন' বই লেখো না কেন?"

জোলা ঢোঁক গিললেন।

সে বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, মসিয়ো জোলা যখন শুয়ারটার মত কাদাতে গড়াগড়ি দেন তখন তিনি সেটি করেন বড়ই গ্রেসফুলি (অর্থাৎ প্রকৃত সমঝদার আর্টিস্টের মত), কিন্তু তিনি যখন বন্ধুজনের অনুরোধে পাখনা গজিয়ে দেবশিশুপারা স্বগ্‌গোপানে ওড়বার চেষ্টা করেন তখন সেই "এলোপাতাড়ি ড্যানার বাড়ি" দেখে হাসি সামলানো রীতিমত মুশকিল হয়—হি ডাজ ইট্ মোস্ট গ্রেস্‌লেস্‌লি। তারপর তিনি বলেন, আই প্রেফার মসিয়ো জোলা ওয়ালেইং ইন মাড্—মসিয়ো জোলার নর্দমাতে হুটোপুটি করাটাই আমি পছন্দ করি বেশি।[৮]

* * *

প্যারিস ড্যানা গজিয়ে ফেরেশতার মত বেহেশৎ পানে ওড়বার চেষ্টা করছে —ইয়াল্লা!!

---

৬ আজকের দিনের সম্মানিত মহিলারা যে খাস কামরায় অতিথি-অভ্যাগতকে "আপ্যায়িত" করেন তার নাম "বুদোআর"। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে। অনেকেই মনে করেন এই "ব্যুদর"="to Sulk"="অভিমান করা" থেকে এসেছে।

৭ ক্রুসেড ইন্ ইউরোপ, পৃঃ ৪৫৬।

৮ কাতরকণ্ঠে নিবেদন; দুনিয়ার কুল্লে বই—তা আমার জরুর যত কমই হোক—আমি যোগাড় করি কি প্রকারে? তাই অনেক স্থলেই স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরস্বতী সাক্ষী, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়, কারও প্রতি অধম অবিচার করে না। এসব মহাজনদের বচন খাঁটি সোনার মোহর, উদ্ধৃতির চাপে ব্যাঁকাট্যাড়া হয়ে গেলেও সোনা সোনাই থাকে।

'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়'

অভিজ্ঞতাজনিত বিজ্ঞতা আসে ল্যাটে। তখন ওটা আর কোন কাজে লাগে না। বিলকুল বেকার। কিরকম? প্রকৃতির নিয়ম : মাথায় বিপর্যয় টাক পড়ে যাওয়ার পর চিরুনি-প্রাপ্তি। ইরানী কবি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন : বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনায় দাঁত কিড়মিড় করছি? কিড়মিড় করার জন্য, হায়, দাঁতও যে আর নেই।

ল্যাটে বুঝলুম, মাতৃভাষা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর নিতান্তই যদি আরেকটি ভাষা শিখতে হয় তবে সেটি হবে, তোমার মাতৃভাষা যার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী সেইটি শেখা : বাঙলার বেলা সংস্কৃত, ফার্সীর বেলা আরবী, ফরাসীর বেলা লাতিন। তার বেশী ভাষার পিছনে ছুটোছুটি করা নিছক আহাম্মুখি। মাসান্তে যে দু'একখানা বিদেশী বই কিনবে, তার আর উপায় রইল না। কেন? কলকাতাতে কি বিদেশী বই পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় বই কি, এন্তের অঢেল। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো তো দিবারাত্তির গান গাইছে। মুশকিল শুধু, আপনার পছন্দের গান গায় না।

ইতিমধ্যে আমি দুখানি চিঠি পেয়েছি। দুটি তরুণ আমার সদুপদেশ পাওয়ার পূর্বেই ফরাসী জর্মনে সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে। তাদের সামনে সমস্যা, এখন এগোয় কি প্রকারে? তারা থাকে মফস্বলে—কি করে বলি, কলকাতার কোনও কোনও লাইব্রেরির লেনডিং সেকশন আছে, তাদের শরণাপন্ন হও, যখন জানি, কলকাতার খাস বাসিন্দার পক্ষেও কর্মটি সুকঠিন।

তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, এরা মফস্বলে বাস করে। তার একটা মস্ত সুবিধে, ইলেকট্রিকের উৎপাত সেখানে নেই, কিংবা নগণ্য। বেতার যন্ত্রটির পুরো ফায়দা সেখানে ওঠানো যায়। কলকাতাবাসীও অবশ্য খানিকটে পারবে।

উপস্থিত বেতার খুললেই শর্টওয়েভে পাবেন, গাঁক গাঁক করে আপন পরিচিতি জানাচ্ছেন চীন (চীন আমাদের অতি কাছে বলেই তাকে পাওয়া যায় হরবকৎ, কিন্তু আমাদের কাজে লাগে অত্যল্পই), রুশ আমেরিকা (VOA = Voice of America), ব্রিটেন (B B C), এবং অস্ট্রেলিয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যেগুলো দরকার, যেমন ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালি সেগুলো জোরদার নয় এবং আমাদের উপকারার্থে তারা ব্রডকাস্ট করে অল্প সময়।

এই বেতারের সাহয্যে পুস্তকের অভাব খানিকটা পুষিয়ে নেওয়া যায়।

এর পূর্বে দু'একটি কথা অবতরণিকা হিসেবে বলে নেওয়া ভালো।

ভারতবর্ষে যে নিরক্ষরতা দ্রুতগতিতে লোপ পাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ এ নয় যে, গ্রামে গ্রামে আমরা পাঠশালা খুলতে পারছি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার আসল কারণ, যারা পাঠশালা পাস করে বেরোয় তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়—পড়বার জন্য বই খবরের কাগজের অভাব। যে গ্রামে পঞ্চাশ বছর ধরে পাঠশালা আছে, সেখানে যে-কোনও সময়ে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, মাত্র যারা দু-এক বছর হল পাস করে বেরিয়েছে তারাই এখনও লিখতে পড়তে আঁক কষতে পারে ("থ্রী আর"= রীডিং,

গ্যারান্টি, রেকর্ডিং)। বাদবাকিরা কিংবা তাদের অধিকাংশ পুনরায় নিরক্ষণ হয়ে গিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বছর কুড়ি পূর্বে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ জোর প্রোপাগাণ্ডা-ক্যামপেন চালিয়েছিলুম; সুযোগ পেলে মৃত্যুর পূর্বে আরেকবার চালাবো—মা ফলেষু কদাচন মন্ত্র স্মরণ করে।

তাই বৎস, তুমি যে ফরাসী, জর্মন বা রুশ ভাষার সার্টিফিকেট পেয়েছ সেটা উত্তম কর্ম, কিন্তু যেটুকু শিখেছ সেও ভুলে যাবে, ঐ গ্রামের পড়ুয়ার মত পুস্তকাভাবে। তাই বলছিলুম, বেতার তোমাকে খানিকটে বাঁচাতে পারে।

তার পূর্বে কিন্তু একটি ভেরি ভেরি ইম্পরটেন্ট তত্ত্বকথা বলে নিই। এটা আমার নিজের উপদেশ নয়—পৃথিবীর যে-কোনও বেতার কেন্দ্র তোমাকে এই উপদেশ দেবে।

রুম অ্যারিয়েল শর্ট ওয়েভের জন্য সম্পূর্ণ বেকার না হলেও ছাতের উপর বাঁধা দীর্ঘ, দীর্ঘতম বাঁশের অ্যারিয়েলের তুলনায় নগণ্য। আমার উপদেশে যারাই কান পাতছ, তাদেরই বলি, যারা মফস্বলে থাকো তারা নেবে দীর্ঘতম বাঁশ (শহরে বোধ হয় এর একটা সীমা আছে, কিন্তু যেহেতু তুমি চোদ্দতলা বাড়িতে বাস করো না, সেটা তোমার উপরে প্রযুজ্য নয়) এবং নির্মাণ করবে সর্বোত্তম অ্যারিয়েল। এস্থলে বলে রাখা ভালো, তিন-চারশ টাকা সেট + আউটসাইড ব্যামবু অ্যারিয়েলে যে রিসেপশন পাবে, হাজার টাকা সেট + রুম অ্যারিয়েলে পাবে তার চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট রিসেপশন। অবশ্য দামী সেটে যে রকম ধ্বনিকে—বিশেষ করে সঙ্গীতের বেলায় ইচ্ছেমত কড়া মোটা করা যায়, সস্তা সেটে সেটা করা যায় না। কিন্তু ভাষার বেলা—যাকে বলে স্পোকেন ওয়ার্ড—সস্তা সেটও + দীর্ঘতম আউটসাইড অ্যারিয়েল ১০০% কাজ দেবে। "আমার সেটা আরও দামী হলে আরও ভালো রিসেপশন হত" এটা ভুল ধারণা। যে-কোনও দিন সকাল সাতটা-আটটা গোছ সময় ১৩ মিটার ব্যান্ডে অস্ট্রেলিয়া শুনে নিয়ে (ঐ সময় ১৩ মিটার মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট) অন্য বাড়িতে দামী সেট শুনে এসো—দেখবে তফাৎ নেই। পুনরায় সন্ধ্যে ৬-৩০-এ ১৩ মিটারে প্যারিসের ইংরেজির প্রোগ্রাম খানিকটা শুনে (প্রোগ্রাম মাত্র আধ ঘণ্টার, ৭টা থেকে ফরাসী ভাষাতে প্রোগ্রাম খানিকটা শুরু হয়ে যায়) দামী সেটের রিসেপশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। প্যারিস দুব্‌লা স্টেশন, তদুপরি ঐ সময় ১৩ মিটারে বিস্তর স্টেশন ঝামেলা লাগায়—গোটা তিনেক বি বি সি, একটা VOA, ভাটিকান, সুইজারল্যান্ড, পাকিস্তান, রুশ, হল্যান্ড, আরও কে কে আছেন—কাজেই তুমি যদি তখন প্যারিসের ইংরিজী প্রোগ্রাম পরিষ্কার বুঝতে পারো তবে আর চিন্তা কোরো না, তোমার সেট এবং অ্যারিয়েল দুই-ই ঠিক। অবশ্য বর্ষার অতি নিকৃষ্ট আবহাওয়া হলে দামী, সস্তা কোনও সেটেই, শহর মফস্বল কোনও জায়গাতেই হয়তো প্যারিস ধরতে পারবে না।

আপন দেশের ভাষা শেখাবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহী ইংরেজ। কিছু দিন থেকে বাংলার মাধ্যমে পর্যন্ত ইংরিজী শেখাতে আরম্ভ করেছে। যারা ইংরেজীটা মোটামুটি জানো, তারা অ্যাডভান্স কোর্সটি শুনলে উপকৃত হবে।

প্যারিস একদা, বোধ হয়, ইংরিজীর মাধ্যমে ফরাসী শেখাতো। এখন সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত যে ইংরিজী প্রোগ্রাম দেয় তাতে তো সে আইটেম শুনিনি। তবু নিরাশ হবার কারণ নেই। প্রথম ১৮৩০ থেকে ১৯০০ অবধি (আমি সর্বত্রই ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম দিচ্ছি) মনোযোগ সহকারে ইংরেজী প্রোগ্রামটি বিশেষ করে সংবাদ—শুনে নেবে। তারপর

সেই সংবাদই ফরাসীতে শুনতে পাবে ১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর ভিতর কোনও এক সময়। ইংরেজীতে খবরটা বুঝে নিয়েছ বলে ফরাসীতে সেটি ধরতে সুবিধে হবে। মাসখানেক প্র্যাকটিসের পরও যদি না বুঝতে পারো তবে মেনে নিয়ো, যে ফরাসী জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছিলে সেটা যথেষ্ট নয়। দুপুরেও প্যারিস ফরাসী প্রোগ্রাম দেয়—প্রধানত ইন্ডোচায়নার জন্য। তবে রিসেপশন সব সময় ভালো হয় না।

সুইজারল্যান্ডও ফরাসীতে প্রোগ্রাম দেয়। ইংরেজীতেও। আমাদের জন্য (অর্থাৎ ফর ফার ঈস্ট অ্যান্ড সাউথ ঈস্ট এশিয়া) তাদের স্টেশন খোলে ১৬৩০, ঐ ১৩ মিটার ব্যান্ডেই। ওরা কিন্তু ব্রডকাস্ট করে (১) জর্মন, (২) সুইস জর্মন, (৩) ফরাসী, (৪) ইতালীয়, (৫) ইংরেজী এবং কোনও কোনও দিন এস্‌পেরান্তোতেও। প্যারিসের বেলা যে প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছি এস্থলেও সেটি প্রযোজ্য। তোমাকে শুধু তক্কে তক্কে থাকতে হবে, কখন কোন্ ভাষায় প্রোগ্রাম দেয়।* এ ছাড়া রুশ, চীন, জাপান এরাও ফরাসীতে ব্রডকাস্ট করে, (বি বি সি-ও করে, কিন্তু এ দেশে শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে কখনও কখনও পাওয়া যায়—আসলে ওটা আমাদের উদ্দেশে বেতারিত হয় না—ওটা পূর্ব ইয়োরোপের জন্য, জর্মনের বেলাও তাই)।

কিন্তু সর্বোত্তম ব্যবস্থা অল ইন্ডিয়া রেডিওর ফরাসী প্রোগ্রাম শোনা। রাত ঘনিয়ে এলে ও বোধ হয় সন্ধ্যার দিকেও ইটি বেতারিত হয়। এটা শোনার সুবিধা এই, রিসেপশন মোটামুটি ভালো, কি কি খবর মোটামুটি দেবে সেটা আগের থেকে জানা আছে বলে বুঝতে সুবিধে হয়, এবং যে দু-চারটে কথিকা দেয়—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ভারত ইতিহাসের কিছু একটা—আমাদের কিছুটা জানা বলে ঐ একই সুবিধে, এদের উচ্চারণ সব সময় ১০০% খাঁটি হয় না—তবে আপনার আমার কাজের জন্য "যথেষ্টর চেয়েও প্রচুর"। এস্থলে উল্লেখ করি, যাঁরা কনভারসেশনাল আরবী এবং ফার্সী বুঝতে নিজেকে অভ্যস্ত করাতে চান তাঁরা যেন আকাশবাণীর আরবী ফার্সী প্রোগ্রাম শোনেন। এঁদের উচ্চারণ অত্যুৎকৃষ্ট। কিছুদিন আগেও মক্কার এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও মদিনাগতা তাঁর স্ত্রী অ্যানাউসার ছিলেন।

ধার্মিকজন মিশরে গৃহীত রেকর্ডে অত্যুত্তম কুরান পাঠও শুনতে পারেন।...রাজনৈতিক তথা প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভালো থাকলে ফরাসী ইকোয়েটরিয়াল আফ্রিকার ব্রাজভিল শহরের উত্তম ফরাসী ব্রডকাস্ট এদেশে পাওয়া যায়।. শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে ত্যুনিস আলজেয়ারস থেকেও মিডিয়াম ওয়েভে ফরাসী প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। এবং রাত দশটা এগারোটা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত মন্তে কার্লো—ফরাসীতে। শীতকালে মিডিয়াম ওয়েভে ২০৫ মিটার (= ১৪৬৬ কি. সা.) ব্যান্ডে। আমার জানামতে এটিই ইয়োরোপের সব চেয়ে

---

* সব স্টেশনই কোনও না কোনও সময় আপন ঠিকানা দেয়। সে ঠিকানায় চিঠি লিখলে তারা প্রোগ্রাম ফ্রী পাঠায়। যারা ভাষা শেখায় তারা কেউ কেউ ফ্রী চটি পাঠ্যবইও পাঠায়, কোনও কোনও স্থলে পয়সা দিতে হয়। কখন কোন্ মিটারে কে ব্রডকাস্ট করে তার সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায় World Radio Hanbdggk, Lindorffs, Allee 1, Hellerup, Denmark বইয়ে। দাম পাঁচ টাকার মত। এবং সকরুণ নিবেদন, আমাকে দয়া করে চিঠি লিখিবেন না। আমি অসুস্থ। সেক্রেটারি নেই।

জোরদার মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন। এর জোর ৪০০ কি. ও.। ফরাসীটা সড়গড় হয়ে গেলে শীতকালে অনিদ্রায় এর প্রোগ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে শোনা যায়। তবে কমার্শিয়াল বলে উৎপাতও আছে।...ওয়েস্ট বার্লিনও ৩০০ কি. ও. স্টেশন, কিন্তু কে জানি নে একে বড় জ্যাম করে।

জর্মনির যে বেতার স্টেশন বিদেশের জন্য বেতার ছাড়ে তার নাম ডয়েচশে ভেলে (Deutsche Welle) এবং তিনি কলোনে (Koeln-Cologne যেখান থেকে অডিকলোন আসে)। ভারতের জন্য এদের প্রোগ্রাম ১৮.২০ থেকে ০.১৫ পর্যন্ত, ১৯ এবং ১৬ মিটারে কিন্তু নিরেট জর্মন ভাষায়। তবে ইংরেজী, হিন্দী. উর্দু এবং ফের ইংরেজীতে ব্রডকাস্ট করে একবার সকালে ৮.৩০ থেকে ৯.১৫ পর্যন্ত এবং দুপুরে একটা থেকে মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি ওই সব ভাষায়। এরই যে কোনও একটা শুনে নিয়ে জর্মন প্রোগ্রাম শুনে নিলে ভালো হয়। কিছুদিন পূর্বে একটি তাজ্জব খবর পেলুম। জর্মনি মাসে দুই বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে ১.৩৫ পর্যন্ত সংস্কৃতে ব্রডকাস্ট করবে! তবে ওয়েভ লেন্থটা জানি নে। আশা করছি, খুঁজে-পেতে পেয়ে যাব।...বর্ষাকালে এ দেশে জর্মনি ভালো পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ১২.১৫ থেকে ১৫.০০ অবধি জর্মনি যে বেতার অস্ট্রেলিয়ার জন্য ২৫, ১৯, ১৬ মিটারে ছাড়ে তার ১৬টা ভালো পাওয়া যায়। জর্মনি একদা ইংরেজীর মাধ্যমে জর্মন শেখাতো—এখনও শেখায় কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়া পূর্বোক্ত সুইজারল্যান্ড অনেকক্ষণ ধরে জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এককালে পূর্ব জর্মনিও (DDR) শুনতে পেতুম। দুপুরবেলা জাপানও উত্তম জর্মনে (১৯ মি.) এবং রাত ঘনিয়ে এলে মস্কো, বুখারেস্ট, প্রাগ, সোফিয়া ইত্যাদি শহরও ফরাসী জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এদের সকলেরই প্রায় এক সুর, কিন্তু আমাদের তাতে কিছুটি যায় আসে না। আমাদের ভাষা শেখা নিয়ে কথা।

দুঃখের বিষয়, ভিয়েনা—জর্মন ভাষার বড় কেন্দ্র—এখনও এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে, এবং ফরাসী কৃষ্টির বৃহৎ কেন্দ্র ব্রাসল্‌স্ আমি কখনও পাইনি।

মস্কো একদা অতি সযত্নে রুশ ভাষা শেখাতো। আরবী, ফার্সীতে যাঁদের দিল্‌চস্‌পী, তাঁরা অনায়াসে বাগদাদ, কাইরো এবং তেহেরান খুঁজে পাবেন। কাবুল ফরাসী ও ইংরেজীতে অল্পক্ষণের জন্য ব্রডকাস্ট করে। ফার্সী এবং পশতু প্রচুর।

আমি শুধু সেসব স্টেশনের কথাই উল্লেখ করেছি, যেগুলো এ দেশে মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায় এবং বিদেশী ভাষা-জ্ঞান সড়গড় রাখতে সাহায্য করবে।

"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—"

কি করে হঠাৎ একরাশ টাকা আমার হাতে এসে পৌঁছল, সেটা দফে দফে বুঝিয়ে বলা শক্ত। দরকারও নেই। মোটামুটি বলতে পারি, অনেকটা লটারি জেতার মত।

কিন্তু বিপদ হল, টাকাটা যাঁর মারফৎ এসেছিল, তাঁকে নিয়ে। তিনি লন্ডনের নিকটতম

উন্নাসিক এক দর্জী "দোকানে" কাজ করেন। সে দোকান নাকি রাজ-পরিবারের বাইরে কারও জন্য অর্ডার নেয় না। সেই কর্ম-প্রতিষ্ঠানে না আছে সাইনবোর্ড, না আছে টেলিফোন-কেতাবে তাদের নাম, নম্বর। তাদের প্রাইভেট নম্বর শুধু রাজ-পরিবার জানেন। অন্য লোকে সন্ধান পাবেই বা কি করে!

আমি বাস করতুম তাঁরই বাড়িতে। বাড়ির জেল্লাই কিছু কম নয়। বাকিংহাম প্যালেস পেরিয়ে হাইড পার্ক গেটে তাঁর ভবন। সে রাস্তাতেই থাকেন আর্টিস্ট এপ্‌স্‌টাইন (না রাটেন্‌স্‌টাইন, ঠিক জানি নে) ও চার্চিল সাহেব। আমি সেথায় আশ্রয় পেলুম কি করে? সেই খলিফের খলিফে গিয়েছিলেন হল্যান্ডে। সেখানকার রাজকন্যার বিয়ে হবে। বরের বিয়ে বেশভূষা তৈরি করতে। অতিশয় অনিচ্ছায়, দেশের আপন রাজার আদেশে। সেই বিদেশের রাজধানীতে পথ, হোটেলের নাম সব হারিয়ে যখন গা গা'র মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলুম। ব্যস। হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে পকড়কে আমাকে লন্ডন নিয়ে এলেন। তদবধি তাঁর ভবনে বাস। অবশ্য স্বীকার করবো লোকটি ভদ্র। আমি অন্যত্র সস্তা জায়গায় থাকলে যে কড়ি গুনতুম, তিনি সেটি সপ্তারাম্ভে সহায্যে নিতেন। পাছে আমি লজ্জিত হই, আমি মুফতে আছি।

আমি বললুম, "কি ধরনের কাপড়ে স্যুটটি হবে সে বাবদে আমারও তো কিছু রুচি থাকতে পারে। দেখি, কাপড়ের নমুনা।"

পাগলামিতে হাতেখড়ি হচ্ছে হেন লোককে যেভাবে ডাক্তার প্রণব রায়ের মত লোক হ্যান্ডিল করেন, সেইভাবে সদানন্দ হাস্য হেসে বললেন, "বৎস, তোমাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন শুধোই। তোমার যখন বিয়ে হয়, তখন গুরুজন তোমার ঐ রুচির কথা শুধিয়েছিলেন?"

সত্যের অনুরোধে আমাকে নিরুত্তর থাকতে হল।

"আর এ তো সামান্য স্যুট। অবশ্য তুমি কুতর্ক করতে পারো, সামান্য জিনিসেই বরঞ্চ আপন রুচিমাফিক জীবনানন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু এ তো সামান্য জিনিস নয়, এ ব্যাপারটি অসামান্য। ভেরি ভেরি ইমপরটেন্ট। নইলে কও, এরই মেহেরবানীতে আমি বাড়ি গাড়ি হাঁকালুম কি প্রকারে? অতএব বুঝিয়ে কই।"

গভীর দম নিয়ে মিঃ সিরিল হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন বললেন, "উপস্থিত নববসন্ত সমারম্ভ। তুমি এসব স্যুট পরবে নিদাঘের অন্তিম নিশ্বাস থেকে হেমন্তের শেষান্ত পর্যন্ত। এইবারে শোন বৎস, তত্ত্বকথা। শিশির বসন্ত নিদাঘ হেমন্ত প্রতি ঋতু অনুযায়ী বকিঙহম প্রাসাদ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। কিন্তু প্রতি বসন্তে একই বর্ণনা, প্রতি শিশিরে একই সর্ষপবর্ণ—অর্থাৎ নুন-হলদে না, একই বর্ণনা, একই বর্ণনা করা চলবে না।

প্রতি ঋতুর সমারম্ভে আমাদের একটি গুহ্যতম—টপমোস্ট-সীকরিট সভা বসে আসছে ঋতুর বর্ণ স্থির করার জন্য। যে বর্ণ স্থির করা হল, সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হয়। নইলে রাস্তার যেদো-মেধো সেই রঙের স্যুট যততত্র ঘোঁত ঘোঁত কর ঘুরে বেড়াবে। তা হলে ড্যুক অব এডেনবরা যখন অ্যাসকটে নামবেন—না, সেখানে হাঙ্গামা কম, প্রশ্ন শুধু ওয়েসকিট নিয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়েস্টকিট কি?"

"চ্যাংড়ারা হালফিল যাকে ওয়েস্টকোট বলে।"

আমি চুপ করে ভাবলুম, আমাদের দর্জীরা যখন 'ওয়াসকিট' বলে, তখন মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণই করে, এবং 'লাট্-সাহেবে'র 'লাট্' উচ্চারণের মতই প্রাচীন শুদ্ধ উচ্চারণ। বললুম, তা "ওয়েসকিট্ নিয়ে দুর্ভাবনা কিসের?"

তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তোমার ব্লাইন্ড স্পটগুলো যে খোদায় কোথায় কোথায় রেখেছেন বলা শক্ত। এদিকে শেক্স্পীয়র-বাইরন পড়েছ, অন্যদিকে মর্নিং স্যুটের ওয়েসকিটের মহিমা জানো না।"

আমি একগাল হেসে বললুম, "টায় টায় মিলে যাচ্ছে। ফ্রান্সের শ্যামপেন প্রভিনসের এক সমঝদার আমায় বলেছিল, 'তাজ্জব লাগে মসিয়ো, এদিকে আপনি মলিয়েরের সারৎর পড়েছেন অন্য দিকে আপনি উত্তম মদ্য বর্দো বুর্গন্নের 'বুকে'র (gouquet) তফাত ধরতে পারেন না! তা সে যাক গে। স্যুটের রঙের কথা কি যেন বলছিলে!"

"হু" আসছে সীজনে সমঝদাররা যেসব রঙের উপর—রঙের উপর ঠিক, না রঙের শেডের উপর ন্যুয়াঁস-এর উপর কৃপা করবেন, সেই অনুযায়ী তোমার স্যুটগুলো তৈরি করা হবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, "গুলো মানে? কটা?"

আপন ওয়েসকিটের সর্বনিম্ন বোতামটির উপর—ইটি কখনও খাঁজে ঢোকানো হয় না, যবে থেকে ড্যুক অব উইনজার ফ্যাশানটি প্রবর্তন করেন—হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "তা, তা, গোটা বিশেক। আপাতক। পরে দেখা যাবে।"

এর পর আর শঙ্কার কোনও কথা ওঠে না। আমি বললুম, "যে টাকাটা ফোকটে পেয়েছিলুম সেটা গেল। উপস্থিত লন্ডনে, একটা নাতিভদ্র লাউনজ স্যুটের কেমৎ নিদেন—£ 50/-/-, আড়্ভালোরেম, আমাদের দিশী টাকায় প্রায় আটশ'—"

বাধা দিয়ে বললেন, "পাগোল! একটা সুস্থ (সোবার) স্যুটের দাম নিদেন £ 120/-/,-"

যখন পুনরায় চৈতন্যময় জগতে ফিরে এলুম তখন মিঃ (পরে তিনি সার হন) হজসন জবসন ফবজ-রোবসন আমার গলায় সাইফন থেকে সোডা-জলের সঙ্গে কড়া ব্রান্ডি মিশিয়ে তাই দিয়ে চোঁ—ওঁ—ওঁ—করে চাঁদমারী মারছেন—দমকলের লোক যে-রকম হৌজ দিয়ে আগুন মারে।

আমার কোনও কিছু বলার মত অবস্থা নয়। মিঃ হজসন (ইত্যাদি) বললেন, "আকছারই এরকম ধারা হয়। আমরা দমকল ডাকি নে। সাইফন দিয়ে কাজ চালাই। এই পর্শুদিনই ড্যুক অব কে—"

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, "তা হলে আমার এই দিশী কোত-পাৎলুন বন্ধক দিয়ে দেশের টিকিট কাটতে হবে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "প্যাট কেম দি রিপ্লাই, খোলা বাজারে না, কিস্সুটি পাবে না। তবে হ্যাঁ, আলবত, ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম পুর্না সব আরকিওলজিকাল ক্যুরো কিনছে। অশোকের দাস্তানা, অর্জুনের পোর্টেবল অ্যাটম বম, দ্রৌপদীর প্রেসারকুকার-কম্-ফ্রিজ—। কিন্তু তুমি ভয় পচ্ছ কেন? আচ্ছা বল তো, পর্শুদিন রোদাঁর যে মূর্তিটি বিক্কিরি হল, তার পাথরের

দাম কত? বুঝতে পারলে তো প্রশ্নটা? স্রেফ পাথরের দাম? প্লেন মেটেরেলের দাম?"

আমি মিনমিনিয়ে বললুম, "পাথরের দাম আর কত হবে? মার্বেল বটে। টাকা তিরিশেক।"

ওস্তাদ সোৎসাহে বললেন, "ইয়েহ্! আর মূর্তিটি বিক্রি হল £ 50,000/-। এইবারে একটু চিন্তা করো। তোমাকে যে ডজন দুই স্যুট বানিয়ে দেব, বাজারে তার দাম হবে, নিদেন, হাজার তিনেক পৌণ্ড। কিন্তু মেটেরেলের দাম? স্রেফ উলের দাম কত হবে? বঢ়ীয়াহ সে বঢ়ীয়াহ? £ 50/-/- ? £ 100/-/? অর্থাৎ ১৪০০ টাকা? আমি আরটিস্ট, আমি রোঁদা।"

একটুখানি ভরসা পেয়ে বললুম, "তা, তা, ডজন দুই, মানে কিনা, অতগুলো স্যুটের কি সত্যই দরকার?"

* * *

এর পর ওস্তাদ অত্যন্ত টেকনিকাল ভাষায় যে-কথা বলেন, সে আমি বুঝতে পারিনি, মনেও নেই। অতএব এখন যদি তাঁর ফিরিস্তি ঠিক ঠিক না দিতে পারি, তবে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

তিনি হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলেন—

"মর্নিং স্যুট—স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারস—অরিজিনাল ওয়েসকিট—তার টপ-এন্‌তে সাদা সিল্কের পাইপিং দেব কি?—টাইয়ের উপরে ডাইমনড পিন্ না পার্ল দেবো—কোণভাঙা কলারের জন্য কোন্ কোম্পানি উত্তম? স্প্যাটার ডেশেজ!

"তার পর দেমি। পাতলুন যথা পূর্বং। কিন্তু কোটটা টেল নয়।

"সে না হয় হল। দুপুরের লাউন্‌জ স্যুটটি কি প্রকারের হবে?

"সন্ধ্যেয়? ডিনার জ্যাকেট? টেলস্?

"ইতিমধ্যে যদি গল্‌ফ খেলতে লোকটা গিয়ে থাকে?

"কিংবা সাঁতার কাটতে?

"কিংবা খেঁকশেয়াল শিকার করতে ঘোড়ায় চড়ে, জোড্‌পুরী।

"কিংবা সে যদি অসুস্থ হয়ে তাবৎ দিন বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার ড্রেসিং গাউন কি হবে?"

আমার মুখে বিরক্তি দেখে বললেন, "এই যে তুমি এখন লাউনঞ্জ স্যুট পরে আছ, এ তো ইংরেজের ডাল-ভাত। এর উপর তার কি ধরনের ক'টা স্যুট দরকার হয় তার ফিরিস্তি দেওয়া বড়ই শক্ত। সে থাক। উপস্থিত তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাষা বাবদে আলোচনা হোক। আচ্ছা বল তো স্মকাঁ কাকে বলে?"

"জানি নে।"

"তাহলে বানান করছি, smoking?"

"এরকম বিৎকুটে উচ্চারণ হতে যাবে কেন?"

"ফরাসীরা তাই করে। অবশ্যি যারা অল্পস্বল্প দুনিয়ার খবর রাখে তারা বলে স্মকিন্‌ন। তা সে যাক গে, কিন্তু ফরাসীতে অর্থ হল ডিনার জ্যাকেট, টেল্‌জ্ না। আবার ইংরেজীতে স্মোকিং-জ্যাকিট অন্য জিনিস। অসকার ওয়াইল্‌ডের বড় প্রিয় ছিল, আর ছিল ফিনসি

ওয়েসকিট—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়াইলডের কথা কও, শুনতে রাজী আছি। কিন্তু তোমার এই বাহান্ন রকমের স্যুটের স্নবারিক দেমাক আমার আর বরদাস্ত হচ্ছে না।"

সিরিল বললেন, "বট্যে? তুমি যখন পাঁচ রকম 'ঔচে' (উচ্ছে) বর্ণনা দিতে দিতে স্নবারির চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে বলো, ইংরেজ রাস্‌টিক, তেতোর কদর বোঝে না, তখন বাধা দিই? তুমি যখন বারো রকম অ্যামবল (অম্বল)—"

* * *

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী যাই বলুন, যাই কন, জামাকাপড় বাবদে আমরা মুক্ত।

রাস্তা দিয়ে নাগা সন্ন্যাসী যখন যায়, তখন তো আমরা শুধোই নে, এটা হিন্দু না মুসলমান 'ড্রেস'!!

'ল্যাটে'

"রদাঁগৎ কাকে বলে জানো?"

"এক রকমের ফরাসী লম্বা কোট। প্রায় ফ্রককোটের কাছাকাছি। এর বেশি কিছু জানি নে, কখনও দেখিনি।"

"শব্দটা—রাদার, সমাসটা—কোত্থেকে এসেছে?"

আমার ইংরেজ বন্ধু সিরিল বেশভূষা বাবদে পয়লা নম্বরি, কিন্তু শব্দ, ভাষা এসব বাবদে তাঁর অণুমাত্র ইন্‌ট্রেস্‌ট্‌ নেই। তাই একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, "কোত্থেকে?"

"চেনার জো-টি নেই। ইংরেজী 'রাইডিং কোটে'র এই হল ফরাসী উচ্চারণ। শুধু তাই নয়, এতে আরও মজা। সেই রদাঁগৎ যখন ফের বিলেতে এল তখন তার ইংরিজী উচ্চারণ হয়ে গেল রেডিংগট এবং ফ্রান্সে নবজন্মপ্রাপ্ত এ-পোশাকে এদেশে আবার এক নবজন্ম লাভ করে হয়ে গেল মেয়েদের পোশাক—পুরুষ আর এটি এদেশে পরে না, অন্তত এ নামে পরিচিত পোশাকটি পরে না। কিন্তু রদাঁগৎ এখনও ফ্রান্সের ভারিক্কি পোশাক। তোমারও তো বয়স হতে চললো, আর যাচ্ছও ফ্রান্সে—"

আমি বললুম, "থাক, আমার সাদামাটা লাউনজ স্যুটেই চলবে।"

* * *

ফ্রান্সের একটি জায়গা দেখার আমার অনেককালের বাসনা।

বহু বৎসর পূর্বে আমরা একবার মার্সেলস বন্দরে নামি। সঙ্গে ছিলেন দেশনেতা স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর পুত্র ডঃ অজিত বসু ও তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মায়া দেবী।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই গুণী, জ্ঞানী কর্মবীর অজিত বসু সম্বন্ধে কেউ কিছু লেখেননি। আসলে ইনি চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞানসাম্রাজ্য যে কী বিরাট বিস্তীর্ণ ছিল সেটা আমি আমার অতি সীমিত জ্ঞানের শিকল দিয়ে জরিপ করে উঠতে পারিনি।

তাঁর কথা আরেক দিন হবে।

তখনকার মত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জিনীভা যাওয়া। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম, সন্ধ্যার আগে তার জন্য কোন থ্রু ট্রেন নেই।

গোটা মধ্য এবং পশ্চিম ইয়োরোপ তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। এবং বিখ্যাত শহর হলেই তিনি ইয়োরোপের ইতিহাসে সে শহর কি গুরুত্ব ধরে ধাপে ধাপে বলে যেতে পারতেন, কারণ তাঁর মত 'পুস্তক কীট' আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

বললেন, " তার আর কি হয়েছে! চলুন, ততক্ষণে এ্যাক্স্ হয়ে আসি। মাইল আঠারো পথ।"

আমি বললুম, "সে কি? এ্যাক্স্-লে ব্যাঁ তো অনেক দূরে?"

তিনি হেসে বললেন, "আমার জানা মতে তিনটে এ্যাক্স্ আছে। উপস্থিত যেটাতে যেতে চাইছি সেটা আগা খানের প্যারা জায়গা এ্যাক্স্-লে-ব্যাঁ নয়—এটার পুরো নাম এ্যাক্স্ আঁ-প্রভাঁস!"

আমি বললুম. "প্রভাঁস? তাহলে এ জায়গাতেই তো আমার প্রিয় লেখক আলফস দোদে তাঁর 'লেটারজ্ ফ্রম মাই মিল' লিখেছিলেন, এখানকারই তো কবি মিস্ত্রাল যিনি নোবেল প্রাইজ পান—"

ডঃ বোস বললেন, "পুব বাঙলার যে লোকসাহিত্য আছে সেটা প্রভাঁসের আপন ফরাসি উপভাষায় রচিত সাহিত্যের চেয়ে কিছু কম মূল্যবান নয়। অথচ দেখুন, মিস্ত্রাল যে রকম একটা উপভাষা—একটা ডায়লেকটে, অবশ্য আজ এটাকে ডায়লেকট বলছি—কাব্য রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হলেন, নোবেল প্রাইজ পেলেন, ঠিক তেমনি পূব বাঙলায় কেউ সেই ভাষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, গর্ব অনুভব করে, মিস্ত্রালেরই মত পরিশ্রম স্বীকার করে, সেটিকে আপন সাধনার ধন বলে মেনে নিয়ে নূতন সৃষ্টি করে না কেন? জানেন, আমি বাঙাল?"

ইতিমধ্যে যান এসে গেছে।

এদেশের বর্ণনা আমি কি দেব? এ্যাক্স্ও নাকি দু-হাজার বছরের পুরনো শহর। কই, মেয়েগুলোকে দেখে তো অত পুরনো বলে মনে হল না! তাহলে বলতে হয়, শহরটা দু হাজার বছরের 'নূতন'।

পার্কের একটি বেঞ্চিতে বসে ভাবছিলাম, এই তো কাছেই তারাসকঁ শহর যাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন দোদে তাঁর তারতারাঁ দ্য তারাসকঁ লিখে।[১] তারই পাশে ছোট্ট জায়গাটি—মাইয়ান্ (জানি নে, প্রভাসাঁলে তার উচ্চারণ কি) যেখানে কবি মিস্ত্রাল তাঁর সমস্ত জীবন কাটালেন। তারই মাইল সাতেক দূরে বাস করতেন দোদে—ফঁভিয়েই গ্রামের কাছে। কবি মিস্ত্রালের বর্ণনা লিখে একাধিক ফরাসি লেখক নিজেদের ধন্য মেনেছেন। কিন্তু অপূর্ব দোদের বর্ণনাটি। —এক রববারের ভোরের ঘুম থেকেই উঠে দেখেন, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। গোটা পৃথিবীটা গুমড়ো মুখ করে আছে। সমস্ত দিনটা কাটাতে হবে একঘেয়েমিতে। হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন, তিন লীগ আর কতখানি রাস্তা? সেখানে থাকেন কবির কবি মিস্ত্রাল। গেলেই হয়।

---

১ বছর চার পূর্বে বোধ হয় খগেন দে সরকার এর অনুবাদ "দেশে" প্রকাশ করেন।

কিন্তু দোদে যেভাবে (তাঁর লেয়'-এ Letters de mon Moulin-এর ইংরেজী অনুবাদ কতবার কত লোক যে করেছেন তার হিসেব নেই, পাঠক অনায়াসে পুরনো বইয়ের দোকানে মূল অনুবাদ যোগাড় করতে পারবেন)[১] সেই জলঝড় ভেঙে পয়দল মিস্ত্রালের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেন তার বর্ণনা আমি দেব কি করে? দোরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পেলেন কবি উঁচু গলায় কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন—কী করা যায়?—নিরুপায়—ঢুকতেই হবে—

মিস্ত্রাল যেন লাফ দিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়লেন—"এ্যাঁ! তুই এসেছিস! আর ঠিক আজকেই! কী করে তোর মাথায় সুবুদ্ধিটা খেললো, বল দিকিনি।"

তারপর কি হল? বলবো না।

শুধু একটি কথার উল্লেখ করি।

খানিকক্ষণ পরে গির্জা থেকে ফিরে এলেন মিস্ত্রালের মা। বুড়ী বড়ই সরলা, রান্নাতে পাকা, কিন্তু হায়, প্রভাঁসাল ছাড়া কোনও ভাষা বলতে পারেন না। তাই কোনও 'ফরাসি' (যেন প্রভাঁসের লোক ফরাসি নয়!) ছেলের সঙ্গে খেতে বসলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন না—কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনি রান্নাঘরে না থাকলে তো রসুইয়ের নিখুঁত তদারকি হবে না।

আরেকটি কথা। মিস্ত্রালের শোবার ঘরটি ছিল বড্ডই ন্যাড়া। ফরাসি একাডেমি যখন মিস্ত্রালকে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দিলে, তখন বুড়ী চাইলেন ঘরটিকে একটু 'ভদ্রস্থ' করতে।

'না, না, সে হয় না"—বললেন মিস্ত্রাল—"এ যে কবিদের কড়ি; এটা ছুঁতে নেই।" ঘরটি ন্যাড়াই থেকে গেল। দোদে বলেছেন, "কিন্তু যতদিন ঐ 'কবিদের কড়ি' ফুরোয়নি, ততদিন কেউ তাঁর বাড়ি থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে যায়নি!"

বৃষ্টি হচ্ছিল না? না, আমি স্বপ্ন দেখছিলুম।

তবে কি আমি ডাঃ বসুর সঙ্গে বসে? না, সেও স্বপ্ন।

আমি এসেছি মিস্ত্রালের গ্রামে, বহু বৎসর পরে, সেই "রদাঁগৎ" পরে।

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল। যাঁকে এখানে আসার খবরটি পিকচার পোস্টকার্ডে জানালে খুশী হতেন তিনি এখন এমন জায়গায় যেখানে এখনও ডাক যায় না।

---

১ এ লেখক দোদের একটি লেখা সম্প্রতি অনুবাদ করেছে। 'দু-হারা' গ্রন্থ পশ্য। কিন্তু আমার অনুবাদ থেকে মূল যাচাই করতে যাবেন না।

আঁদ্রে জিদ

দুনিয়ার লোক হন্দমুদ্দ হয়ে প্যারিস যায়, এবং প্যারিসের ধনীদরিদ্র সকলেরই কামনা, কি করে গ্রামাঞ্চলে একখানা কুটিরাবাস নির্মাণ করা যায়। প্যারিসের ফ্ল্যাটখানাও থাকবে এবং সেখানে মাঝে মধ্যে আসবেন থিয়েটার অপেরা দেখবার জন্য, বন্ধুজনের (বান্ধবী তো নিশ্চয়ই) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

খাঁটি স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া কঠিন,—ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, যে কজন মহৎ ফরাসী লেখক আমার প্রিয় তাঁদের প্রিয় সকলেই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন 'মফস্বলে'। যাঁরা নিতান্তই কোনও না কোনও কারণে পেরে ওঠেননি—যেমন আলফঁাস দোদে—তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন গ্রামাঞ্চলে, কোনও সখার বাড়িতে।

প্রভাঁসের যে-জায়গাটিতে দোদে বার বার গেছেন সেখানে দিন পাঁচেক কাটানোর পর এক অপরাহ্ণে বসে আছি, যে-ইন্‌টিতে উঠেছিলুম (এসব 'ইন্' এমন গাঁইয়া যে এগুলো না হোটেল, না ডাক-বাংলো, না সরাই, না চটি—সব-কটিরই অল্প-বিস্তর সুবিধে অসুবিধে দুইই এগুলোতে পাবেন) তারই জানালার কাছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ঢেউখেলানো উঁচু-নিচু টক্কার ভর্তি জনপদ ধরিত্রীর দূরত্ব যেন আরও বাড়িয়ে দেয়—আপন দৃষ্টি যে কত দূরান্তে যেতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আশ্চর্য, সমুদ্র যদ্যপি দিগন্ত-বিস্তৃত, তার পারে বসে মানুষের এ-অভিজ্ঞতা হয় না।

ইন্‌কীপার, পাঁত্র (Patron), মালিক—যে নামে খুশী ডাকুন—কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি প্রসন্ন বদনে বললুম "এ ব্যাঁ, আলর্—" এ শব্দগুলোর মানে অভিধানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, যেমন "এই যে, হেঁহেঁ বেশ বেশ—শব্দগুলো নিশ্চয়ই কোনও না কোনও মানে ধরে কিন্তু আসলে এগুলো ফার্সী ভাষাতে যাকে বলে "তাকিয়া-ই-কালাস" অর্থাৎ "কথার তাকিয়া" অর্থাৎ যার উপর ভর করে কথাবার্তা আরাম পায়—জমে ওঠে।

তারপর বললুম, "বসবে না? একটা কিছু খাও।"

বললে, "এ ব্যাঁ, আমি আপনাকে 'দেরাঁজ' ('ডিসএরেঞ্জ' শব্দার্থে অর্থাৎ ডিসটার্ব বা বদার) করছি না তো?"

আমি প্রসন্নতর বদনে বললুম, "পা দ্য তু—বিলকুল না—।"

বললে, ''মসিয়ো, আমি আদৌ 'নোজি' না। বিশেষত যখন দেখতে পাচ্ছি, আপনি যখন আপন মনে, মনের সুখে আছেন। ও লা লা—কাল সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডাটি যা জমেছিল! আর আপনি যা হাসাতে পারেন—"

একদম গুল্। হাসাতে পারার মত তেমন কোনও স্টাক্ আমার নেই। আসলে ব্যাপারখানা হয়েছিল এই যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলো গল্প, গোপালভাঁড় ইত্যাদি আমি তাঁদের শুনিয়াছিলুম আপন ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে। তাদের কাছে লেগেছে 'এপাঁতা' (ভয়ঙ্কর মজাদার) এবং অরিজিনাল। অবশ্য এসব গল্প যখন প্যারিস-লন্ডনেই পৌঁছায়নি তখন প্রভাঁসের 'পাণ্ডব-বর্জিত' আজ পাড়াগাঁয়ে যে অরিজিনাল মনে হবে

তাতে আর বিচিত্র কি? গোপালের দু'একটি রিসকে (risky আদিরসাত্মক) গল্প বলতেও ছাড়িনি, এবং তখন গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবই—এবং তিনিই ছিলেন আসরের চক্রবর্তী—সব চেয়ে বেশী চোখের ঠার মেরে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বললে, "মসিয়ো, আমাদের গ্রামে কজন বিদেশী এসেছে সে আমি এক আঙুলে বলতে পারি—তাও তারা পাশের সেই সুদুর ল্যাঁদ (L Inde) থেকে। এখানে আপনি কি মধু পেলেন, বলুন তো?"

আমি বললুম, "তুমি তো বলেছিলে, তুমি কখনও প্যারিস তক্ দেখোনি। তোমাকে বোঝানো হবে শক্ত। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি, এটা অনেকটা রুচির কথা। আপন দেশেও আমি গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে, বাস করতে ভালোবাসি। তা ছাড়া এটা কবি মিস্ত্রালের দেশ।...আচ্ছা, অন্য লোক আসে না এখানে মিসত্রালের জন্মভূমি দেখতে?"

বেশ গর্বভরে বললে, "নিশ্চয়ই, তবে তারা সবাই ফরাসি—"

তারপর কি যেন মনে পড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এবারে সে উৎসাহভাবে বললে, "ও লা লা। সে এক কাণ্ড।"

"দুই লেখকের লড়াই। সে হল গিয়ে ১৯৪৪-এর শেষের দিকের কথা। মার্কিনিংরেজ নরমাঁদিতে নেমে প্রায় সমস্ত ফ্রান্স দখল করে ফেলেছে, ঐ সময় কি কারণে, কি করে যেন দুই লেখক—হ্যাঁ খাঁটি ফরাসি—এসে উঠেছেন আমার এখানে। আর এই ঘরেই, আমরা কাল যেখানে দুপুর রাত অবধি কত আনন্দে হইহুল্লোড় করলুম, এসে বসেছেন, সেই দুই লেখক; কিন্তু তাঁরা তাঁদের চতুর্দিকে যে আবহাওয়া নির্মাণ করলেন সেটি ঠিক তার উল্টো। এ্যাব্বড়া বড়া গেরেমভারী হাঁড়িপানা গম্ভীর এক জোড়া মুখ দেখে আমার গাঁইয়া খদ্দেররা তো আশ্রয় নিলে ঘরের অন্য কোণে।

"ওঁরা গুরুগম্ভীর আলোচনা করে যাচ্ছেন নিজেদের ভিতর—আমরা ওদিকে কান দিইনি। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের গলা চড়তে লাগলো, তারপর আরম্ভ হল রীতিমত ঝগড়া। তারপর আরম্ভ হল আমাদের ঐ পাহাড়ী বকরীতে বকরীতে যে রকম লড়াই হয়।[১] তারপর বলদে বলদে। অবশ্য আমাদের বলদ প্রতিবেশী স্প্যানিশদের বলদের তুলনায় তেমন কিছু না।[২]

"কি নিয়ে ঝগড়া, মসিয়ো? জান কী নিয়ে—ছুঁড়ি নিয়ে? তা হলেও তো বাঁচতুম। সে তো হর-হামেশাই হচ্ছে। এ ঝগড়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস নিয়ে। বলি :—

ঐ সময়—অর্থাৎ তখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি, অবশ্য হিটলারের পরাজয় সম্বন্ধে তখন সবাই নিঃসন্দেহ—এক ফরাসী লেখক লিখেছেন, এই যে আমরা ফরাসিরা 'পাত্রি' (স্বদেশ), 'পাত্রি', 'লিবেরতে' 'লিবেরতে' বলে চেঁচাই তার মূল্য কতটুকু? তিনি নাকি তারপর লিখেছেন, ফরাসি চাষা যদি তার গম দু পয়সা বেশী দামে বিক্রী করতে পারে তবে সে থোড়াই পরোয়া করে দেকার্ত আপন জাতভাই ফরাসি না দুশমন জরমন।

"এই নিয়ে লেগেছে তুলকালাম ঝগড়া! এক লেখক বলছেন, যারা ফরাসি জাতের

---

১ প্রভাঁসের বকরী সম্বন্ধে লিখেছেন স্বয়ং দোদে—Le Chevre de M. Seguin.

২ এও পাঠক পাবেন প্রাগুক্ত পুস্তকে।

দেশপ্রেম নিয়ে এরকম বিদ্রূপ করে তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত। অন্য লেখক বলছেন কথাটা টক হলেও হক। এবং যে ফরাসি লেখক একথা বলেছেন তিনি তো জর্মন বা তাদের 'দোস্ত' পেতাঁর সহযোগিতা করতে রাজী হননি। তাঁর সততা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করে তাদের হওয়া উচিত ফাঁসি। তখন প্রথম জন বললেন, 'আজ যদি আমাদের ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকতেন তবে ঐ যে ব্যাটা ফরাসি দেশপ্রেম নিয়ে মস্করা করেছে তাকে তাঁর নোংরা বন্দুকটা দিয়ে—পরিষ্কারটা দিয়ে নয়, সেটা দিয়ে তিনি বুনো শূয়ার মারেন—গুলি করে মারতেন।"

এতক্ষণ মালিক ভায়া যে গম্ভীর সুরে কথা বলছিলেন, তার থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং ক্লেমাসোঁই লীগ অব নেশনসে প্রতিবেদন পাঠ করছেন।

এবারে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "তারপর যা হল, মসিয়ো, সে সত্যি যাকে বলে কু দ্য তেয়াৎর্[৩]—নাটকীয় ব্যাপার—ইতিমধ্যেই যে আমাদের পাদ্রি সাহেব কখন এখানে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে এঁদের তর্কাতর্কি শুনছিলেন সেটা লক্ষ্যই করিনি।

"তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন "মসিয়ো, আমি আপনাদের দেরাঁজ করতে চাই নে; সামান্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আপন পথে চলে যাব। আপনারা শহুরে সজ্জন—শুনেছি, আপনারা বঁ দিয়োর (ভগবানের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আমার শুধু বক্তব্য, আপনাদের একজন বলছিলেন, আজ ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি কাকে যেন গুলি করে মারতেন। এ-ভোওয়ালা মেসিয়ো—আজই সন্ধ্যায় এই কাগজখানা আমার কাছে এসেছে আমাদের কলোনি ট্যুনিস থেকে। তাতে প্রকাশিত হয়েছে একখানি চিঠি। ইটি লিখেছেন মসিয়ো ক্লেমাসোঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী—তার বয়স, এখন চুরাশি। তিনি লিখেছেন,—'শের মসিয়ো জিদ, আমি আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বহু বৎসর বাস করেছি। আমি বলতে পারি, আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনার পক্ষ নিতেন। তাঁকে কতবার বলতে শুনেছি, জমি! জমি!! শুধু জমি!! আর টাকা। ব্যস, মাত্র এ দুটো বস্তুই আমাদের চাষীরা চেনে!'

"পাদ্রি সায়েব বললেন, 'তা সে যাক! কিন্তু এটা কি বঁ দিয়োর মিরাকল নয়, যে আজই আমি এ কাগজখানা পাব, আজই আপনারা এ আলোচনা তুলবেন, আজই আমি সেই পত্রিকাটি পকেটে করে আজই এখানে আসবো—এবং আপনাদের দ্বন্দ্বের সমাধান করে দেব! ও রভোয়া মেসিয়ো! কাল রববার গির্জেয় দেখা হবে'।"

কাহিনীটি শেষ করে মালিক মিটমিটিয়ে হেসে বললে, "এই যে বিরাট ফ্রান্সভূমি—এদেশের কারও বিশ্বাস, প্রভাঁসের লোক বড় সরস, বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ, আর কারও বা বিশ্বাস তারা কুসংস্কার কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।...আপনার কি মনে হয়? আপনি তো এসেছেন ধর্মের দেশ L'Inde থেকে।"

আমি তার মিটমিটে হাসি থেকে তারই বিশ্বাস কোন্ দিকে বুঝতে পারলুম না।[৪]

---

৩ Coup d'etat cout de palais তুলনীয়। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র নানারকম 'কু' (অনেক সময়ই কিন্তু সেগুলো শিব্রামীর 'সু'! হচ্ছে বলে এটা উল্লেখ করলুম।

৪ আঁদ্রে জিদ্-এর ডাইরি, Journal 1939-42, 1942-44, Appendice 200ff.

আড্ডা

কি বললেন স্যার? বাড়ি বিক্রি করতে এসেছেন? আমি কিনবো? আমি! বাড়ি নিয়ে করবোটা কি আমি? জন্ম নিলুম হাসপাতালে, পড়াশুনো করলুম হস্টেলে, প্রেম করেছি ট্যাক্সিতে, বিয়ে হল রেজিস্টারের আপিসে। খাই ক্যানটিনে—কিংবা যারে কয় 'ভোজনং যত্রতত্র'—, সকালটা কাটে কর্তাদের তেলাতে, তেনাদের তরে বাজার করে দিতে...হাটে র‍্যাশনে, দুপুরটা আপিসে, মাঝে মিশেলে সিনেমা হলে—সন্ধ্যেটা। পটল তুললে শুইয়ে দেবে নিমতলায়। বাড়ি নিয়ে কি আমি গুলে খাব? তার চেয়ে বলি, আসলে আমার দরকার একটি আড্ডার। একটি অত্যুৎকৃষ্ণ আড্ডার। তার খবর দিতে পারেন? তবে বুঝবো, আপনি একটি তালেবর ব্যক্তি!

কথাটা ন'সিকে খাঁটি। অত্যুৎকৃষ্ণ 'কৃষ্ণ' যদি 'কিষ্ট' বা 'কেষ্ট' হয় তবে 'উৎকৃষ্ণ'ই বা হবে না কেন? আড্ডা প্রতিষ্ঠানটি হালফিল পুরো-হাতা ব্লাউজের মত ডাইয়িং ইনডাস্ট্রি—মৃতপ্রায়।

এহেন অবস্থায় অকস্মাৎ বিনামেঘে পুষ্পাঘাত! দিল্লী থেকে খবর এসেছে সদ্যভূমিষ্ঠ শিক্ষামন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাঙালীকে তিনি 'আড্ডাবাজ' করে ছাড়বেন!

দিল্লী থেকে আসা খবরের সঙ্গে আমি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ি না—বয়স হয়েছে। খবরটা ফলাও করে প্রকাশিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেমাঁতি (dementi) বেরুবে, ফের তস্য দেমাঁতি বেরুবে দলিল পত্রসহ, চোপরা-ভাটিয়া আফ্‌টার এডিট লিখবেন, পারলিমেনটে গোটা তিনেক মন্ত্রী নাকুনি-চুবুনি খাবেন, ঐ নিয়ে খানদানী আড্ডায় (আমাদের যৌবনে) তর্কাতর্কির ফলে গোটা তিনেক 'পেয়ারে' মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে—তবে আমি ব্যাপারটার মোটামুটি আবছা-আবছা ধুঁয়াশাপারা একটা 'উন্মান' ('অনুমান' নয়, তার আউটলাইন বড্ড ধারালো) করে নিই যে, ব্যাপারটা কি হয়ে থাকতে পারে। গোলনদাজদের কায়দা-করীনা নাকি এই দস্তুরেই হয়। প্রথম বোমা তাগ করবে লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে, পরেরটা কাছে, তারপর দুটোতে যোগ দিয়ে হাফাহাফি করে মোক্ষম মধ্যিখানে।

কিন্তু এ সংবাদখণ্ডটি নিয়ে কিঞ্চিৎমাত্র দেমাঁতি ডুয়েল হয়নি। দিল্লীর লালাজী, মিয়াসাহেবরা খবরটা পরিবেশন করা সত্ত্বেও ব্যাপারটির গুরুত্ব 'এহমীয়ৎ' সম্বন্ধে বিলকুল বে-খবর। 'আড্ডা'? সো ক্যা বলা? মজলিস, মহফিল, মুশাএরা, জলসা, বয়েৎ-বাজী—আলবৎ—লেকিন 'আড্ডা'? সো ক্যা আফৎ, গজব? ওদের আড্ডা ভিন্ন বাথানের গোরু—ওদের ভাষায় ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া—যেমন ওদের গোলাব জামুন আর আমাদের গোলাপ জাম।

তা সে যাই হোক যাই থাক, খবরটা যদি গুজোরব বা 'আফওয়া' না হয় (হলে আগের থেকেই কলমে খৎ দিচ্ছি!) তবে বড় দুঃখের সঙ্গে শ্রীযুত ত্রিগুণা স্যানকে তাঁরই দ্যাশ করিমগঞ্জের একটি পদাবলী ঘেঁষা লোক-সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেব :—

'দেখা হইল না রে, শ্যাম
আমার এই নত্তুন বয়সের কালে—'

রসরাজের স্মরণে শ্রীমতী বলছেন, 'ঠাকুর! তুমি নির্দয় নও; আমাদের সাক্ষাৎ একদিন না একদিন হবেই হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এই নূতন (নত্তুন) বয়সে যে দেখা হল না, সে-ই আমার মর্মবেদনা।'

'ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক
তাহার তরে বৃথাই করা শোক
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত
তখন শোনায় তিতো।'

খানদানী আড্ডা এখন জীবন্মৃত। তার নত্তুন বয়স বহু কাল হল গেছে। এখন আর তার "কোন্ গুণ আছে, 'তিন-গুণী'?"

আড্ডা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বহুবার বহু স্থলে নিবেদন করেছি। বহু সিন্ধু পেরিয়ে বহু দেশ ঘুরেছি আড্ডার সন্ধানে—পাপ মুখে কি করে বলি। গিয়েছিলুম লব্‌জো কপচাতে; আখেরে সর্বত্র সর্ব পরীক্ষাতে নাগাড়ে ফেল মেরে মেরে বিলক্ষণ বুঝে গেলুম, আমার যদি জ্ঞানগম্যি কখনও হয়—তা সে ঝুটাই হোক আর সাচ্চাই হোক—সেটা হবে 'আড্ডাতে'—শিক্ষামন্ত্রী যে তত্ত্বটি কনফারম করলেন এই অ্যাদ্দিন পরে।...ফের বহু সিন্ধু পেরিয়ে দেশে এসে দেখি, সেই আড্ডার 'বিন্দুটি' খরতাপে বাষ্পপ্রায়।

খানদানী আড্ডা যে জীবন্মৃত সে তথ্য তর্কাতীত। এই যে কলকাতা শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাঁস্তলা-দস্তলা হামে হাল উঠছে তো উঠছেই এর ক'টাতে রক থাকে, বৈঠকখানা আছে? রক উঠেছেন ডাক-এ, আর বৈঠকখানার বদলে ড্রইংরুম। এদিকে ক্ষুদে একটি পেগটেবিলের উপর অতি পাতলা ডিমের খোলসপরা পরসেলেনের প্লেটে স্ন্যাক, অন্য দিকে ফঙ্গবেনে টিপয়ের উপর বেলজিয়াম কাঁচের ঢাউস ফ্লাওয়ার 'ভাজ'। সোফাতে আরামসে হেলানও দিতে পারবেন না, পাছে মাথার তেল লেগে সোফাভরণ চিটচিটে হয়ে যায়। বত্রিশটি দাঁতের মধ্যিখানে বেচারী জিভকে যে রকম অতিশয় সন্তর্পণে 'হাফিজ, খবরদার' হয়ে নড়াচড়া করতে হয় আপনাকেও করতে হবে তাই। তবে সান্ত্বনা, ভুগন্তি বাড়ির মালিকেরই সব চেয়ে বেশী। পাছে মহামূল্যবান কোনও জোড়াবাঁধা বস্তুর একটি ভেঙে যায়! বিলিতি মাল—এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না।

গালগল্প যে একেবারেই হয় না, সে-কথা বলা যায় না। তাকে সোয়ারে, মাতিনে (ম্যাটিনি) কনভেরজাৎসিয়োনে[১] যা খুশি নাম দিতে পারেন, এমন কি আজকের দিনের ভাষায় সেমিনার বললেও দোষ নেই—কিন্তু একে আড্ডা নাম দিলে আমাদের নকিষ্যি কুলীন আড্ডার মেম্বারগণ একবাক্যে বলবেন, কঁহা আসমানকা তারা, আর কাঁহা পিঠকা (আসলে ভদ্রসমাজে মূল শব্দটা অচল) পাঁচড়া!'

গঙ্গাস্নান কমে যাচ্ছে কেন? পুণ্যবানরা নূতন নূতন ঘাট বানাচ্ছেন না তাই।

---

১ প্রথম দুটো শব্দ ফরাসী, তৃতীয়টি ইতালীয়। অর্থাৎ রসালাপ করার তত্ত্বটি বরপ্তঞ্চ লাতিন জাত কিছুটা জানে। শুনেছি, অ্যাংলো সেক্‌শনদের এমন ক্লাবও নাকি আছে যেখানে কোনও মেম্বার কথাটি বলা মাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদা একজন মেম্বার নাকি আগুন লাগা মাত্রই 'আগুন আগুন' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে ক্লাববাড়ি রক্ষা পায়। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাবার পর (অবশ্য লিখিতভাবে) খাতা থেকে তাঁর নামটি কিন্তু কেটে দেওয়া হয়।

আড্ডা কমে গেল কেন? মডারনরা রক বানান না বলে। পাল্লায় পড়ে কেউ কেউ বা প্রাচীন দিনের আগোছালো বৈঠকখানাকে ড্রয়িংরুমের সাত চাপের কারবন কপি বানাচ্ছেন—দিল্লীতে বলে 'বুড়ো ঘোড়ার গোলাপী ন্যাজ' কিংবা 'বুড়ী দাদীমার হাতে বাহারে মেহদি'।

কিন্তু এহ নিরতিশয় বাহ্য।

গুহ্য সমস্যা অপিচ সরলতম প্রশ্ন : এই যে আমাদের মন্ত্রীবর তরুণদের আড্ডাবাজ করে তুলবেন বলে যমুনা পুলিনে দাশরথির শপথ গ্রহণ করলেন সেটা কি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কিংবা প্রকৃত আড্ডাবাজের ন্যায় 'ধ্যত্তর ত্তোর অগ্রপশ্চাৎ' হুঙ্কার ছেড়ে?

ঝাড়া আঠারোটি দিন আমাদের আড্ডাটি এই নিয়ে কুস্তি করেছে। নানা প্রশ্ন, বহুবিধ সপ্‌লিমেনটরি ততোধিক এফিডেভিট—সর্বশেষে এন্তের 'বুলু পেরিন্ট' (আমাদের মন্ত্রী মশাই-এ বস্তুটি বিলক্ষণ চেনেন) ডাঁই ডাঁই তৈরি হল, অবশ্য আড্ডাধারী মাত্রই জানেন, আমাদের হাইজাম্প লঙ-জাম্প মুখে মুখে।

প্রতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পাল্টা প্রস্তাব উঠেছিল; তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন।

যদ্যপি মন্ত্রী মহাশয় এলেমদার ব্যক্তি তথাপি এ-হেন কঠিন গুরুভার তিনি যেন 'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া'র মত এজমালি বা বারো-ইয়ারী পদ্ধতিতে উত্তোলন করেন। বিগলিতার্থ;—তিনি যেন

১। একটি কমিশন নিয়োগ করেন।

এ-স্থলে আমার অতিশয় গোপনীয় একটি অভিজ্ঞতা থেকে জানাই, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গরূপে চিনি, যিনি একবার একটি আড্ডাবাজ ছোকরাকে অধ্যাপক পদের জন্য সুপারিশ করে জনৈক ভাইস্-চ্যানসেলারের কাছে হুট্ হয়েছিলেন। ভি সি যখন জিভ কেটে বললেন, 'ছোকরা পাঁড় আড্ডাবাজ' তখন তিনি জরডন জলে ধোয়া তুলসী পাতাপানা মুখ করে 'নাঈফ' উত্তর দিয়েছিলেন 'ঐ তো তার আসল এলেম।'

এঁকে কমিশনের চ্যারম্যান করতে পারলে সর্বরক্ষা—সকলং হস্ততলং!

২। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরেকটি বিষয়ে আমাদের 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্বা'—প্রকৃত আড্ডাপ্রাণ ব্যক্তিকে কাট্যা ফালাইলেও সে কোনও কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে যেতে পারবে না। হরহামেশা হাজামৎ করছি আমরা উইলসন জনসনের, আর আমরা যাব কমিশনের সম্মুখে!

আড্ডাযজ্ঞের আমরা অভিশপ্ত (পূত, যাই বলুন) ভস্ম। আমরা যেতে পারবো না, নীলকণ্ঠের চড়াই উতরাই পেরিয়ে জটার ভিতর গঙ্গার সন্ধানে।

তিনিই আসতেন। আমি যাঁর প্রতি দু লহমা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি তিনিই আসবেন, স্বেচ্ছায় সানন্দে। শ্যামবাজার থেকে শুরু করে আড্ডা মেরে মেরে তিনি হেসেখেলে পৌঁছে যাবেন টালিগঞ্জে। রিপোর্ট যা লিখবেন সে এক অভিনব মেঘদূত! শ্যামবাজার-রামগিরি থেকে টালি-অলকা!

কিন্তু আমরা কমিশনকে বিভ্রান্ত বা প্রেজুডিস করতে চাই নে বলে অত্যধিক বাগবিস্তার থেকে নিরস্ত হচ্ছি। তবে একটি বিষয়ে তাবৎ গৌড়ভূমি যখন বিলক্ষণ

সচেতন, সেটি যেন কমিশন বিস্মৃত না হন।

আড্ডা জীবন্মৃত কিনা, যদি হয় তবে তার অমরুতাঞ্জন সঞ্জীবনী সুধা কি সে নিয়ে তো কমিশন চিন্তা করবেনই—যথেষ্ট সুযোগ পাবেন, আজকাল প্রায়ই বিজলি ভ্রষ্টা রমণীর মত সাঁঝের ঝোঁকে চোখ মারতে মারতে আঁধারে গায়েব হয়ে যায়, তেমন আত্ম-অন্বেষণী, বিশ্বভাবনা ভিন্ন গতি কি?—কিন্তু আমরা আগেভাগেই বলে রাখছি;—

বঙ্গসন্তান চাহে না অর্থ, চাহে না মান, চাহে না জ্ঞান, সে চায় ডিগ্রী!

আড্ডাবাজরূপে সে যদি স্বীকৃতি পায় এবং উমেদার মাত্রেই জানেন—খানদানী আড্ডাতে সীট পাওয়াটাই কী কঠিন কর্ম—তবে সে ডিগ্রী না নিয়ে ছাড়বে না!

এবং ঐ সব বস্তাপচা পি-এচ ডি, ডিফিল, হনোরিস কাউজা, সুম্‌মা কুম লাউডে, দকত্যোর অ্যাস লেৎর, ফাজিল-অল-মুহদ্‌দিসীন, শমশীর-ই-জমশীদই আলিমান, সাংখ্যবেদান্তর্কচুঞ্চু—এসব উপাধি-খেতাব-ডিগ্রী বিলকুল না-পাশ।

তাহলে সে ডিগ্রীর নাম কি হবে?

এ-বাবদে ইহসংসারে সর্বাভিজ্ঞ মহাজনকে আমরা চিঠি লিখেছি।

ইনি স্ট্রাসবুরগ্ শহরের সরকারী উপাধিদাতা।

শহরের সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকলেন এক অশ্বারোহী—ইয়া মোচ, ইয়া তলওয়ার।

সামনেই সদররাস্তা-বুলভার জোড়া একটি টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে ফ্রক-কোট, টপ-হ্যাট, আতশী-কাঁচের চশমা পরা এক—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সরকারী কর্মচারী। আমাদের আই এ এস গোছ।

হুঙ্কারিলেন, 'তিষ্ঠ!'

'? ? ?'

'আপনি ডক্টরেট উপাধি ধরেন?'

অশ্বারোহী অবতরণ পূর্বক সবিনয় : 'আজ্ঞে না।'

গম্ভীর নিনাদ : 'এ শহরে ডকটরেট না থাকলে "প্রবেশ নিষেধ"।'

কাতর রোদন : 'তাহলে উপায়?'

মোলায়েম সান্ত্বনা : 'উপায় আছে বই কি। এই তো হেথায় টেবিলের উপর রয়েছে সর্ব গোত্রের উপাধিপত্র। আপনার দেশ?'

আশাভরা কণ্ঠ : 'এজ্ঞে, লুক্‌সেম-বুর্‌গ্।'

নুড়ি-চাপা ভিন্ন ভিন্ন ডাঁই থেকে একখানা করকরে কাগজ তুলে নিয়ে : 'আ-া-সুন, আসুন, স্যর (বিতে শ্যোন, প্লীজ!)। দক্ষিণা : পঞ্চাশৎমুদ্রা।'

বিগলিত আপ্যায়িত কণ্ঠ : 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ (ডাংকে শ্যোন, মেনি, থ্যাকংকস)। এই যে।'

অশ্বারোহী নগরকেন্দ্রে প্রবেশ করতে করতে ভাবলে, 'আমার এই অশ্বিনীটি আমার বিস্তর সেবা করেছে। এর জন্য একটা হনোরিস কাউজা ডক্‌টরেট আনলে মন্দ হয় না।' ঘোড়া ঘুরিয়ে উপাধিদাতার কাছে এসে তার সদিচ্ছা জানালে। আই এ এস্ দুঃখ-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ভেরি ভেরি সরি, হের ডকটর! এ শহরে ডকটরেট দেওয়া হয় শুধু গাধাদের। ঘোড়ার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই।'

আমরা এঁরই উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছি। আমেন!

পাসপরট্

গল্পটি পুব বাঙলার বিশেষ একটি জেলা সম্বন্ধে। মনে করুন তার নাম 'লোহাভরা'।

পূর্ব বাঙলার সাধারণ জন মাত্রেরই দৃঢ়তম বিশ্বাস 'লোহাভরা' জেলার লোকমাত্রই অতিশয় ধুরন্ধর। এদের কেউ একা বা দল বেঁধে ঢাকা স্টেশনে নামলে বিদগ্ধ, হাজির-জবাব কুট্টি পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে এদের রীতিমত সমঝে চলে। সর্বশেষে বলা হয়, ঐ জেলাতে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানে স্বয়ং শয়তান সে-জেলার যে প্রধান প্রতিভূ সে পর্যন্ত মাছি ধরে ধরে খায়—কারও গোলায় হাত দিতে হিম্মৎ পায় না।

তামাম পুব বাঙলার চাণক্য-মাকিয়াভেললি যে এদের সম্মুখীন হলে হুঁশিয়ারির খাতিরে তদ্দণ্ডেই তাঁদের কানাকড়িটি পর্যন্ত স্টেট ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসেন সে তত্ত্বটি লোহাভরাবাসী বিলক্ষণ অবগত আছে বলে তারা সহজে আপন বাসভূমির খবর দেয় না; লোহাভরার পার্শ্ববর্তী কোনও এক জেলার বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়।

* * *

পারটিশনের ফলে কলকাতা এবং ঢাকাতেও নানা নয়া নয়া সমস্যা দেখা দিল।

ঢাকা সেকরেটারিয়েটে খবর এল আমেরিকা থেকে—ভারতের বিস্তর জানোয়ার-দরদী মহাজনরা বাধা দিচ্ছেন, বাঁদর যেন মারকিন মুল্লুকে চালান না দেওয়া হয়, মারকিনরা নাকি ডাক্তারী এক্স্পেরিমেন্টের অছিলায় এদের উপর পাশবিক অত্যাচার (ভিভিসেকশন) করে। মারকিন ডাক্তাররা তাই ঢাকাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যদি ন্যায্যাধিক মূল্যেও মর্কট-সরবরাহ করেন। পশ্চিম ও পুব বাঙলার মর্কটে মর্কটে নাকি রত্তিভর ফারাক নেই এবং এরা কোনও প্রকারের মাইগ্রেশন সারটিফিকেট নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে বলে জানা যায়নি!

সংশ্লিষ্ট সেকরেটারি মহোদয়—তিনিই আমাকে সংক্ষেপে ইতিহাসটি কীর্তন করেন—তাঁর দফতরের ঝানু-ঝাণ্ডু এসিসটেনট তস্য এসিসটেনটদের এত্তেলা দিয়ে তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা ফরেন ইক্স্চেনজের গুরুতর ব্যাপার!'

দফতর ভুশুণ্ডিরা এক বাক্যে উত্তর দিলেন : 'বাঁদর ধরার কৈশল অতিশয় প্যাচাঁল। এর স্পেশালিস্ট ছিলেন হিঁদুরা। তাঁরা ইন্ডিয়া চলে গেছেন।'

অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল জেলায় জেলায় খবরের কাগজে যেন নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি ফলাও করে ছাপানো হয়;

বাঁদর! বাঁদর!! বাঁদর!!!

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মারকিন-মুল্লুকের অনুরোধে এই দেশ হইতে জীবন্ত বাঁদর আমেরিকায় রফতানী করা হইবে। তজ্জন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর সেকরেটারি
সবুজপুরা, ঢাকা-১১।

আমি সচিব মহোদয়কে শুধালাম, 'উত্তম ব্যবস্থা। তার পর?'

বললেন, 'যেই না বিজ্ঞাপনটি লোহাভরা জেলায় বেরিয়েছে অমনি দেখা গেল, তাবৎ জেলার লোক লুঙ্গি ফেলে ফেলে গুয়া গাছের ডগায় চড়ে বসে আছে। সবাই মারকিন মুল্লুকে যাবে। মুশকিল! জানেন তো, লোহাভরার লোকের যা কাত্তিকের মত চেহারা, তাতে কোন্‌টা বাঁদর কোন্‌টা মানুষ ঠিক ঠাহর করা—'

* * *

ইতিহাস-দার্শনিক শ্রীযুক্ত টইনবি বলেছেন, দেশকালপাত্রের যোগাযোগের ফলে নিত্য নিত্য প্যাটারন্ তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু সেগুলো আকছারই প্রাচীন প্যাটার্‌নের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তফাত ডীটেলে।

অতএব, যখন সবিশেষ অবগত আছি, উভয় বাঙলার দেশকালপাত্রে ফারাক যৎসামান্য তবে পূর্বোল্লিখিত পূর্ববঙ্গীয় প্যাটার্‌নের পুনরাবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভাসিত হবে না কেন? আমরা কিসে কম?

অবশ্য স্বীকার করছি ডীটেলে উনিশ-বিশ হওয়া বিচিত্র নয়।

এবং তাই হয়েওছে।

কারণে, কিংবা অকারণে, অথবা বলতে পারেন, কিসমতের মারে এদেশে পাশপরট্ যোগাড় করাটা ক্রমশ কঠিন হতে কঠিনতর হতে লাগলো, স্বরাজ পাওয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই। শেষটায় হাল এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে তখন কেউ আর নিতান্ত বিপদে না পড়লে ঐ সাপের পায়ের সন্ধানে বেরুতো না। অবশ্য লক্ষপতি, কালোবাজারী, বিদেশে যার আচার-করা ফরেন কারেন্‌সি আছে তাদের কথা আলাদা। এসব কাহিনী দফে দফে বয়ান করার প্রয়োজন নেই। খবরের কাগজে অনেক খবর বেরোয় সাদা কালিতে ছাপা। সেগুলো পড়ার জন্য একটি তৃতীয় নয়নের প্রয়োজন—ইংরিজীতে যাকে বলে টু রীড বিটুইন দ্য লাইনজ। যাঁদের সেটা আছে—আমার নেই—তাঁরা আপনাকে অনায়াসে দু কলম শেখাতে পারেন। সে কথা থাক।

ইতিমধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

লোকটার নিশ্চয়ই কোমরের জোর, কড়ির ওজন ও বুকের পাটা আছে, নইলে সরকারের সঙ্গে লড়তে যাবে কেন? ক'টা আদালতে হারার পর লোকটি সুপ্রীম কোরটে পৌঁছল জানি নে। সেখানে প্রধান বিচারপতি (তৎকালীন) শ্রীযুত সুব্বা রাও যা রায় দিলেন তার বিগলিতার্থ, কোনও ভারতীয় যদি আপন দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চায় তবে তাকে ঠেকাবার এখ্‌তেয়ার ভারত সরকারের নেই। সেটা হবে সংবিধান-বিরুদ্ধ।

বাস্! আর যাবে কোথা!

আমাগো দ্যাশে কয়, একে তো ছিল নাচিয়ে বুড়ী তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল।

পূব বাঙলার প্যাটার্‌নে এস্থলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গাছের মগডালে না চড়ে মেয়েমদ্দে আণ্ডাবাচ্চায় ধাওয়া করলে পাসপরট্ ফরমের জন্য। বাঁদরের জন্য ও-বস্তুর প্রয়োজন নেই—তাকে খাঁচায় পুরে প্লেনে ঢুকিয়ে দিলেই হল। মানুষের বেলা জাহাজের কাপতান, প্লেনের টিকিট বেচনেওয়ালা, ভূপৃষ্ঠে বর্ডারের উভয়পক্ষের পুলিস শুধোত, অভিজ্ঞান-পত্রটি কোথায়?

ইতিমধ্যে নাকি আরও দুজন জজ সাহেবের রায় বেরলো : আইনত নাকি পাসপর্‌টের কোনও প্রয়োজনই নেই। এটা আমি বুঝতে পারিনি, কাজেই এটি নিয়ে তড়িঘড়ি

আলোচনা করা আমার শোভা পায় না।[১] পয়লা তো ঝামেলাটা বুঝে নিই।

উপস্থিত একটি কথা বলে রাখি।

আইন অবশ্যই সর্বজনমান্য। কিন্তু কার্যত কি হয়?

আইনত (ডেজুরে) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তার নাগরিককে অবাধ চলাফেরা করার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু কার্যত (ডে ফাকটো) কোনও দেশ দেয় বলে জানি নে।

এই তো হালের কথা। মার্কিন দেশে যে জোর গণতন্ত্রের রাজত্ব সে-কথা আমরা সবাই জানি। অন্তত সেই নিয়ে তাদের বড়-ফাটাইয়ের অন্ত নেই। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েৎনাম সর্বত্রই তাঁরা যে গণতন্ত্র তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন একথা তাঁরা বিশ্ববাসীকে অহরহ শোনাচ্ছেন। সত্যি হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে, কিংবা হয়তো মারকিনগণ নিজেদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। এবারে সেই হালের কথাতেই আসি।

দার্শনিক বারট্রানড রাস্‌ল্‌ কিছুদিন হল স্থির করলেন, একটা বেসরকারী আদালত বসিয়ে সেখানে ভিয়েৎনামে 'মারকিন পাপাচারের' বিচার করা হবে। খোলা আদালতে যে বকম যে-কোনও মানুষ, হয় আসামী নয় ফরিয়াদি পক্ষে দাঁড়াতে পারে বা আদালতের দোস্ত (আমিকুস কুরিএ) হিসেবে নিরপেক্ষভাবে কথা বলার হক্ক ধরে—রাসলের বেসরকারী বে-আইনী (বা অ-আইনীও বলতে পারেন) আদালতেও সেই ব্যবস্থা থাকবে।

এ আদালতে হাওয়া কোন্‌ দিকে বইবে সেটা ঠাহর করা জন্য হ্যামলেট নাটকের ভূতের প্রয়োজন হয়নি। তৎসত্ত্বেও মার্কিন জুজুর ভয়ে সব রাষ্ট্রই মুখে কাঁথা চাপলেন। অর্থাৎ সে আদালতের জন্য আসন দিতে (ভেনু) রাজী হন না—'তোমার আসন পাতবো কোথায়' হে অতিথি'—অবশ্য ভিন্নার্থে।

শেষটার সরল সুইডেন লাজুক কনেটির মত কবুল পড়লো—এবং আখেরে পস্তালো, কিন্তু সে কথা থাক।

সেই 'উয়োর ক্রাইমস ট্রিবুনালে' সাক্ষ্য দিলেন ৭ই মে তারিখে এক ভদ্রলোক—এঁর নাম রাল্‌ফ্‌ শ্যোমান। মারকিন নাগরিক, এবং রাসলের খাস নায়েব (পারসনাল সেকরেটারি)। ভিয়েৎনামে মারকিনদের 'পাশবিক অত্যাচারে'র দফে দফে বয়ান দিয়ে—যার সঙ্গে এ রচনার কোনও সম্পর্ক নেই—তিনি বলেন, তিনি স্বয়ং হানয় গিয়েছিলেন এবং অনুমান করেন, যেহেতু তিনি ঐ জায়গায় মারকিন সরকারের বিনানুমতিতে গিয়েছিলেন তাই সে-সরকার এক্ষণে তাঁর পাসপরট্‌ রদ করবে (অর্থাৎ বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করে নেবে)।

যদি করে তবে সেটা আইনসঙ্গত কিনা, সেটা বিচার করার মত আইন জ্ঞান আমার কেন, বহু ধুরন্ধরেরও নেই।

(১) এই দেখুন না, কেন্দ্রীয় সরকার পাসপরট্‌ বাবদে যে আইন এতদিন মেনে চলতেন তারও একটা রেজোঁ দেৎর্‌ (raison detre) নিদেন একটা ভিত ছিল

---

১ কাগজে রিপোর্‌ট বেরিয়েছে : "Giving their reasons the minority said that there was no compulsion of law that a passport must be obtained before leaving India." আমারই মত জনৈক সম্পাদক ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি এবং ঐ নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন।

(২) তিনজন মহামান্য জজ সেটা অস্বীকার করলেন (৩) অন্য দুজন মহামান্য জজ ঐ তিনজনের সঙ্গে একমত হলেন না। এদিকে পাসপর্‌ট্ দরখাস্তের বন্যায় হিল্লী দিল্লী যায়-যায়। সেটা ঠেকাবার জন্য সরকারকে বাধ্য হয়ে জারী করতে হয়েছে, (৪) অরডনন্‌স্—সাময়িক আইন। এ আইনের আয়ুষ্কাল মেরে কেটে ছ'মাস। ইতিমধ্যে সরকার এই অরডনন্‌স্‌টি মেজে ঘষে (৫) বিল রূপে পরিবর্তন করে পেশ করবেন পারলিমেনটের সমুখে।

তখন লাগবে ধুন্ধুমার, ইংরিজীতে যাকে বলে দ্য ফ্যাট উইল বি ইন দ্য ফায়ার। উপরের প্যারায় আমি পাঁচ রকমের দৃষ্টিবিন্দু পরিবেশন করেছিলুম—এবারে পারলিমেনটে জুটবে এসে আরও পাঁচশ!

আমার ঘাড়ে কি ৫০৬টি মাথা যে আমি রা'টি কাড়বো!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

পারলিমেনটে বিস্তর বেদরদ ধোলাইয়ের পর ইস্ত্রি হয়ে বেরবেন বিলটি তখন আইনরূপে।

আমরা শঙ্খ বাজাবো হুলুধ্বনি দেব।

কিন্তু হায়, এ পোড়ার সংসারে শান্তি কোথায়? এই নয়া তুলতুলে তুলোয়ভরা তাকিয়া-পারা আইনটার উপর ভর করে যে দুদণ্ড জিরিয়ে নেবেন তারই বা মোকাফুরসৎ কোথায়?

আবার এক 'পাষণ্ড' হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—সে আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দাঁড়াবে।

এবং এবারও যদি মহামান্য বিচারপতি...?

তা হলে শুরুসে, ফিন্‌সে, সেই ঔড্র পদ্ধতিতে :—

ক-রে কমললোচন শ্রীহরি,
খ-রে খগ-আসনে মুরারি
গ-রে...!

আড্ডা—পাসপর্‌ট্

'এত দেরিতে যে?'

শোনো কথা! আড্ডাতেও আসতে হবে পাঙট্যুয়ালি?

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো হচ্ছে। তুমি তো হামেশাই পাঙট্যুয়ালি অন-পাঙট্যুয়াল।'

আড্ডা প্রতিষ্ঠানের কাশীবৃন্দাবন কাইরো শহরে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর গবেষণামূলক একাধিক গেরেমভারী প্রবন্ধ খানদানী অকসব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাত্মক বনেদী ত্রৈমাসিকে বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্তাদের খেয়াল গেল যে আমার ঐ সাতিশয় উচ্চপর্যায়ের লেখাগুলো যদি একবার তাঁদের কাগজে বেরয় তবে সে-কাগজের মান বা স্ট্যান্‌ডার্‌ড চড়াকসে এমনি সুপুরি গাছের ডগায় উঠে যাবে যে আর পাঁচজন লেখক সে মগ্‌ডালে উঠতে পারবে না। অথচ পয়লা নম্বরী পাঠকমাত্রই

আমার উচ্চাঙ্গ লেখায় পেয়ে গেছেন তাজা রক্তের সন্ধান, হয়ে গেছেন ম্যানঈটার। সম্পাদকমণ্ডলী তখন আর পাঁচজনের লেখা বাসি মড়া পাচার করবেন কি প্রকারে! একবার ভাবুন তো, স্বয়ং কবিগুরু যদি কোনও সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় 'ট্রামেবাসে', 'সুনন্দর জারনল' এবং 'পঞ্চতন্ত্র' সব কটাই লেখেন, তারপর আমাদের তিনজনের—এক কথায় সৈয়দ সুনন্দ করের কি হাল হবে? পচা ডিম ছুঁড়বে আমাদের মাথায় পাঠকগুষ্টি—কাগজ হয়ে যাবে বন্ধ। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, লেখক সবাইকে বসতে হবে রাস্তায়। আমাদেরও তো কাচ্চাবাচ্চা আছে। ডাল-ভাত যোগাতে হয়।

আমার অত্যুৎকৃষ্ট রচনার মূল্য অকসব্রিজের কর্তৃপক্ষ বুঝুন আর নাই বুঝুন—এটা কিন্তু ভুললে চলবে না তারা ইংরেজ। ইংরেজ ব্যবসা বোঝে। নেপোলিয়ন একদা বলেছিলেন 'নেশন অব শপ-কীপারজ্'—এখন বলা হয় 'নেশন অব শপলিফটারজ্'[১] (ভদ্রবেশী 'দোকান-লুটেরা')। ব্যবসা বোঝে বলেই তারা আমার 'লা-জবাব' প্রবন্ধগুলো ইনশিওর করে সবিনয়, সকাতর ফেরত পাঠায়—ছাপলে তারা, তাদের আণ্ডাবাচ্চারা বেবাক-আণ্ডাহীন হবে সেই কারণ দর্শিয়ে।

তখন করি কি?

কথিত আছে, একদা লন্ডনে এসে মার্কিন হেনরি ফোরড দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন খাসা রহিসী রোলস রইস। পঞ্চম জর্জ তাঁকে শুধোলেন, 'সে কি মিসটার ফোরড! আপনি বিজ্ঞাপনে বলেন "ফোরড গাড়ি দুনিয়ার চীপেস্ট এবং বেস্ট গাড়ি", তবে রোলস চড়েন কেন?' ফোরড বাও করে বললেন, 'আমার ম্যানেজারকে বহুবার বলেছি, আমাকে একখানা ফোরড গাড়ি দিতে। তার মুখে ঐ এক কথা—ফোরড গাড়ি তৈরি হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায়; সে খদ্দের সামলাবে না মালিককে গাড়ি দেবে। খদ্দের মোর ইমপরটেনট দ্যান মালিক। অতএব, হুজুর, বাধ্য হয়ে বাজারের সেকেনড বেস্ট্ মোটর—রোলস—কিনেছি।'

গল্পটি মিশরের পিরামিডের চেয়েও প্রাচীন—যে পিরামিডের দিকে পিছন ফিরে আমরা কাইরোর কাফেতে বসি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল কাহিনীর ভালে ঐ তো চন্দন-তিলক! নিত্য নিত্য নব নব ফাঁড়া গরদিশে সাক্ষাৎ মুশকিলআসান।

আমি জানতুম, অকসব্রিজ ত্রৈমাসিকের পরেই সেকেন্ড বেস্ট্ কাগজ 'দেশ'।

সেখানে পাঠালুম। ছাপা হয়ে গেল (সম্পাদক-ম্যানেজার হয়তো সোল্লাসে ভেবেছিলেন, ওটা পয়সা-কামানেওলা বিজ্ঞাপন), বই হয়েও বেরুলো। পাঠক সাবধান! চীনেবাদামের ঠোঙা কদাচ অবহেলা করবেন না। একমাত্র ঐ কাগজেই একখানা তাবাল্লোক মল্লিখিত কাইরোর কাফে আড্ডা সম্বন্ধে নিবন্ধগুলি পড়তে পায়।

---

১ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন : আশকথা পাশকথা (আড্ডার সেটা প্রাণধর্ম) না শুনে যে-সব বে-আড্ডাবাজ অথচ গুণী পাঠক মূল গল্পের খেই ছিনেজোঁকের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁরা যেন ফুটনোটগুলো না পড়েন; কণামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অবশ্য তার অর্থ এও নয়, যে, মূল লেখা না পড়লে তাঁর সর্বনাশ হবে।

'শপ্-লিফটারজ্' কথাটা ইংরেজের উপর প্রথম আরোপ করেন ছদ্মনামধারী সরস লেখক 'সাকী'।

অতএব কাইরোর কাফে-আড্ডার সবিস্তর বর্ণনা নূতন করে দেব না। শুধু এইটুকু বলবো কাইরোর কাফের তুলনায় আমাদের আড্ডা, ইংরেজের ক্লাব, জরমনের পাব, কাবুলির চা খানা, ফরাসীর বিস্‌ৎরো—এস্তেক অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর জমজমাট ঘাট—সব শিশু, শিশু। বৈজ্ঞানিক বলেন, আমাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটে শয্যায়—নিদ্রায়। কাইরোর কাফে হাসবে—কুট্টির ঘোড়ার মত—আস্তে বলুন। তাদের জীবনযাত্রা ঐকপ্রকার :—

সকাল ৬টা থেকে ১০টা কাফে = ৪ ঘণ্টা। ১০টা থেকে ১টা দফতর। ১টা থেকে ২টা কাফে = ১ ঘণ্টা। ২টা থেকে ৫টা দফতর, ৫টা থেকে ১২টা কাফে = ৭ ঘণ্টা। ১২টা থেকে ৬টা ভোর নিদ্রাযোগে গৃহবাস অতিশয় অনিচ্ছায়।

একুনে, সর্বসাকুল্যে কাফেতে ১২ ঘণ্টা। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ না ঘণ্টা! হোলি রাশার সেই ফাটা ঘণ্টা যেটা কখনও বাজেনি।

কাইরো সজ্জনের জীবনের হাফ কাটে কাফেতে—অবশ্য বেটার হাফ-কে বাড়িতে রেখে! আর ছুটিছাটা, স্ট্রাইক—রাজা ফারুকের মেহেরবানীতে হরবকৎ লেগেই আছে[১]—লটারি উত্তোলন দিবসচয় যদি হিসেবে নেন তবে সেই প্রথম প্রবন্ধের প্রথম তত্ত্বে ফিরে যাই : বাড়ি নিয়ে কি গুলে খাব, পারেন তো দিন একটি নন্‌স্টপ্‌-আড্ডার সন্ধান। তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, কাইরোতে লোক বাড়ি বানায় কেন? মিশরবাসী তখন বিদেশীকে বুঝিয়ে বলে, প্রাচীন যুগে তারা আদৌ বানাতো না, বানাতো গোরের জন্য স্রেফ পিরামিড—চোখ মেললেই এখনও চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে-যুগের বাড়ি? বানানোর বদ অভ্যাস বাজে খরচা তারা শিখেছে হালে, ইংরেজের কাছ থেকে, তার 'হোম' নাকি তার আসল (অ্যান্ড হি ইজ দ্য টাইরেন্ট ইনসাইড)। আর বাড়ি বানানোটাই যদি এখন কিছু জব্বর মহৎকর্ম, বাবুইকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা উচিত, ওর মত নিটোল, নিখুঁত বাড়ি বানিয়েছে আর কেউ? ছাত ধসে না, ট্যাকশো দিতে হয় না।—ইত্যাদি।[২]

তা সে থাকগে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে এলুম, ঐ তো আড্ডার দোষ।

কাইরোর কাফে আমাকে বোঝাচ্ছিল, আমি পাঙট্যুয়াল, অর্থাৎ কথা দিয়ে থাকি ঘণ্টায় আসবো বলে, আর আসি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ঘণ্টায় অর্থাৎ পাঙট্যুয়ালী...ইত্যাদি।

এরপর কাফে বলে কিনা, আমি নাকি অন্-পাঙট্যুয়ালও বটে!

সেটা কি প্রকারের?

টুটেনখামেন-এর আমল থেকে এদেশের অলিখিত আইন, মিটিং যদি ধার্য হয়ে থাকে সাতটায়, তবে শুরু হয় আটটায়, দিল-হামেশাই হচ্ছে। আমি নাকি উপস্থিত হই কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। এটা নাকি অন্-পাঙট্যুয়াল পাঙট্যুয়ালিটি।

সেটা নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার একচেটে কারবার। নীলনদে কখনও প্রচুর জল আসার

---

১ আমার কাইরো-কাফে আশ্রম ঐ সময়ে।

২ ভারতের বাইরের বেদে মাত্রেরই বিশ্বাস তাদের আদিমতম পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। তা হতেও পারে। এবং তাদের আর একটি বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আগাপাস্তলা বেদেদের দেশ, সবাই ঘুরে বেড়ায় সুতরাং কেউ বাড়ি-ঘরদোর বাঁধে না!

ফলে কাফের সকলে গায়ে রেশমের স্যুট চড়ায়, কখন মাত্র কপ্নিনটুকু সম্বল : কখন সাহারায় ঝড়ের ঠেলায় ছ ফুট বালি জমে বাড়ির দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারই ফলে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিস্থিতি—কাফেতে আসার জোটি নেই—এসবের হদীসান্বেসীরা নাকি পরবর্তীকালে আবহাওয়া দফতরের ডিরেকটার জেনরেল হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের টার্ক—(তুর্কী বললে মানুষটাকে ভদ্র বলে মনে হয়)—ইংরিজি অর্থে টার্ক, সদস্য তওফীক এসে উপস্থিত।

পয়লা নম্বরের ধুরন্ধর এক গোঁয়ার। আমাকে শুধোলে 'কি বাবুজী, খানিকক্ষণ আগে তোমাকে দেখলুম এক আজব চিড়িয়ার সঙ্গে—ওহেন মাল কস্মিন্‌কালে বাবা, এই বহুতর চিড়িয়ার শহর কাইরোতেও দেখিনি! ব্যাপারটা কি?'

আমি বললুম, 'আর কও কেন? সেই কথাই তো এদের বোঝাতে যাচ্ছিলুম। সমস্ত বৈকালটা কেটেছে ব্রিটিশ কনসুলেটে—বুনো হাঁস ধরার চেষ্টা কখনও করেছ? তাইতেই হেথায় হাজিরাতে দেরি?'

'বুনো হাঁস! সে আবার কি?'

'নয় তো কি? কিন্তু আমার সঙ্গে যে চিড়িয়া দেখছিলে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন চীজ। আমার দেশের লোক।'

কাফে অবাক। 'সে কি? আমরা তো জানতুম, তুমি কোথাকার সেই বাঙলা না, কি যেন বলে, সেই দেশের একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া এসেছ এদেশে।'

'সে কথা পরে হবে। উপস্থিত শুধোই, বিদেশে-বিভুঁইয়ে কেউ কখনও পাসপর্‌ট্ হারিয়েছ?' সকলেই একসঙ্গে শিউরে উঠলেন, কারও কপালে ঘাম দেখা দিল, কেউ বা চোখ বন্ধ করে আল্লারসূলের নাম স্মরণ করছেন।

পাঠককে বুঝিয়ে বলি, এ সংসারে নানান ভয়াবহ অবস্থা আমরা দেখি, কাগজে পড়ি, —শ্রবণ বা স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান না হয় বাদই দিলুম। কিন্তু এ সব ক'টাকে হার মানায় মাত্র একটি নিদারুণ দুর্দৈব—বিদেশে পাসপর্‌টি হারানো।

ছুটুন কনস্যুলেটে। তারা কানই দেবে না। লিখুন আপন দেশে। নো রিপলাই। কিংবা শুধোবে, পাসপর্‌টের নম্বর, ইস্যুর তারিখ গয়রহ জানাও। সেগুলো আপনি ডাইরিতে টুকে রাখেননি। আবার কনস্যুলেটে ধন্না। সঙ্গে নিয়ে গেছেন দু-পাঁচজন ভারতীয়। তাঁরা হলপ খেলেন, আপনি যে ভারতীয় সে বাবদে তাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। কনস্যুলেট বলবে, মাডাগাসকারের বিস্তর লোক ভারতীয় ভাষায় কথা কয়; তাই বলে তারা ভারতীয়? ইনডিয়ান নেশনালিটির প্রমাণ কোথায় যে আমরা নয়া পাসপর্‌ট্ দেব? বের করুন ব্যর্থ সারটিফিকেট, এবং প্রমাণ করুন সেটা আপনারই।

হাজারোগণ্ডার হাবিজাবী হেনাতেনা চাইবে। এবং তাদের চাওয়াটা সম্পূর্ণ ন্যায্যত হক্কতঃ। না চাইলে দুনিয়ার যত ভাগাবন্ড ভ্‌লাডিভসটক থেকে আলস্‌কা—এসে কিউ লাগাবে একখানা করকরে ঝাঁ চুকচুকে, সোঁদা সোঁদা গন্ধওলা ইনডিয়ান পাসপর্‌টের লোভে। এক ঝটকায় হয়ে যাবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল, সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে মহারাণীর মোলাকাৎ চাইবে। যে বেচারাকে টারক তওফীক দেখেছিল পথিমধ্যে, সে সত্যি সিলেটের লোক।

আমি গিয়েছিলুম কনস্যুলেটে, প্যালেসটাইন যাবার জন্য 'অনুমতির ('ভিজার')

সন্ধানে। সেই জরাজীর্ণ লোকটাকে জবুথবু হয়ে এক কোণে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেই বুঝে গেলুম লোকটা সিলেটি।

এবং তাই। আমার মুখে সিলেটি শুনে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে। আমি একপাল লোকের সামনে মহা অপ্রস্তুত।

ব্যাপারটা সরল, কিন্তু পরিণামে হয়ে গেছে বেজায় জটিল। মাসখানেক পূর্বে আলেকজান্দরিয়া বন্দরের কিছু দূরে একটা জাহাজডুবি হয়—ঐ কোনও গতিকে বেঁচেছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, গায়ের চামড়াও কিছুটা পুড়েছে। পাসপর্ট্ তো সাপের মণি—রত্তিভর ডকুমেন্ট তার কাছে নেই। আর ঐ একমাত্র 'সিলট্যা' ভিন্ন অন্য কোন ভাষার একটি শব্দও সে বুঝতে পারে না।

কুল্লে কাফে মাথা নেড়ে সায় দিলে, ব্যাপারটা সঙ্গীন।

ভ্যাগ্যিস, ডেপুটি কনসালটি ছিলেন আমার পরিচিত—অতিশয় অমায়িক খানদানী ইংরেজ ভদ্রলোক। আমার আপন কাজ শেষ হয়ে গেলে খালাসিটার কথা পাড়লুম। সায়েব মাথা নেড়ে বললেন, 'বিলকুল হুম্‌বগ্। আমি কলকাতায় কাজ করেছি পাঁচটি বৎসর। বাঙলা শুনলে বেশ বুঝতে পারি। ও যা বললে সে তো বাঙলা নয়।'

মনে মনে আমাকে বলতে হল, 'পোরা কপাল আমার।' সায়েবকে বললুম 'ওকে একটু ডাকলে হয় না?' সায়েব সদাশয় লোক, বললেন, 'আলবৎ।'

লোকটা আসামাত্রই আমি চালালুম তোড়সে সিলেটি। কিঞ্চিৎ কটুকাটব্যের কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে। উদ্দেশ্য তাকে একটু অতিশয় তাতিয়ে দেওয়া, নইলে যে রকম ন'সিকে ভিলেজ ইডিয়ট, পেটে বোমা মারলেও—। দাওয়াই ধরলো। কাঁইকুঁই করে বলে গেল অনেক দুঃখের কাহিনী—চোখে সাত দরিয়ার নোনাজল। মিনিট পাঁচেক চললো 'রসালাপ'। সায়েব খালাসীকে বললেন, 'টুম্ যাও।' আমাকে শুধোলেন, 'এও বাঙলা'? আমি বললুম, 'লন্ডনের সঙ্গে উত্তর স্কটল্যান্ডের ভাষায় যে মিল—এ বাঙলার মিল কলকাত্তারই সঙ্গে তার চেয়েও কম।'

এরপর সায়েব যা বললে, তার থেকে পরিষ্কার বুঝে গেলুম, লোকটি সত্যকার ডিপলমেট। বললেন, 'দু-একটা শব্দ যে একবারই বুঝতে পারিনি তা নয়। তবে কি জানো, ব্যাবু, ব্যাপারখানা আসলে কি? কোনও বিশুদ্ধ স্ট্যান্ডার্ড ভাষা—যেমন মনে করো প্যারিসের ফরাসী, কিংবা ধরো লন্ডনে প্রচলিত খানদানী ঘরের ইংরেজী—সেটা শেখা কিছু অত্যধিক কঠিন কর্ম নয়। হাজার হাজার রুশ, পোল, হাঙগেরিয়ান চোস্ত ইংরিজী বলে, খাসা ফরাসী কপচায়—কার সাধ্যি বলে কোন্‌টা কার মাতৃভাষা নয়—এবং প্রসঙ্গত বলি, এরাই হয় বেস্ট স্পাই। কিন্তু মশাই, বিশুদ্ধ গাঁইয়া ডায়লেকট রপ্ত করাটা বড়ই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। লন্ডনের ক'টা খানদানী ইংরেজই বলতে পারে খাঁটি ককনি?'

সায়েবটি ছিল একটু দুঁদে টাইপ। খালাসিটার জন্মভূমির গ্রাম থানায় চিঠি না লিখে রেডটেপিজেমের মূর্ত প্রতীক 'এনকোয়ারি' না করেই আপন জিম্মায় ছেড়ে দিলে একখানা পাসপর্ট্।

নইলে ঐ হতভাগা ক'মাস ধরে কে জানে, হয়তো বারো বছর ধরে আপিসে দফতরে ধন্না দিত, রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতো, খেত কি, মাথা গুঁজতো কোথায়?

আর ইতিমধ্যে যদি কোনও সমধিক কর্মনিষ্ঠ তথা অত্যুৎসাহী উৎকোচাশ্রয়ী মিশরী

পুলিসম্যানের নজর পড়ে যেত? কাঁধে খাবলা মেরে শুধতো 'তুমি তো বিদেশী বলে মনে হচ্ছে হে—নিকালো বাসবর' (আরবীতে 'প' নেই বলে 'ব' আদেশ, এবং শব্দটি আরবরা ফরাসী থেকে নিয়েছে বলে শেষের 'টি' উচ্চারিত হয় না—একুনে পাসপর্ট্ উচ্চারিত হয় 'বাসবর', বা 'বাসাবর') তাহলে?

শ্রীঘর। তাতে যে আমাগো সিলট্যা মোতিমিয়ার খুব একটা ভয়ঙ্কর আপত্য (আপত্তি শব্দের সিলেটি রূপ) আছে তা নয়; জাহাজের কয়লাঘরের কারবালায় কারবার করছে যে লোক তার পক্ষে কাইরোয় কারাগার করীমা ব্‌বখশায় বর হাল-ই-মা—আল্লার কৃপা তার উপরে এসেছে।

কিন্তু ততোমধ্যে তার নয়া বাসবরের জন্যে যেটুকু ধর্না দেওয়া, তদবির করা সেটুকুনই বা করবে কে? অবশ্য আখেরে এস্থলে তদবির করা না করা—বরাবর বসুন্ধরা সর্বত্রই তদ্বির-ভোগ্যা নন—এখানে প্রকৃতি তার আপন গতি নেয়।

সাঁইমুরশীদ কবুল, আমি স্নব নই। কিন্তু আপনার আমার মত ক্ষীণকায় মধ্যশ্রেণীর ভদ্রসন্তানকে যদি বিদেশের জেলে ঠেসে দেয়, তবে টেঁসে যেতে কতক্ষণ? না হয় সপ্রমাণ হল, কাইরোর জেলকে আপনি হার মানিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেরনো মাত্রই তো আপনি সেই ক্রাইমটি ফের করে ফেলেছেন, বিদেশে বিনা পাসপর্টে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অবশ্য আপনি তর্ক তুলতে পারেন, মিশর সরকারই আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে ক্রাইমটি করছে, সে-ই কাজের আপনি ইফেকট মাত্র। ততোধিক কুতর্ক করতে পারেন, আজ যদি মিশর সরকারের প্রতিভূ পুলিসম্যান আপনাকে চোদ্দতলা বাড়ির ছাদ থেকে পেভমেন্টে ফেলে দেয় তবে সেটা আত্মহত্যা নয়।

*　　*　　*

কাফেতে এ নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি হয়।

একমাত্র তওফীক আফেন্দী চরম অবহেলাভরা সুরে পরম তাচ্ছিল্যসহ মাঝে মাঝে বলছিল 'যত সব!' কিংবা 'আদিখেত্তায় মানওয়ারী' অথবা ডিমের খোসায় কালবৈশাখী!

শেষটায় বললে, 'ছোঃ! আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন?'

নিবেদন করলুম, 'জানি তুমি একদা ছিলে মুস্তাফা কামালের 'বিবেকরক্ষক', অধুনা ইসমেৎ ইনেনুর অমনিবাস এমবেসডর, কিন্তু তথাপি—'

বললে, 'যাঃ! এইটুকু মশা মারতে বাঘের উপরে টাগ!—না। কিনে দিতুম। কী আর এমন ক্লেওপাত্রার গুপ্তধন প্রয়োজন ঐ সাসিটুকুর জন্য?'

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, 'সে কি? পাসপর্ট্ কি হাটের বেসাতি, যে—'

গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'দেখো, বৎস! তুমি আজহর মাদরাসার ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করো; না-ই বা জানলে এসব জাল-জচ্চুরির কায়দা-কের্তা।

'ঈস্‌ট ইজ ঈস্‌ট অ্যানড—'

ইজ্‌রাএল (ইসরাইল) নিমিত্ত মাত্র। অর্-রঈস জমাল্ আবদুন নাসিরও নিমিত্ত মাত্র। দুজনের পিছনে রয়েছে দ্বিধা বসুন্ধরা—যাকে আমরা এতদিন প্রাচী তথা প্রতীচী নামে চিনেছি। ইংরেজ ফরাসী গয়রহ বলেছে, অরিএনট এবং অকসিডেন্ট। জর্মনরা এ দুটো শব্দ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু খাঁটি জরমনে বলা হয় মরগেন্‌লান্‌ট (উদয়াচল) ও আবেনটলান্‌ট্ (অস্তাচল—অবশ্য লান্‌ট্=ভূমি, দেশ); আরবরা হুবহু ঐ রকমই মশরিক্ ও মগরিব[১] (মগরিব বলতে আবার দক্ষিণ আফরিকাকেও বোঝায়) বলে থাকে।

এই দুই ভূখণ্ড নিজেদের ভিতর প্রায় সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সম্মুখীন হয়েছে—যুদ্ধং দেহি।

এ-লেখা বেরুবার পূর্বেই হয়তো উভয় পক্ষ অস্ত্রসংবরণ করে নেবেন। কিন্তু এর শেষ অতি অবশ্যই এখানে নয়। এ শুধু আরম্ভ মাত্র।

প্রতীচীর শক্তিশালী যুযুধান বলতে উপস্থিত বুঝি জনসন, উইলসন[২] ও দ্য গল্। প্রাচীর ভীষ্ম কর্ণ বলতে বুঝি কসিগিন মাও।

ইজ্‌রাএলের পিছনে দাঁড়িয়েছেন মারকিন ও ইংরেজ। আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের পশ্চাতে রুশ ও চীন।

দ্য গল্ ব্যত্যয়। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের মত। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণেরই মত তিনি একটা শান্তিসভার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং সে প্রস্তাবের পশ্চাতে তাঁর কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কূট কসিগিন সঙ্গে-সঙ্গেই অনুমান করে নিলেন যে ধড়িবাজ মারকিন ইংরেজ এই সভাটাকেই মুষলে পরিবর্তিত করে আরব বংশ ধ্বংস করতে চাইবে। তাই কসিগিন যা বললেন, যার ব্যঞ্জনা দিলেন, এবং যা বললেন না কিন্তু মীন করলেন তার সব কটা একুনে দাঁড়ায় : 'শান্তির প্রস্তাব তো উত্তম প্রস্তাব', কিন্তু প্রশ্ন, তুমি জনসন, এবং উনি উইলসন যে দুটি আপন আপন খাসা নৌবহর ভূমধ্যসাগরে রোঁদ মারিয়ে ফেরাচ্ছ, দুনিয়ার সর্বত্র ছড়ানো বাদবাকিগুলোকে নোঙর ভেঙে ফেলে ফুল ইস্টীমে ওদিক-বাগে ধাওয়া করতে হুকুম দিচ্ছ (মুখে যদিও বলছ, 'ওরা তো চলাফেরা করছে কবেকার সেই ঈসু করা প্রাচীন দিনের টাইম-টেবিল অনুযায়ী) তারা কি ওখানে

---

১ বাঙলা গরিব শব্দ ও মগরিব মূলে একই ধাতু থেকে। গরিব আরবীতে 'বিচিত্র' 'অদ্ভুত' অর্থ ধরে।

২ একদা এ দেশে বলা হত বাঙালীর জাত মারছে তিন 'সেন'-এ মিলে। উইলসেন-এর হোটেলে বাঙালী খেত নিষিদ্ধ মাংস, কেশব সেন তাদের করে ফেলত 'বেম্মজ্ঞেনী', আর ইস্টিসেনে বাহান্ন জাত-বেজাতের সঙ্গে মেলা-মেশা এড়ানো যেত না। এখন পৃথিবীর জাত মারার জন্য এসেছেন অন্য তিন সেন। মার্কিন জনসেন, ইংরেজ উইলসেন এবং কানাডার পিয়ারসেন। তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিটি নিতান্তই চুনো পুঁটি। কিন্তু স্বয়ং জনসেন মুক্তকচ্ছ হয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এঁকে বেজাতে তুলেছেন, কিংবা বলবো এঁর জাত মেরেছেন।

আসছে ফেরেস্তাদের প্যাটারনে পিঠে ড্যানা গজিয়ে, হাতে হাপর যন্ত্র নিয়ে "হাল্লেলুইয়া" কীর্তন সহ যীশুদত্ত আপ্ত আপ্ত শান্তি সঙ্গীত গাইতে :

"অগ্রসর হও আজি খ্রীষ্টসেনাগণ ·
সবে মিলি আইস—"

"থাক না, বাছারা, ওসব সান-ডে ইস্‌কুলের মোলায়েম মোলায়েম মধুরসের মোরব্বা! আর সেই যদি কইছ, ভূমধ্যসাগরে, ইজরাএলের ধারে ধারে, মিশরের বন্দরে বন্দরে মানওয়ারিদের কোনও প্রকারের ভালোমন্দ মতলব নেই তবে একটা সরল কর্ম করলেই তো হয়। বেচারী খালাসীমাল্লারাও লক্ষ্য-হস্ত তুলে তোমাদের আশীর্বাদ করবে আপন আপন দেশের বন্দরে দারাপুত্রপরিবার সহ সম্মিলিত হয়ে—যাক না এরা ফিরে আন্‌কল্ স্যামের সোনার দেশে, ডিফেনডার-অব-ফেৎ-রুল-ব্রিটানিয়ার অক্ষয় স্বর্গে—আহা! ন্যু ইয়রক সাউত্যামটনে ফুল কত না অজস্র, আসব কত না সুলভ, আর ললনারা কতই না উন্মুক্ত হৃদয় (পাঠক, আমি শব্দার্থে বলছি না!—খেয়াল থাকে যেন—লেখক)। শান্তি সম্মেলনে তো যাব, ওদিকে যারা তোমাদের দলে নয়, তাদের প্রত্যেকের পিছনে থাকবে ছোরা-হাতে একটি একটি করে মানওয়ারী গুণ্ডা (হিটলার রাইষটাগে এই ব্যবস্থা করাতেন গোড়ার দিকে, বিপক্ষ দল নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত)। ঐ আনন্দেই থাক।"

সরল পাঠক হয়তো এই বলে প্রশ্ন শুধোবেন, আমরা তো জানি, রুশরাও ইউরোপীয়, অকসিডেন্টাল, প্রতীচ্য জাত। আদৌ তা নয়। রুশ কেন, চেক পোল ইত্যাদিকেও অনেকে ইয়োরোপীয় ঈসটারন বলে থাকে। এই তো সেদিন জরমনির কন্‌স্‌টান্‌ৎস শহরে এক সাহিত্য সম্মেলন হয়—তাতে 'ঈসটে'র প্রতিভূ হয়ে আসেন এক চেক, অন্যজনা পোল্ বা রাশান। আর হিটলার তো যুদ্ধ লড়তে লড়তে বরাব্বর চিৎকার করে গেছেন, 'এ সংগ্রামে এক পক্ষে সভ্য ঐতিহ্যশীল ইউরোপীয়, অন্যপক্ষে বর্বর ঈসটার্‌ন্—রুশ।' মৃত্যুবরণের পূর্বে বলেন, 'আমি ছিলুম ইউরোপের শেষ আশা। কিন্তু সপ্রমাণ হল, প্রাচী আমার চেয়ে শক্তিশালী।'

সরল পাঠককে বোঝাই, তাঁরই মত সরল—অবশ্য ওদেশে বিরল—ইয়োরোপীয় মাত্রই একটি অতি বাস্তব, ধরা-ছোঁওয়ার জিনিস দিয়ে প্রতীচী প্রাচীর তফাত করে। জামার সামনের দিকটা পাতলুনের ভিতর যে গুঁজে দেয় সে ইয়োরোপীয়, যে বাইরে ঝুলিয়ে রাখে সে প্রাচ্যদেশীয়। রুশরা যখন তাদের খাঁটি দিশী পোশাক—বাতুশ্‌কা, স্তালিন যা পরতেন—গায়ে চড়ায় তখন তাদের কারুকার্য-করা শারটটি (ব্লাউজও বলা হয়) পাতলুনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়, আমরা যে রকম পাঞ্জাবির সামনের দিকটা (দামন, অঞ্চল) ধুতির উপরে ঝুলিয়ে রাখি।[১] এখানে বুশ্-শারটের 'রেজোঁ দেৎর' নিয়ে আলোচনা করাটা সমীচীন, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে চলে যাব; তবে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, উত্তম বুশ্-শারটের দামন ভিতরে গুঁজে টাই পরা যায়,

---

১ মধ্য বা পশ্চিম ইয়োরোপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরুলে একাধিক সজ্জন আপনার কানে কানে ফিসফিস করে বলবে, 'স্যার! শার্টটা গুঁজতে ভুলে গিয়েছেন।' তাঁর মনে হয়েছে, আপনি শৌচাগারের প্রয়োজনীয় কর্মটি করার পর দামনটি গুঁজতে ভুলে গেছেন—বুড়ো অধ্যাপকরা যে রকম ক্ষুদ্রতর কর্মের পর পাতলুনের বোতাম লাগাতে ভুলে যান।

আবার বাইরে ঝুলিয়ে মিন্-টাই হওয়াও যায়।

মধ্য-প্রাচ্য উপলক্ষ মাত্র।

এক দিকে জনসন-উইলসন চালিত ইয়োরোপ—লক্ষ্য করেছেন চ্যাংড়া ডেন্মারক্ তক্ বাঁদর নাচ নেচে রুশের কাছে ধমক খেয়েছে?—অন্য দিকে রুশ-চীন চালিত এশিয়া, এবং আফরিকাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ এক দিকে সাদা, অন্যদিকে কালো—বা রঙিন বলতে পারেন। সাদার পাল এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, ইউরোপের বাইরের সবাইকে কলর্ড নাম দিয়ে কী থানডারিং ব্লানডারই না সে করেছে! পিলা চীন, কালা নিগ্রো, তাঁবাটে আরব, আধা-পিলা রুশ (ইংরেজাদির দৃঢ় সংস্কার, রুশের গায়ে প্রধানত মন্গোল-তাতার রক্ত) হয়েছে এক-জোট—ওদিকে মার্কিন নিগ্রো মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) বলছে, মারকিনের হয়ে লড়তে তার বিবেকজাত ঘোরতর অধর্মবোধ রয়েছে—পিছনে রঙ-বেরঙের ভারতীয়-পাকিস্তানীও সায় দিয়ে মাথা নাড়ছে; এস্তেক যে, লেবানন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—কারণ সে আধা ক্রিশ্চান আধা মুসলমান—যে কিনা এতদিন সর্বসংঘাতে গা বাঁচিয়ে 'দেহ রক্ষা' করেছে, সেও আব্দুন নাসিরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু লক্ষ্য করার মত দেশ, জাপান। পশ্চিমের দ্য গলের মত ইনিও এতাবৎ নিরপেক্ষ। তা, এরকম দু'একটা ব্যত্যয় না থাকলে মাথাভরা চুলের প্রকৃত বাহার মালুম হয় না।

হাজার চার-পাঁচেক বছর পূর্বে ঠিক এই প্যাটার্ন্টিই ভারতবর্ষে রূপ নিয়েছিল—যার প্রতি ইঙ্গিত, যার সঙ্গে বর্তমান সমস্যা—প্যাটার্নের তুলনা আমি এই ক্ষুদ্র লেখায় এতক্ষণ দিলুম : বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, নানা বর্ণ[১]—বিশুদ্ধ সংমিশ্রিত—নানা জাতি, নানা সভ্যতার লোক একদা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল। এক দিকে দুর্যোধনের পশুবল; অন্য দিকে ধর্মরাজের ধর্মবল।

আজ সেই প্যাটার্ন্ই বোনা হচ্ছে গোটা বিশ্বের নানা রঙের সুতো দিয়ে।

হয়তো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ লাগবে না। কিন্তু সে 'শান্তি' দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

তেইশ বৎসর পূর্বে—তখন স্বরাজ হয়নি—'আনন্দবাজারে' আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি—মারকিন-ইংরেজের এই বে-আদপী বেতমিজীকে 'ধবলদন্ত' নাম দিয়ে। ইংরেজ যে-রকম একদা চীনকে 'পীতাতঙ্ক' (ইয়েলো পেরিল) নামে ডাকত, আজ বিশ্ব জুড়ে তারই পুনরাবির্ভাব!

হাজার পাঁচেক বৎসর পূর্বে হয় মহাভারত; আজ না-হোক, দুদিন বাদে হবে বিশ্বভারত।

---

১ অনেকের বিশ্বাস, কৃষ্ণের যদুবংশ ছিল কালো, কৌরবেরা ছিলেন গোরা আর পাণ্ডবরা ছিলেন পাণ্ডু, অর্থাৎ পিলা, হলদে। পাণ্ডবরা নাকি আসলে তিব্বতের মঙ্গোলীয়ান। (Winternitz পশ্য। এ বাদ বা বিবাদে যোগ দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই)। মহাভারতের যুদ্ধ নাকি কৃষ্ণ-পাণ্ডু বনাম গোরা-কৌরব।

বিষবৃক্ষ

নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে। আমি খবরের কাগজের সম্মানিত রিপর্‌টার নই। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা, যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক (ইম্‌পার্‌সনাল) ভাবে আপন বয়ান পাঠকের সম্মুখে পেশ করা। তৎসত্ত্বেও তাঁরা মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনতে পান। পাঠকসাধারণ ভুলে যান, রিপর্‌টারও মাটির মানুষ, তারও ধর্মবুদ্ধি আছে, সেও অন্যায় অবিচারের সামনে কখনও-কখনও আত্মসংযম না করতে পেরে উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার করে। ফলে কখনও বা কটুবাক্য শুনতে হয়, কখনও বা হাততালিও পেয়ে যায়। প্রকৃত রিপর্‌টার অবশ্য কোনওটারই তোয়াক্কা করে না। সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে যদি দেখে যে, সে নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পেরেছে।

রিপর্‌টার হওয়ার মত শক্তি আমার নেই। তদুপরি দৈনন্দিন যে-সব ঘটনা রিপর্‌টেড হচ্ছে, তার যদি কোনও ঐতিহাসিক মূল্য না থাকে, সে যদি আমাকে মানবসমাজের পতন-উত্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তার খোরাক না যোগায় তবে সে জিনিসের প্রতি আপনার আমার মত সাধারণজনের চিত্ত আকর্ষিত হয় না।

যেমন ধরুন আরব-ইজরাএল দ্বন্দ্ব। কথার কথা কইছি, কাল যদি মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, রুশ সবাই একজোট হয়ে একটা সমাধান করে দেন—যার চেষ্টা এখন প্রতিদিনই হচ্ছে—তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উভয় পক্ষই যখন শান্ত হয়ে গেছেন তখন আমরাও নিশ্চিন্ত মনে আর পাঁচটা খবরের দিকে নজর বুলাই। আর রিপর্‌টারদের তো কথাই নেই। দুই প্রতিবেশী শান্তিতে আছে—এটা খবর নয়। দুই প্রতিবেশীতে খুনোখুনি হচ্ছে সেটা খবর। সংবাদ-সরবরাহ-ভুবনের আপ্তবাক্য—কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা খবর।

অথচ আমি বিলক্ষণ জানি আরব-ইজরাএল সমস্যার প্রকৃত সমাধান যে কি, তার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। নাসির বলছেন, আমি ইজরাএলকে সমূলে উৎপাটন করবো। ওদিকে ইজরাএল যেটুকু জমির উপর এখন রাজত্ব করেছেন তা নিয়ে যে তিনি একদম সন্তুষ্ট নন, সে কথাও তিনি গোপন রাখেন না। অ্যানটনি ঈডন-এর গোঁয়ার অভিযানের ফলে যখন ইজরাএল সৈন্য সবলে মিশরের সাইনাই (সিনাই, আরবীতে[১] সীনিন, সীনা) অধিকার করে তখন আনন্দে উল্লাসে কম্পিত, ভাবাবেগ দমনে অশক্ত ইজরাএল-প্রধান বেন গুরিয়ন যাজকসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তার অর্থ, আমরা আমাদের ন্যায্য ভূমি অধিকার করেছি, এ-ভূমি আমরা আর কখনও পরিত্যাগ করবো না। তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল (এবং আজ সেখানে পুনরায় দুই দল সম্মুখীন হয়েছেন), কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রথমার্ধ, অর্থাৎ সানহাই ইজরাএলের প্রাপ্য, এটা ইজরাইল-দৃষ্টিবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান)

---

১ ইহুদি আরব উভয়ের কাছেই এ গিরি পূতপবিত্র। কুরান শরীফে আল্লাতালা এর নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। ৯৫ সুরা, ২য় ছত্র।

আমলে ইহুদি রাজত্ব কতখানি বিস্তৃত ছিল সেটা পাঠক বাইবেলের পিছনে যে প্রাচীন যুগের ম্যাপ দেওয়া থাকে সেইটে দেখলেই কিছুটা বুঝতে পারবেন। আজ তার বৃহৎ অংশ লেবানন, সীরিয়া, জর্ডন, মিশরের দখলে। কিন্তু হায়, বিশ্বের আদালত ইজরাএলের আড়াই হাজার বছরের তামাদি এ দাবি মানবে না। প্রায় দু হাজার বছর ধরে ইহুদিরা তাদের পুণ্যভূমি প্যালেসটাইন ত্যাগ করে দলে দলে সেই সুদূর রুশ দেশ থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ-কথাও সত্য, ইহুদিদের যাজক-সম্প্রদায় কখনওই আপন পুণ্যভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। কারণ, স্বয়ং ইহুদির সদাজাগ্রত প্রভু য়াহবে ধর্মগ্রন্থ তোরাতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব, সেই দুগ্ধ-মধু'র দেশে।' এ-স্বপ্ন বাস্তবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দিতে —এরই নাম জায়োনিজম এবং এর প্রধান কেন্দ্র ছিল জরমনিতে। মহাকবি হাইনে কিছুদিন বারলিনে এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিন্তু পরে সেটা ত্যাগ করেন; বস্তুত জায়োনিজমের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই একদল শক্তিশালী ইহুদি এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁদের বক্তব্য ছিল : 'প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদি রাজ্য নির্মাণের প্রস্তাব দূরে থাক, সেখানে ইহুদিদের জন্য কোনও ধরনেরই খাস 'ন্যাশনাল হোম' করা হবে ভুল। কারণ সে দেশ ছেড়েছি আমরা দু হাজার বছর পূর্বে, এখন (১৯২০ শতাব্দীতে) সেখানে শতকরা দশজন ইহুদিও বাস করে না, বাদবাকি শতকরা ৭০/৮০ মুসলমান ১৫/২০ খ্রীষ্টান (হিসেবটা খুবই মোটামুটি, কারণ সে-যুগে এ-অঞ্চলের তুর্কী শাসনকর্তারা আদমসুমারিতে বিশ্বাস করতেন না) এখানে শত শত বৎসর ধরে বাস করছে (এবং এঁরা না বললেও আমরা জানি, এই মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের অনেকেই গোড়াতে ইহুদি ছিল, পরে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান খ্রীষ্টান হয়। প্রভু যীশু স্বয়ং ইহুদি ছিলেন এবং তিনি যাঁদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন তার ৯৯% ছিলেন জাত-ইহুদি। পরবর্তী যুগে এঁদের অনেকেই হয়ে যান মুসলমান)। এঁদের অধিকাংশই চাষা, জেলে। এঁদের ভিটেমাটি কেড়ে না নিয়ে নবাগত ইহুদিদের বসাবে কোথায়?...তার চেয়ে বহুতর গুণে কাম্য আমরা, ইহুদিরা, যেন যে-সব দেশে বাস করি সেই সব দেশের পূর্ণ নাগরিক হয়ে যাই।' আমার যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন লয়েড জরজ ইহুদির জন্য 'ন্যাশনাল হোমে'র খসড়া বানাচ্ছেন তখন ভারত-খ্যাত ইহুদি (?) মনটাগু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বার বার বলেন, এতে করে আখেরে ইহুদিকুলের অমঙ্গল হবে।

কিন্তু যুক্তিতর্ক এক জিনিস আর অনাগত যুগের সুখস্বপ্ন দেখা অন্য বিলাস। রাজকুমারী মীরাকে রাজসভার গুণীজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই অত্যুত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃন্দাবনের পেভমেন্ট (!) সোনা দিয়ে গড়া নয়, যদ্যপি বর্ষারম্ভে মেঘাগমনে তথাকার আকাশ মেদুর হয় অতি অবশ্য, ঘন তমালদ্রুমরাজি জনপদভূমিকে শ্যামল করে রাখে নিঃসন্দেহেই, কিন্তু সেস্থলে বিষধর সর্পও ঠিক ওই সময়েই গোপগোপীদের প্রাণহরণ করে, তদুপরি—তদুপরি নিশ্চয়ই সভাসদরা বিস্তর অকাট্য যুক্তিতর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করেছিলেন যে, ওই সাতিশয় অগণ্ড-গ্রাম রাজকন্যার বাসভূমি হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তথাপি তিনি স্বপন দেখছেন,

চাকর রহসূঁ বাগ লাগাসূঁ
নিতি উঠি দরশন্ পাসূঁ

বৃন্দাবনকে কুঞ্জগলিমে
তেরী লীলা গাসূঁ!

পিস্তলের বুলেট দিয়ে যে-রকম ভূত মারা যায় না, যুক্তিতর্কের খাণ্ডার দিয়েও সুখস্বপ্ন খণ্ডবিখণ্ড করা যায় না।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে গড়া মেলা ঝামেলার ভিতর রিপর্টার অনুপ্রবেশ করে খামখা হায়রান হতে চান না—তাই বলেছিলুম, আমি রিপর্টার নই, হবার মত এলেম ও হক্কও আমার নেই।

কিন্তু সেই ১৯২৯ থেকে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ইহুদিদের সংস্পর্শে এসেছি। বোম্বাই অঞ্চলে 'শনিবারের তিলী' নামে পরিচিত এ-দেশে অতি প্রাচীনকালে আগত ইহুদিদের সঙ্গে আমি বাস করেছি (ব্যক্তিগতভাবে আমি এঁদেরই ইহজগতের সর্বোত্তম ইহুদি বলে মনে করি), দিগ্বীজয়ী ইহুদি পণ্ডিতের কাছে হীব্রু শেখার নিষ্ফল প্রচেষ্টা আমি দিয়েছি (দোষ রাব্বির নয়, আমার), ইহুদির (তথা খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরও) পুণ্যভূমিতে আমি বাস করেছি, জরডনের পাক পানিতে ওজু করেছি, গ্যালিলিয় হ্রদের অতিশয় সুস্বাদু মৎস আমি দিনের পর দিন দু বেলা পরম তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করেছি, বস্তুত প্যালেস্টাইনের উত্তরতম সীমান্ত থেকে—যেখানে সীরিয়া আজ সৈন্য সমাবেশ করেছে—দক্ষিণতম সীমান্ত গির্জা অবধি, তথা পূর্বতম সীমান্ত (ট্রান্স্) জরডন থেকে পশ্চিমতম সীমান্তের খাস ইহুদি নগরী তেল আবিব ('বসন্তগিরি') পর্যন্ত অবাধে যাতায়াত করেছি।

* * *

পরম পরিতাপের বিষয় উপরের ছত্রের কালি শুকোতে না শুকোতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ এসেছে যে আরবে ইহুদিতে কোনও প্রকারের সমঝওতা সম্ভবপর হল না বলে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

এ দুঃসংবাদের পর বিমূঢ় মুহ্যমান হয়ে আমার এ অক্ষম লেখনী আর এগোতে চায় না।

যদি ইজরাএল হারে তবে তার তিনদিকে আরব বেদুইন ও বাস্তুহারা আরব (প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার) যারা জরডন অঞ্চলে কেউ কুড়ি বৎসর ধরে, কেউ বা এগারো বৎসর ধরে তাঁবুতে তাঁবুতে দুঃখদৈন্যের জীবন কাটাতে কাটাতে এই মহালগ্নের অপেক্ষা করছিল তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত ইজরাএলে ছেয়ে পড়ে বালবৃদ্ধনারী কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না। হিটলারকে ছাড়িয়ে যাবে।

আর সম্মিলিত আরব জাতিপুঞ্জ যদি হেরে যায় তবে তাদের সে অবমাননা—ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও—তাদের সে অবমাননা, তাদের আত্মসম্মান-বোধের পরিপূর্ণ পদদলিত বিনাশ—তাদের করে তুলবে নিষ্ঠুরের চেয়ে নিষ্ঠুর, সর্বনেশে ভবিষ্যতের প্রতিশোধকামী জিঘাংসু জীবন্ত প্রেতাত্মার মত।

মধ্যযুগের সেই নির্মম ক্রুসেডের মত এর প্রস্তুতি চলবে পুনরায় শত বৎসর ধরে, পরিণাম হবে শত শত বর্ষব্যাপী।

প্রথম লেখনেই আরম্ভ করেছিলুম এই বলে যে, এ তো শুধু অবতরণিকা। মনে মনে দুরাশা করেছিলুম, এই বিষবৃক্ষের চারাটাকে বিশ্বমানবের শুভবুদ্ধি হয়তো বা উৎপাটিত করে দেবে; এখন দেখছি, এই শিশু বিষবৃক্ষ মহীরুহ হয়ে উঠবে একদিন—শত শত

বৎসর ধরে এ বিষবৃক্ষ পাবে উভয়পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত প্রতিশোধ কামনার অপবিত্র শূকররক্তের উর্বরতাদায়ক খাদ্যনিষ্কর্ষ।

এ বিষবৃক্ষকে তখন আর সমূলে উৎপাটিত করা যাবে না।

যদি যায়, কিংবা বিধির আদেশে কোনও দৈবাগত ঝঞ্ঝায় সে ভূপাতিত হয় তবে সে মৃত্যু বরণ করার পূর্বে সঙ্গে নিয়ে যাবে অসংখ্য নরনারী বালবৃদ্ধকে নিষ্পিষ্ট করে তাদের প্রাণবায়ু॥

আরব-ইজরাএল যুদ্ধারম্ভ দিবস।

"দুঃখ তব যন্ত্রণায়"

আমাদের কৈশোরে রমা রলাঁ ছিলেন অতিশয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বস্তুত এমনও একটা সময় গিয়েছে, যখন বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস বলতে রলাঁর জ্যাঁ ক্রিস্‌তফই বোঝাত।

সে-যুগে ঔপন্যাসিক ছাড়া অন্য কোনও রূপে রলাঁ আত্মপ্রকাশ করেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা কোনও কৌতূহল প্রকাশ করিনি।

অথচ ইয়োরোপের ভাবুকজন মাত্রই রলাঁকে চেনেন আরও অন্য একটি রূপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু আগের থেকেই রলাঁ ইউরোপে ক্রমবর্ধমান উৎকট জাতীয়তাবাদ (শভিনিজিম) যে ভিন্ন ভিন্ন দেশকে অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যান এবং দেশবাসী ফরাসী তথা জরমনদের (রলাঁ ছিলেন জরমন সংগীতের আবাল্য একনিষ্ঠ ভক্ত) এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাবধানবাণী শোনান। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে সর্বত্র, সর্বকালে যা হয়ে থাকে, তাই হল। উভয় দেশই তাঁকে আপন আপন শত্রু বলে ধরে নিল।

বিশ্বযুদ্ধ লাগার সময় রলাঁ ছিলেন সুইজারল্যান্ডে। তিনি রেডক্রসে যোগ দিলেন এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রায় সমস্ত যুদ্ধকালটা ফ্রান্সের উদগ্র শভিনিজমের বিরুদ্ধে দৈনিক মাসিকে প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। যুদ্ধশেষের সময় ভগ্নোৎসাহ ক্লান্ত রলাঁ খুঁজলেন শান্তির সন্ধান। ডুব দিলেন তাঁর স্বদেশের শত্রু জরমন জাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতসৃষ্টিকার বেটোফেনের সংগীতের আরও গভীরে। বেটোফেন জরমন হয়েও জরমনদের বহু ঊর্ধ্বে—তাঁর সংগীত মানুষকে তুলে নিয়ে যায় নভঃলোকে, যেখানে ক্ষুদ্র-নীচ শভিনিজম পৌঁছতে পারে না। একদা তিনি তাঁরই মত মহামানব কবি গ্যোটেকে বলেছিলেন, 'আপনি আমি দেবদূত : আমাদের কাজ—মাটির মানুষকে স্বর্গলোকের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া[১]।'

---

১ দুঃখের বিষয়, মূল পাঠটি আমার কাছে নেই। উভয় মহাপুরুষের পরিচয় হয় কারলস বাড-এ (চেক নাম Karlovy Vary)। ছোট গলির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে উভয়ের দেখা হয় জনা দু-তিন রাজপুত্রের সঙ্গে। গ্যোটে সসম্মানে তাঁদের পথ ছেড়ে দেন। বেটোফেন পাগলা ষাঁড়ের মত সোজা চলতে থাকলে রাজপুত্ররা সবিনয় তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যান।

রলাঁ যে বেটোফেনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটাকে মডার্ন উন্নাসিক 'ইসকেপিজম, পলায়নী-মনোবৃত্তি' নাম দিয়ে সস্তায় কিস্তিমাত করবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, রলাঁ অবগাহন করতে নেমেছিলেন সুরগঙ্গায় ক্লান্ত দেহমন স্নিগ্ধ করে নিয়ে পুনরায় তাঁর কর্তব্য-কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য। তিনি গঙ্গা নদীর মীন হয়ে ইস্‌কেপিজমের নদীগর্ভে বিলীন হতে চাননি।

*   *   *

আঁদ্রে জিদ-এর কপালে ছিল নিদারুণতর দুর্দৈব। তিনিও জাতি-ধর্ম-দেশের ঊর্ধ্বে বিরাজ করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রলাঁ যেরকম আশু দুর্যোগের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনিও তেমনি পেয়েছিলেন দ্বিতীয়ের পূর্বাভাস। যুদ্ধ লাগার পর তাঁকে যখন বেতারে প্রোপাগান্ডা করতে বলা হল, তিনি অসম্মতি জানালেন। দেশকে ভালোবাসতেন রলাঁ, জিদ উভয়েই, কিন্তু যে স্থূল পদ্ধতিতে অশ্রাব্য কটু ভাষণে যুদ্ধের সময় এক জাতি অন্য জাতিকে গালাগাল দেয়, স্পর্শকাতর বিশ্ব-নাগরিক এবং সর্বোপরি বিদগ্ধ কলাকার জিদ তার সঙ্গে সুর মেলাবেন কি করে! জিদ তাঁর জুরনালে (রোজনামচাতে) লিখছেন, নঁ, দেসিদেমাঁ, জ্য ন্য পারলরে পা আ লা রাদিয়ো—'না, আমার স্থির সিদ্ধান্ত, আমি বেতারে বক্তৃতা দেব না।...খবরের কাগজগুলো এমনিতেই যথেষ্ট দেশপ্রেমের ঘেউ-ঘেউয়ে ভর্তি। নিজেকে যতই ফরাসী বলে অনুভব করি ততই আমার ঘেন্না করে।' এর পর জিদ বড় সুন্দর করে বলেছেন, তিনি নিজেকে যেভাবে ফরাসী মনে করে গর্ব অনুভব করেন, এই স্থূল পদ্ধতির সঙ্গে তো তার কোনও মিল নেই।

জিদের স্মরণে এল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়কার কথা। তখন কিছু লোক এমনই হাস্যকর 'প্রচারকার্য' আরম্ভ করে যে, তখনকার দিনের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক ল্যুসিআঁ জাক্ বলেন, 'চুপ করে থাকাটা কি তবে এমনই কঠিন?'—'সে দঁক্ সি দিফিসিল দ্য স্য ত্যার?'

তারপর জিদ বলছেন, 'কিন্তু হৃদয় যখন ফেটে পড়তে চায়, তখন নীরব থাকাটা যে বড়ই বেদনাময়।' এটা স্বীকার করে তিনি শেষ করেছেন এই বলে 'কিন্তু আমি তো চাই নে আজ এমন কিছু লিখতে, যার জন্য কাল আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়'!

এই সময় জিদ পড়ছেন জরমন কবি ও ঔপন্যাসিক আইসেনডরফের বই 'নিষ্কর্মা';

অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে যেতে লাগল জিদের চোখের সম্মুখে। অবিশ্বাস্য মনে হল বিশ্বজনের কাছে যে, নেপোলিয়নের দেশ ফ্রান্স মাত্র পাঁচ-ছয় সপ্তাহের একতরফা যুদ্ধের পর—বস্তুত ফ্রান্স একবার মাত্রও পুরো জোর হামলা করতে পারেনি!—বিজয়ী জরমনির পদতলে লুণ্ঠিত হল।

জিদ বলছেন, 'শত্রু যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী, তখন তার কাছে পরাজিত হওয়াতে নিশ্চয়ই কোনও লজ্জা নেই; এবং আমিও কোনও লজ্জা অনুভব করি নে। কিন্তু যখন

গলির শেষে পৌঁছে বেটোফেন প্রতীক্ষা করেন গ্যোটের জন্য। তিনি পৌঁছলে পর রাজপুত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, 'এরা কারা? আপনি আমি দেবদূত—ইত্যাদি।' সমস্ত ঘটনাটিই হয়তো কিংবদন্তীমূলক। এর একাধিক 'পাঠ' (ভারসন) আমি কারলস বাডে বাসকালীন শুনেছি। তবে রলাঁও তাঁর বেটোফেন-গ্যোটে সম্বন্ধে পুস্তকে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

ভাবি আমরা কি-সব স্তোকবাক্যের উপর নির্ভর করে কর্তব্য-কর্ম অবহেলা করে পরাজয় ডেকে এনেছি—তখন যে গভীর বেদনা অনুভব করি সেটা ভাষাতে প্রকাশ করতে পারিনে, অস্পষ্ট মূর্খ আদর্শবাদ, প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মোহাচ্ছন্ন অপরিচয়, অপরিণামদর্শিতা, মূর্খের মত অর্থহীন এমন সব বাগাড়ম্বর অন্ধবিশ্বাস—যার মূল্য আছে শুধু অপোগণ্ডের কল্পরাজ্যে।'

নিরঙ্কুশ পরাজয়ের পরের দিন জিদ লিখছেন :

'একমাত্র গ্যোটের সঙ্গে কথোপথনই আমাকে দুশ্চিন্তার এই মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি এনে দেয়'—

'Seules les Conversations avec Goethe parviennent a distraire un pea ma pensee de Pangoisse.'

পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথন, 'Conversation with Goethe' (মূল জরমনে Gaspraecche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens'.)

গ্যোটে সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক অত্যুত্তম 'জীবিত' জীবনী লিখেছেন গ্যোটে সখা এবং শিষ্য একেরমান (অনেকটা 'শ্রীম')। কথোপকথন হয়েছে গ্যোটে এবং একেরমানে। অথচ জিদ ইচ্ছে করে এমনভাবে বাক্যটি রচনা করেছেন যে মনে হয় তিনি, জিদ-ই, যেন স্বয়ং কথাবার্তা বলছেন জরমন মহাকবি ঋষি গ্যোটের সঙ্গে, ইঙ্গিত করছেন, তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ঋষির বাণী, তাঁর কণ্ঠস্বর। দুশ্চিন্তার বিভীষিকায় যে-টুকু সান্ত্বনা তিনি আদৌ পাচ্ছেন সেটি তাঁরই কাছ থেকে।

জিদ ঋষি নন—গ্যোটের মত। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সের গ্রাঁম্যৎর্—গ্র্যান্ড্ মাস্টার—অর্থাৎ ফ্রান্সের পথদ্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট। সেই ফরাসী সম্রাট সঞ্জীবনী সান্ত্বনা নিচ্ছেন—যে জরমনি নির্মমভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে তারবিনী ফ্রান্সকে, তারই ঋষি কবির কাছ থেকে!

* * *

মিশরের আড্ডা সম্বন্ধে পক্ষাধিককাল পূর্বে যখন লিখি তখন কল্পনাও করতে পারিনি, এই মিশরেই দু-পাঁচদিনের ভিতর লেগে যাবে জীবনমরণ সংগ্রাম। সেই আড্ডাতে যিনি ছিলেন আমাদের 'কবিসম্রাট' তাঁর কবিতা পড়লে মনে হত তিনি যেন ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের বেদুইন ভাট। কথায় কথায় 'বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন', 'ছুটছে ঘোড়া উড়ছে বালি' আর জাত ইহুদি ইব্রাহিমের পুত্র মিশররাজ ইউসুফ ও জোলেখার সাহারার উষ্ণশ্বাসভরা নীলনদের দুকূল-ভাঙা প্রেম।[১] আলট্রা মডারন কাইরো শহরের শিক্ পশ্ কাফের বাতাবরণে আমাদের কবিরাজ আহমদ ইবন শহরস্তানী অল্-মুকদ্দসী যখন তার সেই ফারাও যুগের প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো, তখন আমার মনে হত এ রস রোমান্টিক, ক্লাসিক, এপিক, বৈদিক, প্রাগৈতিহাসিক সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়ে সোজা বেআন্তারিটাসে পৌঁছে গেছে। কবিও তাই চাইতেন।

---

১ আমরা যে গ্রন্থকে ওলড টেস্টামেন্ট বলি সেইটেই ইহুদিদের 'তৌরা' ইত্যাদি। সেসব গ্রন্থে বর্ণিত অনেক পয়গম্বর কুরানেও বর্ণিত হয়েছেন। ইউসুফ তাঁদের একজন। নজরুল ইসলাম হাফিজের অনুবাদ করেছেন :

দুঃখ করো না, হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে!

আমাদের মুকদ্দসী কিন্তু আর্ট্ কি, অলঙ্কার কাকে বলে, আর্ট্ অনুভূতিপ্রধান না তাতে অন্য কোনও মনোবৃত্তি চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করতে পারে কিনা সে নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইতো না, পারতোও না। এ কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। মা-ঠাকুরমার রূপকথা শুনে আমরা, হ্যাঁ, বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে ভাবি, রূপকথা কল্পনা করার, তাকে অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করার রহস্যটা কোন্‌খানে। প্রশ্ন শুধিয়ে দেখি ঠাকুরমাও জানেন না। মুকদ্দসীর বেলাও হুবহু তাই।

শুধু একটি কথা মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে দোলাতে বলতো, কবি হওয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে হে, কবি হওয়ার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সে মূল্য কিন্তু অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোনও-কিছুর মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা যায় না। কোন্ এক ইরানী কবি নাকি পেয়েছিলেন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, দান্তে পেয়েছিলেন বেয়াৎরিচের কাছ থেকে একটি ফুল, কিংবা কি জানি, কার ঠোঁটের কোণে স্বীকৃতির একটুখানি স্মিতহাস্য, কি জানি—।'

* * *

কবি মুকদ্দসী বড় স্পর্শকাতর। সে আরব। ইহুদিদের কাছে তারা নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। তাকে চিঠি লিখেছি, 'সখা তুমি ইহুদিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিষ হাইনে পড়ো।'

* * *

যে একেরমান গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথনের বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন তিনি ছাত্রাবস্থায় গ্যোটিঙেন শহরে হাইনের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এক জহুরিকে চিনতে অন্য জহুরির বেশীক্ষণ সময় লাগেনি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই হাইনের সরল মধুর কবিতা জরমনির সর্বত্র খ্যাতিলাভ করে। অতিশয় সাধারণ জন-দফতরের কেরানী, ম্যাট্রিকের মেয়ে, ছাপাখানার ছোকরা—তাকে যেন দু বাহু মেলে আলিঙ্গন করে নেয়। আর ওদিকে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলঙ্কারিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফন্ শ্লেগেল তো তাকে প্রথম দিনই বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন একেরমান; ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। তারপর সেটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যোটিঙেন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের পথ—লানট্‌ভের বিয়েরগারটেন। খোলামেলাতে বিয়ারের আড্ডা। রববার দিন গ্যোটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে এসে জালা জালা বিয়ার খায়, হইহুল্লোড় করে, আর নৃত্যগীত তো লেগেই আছে।

একেরমান, হাইনে এবং কলেজের আরও কয়েকজন ইয়ার বক্‌সী গেছেন সেখানে ফুর্তি করতে।

হাইনে আগের থেকেই মৌজে—বোধ হয় হামবুর্গের ব্যাঙ্কার কাকার কাছ থেকে বেশ কিছু পেয়েছেন।[1] তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর আনন্দোল্লাসের লাগাম—বাক্যস্রোত ছুটেছে

১ টাকাকড়ি বাবদে হাইনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী। তিনি স্বয়ং এক জায়গায় লিখেছেন, কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

তুরুক সোওয়ারের মত। বিয়ার তাদের টেবিলে নিয়ে এসেছে পাব্-এর খাবসুরুত কোমলাঙ্গী তরুণী লটে (Lotte), হাইনে ফুর্তির চোটে জড়িয়ে ধরেছেন সুন্দরী লটেকে। কিন্তু একেরমান ও অন্যান্য ইয়াররা পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, এই লটেটি বিয়ার-খানার আর পাঁচটা বার্-গার্লের মত ঢলাঢলির পাত্রী নয়। রাগে তার বাঁশীর মত নাকের ডগাটি হয়ে গেছে টুকটুকে রাঙা, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের হল্কা, আর সে এমনই ধস্তাধস্তি আর পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়তে আরম্ভ করেছে যে ইয়ারগোষ্ঠী কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছেন। হাইনে ওটা মস্করা হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু একটু পরেই কি যেন ভেবে অপ্রতিভ হয়ে চুপ মেরে গেলেন—যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।[১]

পরের সপ্তাহে একেরমানরা যখন হাইনেকে তুলে নিয়ে এলেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে কবুল নারাজ। শেষটায় একরকম গায়ের জোরে জাবড়ে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলতে হল।

কাফেতে আসন নিয়ে হাইনে মাথা হেঁট করে রইলেন চুপ। ঘাড় তুলে মেয়েটির দিকে তাকাবার মত সাহস পর্যন্ত তাঁর নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য! লটে স্বয়ং এসে উপস্থিত হাইনেদের টেবিলে। মধুর হাসি হেসে হাইনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালে। ইয়ার-দোস্তরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লটে হাইনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার উপর রাগ করবেন না, স্যর। আপনি অন্য ছাত্রদের মত নন। আমি আপনার কবিতা পড়েছি। কী সুন্দর! কী সুন্দর!! আপনার যদি ইচ্ছে যায়, তবে এই সব ভদ্রলোকের সামনাসামনি আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন —কিন্তু ঐসব মধুর কবিতা আপনাকে রচনা করে যেতেই হবে।'

বলেই লটে তার গাল বাড়িয়ে দিলে হাইনের দিকে।

আর হাইনে?—কে জানতো হাইনের মত সপ্রতিভ লোকও লজ্জায় লাল হয়ে যেতে পারেন—লজ্জায় লাল হয়ে তিনি চুমো খেলেন।

একেরমান বলেছেন, 'লক্ষ্য করলুম (নটবর) বন্ধু স্পিটা হিংসেয় একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।'

* * *

হাইনের চোখ দুটি ভিজে গিয়েছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এ জীবনে এর চেয়ে সুখী আমি আর কখনও হইনি। এই আমি প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলুম, কবি হওয়ার মূল্য আছে, কবি হওয়া সার্থক।'

* * *

সখা মুকদ্দসী, কবি হওয়া সার্থক!

---

১ কনটিনেনটের ছাত্র-পাবে এ ঘটনা নিত্য নিত্য ঘটে। কেউ বড় একটা সিরিয়াসলি নেয় না। চেঁচামেচিটা অনেক ক্ষেত্রেই 'ন্যাকরা' বলে ধরা হয়।

'সাঙ্গ হয়েছে রণ—'

রবীন্দ্রনাথ

এ-রণ সাঙ্গ হয়নি। সবে আরম্ভ মাত্র। কত শতাব্দী ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। কিংবা, কত হাজার বছর ধরে। 'হাজার বছর ধরে' বলছি ভেবেচিন্তেই। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জাত আপন রাষ্ট্র আপন স্বাধীনতা হারায়। সেই সময় থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ফলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জনসংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে দশের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ১৯১৯/২০ থেকে পুনরায় ইহুদিদের বহু লোক প্যালেস্টাইনে ফিরে আসতে লাগলো। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে (ইহুদি গণনায় ৫৭০৮ সালে—অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে) ইউনাইটেড নেশনসের অনুশাসনানুসারে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের একাংশ নিয়ে ইজরাএল রাষ্ট্র (Ercz Jissrael) গঠিত হয়। অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর লাগলো একটা মৃত রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তাই এ রাষ্ট্র যদি আবার লোপ পায় তবে হয়তো লাগবে আরও হাজার দুই তাকে পুনরায় প্রাণ দিতে। তাই গোড়াতেই বলেছি, এ সংগ্রাম হয়তো চলবে আরও কয়েক হাজার বছর ধরে।

কিন্তু প্রশ্ন, এ-রাষ্ট্র কি আবার লোপ পেতে পারে? অতি ক্ষুদ্র যে রাষ্ট্র এতগুলো বিরাট বিরাট আরব রাষ্ট্রকে চারদিনের ভিতর চূড়ান্ত পরাজয় দিল (বস্তুত এক ঘণ্টার ভিতরেই আরবশক্তির চোদ্দ আনা জঙ্গী বিমান নষ্ট হয়, এবং ফলে আরবরা কোনও যুদ্ধক্ষেত্রেই সামান্যতম সার্থক আক্রমণ চালাতে পারেনি) সে কি কস্মিনকালেও এদের কাছে পরাজিত হবে? অবিশ্বাস্য।

মাত্র একটি যোগাযোগের ফলে এ বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং উপস্থিত আরবরা যে সন্ধিপত্রেই দস্তখৎ করুক না কেন, তারা সেই মহালগনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনবে।

সকলেই জানেন, আরব ইজরাএল দুই পক্ষই লড়েছেন পশ্চিমাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কোনওদিন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় (এবারে আব্দুন নাসির তাই চেয়েছিলেন কিন্তু রুশ তাঁকে ডোবাল) তবে ইজরাএলের সর্ব সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কি খাদ্যশস্যও। মিশর ইরাক তখন লড়বে অনেকটা রুশ যে রকম হিটলারের সঙ্গে লড়েছিল। ইরাক জরডন হটে হটে যতদূর খুশি যেতে পারে, মিশরের বেলাও তাই। আরব বাহিনী হুবহু রুশদের মতই কোনও জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কিছুতেই বিধ্বস্ত হতে দেবে না। এবারেও কোনও কোনও আরব রাষ্ট্র মিশরকে এই ট্যাকটিক বরণ করতে বলেছিল। কিন্তু নাসের জানতেন, ইজরাএল কালক্রমে যদি পরাজয়ের সম্মুখীনও হয় তবে মার্কিনিংরেজ শেষ মুহূর্ত তার পক্ষে নামবেই। আর ইতিমধ্যে প্লেন, তেল বোমার সাপলাই তো চালু থাকবেই। তাই ভবিষ্যতে আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ শুধু তখনই ইজরাএল আক্রমণ করবে যখন গোড়াতেই দেখবে মার্কিনিংরেজ রুশ বা চীনের কিংবা উভয়ের সঙ্গে 'মরণ আলিঙ্গনে/কণ্ঠ পাকড়ি ধরেছে আঁকড়ি /দুইজনা দুইজনে। তখন ইজরাএলের সাহায্যের জন্য এরা কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবে না। ইজরাএল অবশ্যই তার প্রতি-ব্যবস্থা বছরের পর বছর করে যাবে, কিন্তু যুদ্ধবিশারদ তথা অর্থনৈতিক

বিশেষজ্ঞরা বলেন : ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র যার লোকবল যৎসামান্যেরও কম, যার প্রায় তাবৎ 'উপার্জন' বিশ্ব ইহুদি সংঘের দান-খয়রাত থেকে, যার আপন উৎপাদনী শক্তি প্রয়োজন মেটানোর চেয়েও ঢের ঢের কম তার পক্ষে এহেন অর্থনৈতিক পলিসি আত্মহত্যার শামিল। তাই আজ থেকে আরব ঠিক এইটেই কামনা করছে।

আর আরব সম্পূর্ণ নিরাশ হবেই বা কেন? ক্রুসেডের সময় আরবভূমির এক ক্ষুদ্রাংশ তিনশ' বছর ধরে লড়েছে পোপের নেতৃত্বে জমায়েত তাবৎ ইয়োরোপের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা হোলিল্যান্ড ত্যাগ করে ফিরে যান যাঁর যাঁর দেশে—পোপের কাতর ক্রন্দন, তীব্র অভিসম্পাত উপেক্ষা করে। ইহুদি যদি দু হাজার বছরের মড়া রাষ্ট্রের প্রাণ দিতে পারে, তবে আরবই বা তার মাত্র এক হাজার বছরের পুরনো রাষ্ট্রশক্তিকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না কেন?

তা হলে প্রশ্ন, এ সমস্যার কি কোনও সমাধান নেই?

আছে হয়তো। কিন্তু যে-সমাধান এক পক্ষ কিছুতেই স্বীকার করবে না সেটাকে সমাধান বলি কি প্রকারে? তবু দেখা যাক।

যুদ্ধবিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই মারকিনিংরেজের শুধু একটি চিন্তা : এই যে আরববলদের মড়াটা পড়েছে পায়ের কাছে এর কতটা অংশ পাব আমি—সিংহ-আন্‌কল-স্যাম, কতটা পাবে জনবুল-নেকড়ে, আর কতটা পাবে ইহুদিফেউ?—যদ্যপি বেচারী ফেউটাই এস্থলে করেছে লড়াই। কিন্তু সে ফালতো জমিজমা নিয়ে করবে কি? অত ইহুদি পাবে কোথায়? হাতের চেয়ে যে আঁব বড় হয়ে যাবে! আর সে যদি নিতে চায়, নিক। আমরা নেব সীনা, গুর্দা, কলিজা! শাঁসালো বস্তু। সেগুলো কি, এখখুনি নিবেদন করছি।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বি বি সি যুদ্ধবিরতির প্রথম খবর দেবার ঠিক আট মিনিট দশ সেকেন্ড পর একটি talk-টিপ্পনী বেতারিত করলে। বক্তা ইংরেজ ইহুদি কিনা জানি নে; তাকে ইহুদি বলে ধরে নিয়ে আমি ইহুদিজাতকে অপমান করতে চাই নে।

নাকি-নাকি ন্যাকা সুরে নিজের স্বার্থ যতখানি গোপন করা যায় তাই করে—এবং ইংরিজী ভাষা যে ভণ্ডামির জন্য প্রকৃষ্টতম ভাষা সে-কথা যে-হটেনটট্ সাত অবধি গুনতে পারে না সেও জানে—যা বললেন তার বিগলিতার্থ, 'এ-রকম লড়াই বড়ই খারাপ, বড়ই খারাপ। এরকম ফের হতে দেওয়া উচিত নয়, উচিত নয়। এই দেখুন না, এরই ফলে আরব জাত বন্ধ করে দিলে সুয়েজ খাল—বলুন তো আমাদের জাহাজ চলাচল করবে কি করে? আবার কসম খেয়ে বসলো, তেল বেচবে না আমাদের কাছে—ওঃ! আমাদের বাস্-কারখানা তা হলে চলবে কি করে! আর গালফ্-অব-আকাবা, শর্‌ম্-উশ্-শেখ সে তো বটেই বটেই। অতএব এ-হেন অঘটন যাতে পুনরায় না ঘটে তার জন্য (ক) সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক কনট্রলে নিয়ে নাও, (খ) তাবৎ আরবভূমির তেলেরও এমন ব্যবস্থা করো যাতে করে আসছে দুর্যোগে আরব জাত বস্তুটা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারে এবং (গ)—কিন্তু 'গ'—অর্থাৎ গাল্‌ফ্ অব আকাবা সম্বন্ধে টীকাকারের উৎসাহ কম কারণ সেখানে প্রধান স্বার্থ ইজরাএলের। এর অর্থ কি? সুয়েজ খাল কনট্রলে এলে ইংরেজকে মাশুল বাবদ এক পৌণ্ডের জায়গায় দিতে হবে একটি ফার্দিং (ও! ফার্দিং বুঝি অধুনা দুর্লভ? তা সেটা দারুণ স্বার্থত্যাগ করে ফের টাঁকশালে বানাতে হবে বই কি! Oh Albion! Consider thy historical self-sacrifice!)। তেল কনট্রলে এলে হয় কোনও রয়েলটিই দেব না, নয় ঐ দু'একটা ফার্দিং থ্রোন টু দি অ্যারাব-বয়!

লড়াই করে ম'লো ইজরাএল আর লুটের বেলা এলবিয়ন। এর ঠিক উল্টোটাকে বাঙলায় বলে—হায়, বাঙলা বড়ই নাঈফ শিশুর আধো-আধো ভাষা, ও নিয়ে আদৌ ভণ্ডামি করা যায় না—'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবদ্দন।' এস্থলে ইজরাএল আগেভাগেই বিকার করে বসে আছে, এবারে দই খাবেন গোবদ্দন ইংরেজ মহাজন। তবে এর মধ্যে একটুখানি আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অ্যাদ্দিন ইংরেজ 'বিজিনেস' বা শপ্-লিফটিং করেছেন অগা ভারতীয়দের সঙ্গে, শিশু নিগ্রোদের সঙ্গে, ক্যাবলাকান্ত আরবদের সঙ্গে, এবারে চাচা, নয়া ওঝার নয়া নয়া খেল। এরা আণ্ডা না ভেঙে মামলেট বানাতে পারে, দেখলে না, নেই নেই তো নেই, সেই নেই নেই থেকে দ্যাখ তো না দ্যাখ একটা নয়া চনমনে সমুচ্চ রাষ্ট্র ইজরাএল পয়দা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে ফেললে, তোমাদের আড়াই হাজার বছরের পুরনো পদার্থবিদ্যা দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ something cannot come out of nothing আগাপাস্তলা ভুল, বিলকুল ভণ্ডুল। জানি তোমরা 'হর্স্ ডীল' বা 'ঘোড়া বিক্রি'র জন্য পাঠাবে তোমাদের ঝানু ঝানু স্কটস্ম্যানদের কিন্তু ওদের খোঁয়াড়েও আছে গণ্ডায় গণ্ডায় ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু স্কটিশ জু—যারা ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ পুরুষ স্কটল্যান্ডে জন্মমৃত্যু বিবাহ সেরে স্কটস্ম্যানদের চুষেছে এবং চুষে ভর্তি পকেটে হুইসিল দিতে দিতে পর্শুদিন এই হেথা ইজরাএলে এসেছে। তোমরা যদি সুয়েজখালে 'নাও চল কইরা দু পয়সা কামাও তবে ইহুদি গোপাল সেখানে স্রেফ ঢেউ গুনে দু আঁজি।'

কিন্তু এ সবেতে কিছু যায় আসে না। সুয়েজ, শরম্ উশ্-শেখ, তেল এ সব নিয়ে আরব লেনদেন করতে হরবকৎ তৈরি। এস্তেক—আমার বিশ্বাস—ইজরাএলের চতুর্দিকের জমাজমি নিয়েও সে দরদস্তুর করতে রাজী আছে, কিন্তু তার একটি মাত্র শর্ত মেনে নিতে হবে।

সে শর্তটি : যে-সব আরব চাষা জেলেদের প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইজরাএল তৈরি করেছ তাদের ফিরিয়ে নিয়ে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে হবে।

ইহুদিদের প্যারিস তেল-আভিভ শহর হেসে গড়াগড়ি দেবে। তা কখনও হয়!

উত্তরে আরব বলে, 'কেন হবে না? তেরশ' বছর নয়, তারও বহুপূর্বের থেকে আরব ইহুদি পাশাপাশি বাস করেছে। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ ইহুদিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। নিউ টেস্টামেন্টে পাই, ইহুদিরা প্রভু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে এবং তারই ফলস্বরূপ যুগ যুগ ধরে খ্রীষ্টানরা তোমাদের অত্যাচার করেছে, এখনও কোনও কোনও দেশে করে—আর হিটলারের কথা তুলবো না, সে তো বিশ্বজন জানে। অথচ কুরান শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রভু যীশু আদৌ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায়নি। যে কলঙ্ক থেকে আমাদের নির্ভুল আপ্তবাক্য কুরান শরীফ তেরশ' বছর পূর্বে তোমাদের বেকসুর মুক্তি দিয়েছে, সেই কলঙ্ক থেকে খ্রীষ্টানদের প্রতিভূ হিজ হোলিনিস পোপ তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন বছর দুই হয় কি না হয়। গ্রীক অর্থডক্স, কপ্ট্, লুথেরিয়ান ইত্যাদি চার্চ এখনও দেয়নি। অর্থাৎ প্রায় এক হাজার ন' শ' ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর সর্ব খ্রীষ্টান তোমাদের অপরাধী ধরে নিয়ে যেখানে সেখানে ঠেঙিয়েছে। তোমাদের নামে কুৎসিত কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রটিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এক বিশেষ পরবের দিনে একটি নিষ্পাপ খ্রীষ্টান শিশুর গলা কেটে তার রক্তপান করাটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্য বলে স্বীকার করো।[১]

---

১ দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে নিবেদন, চসার বোধ হয় ঐ ধরনের একটি

খ্রীষ্টানদের এই ইহুদি বিদ্বেষের জন্য বিশেষ ইংরিজী শব্দ 'এন্‌টি সেমিটিজম'। এবং এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইংরিজী ভাষা জরমন থেকে নিয়েছে 'যুডেনহেৎসে', সুদূর রুশ থেকে নিয়েছে 'পগ্রম'। আরবীতে সে রকম কোনও শব্দ আছে, না আমরা তোমাদের উপর কখনও কোনও অত্যাচার করেছি? বস্তুত আমাদের নবী মদ খাওয়া এবং সুদ নেওয়া বারণ করে দেওয়াতে এ দুটো মুনাফার ব্যবসা তোমরা একচেটে চালিয়েছ তেরশ' বছর ধরে তামাম মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। এই যে ১৯১৯ থেকে তোমরা মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের বার বার তোমাদের হোলি ল্যান্ডে নিমন্ত্রণ জানিয়েছ তাদের সবাই এসেছে?[২] এই গত যুদ্ধের সময়ও আমরা কোনও কোনও জায়গায় বিশেষ পুলিস মোতায়েন করেছি পাছে উত্তেজিত জনতা তাদের মারধোর করে। আর তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে তো আমরা জেরুজালেম দখল করিনি। লড়াই হয়েছিল খ্রীষ্টানদের সঙ্গে। শত্রু যদি আমাদের কেউ থাকে তবে সে খ্রীষ্টান। অথচ এই খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমরা সম্মিলিতভাবে অক্লেশে লেবাননে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।

'তোমরাই বা আমাদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বাস করতে পারবে না কেন?'

অসম্ভব! অসম্ভব! ইহুদি জানে সে আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলে যে নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্ন গড়েছে সে রাজ্য দাউদ (ডেভিড) সুলেমানের রাজ্যের হুবহু ফোটোগ্রাফ। সে রাজ্য পূত-পবিত্র। তাতে কোনও বিধর্মী নেই। যারা ছিল তাদের বহু পূর্বেই নির্মূল করা হয়েছে। সলমনের গ্লরি তো তার বিধর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নির্মিত হয়নি। এসব প্রস্তাব শুনলেই কানে আঙুল দিতে হয়।[৩]

তাই বলেছিলুম, আরব ইহুদি সমস্যার সমাধান কোথায়?

জেরুস্‌লম

আইস, সুশীল পাঠক, যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে যে মেছোহাটার গালাগালি এবং দর কষাকষি হচ্ছে সেগুলো ভুলে গিয়ে পুণ্যভূমি জেরুস্‌লমে তীর্থ করতে যাই।

নিষ্পাপ বালকের কাহিনী লিখেছেন। ইহুদিরা নাকি তার গলা পুরোপুরি কেটে ফেলতে পারেনি বলে সে বেঁচে যায় ও তার করুণ কাহিনী খ্রীষ্টানদের সামনে বর্ণনা করে।

২ আসলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইজরাএল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন ইহুদিরা সে রাজ্যের চাষীদের সঙ্গীনের খোঁচায় তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের জমিতে বিদেশাগত জাতভাইদের বসালে তখন ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদিতে (মিশর ও উত্তর আফরিকায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম) আরবরা সেখানকার ইহুদি বাসিন্দাদের উপর দাদ তুলতে লাগলো। ফলে বাধ্য হয়ে এরা ইজরাএলে চলে যেতে লাগলো।

৩ অতীতের কোনও বিশেষ পূত পবিত্র যুগে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাটা ইহুদিদের একচেটে নয়। মুসলমানদের ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন এককালে তাই চাইত। অবশ্য তাদের প্রোগ্রামে বিধর্মীদের খেদাবার ব্যবস্থা নেই। কারণ তাহলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য লোক পাবে কোথায়? শুনেছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দও বৈদিক যুগ পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন কিন্তু সেই ধর্মরাজ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের 'শুদ্ধি' করে নেবার ব্যবস্থা ছিল ('ব্রাত্য' ব্যবস্থা তুলনীয়)। এটাকেই যখন 'বিজ্ঞান'সম্মত পদ্ধতিতে পেশ করা হয় তখন তার জিগির "Back to nature!"

অতি প্রাচীন নগর জেরূসলম। খ্রীষ্টের দু'হাজার বছর পূর্বে জেরূস্‌লম মিশরীয়দের অধীনে ছিল। তখন তার নাম ছিল উরূসালিম্‌মু ('শান্তিনিকেতন' ত্রাণদুর্গ)। পরবর্তী রোমানযুগে রাজা হাদ্‌রিআন এর নাম দেন অ্যালিয়া কাপিতলিনা। খ্রীষ্টের প্রায় দেড়শ' বছর পর থেকে ইহুদিরা দলে দলে, কখনও রোমানদের দাসরূপে কখনও বা স্বেচ্ছায় জেরূস্‌লম ত্যাগ করে।[১] ঐ সময় থেকে সে নগরী আর ইহুদি ধর্মের কেন্দ্রভূমি হয়ে রইল না। সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় খলীফা ওমরের আমলে যখন মক্কামদীনার আরবরা এ নগর দখল করে তখন শহরের ৯৫% বাসিন্দা খ্রীষ্টান। এবারে প্রায় সকলেই ধীরে ধীরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কামদীনা ত্যাগ করে যে সব আরব এখানে আসে তাদের সংখ্যা ১%-ও হবে না। যে ৯৫% মুসলমান হয়ে যায় তারা যুগ যুগ ধরে জেরূস্‌লম তথা প্যালেস্‌টাইনের (আরবীতে ফলস্‌তীন) আদিমতম বাসিন্দা (বস্তুত ইহুদিরা বাইরের থেকে এসে এদেশ জয় করে) এবং ইহুদি কর্তৃক যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হয়েও আপন ধর্ম ত্যাগ করেনি, পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টান হয়ে যায় এবং সর্বশেষে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী সেনাপতি ইংরেজ লর্‌ড অ্যালেন্‌বি যখন প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেন[২] তখন সেখানে শতকরা ৮৫ মুসলমান, ১০ খ্রীষ্টান ও ৫ জন ইহুদি। সে ইহুদিরা ততদিনে ধর্ম ছাড়া সর্ব বাবদে আরব হয়ে গিয়েছে—হিব্রু ভাষা বলতে পারে না, বলে আরবী। একাধিকজন কবিতা লিখে আরবী সাহিত্যে সেরা লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছেন।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাজত্ব কায়েম হয়ে 'ইজরেএল' (আরবীতে ইসরাঈল) নাম ধরার তেরো বছর পূর্বে, অর্থাৎ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি একদিন কুদ্‌স (জেরূস্‌লমের আরবী নাম) শহরের নাগরপ্রাচীরের বাইরে দূর যাত্রীর বাস্‌-স্ট্যান্‌ডে দাঁড়িয়ে আছি, তোরঙ্গটি মাটিতে রেখে। বাসনা, যাব ন্যাজরিথ (নাজরেৎ, আরবীতে অর্থাৎ বর্তমান যুগে প্রচলিত নাম 'অন-নসীরা'—আদি যুগের খ্রীষ্টানদের ঐ নাম থেকে 'ন্যাজরীন' নামে ডাকা হত। মুসলমানরা আজও ওদের 'নসারা' নামে পরিচয় দেয়) যেখানে প্রভু যীশু বাল্যকাল কাটান, মা মেরি (আরবীতে 'মরিয়ম') যে কুয়ো থেকে জল আনতে যেতেন সেটা নাকি তখনও আছে! আরও নাকি আছে, মা-মেরির বর জোসিফ-এর (আরবীতে ইউসুফ) ছুতোর কারখানা। ইনি যীশুর পিতা নন। কারণ প্রভুর জন্ম হয়েছিল কুমারী-গর্ভে, পবিত্র

---

১ পুণ্যনগরী জেরূস্‌লম যে ইহুদিদের একদিন ত্যাগ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা এর প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে ইহুদি প্রফেটরা বার বার ভবিষ্যদ্বাণী করে ইহুদিদের সাবধান করেছেন; তারা কান দেয়নি; আচার-আচরণ বদলায়নি। এই 'বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার' নামই 'ডিসপারসেল', গ্রীক 'দিয়াসপরা'।

২ ইংরেজ অ্যালেন্‌বি যখন জেরূস্‌লম প্রবেশ করেন তখন সে-খবর একজন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যকে দিলে পর সে রীতিমত শঙ্কিত হবে বলে, 'তাই তো! প্রভু খ্রীষ্টের জন্মকালে যে সব মেষপালককে দেবদূত সে-সুসমাচার জানান, তাদের বংশধরদের একটু হুঁশিয়ার করে দিলে হয় না যে—ইংরেজ ভেড়ার পালে ঢুকেছে—মতলবটা ভালো নয়।' 'শপ-লিফ্‌টার ইংরেজ 'শীপ্‌-লিফটিঙে'ও যে কিছু কম যান না সে তত্ত্ব আউসি বিলক্ষণ জানতো। তার হুঁশিয়ারি কিন্তু পরবর্তী যুগে টায় টায় ফলেনি। ইংরেজ যখন দেখলে যে সে 'নেটিভদের' সঙ্গে পেরে উঠবে না, তখন তাদের পিছনে ইহুদিদের লেলিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর ইহুদি যে শুধু ভেড়াগুলো মেরে দিলে তাই নয়, নেটিভদের জর্‌ডনের 'হে-পারে' (আমরা যেরকম বলি পদ্মার হে-পারে) খেদিয়ে দিলে।

আত্মা দ্বারা। নিউ টেস্টামেনট ও কুরান শরীফ, দুই-ই এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, মা-মেরির বর জোসিফ র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ পরিষ্কার করে কাঠে কাঠে জোড়া দিতেন। আর প্রভু যীশু মানুষের চরিত্র পরিষ্কার করে মানুষে মানুষে জোড়া দিতেন। যে স্যামারিটানদের প্রভু যীশুর গোষ্ঠী এবং তাঁর কট্টর ইহুদি সম্প্রদায়ের শিষ্যরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না তিনি করেছেন তাদের প্রশংসা—গুড স্যামারিটান। এই স্যামারিটানরাও ইহুদি, কিন্তু যেসব ইহুদিরা ইজরাএল সৃষ্টি করেছে এদের সঙ্গে স্যামরিটানদের দ্বন্দ্ব চলেছে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে। জেরুস্লমে প্রতিষ্ঠিত রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) মন্দির যে ইহুদির পরমেশ্বর য়াহভের (জেহোভা, ইলোহিম) পীঠস্থল একথা স্বীকার করেনি। আজ সেখানে নাবলুস শহর (বাইবেলের 'শেখেম') তারই পাশে গেরিজিম পাহাড়ের উপর ছিল তাদের আপন মন্দির।[১]

একদা এই স্যামারিটান জাতি সংখ্যায়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে মূল ইজরাএলিদের চেয়ে কোনও অংশে হীন ছিল না। তাবৎ ইহুদি যখন প্যালেস্টাইন পরিত্যাগ করে তখন শত অত্যাচার সহ্য করে দেশের মাটি কামড়ে ধরে এরা পড়ে থাকে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'স্বগোত্রে' বিবাহের ফলে এদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন মাত্র চারশতে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি যখন পুণ্যভূমিতে যাই তখন দেখি খবরের কাগজে একটা তর্কবিতর্ক চলেছে। যদ্যপি আজ খবর-প্রতিষ্ঠানগুলো বলছেন, স্যামারিটানদের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারশ', আমাকে কিন্তু তখন বলা হয়েছিল প্রায় আশি। খবরের কাগজে আলোচনা হচ্ছে, এই স্যামারিটানদের 'প্রধান রাব্‌বি'-র (পণ্ডিত পুরোহিতের) একমাত্র জোয়ান ব্যাটা—ইনিই পরে প্রধান রাব্‌বি হবেন—'সোমত্ত' হয়েছেন, এখন তাঁকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু

১ এ জায়গাটায় ছিল জরডন এলাকায়। হালে ইজরাএল বাহিনী সেখানে পৌঁছে গেরিজিম মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর ইজরাএলের জাতীয় পতাকা তুলতে গেলে স্যামারিটানদের সঙ্গে হাতাহাতি উপক্রম হয়। পরধর্ম বাবদে ইহুদিরা ঈষৎ অসহিষ্ণু এ তত্ত্বটি ইংরেজ জানতো বলেই ইজরাএল রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৪৮) তারা খ্রীষ্টান মুসলিম গির্জা মসজিদে ভর্তি প্রাচীন জেরুস্লম (ইহুদিদের বিশেষ কোন স্থাপত্য এ শহরে আজ আর নেই, কারণ রাজা হাদরিয়ান শব্দার্থে এ নগরের উপর হাল চালিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ই ইহুদিকুল শেষবারের মত জেরুস্লম পরিত্যাগ করে বলে পরবর্তী যুগে কিছু নির্মাণ করার সুযোগ পায়নি) ইজরাএলের শত মিনতিভরা কাতর রোদনে কর্ণপাত না করে মুসলমান জর্ডনরাজকে দিয়ে দেন। হালের যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইজরাএল যখন প্রাচীন জেরুস্লম অধিকার করে তখন এ-যুগের ইংরেজ লেবার (অর্থাৎ ঐতিহ্যহীন অনভিজ্ঞ) সরকার কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু স্যামারিটানদের মন্দিরে ইজরাএলের ব্যভিচারের খবর ইংলন্ডে পৌঁছনো মাত্রই লেবার-বাবুদের কানে জল গেছে। নিরাপত্তা পরিষদে চিৎকার করে ইংরেজের ফরিনমন্ত্রী ব্রাউন একাধিকবার বলেছেন, ইহুদিকে প্রাচীন জেরুস্লম ছেড়ে দিতেই হবে। এই প্রাচীন নগরের ভিতরে রয়েছে খ্রীষ্টের বিরাট—সত্যই অতি বিরাট—সমাধি। সৌধ (হোলি সেপালকর), গেৎসিমেনের বাগান যেখানে প্রভু যীশুর দেহ থেকে স্বেদের পরিবর্তে রক্ত বেরোয়, মাউন্ট অলিভ এবং ভিয়া দলরসা—যে পথ দিয়ে প্রভু ক্রুশ বহন করে বধ্যভূমিতে পৌঁছন। (মুসলমানদের হরমশরীফ, মসজীদ-উল-আকসা বাদ দিচ্ছি—এগুলোর জন্য ইংরেজের কোনও দরদ না থাকাই স্বাভাবিক)। ইজরাএলের 'সাতিশয় বিবেচক করুণ করে' এগুলো সঁপে দিতে ব্রাউন হিম্মৎ পাচ্ছেন না কিসের হাতে যেন কি সমর্পণ!

হায়, কনে কোথায়? মাসীপিসীদের অর্থাৎ অগম্যাদের বাদ দিলে তিনি যে দুটি বধূকে বিয়ে করতে পারেন তাদের একটির বয়স ষাট এবং তিনি তারস্বরে চিৎকার করে বলেছেন—আমাদের আইবুড়ো জাতকুলীন বৃদ্ধরা যা বলে থাকেন—'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! এখন সাজবো কুনে বউ! কী ঘ্যান্না। কী ঘ্যান্না'। এবং তদুপরি দ্রষ্টব্য, এই বৃদ্ধাকে বিয়ে করলে বংশ রক্ষা হবে না, এবং এ স্থলে সেইটেই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বধূটি বোবাকালা ইডিয়েট। স্যামারিটানরা আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলিদের সঙ্গে বিয়েশাদী করেনি। এখনই বা করে কি প্রকারে? এসব গুল-গ্যাশ আমি শুনেছি প্রাচীন জেরুস্লমের হেরোদ গেটের কাছের (এখানেই ভারতীয় হস্পিস্—সরাইখানা, চট্টি যা খুশী বলুন—অবস্থিত) কাফে—আড্ডাতে। এর শতকরা ৯৯% পাঠক বাদ দিতে পারেন। মোদ্দাটুক্ শুধু এই : যুবক রাব্বিপুত্রের জন্য বিবাহযোগ্যা বধূ সে-কুলে নেই।

অতএব স্থির হল, ঐ জাতশত্রু ইজরাএলি ইহুদিদেরই কোনও মেয়ে বিয়ে করো। হাজার হোক, ওরা তো ইয়াহভে মানে, ধর্মগ্রন্থ পেনটাটয়েশ স্বীকার করে। খ্রীষ্টান, মুসলমান তো আর বাড়িতে তোলা যায় না।

ন্যাজরিথ যাবার পথে পড়ে স্যামারিটানদের নাবলুস; নিশ্চয়ই দেখে যেতে হবে। নিঃসন্দেহে যারা অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ভিটের মাটি (ওঃ! আর সে কী মাটি, বালি পাথরে ভর্তি!) কামড়ে ধরে পড়ে আছে, তারা দ্রষ্টব্য বইকি।

* * *

সে-আমলে প্যালেস্টাইনে চলতো তিন রকমের বাস্। আরব বাস্ ইহুদি বাস্ আর স্টেট বাস্। কাট্যা ফালাইলেও ইহুদি চড়তো না আরবের বাস্ এবং ভাইস্ ভার্সা। দু দলেই চড়তো স্টেট বাস্।

আত্মচিন্তায় নিমগন আমার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়ালো একখানা করকরে নতুন ট্যাক্সি। আরব ড্রাইভারের পাশে দেখি গোটা পাঁচেক মেল-ব্যাগ। পিছনের সীটে জাব্বা জোব্বা পরা ইয়া মানমনোহর গলকম্বল দাড়িওলা দুই রাব্বি। এক রাব্বি পিছনের দরজা খুলে বার বার বলে যাচ্ছেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো'।

আমি ক্ষণে সালাম জানিয়ে, ক্ষণে জোড়-হাতে নমস্কার করে (এটা ভারতীয়দের পেটেন্ট মাল—বিদেশী মাত্রই চেনে!), ক্ষণে ডান হাত বুকের বাঁ দিকের উপর রেখে ঝুঁকে ঝুঁকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'ট্যাক্সিতে যাবার মত কড়ি আমার গ্যাঁটে নেই। আমি যাব বাস্-এ।'

দুই রাব্বি যা বলেছিলেন—আহা কী সুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট বিদগ্ধ নাগরিক আরবী ভাষাতে—তার তাৎপর্য 'কী উৎপাত, কী জ্বালাতন! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। আমরা কি কানা! দেখতে পাচ্ছি নে, তুমি ভিনদেশী? আমরা তো ট্যাক্সিটার সাকুল্যে পিছন দিকটা ভাড়া নিয়েছি। উঠে পড়ো উঠে পড়ো। কী মুশকিল! আচ্ছা বাপু, তুমি বাস্-এ যে ভাড়া দিতে সে-ই না হয় আমাদের দেবে।' (এই বেলা বলে নি, পরে, বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেটা তাঁরা নেননি।)

কিন্তু ইয়া আল্লা, বসি কোথায়! গোটা তিনেক মোরগামুরগী ক্যাঁক মাক করছে, দু তিন ঝুড়ি আলু-টমাটো-মটরশুঁটি-কপি, দু খালুই ডিম, আর কি কি ছিল খোদায় খবর।

রাব্বিরা বরাব্বর বলে যাচ্ছেন, 'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।'

এক রাব্বি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, 'মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। তাই এত সব।'

আমি চোখের তারা কপালে তুলে বললুম, 'বলেন কি মশাই! এই তিনটে আণ্ডা, গোটা কয়েক মুরগীতেই আপনাদের দেশের কন্যাপক্ষ খুশী হয়ে যায়! তাজ্জব! তাজ্জব!! আমাদের মোশয়, সিনাই পর্বত প্রমাণ মাল নিয়ে গেলেও হালাদের মুখে হাসি ফোটে না।'

আমার জেবে একটা হাতির দাঁতের ডিম্বাকার নস্যির কৌটো ছিল। নস্যাভাবে সেটাতে রাখতুম মিশরীয় সুগন্ধি। সেইটা তুলে ধরলুম তাদের সামনে।

দুই রাব্‌বি আমাকে জাবড়ে ধরে চুমো খেতে লাগলেন।

বিস্তর কথাবার্তা হল। নাবলুস, ন্যাজরিথ গল্পের তোড়ে পেরিয়ে গিয়ে তখন পৌঁছে গিয়েছি গেলিলিয়ান লেক-এ।

দুই রাব্‌বি আমার মাথার উপর হাত রেখে বিস্তর মন্ত্র পড়ে গেলেন। তাঁদের আশীর্বাদের এক কণাও যদি সফল হয় তবে আমি ভারতবর্ষের রাজা হব।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর

সুইটজারল্যান্ডের রামগাড়ল হ্যার পল্‌ডি নাকি একদা একটা দাঁড়কাক পুষেছিল।

বন্ধু শুধালে, এ কী ব্যাপার। কাক আবার কেউ পোষে নাকি? বৈজ্ঞানিকসুলভ অর্ধমুদ্রিতনয়নে পল্‌ডি বললে, ঐ যে লোকে বলে দাঁড়কাক একশ বছর বাঁচে, সেটা ঠিক কিনা আমি হাতে-নাতে নিজে দেখে নিতে চাই।

মুচকি হাসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু আমি নিজেই পল্‌ডির মতই বটি।

চিন্তা করুন তো এই যে ইহুদি জাত—বিস্তর ঘোরাঘুরি করে, হাজার দুই বছর ধরে এ-জাত, ও-জাত সে-জাতের কাছে মার খেয়ে খেয়ে গোলামী করে করে প্রথম আপন রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ পেল খ্রীষ্টজন্মের হাজারখানেক বছর পূর্বে রাজা সুলেমানের আমলে। কিন্তু হায়, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই 'গ্লরি' খানখান হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তিনি ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহ্‌ভের জন্য যে 'বিরাট' মন্দির গড়েছিলেন তার স্মৃতি ইহুদিরা আজও প্রতি শনির স্যাবাৎ পরবে স্মরণ করে।[১]

তারপর খেল মার ফের ঝাড়া একটি হাজার বছর ধরে। আর বাবিলনের রাজা তো একবার প্রায় গোটা গোষ্ঠীটাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখে দিলেন আপন দেশে। দু পুরুষ সেখানে কাটিয়ে কোনওগতিকে প্রাণ নিয়ে তারা ফিরলো ফের প্যালেস্টাইনে।

সুলেমানের হাজার বছর পর ফের তারা পেল আরেকটা চানস। প্রভু যীশুর জন্মের কয়েক বছর পূর্বে, রাজা হেরডের আমলে (এরই পুত্রের সামনে 'বিচারের' জন্য প্রভু যীশুকে পাঠানো হয়), আবার জেরুস্‌লম তথা ইহুদি জাতের মুখে হাসি ফুটলো। ধনদৌলত তো বাড়লোই, তদুপরি সুসভ্য বাবিলনে তারা যে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয় তারই কাঠামোতে ফেলে আপন প্রাচীন শাস্ত্রাদির নূতন নূতন টীকাটিপ্পনী

---

১ তিন হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই মন্দিরের গুণকীর্তন করে করে তার পরিধি ও ঐশ্বর্য এমনই বাড়িয়েছে যে বাস্তবের সঙ্গে আজ আর তার কোনও মিলই নেই। বাইবেল অনুযায়ীই দেখা যাচ্ছে, মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট, প্রস্থ ৭০-এর একটু বেশী (বাইবেল, কিংজ ১; ৬ অধ্যায়)! এ যেন সেই—'লোক মরে লক্ষ লক্ষ কাতারে কাতার! গুনিয়া দেখিনু শেষে আড়াই হাজার!!'

রচনা করলে। হেরড আবার নূতন করে য়াহ্‌ভের মন্দির গড়লেন।

কিন্তু এবারে যে দুর্দৈব এল, তার সঙ্গে পূর্বেকার কোনও অভিজ্ঞতারই তুলনা হয় না। খ্রীষ্টজন্মের ৭০ বৎসর পর রোমানরা জেরূসলম আক্রমণ করে শহর এবং দুর্গ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে য়াহ্‌ভের মন্দির পুড়িয়ে ছাই করে দিল; এক ইহুদি ঐতিহাসিকের ভাষায় Amid circumstances of unparalelled horror, Jerusalem fell. The temple was burnt and the Jewish State was no more.''

এই কি শেষ? হ্যাঁ, কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র লোপ পাওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা জেরূসলম নগরে বসবাস করতে লাগল। ওদিকে তাদের উপর রোম সম্রাটের কুশাসন ক্রমে ক্রমে এমনই বেড়ে যেতে লাগল যে শেষটায় ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে তারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো— অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য, ইহুদিদের অনেকেই এ রকম বছরের পর বছর ধরে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে মানা করেছিলেন। আমরা জানি স্বয়ং খ্রীষ্ট রোমানদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এবারে রোমানরা যা করল তার সঙ্গে ৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্দির পোড়ানোরও তুলনা হয় না। হাদ্‌রিয়ানের আদেশে সমস্ত শহর পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে তার উপর হাল চালানো হল। খুব সম্ভব হাদ্‌রিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা দায়ুদের গোর, সুলেমানের মন্দির এমনই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, যাতে করে পরবর্তী যুগে ইহুদিরা সেগুলো খুঁজে বের করে সমাধিসৌধ এবং নূতন মন্দির গড়ে তাদেরই চতুর্দিকে নবীন বিদ্রোহ, নবীন রাষ্ট্রের সূত্রপাত না করে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হুকুম জারি হল : ইহুদি মাত্রেরই হাদ্‌রিয়ান নির্মিত নবীন জেরূসলমে প্রবেশ নিষেধ। অর্থাৎ রোমান, খ্রীষ্টান, আরব, গ্রীক ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায় নানা শেমিতি তথা মিশরীয়রা সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে কিন্তু য়াহ্‌ভের উপাসকরা সেখানে প্রবেশাধিকারও পাবে না।

এর পরই ইহুদিরা ব্যাপকভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো।

আজ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। জেরূসলমের উপর হাদ্‌রিয়ান হাল চালান ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে, হেরডের মন্দির ধ্বংস হয় ৭০ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ আজ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী বীর রূপে যে ইহুদিরা জেরূসলমে প্রবেশ করলো সেটা যথাক্রমে আঠারো বা উনিশশ' বছর পর। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের কথা পরে হবে।

প্রথম পর্যায়ে রাজা সুলেমান যে ইহুদি-প্রাণাভিরাম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল প্রতিবেশী ফিনিশিয় রাজা টায়ার (বর্তমান লেবানন অঞ্চল)-অধিপতি রাজা হিরমের সাহায্যে। বস্তুত রাজা সুলেমান স্বাধীন হলেও তাঁর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হিরমকে তিনি অনেক প্রকারে সেবা করে সে সাহায্য পান। এচ জি ওয়েলস তো তাঁর ইতিহাসে তাচ্ছিল্যভরে বলছেন, ''There is much in all this (অর্থাৎ সুলেমানের সেবা) to remind the reader of the relations of some Central African chief to a European trading concern.''

অর্থাৎ অর্ধ বর্বর নীগ্র চীফ যে রকম শক্তিশালী ইয়োরোপীয়কে কাঁচা মাল সস্তা লেবার যুগিয়ে সভ্য জগতের এটা সেটা পায়, সুলেমানের বেলাও তাই। এবং তার পরই বলছেন, ''এবং বাইবেল পড়লেই দেখা যায়, সুলেমানের রাজ্য was a pawn between

(হিরমের) Phoenicia and Egypt.'' এবং বাইবেলেই আছে সুলেমান তাঁর রাজ্যের উত্তরার্ধ হিরমকে দিয়ে দেন বা দিতে বাধ্য হন।[১]

পূর্বেই বলেছি, এর হাজার বছর পর দ্বিতীয় চান্‌স্ পান রাজা 'হেরড দা গ্রেট'। ইনি আবার সংস্কার করে গড়ে তুললেন নব জেরূসলম। সুদৃঢ় নগর প্রাচীর, বিরাট রাজপ্রাসাদ, নানা অট্টালিকা—এবং সব চেয়ে বড় কথা—সুলেমানের মন্দির নব মহিমা-মণ্ডিত করে গড়ে তুললেন। এ ছাড়া প্যালেস্‌টাইনের সর্বত্র প্রাচীন নগরী সংস্কার ও বহু নূতন নগর স্থাপনা করলেন। বস্তুত ইহুদিদের এ যুগকে দ্বিতীয় সত্যযুগ বলা যেতে পারে।

কিন্তু 'রাজা' হেরড ছিলেন সুলেমানের চেয়ে পরমুখাপেক্ষী। তিনি ছিলেন রোম সম্রাটের অধীনে পরাধীন রাজা। মিশর রাণী ক্লেওপাতরা-বল্লভ-রোমশাসক অ্যানটনির কৃপায় তিনি 'রাজা' উপাধি পান ও তাঁকে রোম সাম্রাজ্যের 'ক্লাএন্ট প্রিন্‌স' হিসাবে প্যালেস্‌টাইন শাসন করতে হত। অ্যানটনির আত্মহত্যার পর তিনি পান রোম রাষ্ট্রপ্রধান (কার্যত সীজার) অক্‌টাভিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম দফায় সুলেমান তাঁর গ্লরি গড়লেন ফিনিশিয় রাজা হিরমের সহায়তায়; তার এক হাজার বছর পর দ্বিতীয় দফেতে 'রাজা' হেরড ইহুদিকুলের গৌরব বৈভব পূর্ণ করে তুললেন রোম শাসকের সাহায্যে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেটাও বিনষ্ট হল ৭০ বছরের ভিতর ও তারপর কেটে গেল আরও দু হাজার বৎসর। এবারে তৃতীয় দফাতে, ১৯৬৭-এর জুন মাসে ইহুদি প্রবেশ করল বিজয়ী বীরের বেশে প্রাচীন জেরূসলম নগরে। পুরোভাগে জঙ্গীলাট দায়ান। বিশ্ব ইহুদি উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলো ইনিই ''মাশীয়হ্।''—মিসায়া (Mecsiah), খ্রীষ্টানের যীশু (খ্রীষ্ট শব্দের অর্থেও 'মিসায়া') মুসলমানের মসীহ = মাহ্দী, হিন্দুর কল্কি।

এবারে তৃতীয় দফাতে এ-'মশীয়হ্' এ-কল্কির পিছনে কে?

আন্‌কল স্যাম—জনসন!

*　　　　*　　　　*

কিন্তু এবারেও যদি ইহুদিরা ফের মারে তবে আগের এক হাজার, তারপর দু'হাজার সেই হিসেবে ফোর্থ চান্‌স পাবে চার হাজার বছর পরে।

লেখনারম্ভের পলডি হয়তো বা দেড়শ বছর পরমায়ু পেয়ে দাঁড়কাক একশ' বছর বাঁচে কিনা পরখ করে যেতে পারবে, কিন্তু 'ইওরস অবিডিয়ানটলি' এ অধম তো চার হাজার বছর বাঁচবে না! আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমেন॥

---

১ বাইবেল, কিংজ ১/২১। উত্তর গ্যালিলির এই অঞ্চলেই ইজরায়েল সিরিয়ার হালে সংঘর্ষ হয়। অনুর্বর প্রস্তরময় এই ভূমি কিন্তু বড় ঐতিহাসিক মূল্য ধরে। গ্যালিলি হ্রদের এই উত্তর তীরে যীশু তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রচারকার্য আরম্ভ করে টিলার উপরে বসে 'সারমন অব দ মাউনট' ('ধন্য যাহারা আত্মাতে দীন-হীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই') উপদেশ দেন। এখানেই তিনি সাতখানি রুটি ও ছোট্ট কয়েকটি মাছ দিয়ে চার হাজার লোককে খাওয়ান। এরই কাছে মগদলা গ্রাম, যেখান থেকে নর্তকী, পরে তাপসী মেরি মগডলীন (অক্‌স্‌ফরডের মডলিন কলেজ। maudlin tears; কেম্‌ব্রিজের মডলিন বানানে পিছনে e অক্ষর আছে) যীশুর কাছে আসেন। পাঠক যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, এখানেই আমি সর্বপ্রথম গ্যালিলি হ্রদের মাছ খাই। তার অপূর্ব স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে: ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ অঞ্চল সম্বন্ধে সবিস্তর লেখার বাসনা আছে।

রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাওয়ার

প্রাচীরটা যে প্রাচীন সেটা দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কত প্রাচীন, সেটা অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক গবেষণা না করে বলতে যাওয়াটা অবিবেচকের কর্ম হবে। তবে এ নগরে যারা বাস করে তারা ছেলেবেলা থেকেই চতুর্দিকের এত সব প্রাচীন দিনের ভগ্নাবশেষ দেখে আসছে যে তাদের চোখ যেন বসে গেছে; আপন অজানতেই অবচেতন মন জরাজীর্ণ পাষাণস্তূপের একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা করে করে যেন প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের কতকগুলো সাদামাটা কাঁচা-পাকা সূত্র নির্ণয় করে ফেলে। এমন কি যে বিদেশী প্রাচীন ভগ্নস্তূপ অতি অল্পই দেখেছে—যেমন ধরুন মামুলী মারকিন—সে পর্যন্ত এখানে কিছু দিন থাকার পর এটা-ওটার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ওয়াকিফহাল হয়ে যায়—অবশ্য যদি 'গাঁইয়া' মারকিনের মত চোখে ফেটা কানে তুলো মেরে 'টুরিজম' কর্ম না করে।

মোটা দড়, ভারিক্কি প্রাচীর। প্রায় বিশ গজ উঁচু, অন্তত পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন গজ লম্বা। রোদে জলে পাথরের চাঁই তার মসৃণতা হারিয়ে খোওয়া খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু পাথরে পাথরে যে জোড়া লাগানো আছে সেটা আজও যেন প্রথম দিনের মত মোক্ষম। রঙ প্রায় কালো।

কিন্তু আশ্চর্য, এ প্রাচীর যে এখানে কি করতে আছে সেটা কিছুতেই অনুমান করতে পারলুম না। অন্য প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সে কোনও চত্বর বা বাড়ির বেষ্টনী নির্মাণ করেনি। শহরের মাঝখানে না হয়ে যদি ফাঁকা মাঠে এটা দেখতুম তবে হয়তো বলতুম, এটা চাঁদমারির (টারগেট শ্যুটিঙের) দেয়াল। এখানে এটার—স্থাপত্যে যাকে বলে আরকিটেকচরল ফংশন কি?

একটি প্রৌঢ়া মহিলা—সর্বাঙ্গ লম্বা ভারী কালো জোব্বায় ঢাকা, মাথায় কপাল পর্যন্ত অবগুণ্ঠন, শুধু মুখের লালচে হলুদ রঙের আভা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে—এক হাত উপরে তুলে দেয়ালে রেখেছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাথাটিও দেয়ালের উপর কাত করে রেখে যেন কোনও গতিকে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকটে এগিয়ে যেতে দেখি, তাঁর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, আর ঠোঁট দুটি অল্প-অল্প কাঁপছে যেন, কেমন মনে হল, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। কোনও প্রিয়জনের স্মরণে? কিন্তু কই, কাছে-পিঠে কোথাও তো কোনও গোরস্তান নেই। আমি আর এগোলুম না। রোদ চড়তে আরম্ভ করেছে। বাঁদিকে মোড় নিতে হেরড গেটের কাছে ভারতীয় ধর্মশালার দিকে রওয়ানা হলুম।

একটা ছোট বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

প্রায়ান্ধকার রাস্তা—হাত ছয় চওড়া। দুদিকে দোকানের সারি—আর রাস্তার উপরটাও ঢাকা বলে মনে হয় গোধূলির অন্ধকার যেন নেমে আসছে। তবু ফলের দোকানে কী রঙের বাহার! সব চেয়ে চোখে পড়ে আমাদের কমলানেবুর তিনগুণ সাইজের জাফা অরেন্জ। মধুর মত মিষ্টি রসে টইটম্বুর। দুপুরে একটা খেলে সে-বেলা যেন অন্নে রুচি হয় না। দুটো খেলে গা বিড়োয়।

একটা কিউরিওর দোকান। টুকিটাকি অলঙ্কার, তাবিজ, তসবী, রেকাবি, গেলাস, তীর, ধনু, আরও কত কি! কোনওটা নাকি পাঁচশ, কোনটা নাকি পাঁচ হাজার বছরের পুরনো! আমি অবশ্য জানতুম, এগুলোর ৯৯% কাইরোর কারখানায় তৈরি হয়। কোনও-কোনওটাতে এস্তেক সরকারী ক্ষুদে শীলমারা আছে : সরকারী মিউজিয়াম গ্যারান্‌টি দিচ্ছেন, এটা প্রাচীন দিনের কোনও পিরামিডে বা গোর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। বলে আর কি হবে, মাল যেমন জাল, শীলও তেমনি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই জরমন টুরিস্‌ট্ ছোকরা। পরশুদিন আমি এদেশে এসেছি—ছোকরা বেশ কয়েক সপ্তাহ হল। আলাপ হয়েছে কাল সকালে, খ্রীষ্টের সমাধিসৌধে অর্থাৎ হোলি সেপাল্‌কর্‌-এ। অবাক হয়ে বললুম, 'এ কি ভায়া, এসব যে বিলকুল ডাড়্—জাল মাল।'

একগাল হেসে বললে, 'আমার নোটও জাল।'

একসঙ্গে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলুম।

খানিকক্ষণ পরে আমি সেই দেয়ালের ধারের মহিলাটির কথা পাড়লুম।

বললে, 'সে তো ক্লাগে-মাত্তার।'

জর্মন ভাষায় 'ক্লাগে' অর্থ 'লেমেনটেশন' অর্থাৎ 'বিলাপ' : 'মাত্তার' অর্থ 'প্রাচীর'। বিলাপ করার প্রাচীর। আমি বললুম, খুলে বলো।

পরম তাচ্ছিল্যভরে ঘোঁৎ করে উঠলো, ইহুদিদের কি যেন একটা কী, আমার ও নিয়ে কোনও শিরঃপীড়া নেই। ঐ যে, কে এক হিটলার, সে শিখেছে ইহুদিদের কাছ থেকে একটা মারাত্মক তত্ত্ব—ইহুদিরাই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বলে তারা বিশ্বেশ্বর য়াহ্‌ভের "নির্বাচিত সর্বোৎকৃষ্ট জাতি"—অন্যেরা বলতো, অমর ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রিয় জাতি আমরা। ওনরা বিশ্বেশ্বরের! হিটলার ওদেরই কাছ থেকে এই অদ্ভুত, প্রলয়ঙ্করী, জাতে জাতে রক্তাক্ত সংগ্রামসৃষ্টিকারী বীজমন্ত্র শিখে নিয়ে বললে, "বটে! এত বড় মিথ্যে কথা! সার সত্য কিন্তু, হে বিশ্বজন, জেনে নাও :—আমরা, আর্যরা, এবং তাদের ভিতরও নীল চোখ, সোনালী চুলওলা নরড়িকরা ত্রিলোকের সর্বোৎকৃষ্ট জাত।" এবং এইখানেই হিটলার থামলো না; বললো, "এবং ইহুদিরা এ জগতে কাফরী নীগ্রোর মত উন্‌টর মেন্‌শ (মানব পর্যায়ের নিম্নস্তরের সৃষ্টি)-ও নয়। তারা ভার্‌মিন নরকের কীট! যথেষ্ট হয়েছে; আমি ওসব কোঁদলে নেই।'

* * *

নিরপেক্ষ ইতিহাস বলেন, হেরড দ্য গ্রেট খ্রীষ্টজন্মের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জেরূসলমে যে বিরাট বিচিত্র য়াহ্‌ভের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন সেটা আকারে-প্রকারে সর্বভাবে হাজার বছর পূর্বেকার সুলেমানের টেম্‌পলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল।'[১] রোমানরা এ মন্দির ৭০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।

---

১ নির্মাণ আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ ২০; নির্মাণ শেষ খ্রীষ্টাব্দ (খ্রীষ্টের পর) ৬২। কী ট্রাজেডি! যে মন্দির গড়তে লাগলো প্রায় ৮২ বৎসর সেটা ভাঙতে (প্রধানত লুট করতে—কারণ ইহুদি মন্দিরে তাদের 'কোষাকুষি' হয় বিরাট আকারের ও নিরেট সোনায় তৈরি) ৮২ ঘণ্টাও লাগেনি! প্রফেট নোআর (আরবী বাঙলায় নূহ) আরক্ বা নৌকা তুলনীয়।

'পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট' করেনি। বিরাট মন্দির-চত্বরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর একে পরিবেষ্টন করে ছিল তার একটি ক্ষুদ্র অংশ, কি কারণে জানি না, আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে—এরই বর্ণনা দিয়ে এ-লেখা আরম্ভ করেছি।

কবে এ প্রথা, অনুষ্ঠান বা আচারটা আরম্ভ হয় সেটা বলা কঠিন। অন্তত ষোলশ' বছর তো হবে।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে দেড়/দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বিলাপ রোদন করছেন। অনেকক্ষণ ধরে যে দীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেটিতে বার বার যে-ধুয়া আসে (আমার যত দূর স্মরণে আসছে তারই উপর নির্ভর করে বলছি, কারণ বহু চেষ্টা করেও এই সুন্দর 'কিনোৎ' = ইংরিজি 'এলিজি' মন্ত্রটি যোগাড় করতে পারিনি) তার নির্যাস 'আমাদের সর্বগৌরব-মহিমার যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে আমরা তারই স্মরণে এই বিজনে রোদন করি।'

যত দূর মনে পড়ছে রাব্বি—পুরোহিত সে 'গৌরব-মহিমার' কিছুটা বর্ণনা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই উপরের ধুয়াটি বলে। ফের রাব্বি আরও খানিকটা বর্ণনা দেন, ফের উপাসক-মণ্ডলী ঐ ধুয়ার পুনরাবৃত্তি করে। বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বয়।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে ইহুদিরা এই প্রাচীরের দিকে মুখ করে এই 'কিনোৎ' বিলাপ করে। অন্যান্য দিনও যে কোনও সময় দু'একজনকে কাঁদতে দেখা যায়। আমি যে মহিলাটিকে দেখেছিলুম ইনি তাঁদেরই একজন। আর ইহুদি পঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের 'আব্' মাসের ৯ তারিখ মন্দির ধ্বংসের সাম্বৎসরিক কিনোৎ।

প্রাচীন জেরূস্লমের যে অংশে এই প্রাচীরটি পড়েছে সেটি মন্দির ধ্বংসের বহু পূর্ব থেকে গত জুন মাস পর্যন্ত ছিল হয় রোমান না হয় খ্রীষ্টান নয় আরবদের অধীনে। গত জুন মাসে আরব-ইজরাএল যুদ্ধের সময় আরব শাসনকর্তা ও প্রজাকুল নগর ত্যাগ করে জরডন নদীর পূর্ব পারে চলে যায়।

বিজয়ী ইহুদী প্রধান সেনাপতি দায়ান ও পুরোহিত বংশজাত (লেভি) প্রধানমন্ত্রী এশকল্ দুই আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার পর 'বিলাপ প্রাচীর'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে হাজার হাজার ইহুদি। অতিশয় পরিতাপের বিষয়, সে মহোৎসব সমাধিত হল তার খবর এসেছে মাত্র কয়েক ছত্রে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে : এশকল্-দায়ান্ এরা কি সেই প্রাচীন দিনের কিনোৎ-বিলাপ করেছিলেন? করার কি প্রয়োজন? সুলেমান হেরডের মন্দির যেখানে ছিল সেখানে নূতন মন্দির গড়ে তুলে সর্ব গেরব-মহিমা ফিরিয়ে আনলেই হয়—তাহলে অবশ্য শত শত শতাব্দীর প্রাচীন 'কিনোৎ' পরবটি মারা যায়। আজ যদি ভারতে সর্পকুল লোপ পায় তবে কি মনসা পূজা বন্ধ হয়ে যাবে?

কিন্তু যে জায়গায় প্রাচীন মন্দির ছিল সেখানে তেরশ' বছর ধরে যে মসজিদ!

হজরৎ মুহম্মদের পরলোকগমনের পর আরবদের দ্বিতীয় খলীফা হজরৎ ওমরের সময় ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাইজেনটাইন খ্রীষ্টানদের হারিয়ে স্বয়ং ওমর জেরূস্লমে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন, নবী সুলেমানের মন্দির ছিল কোথায়? সেখানে তখন শহরের তাবৎ ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ভগ্নস্তূপ। খলিফা স্বয়ং স্বহস্তে ময়লা আর পাথর সাফ করতে

লাগলেন। দেখাদেখি তাঁর সেনাপতিরা ও সৈন্যদল সে কাজে যোগ দিল। অত্যল্প সময়েই কর্ম সমাধান হলে পর ওমর সেখানে একটি মসজিদ উল্-আক্সা[১] সেটিও অতিশয় পুণ্যভূমি কারণ হজরৎ মুহম্মদকে তাঁর জীবিতাবস্থায় বেহেশ্তে আল্লার কাছে যখন নিশাভাগে নিয়ে যাওয়া হয় (সশরীর না শুধু আত্মা এ নিয়ে মতভেদ আছে) তখন তাঁকে আরবদেশ থেকে প্রথম এই মসজিদ উল্-আক্সা ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ওমর যে সাদামাটা মসজিদ নির্মাণ করেন তার পরিবর্তে খলীফা আব্দুল মালিক আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে যে মসজিদ সেখানে নির্মাণ করলেন সেটি সত্যই অতুলনীয়। বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিদের মতে পৃথিবীর আটটি স্থাপত্যকলার নিদর্শন উল্লেখ করতে হলে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক মসজিদ নয়, এটাকে 'পুণ্যসৌধ' বলা চলে—আরবীতে এর নাম কুব্বৎ উস্সখ্রা (ডোম্ অব্ দ রক্)।

এ দুটি না ভেঙে তো সুলেমানের টেম্প্ল্ গড়া যায় না।

ইতিমধ্যে খবর এসেছে ইহুদিরা জেরুসলেমে প্রবেশ করেই মসজিদ উল্-আকসার উপর ইহুদি পতাকা তুলে পূর্ণ এক দিবস সেটা সেখানে রাখে। অনেকেই এই ঝাণ্ডা ওড়ানোটাকে ইহুদির আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন স্বত্বাধিকার দাবী করার পূর্বাভাস মনে করে শঙ্কিত হয়েছেন। খ্রীষ্টান উইলসন শঙ্কিত হননি, এবং খ্রীষ্টান জনসন তো ইহুদির পিছনে রয়েছেনই। যা শত্রু পরে পরে। লেড়েতে শাইলকে লড়াই।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা চালে করলে একটা ভুল। দায়ান এশকল্ সম্প্রদায়ের জাতবৈরী আরেক ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম স্যামারিটান। তাদেরও আড়াই হাজার বছরের পুরনো একটা ভাঙা মন্দির পড়ে আছে একটা টিলার উপর। ১৯৪৮ সালে প্যালেসটাইন বিভাগের সময় স্যামারিটানরা কিছুতেই দায়ান হিস্যায় পড়তে চায়নি। তারা জরডনের আরব হিস্যাতে যেতে চেয়েছিল এবং যায়। জুন মাসে আরব সেখান থেকে পালালে পর এ মন্দিরেও দায়ানরা 'দাবি'র ঝাণ্ডা ওড়াতে গেলে হাতাহাতির উপক্রম হয়—যদ্যপি সেস্থলে মাত্র তিন-চারশ' স্যামারিটান বাস করে (তাবৎ দুনিয়ায় এ সম্প্রদায়ের সাকুল্য সংখ্যাই মাত্র তিন থেকে পঁচিশ) তবু তারা সাহস করে এ 'গুণ্ডামি' রোকতে যায়।

তখন খ্রীষ্টজগৎ—মাইনাস জনসন—শঙ্কিত হল।

জেরুসলেমে যে রয়েছে প্রভু যীশুর সমাধি মন্দির—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় গির্জে। ক্যাথলিক, গ্রীক অর্থডকস্, আরমেনিয়ান, কপ্ট, হাবশী, সীরিয়ান, লুথেরিয়ান আরও কত জাত-বেজাতের (মুসলমানদের তো মাত্র দুটো—হরমশরীফ আর আক্সা)। আজ ঝাণ্ডা ওড়ায়নি বটে কিন্তু মুসলমানের দুটো দখল করার পর ইহুদির হিম্মত বেড়ে যাওয়াতে যদি সে খ্রীষ্টানগুলোও—?

পোপ শঙ্কিত হন সর্বপ্রথম। তারপর উইলসেন। তিনি হুঙ্কারিলেন, 'বেরিয়ে যাও, প্রাচীন জেরুসলম থেকে।' দায়ান উত্তরিলেন, 'ইয়ারকি পায়া হৈ? যাব না।'

স্নাব্‌ড় উইলসন চুপ-ed!!

---

১ বছর চল্লিশেক পূর্বে হায়দরাবাদের নিজাম প্রায় পাঁচ লক্ষ (পাকা অঙ্কটি কেউ আমাকে বলতে পারেনি) মুদ্রা ব্যয় করে মসজিদটির আমূল সংস্কার করেন।

অল্পে তুষ্ট

॥ ১ ॥

আমার পরিচিত জনৈক সমাজসেবী ভদ্রসন্তান রাত করে বাড়ি ফিরছিলেন। শর্ট কাট পাবার জন্য যে গলি ধরেছিলেন সেটা প্রায় বস্তি অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে এসেছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পরিত্রাহি চিৎকার—যা এ অঞ্চলে রাতবিরেতে আকছারই শোনা যায়। সমাজসেবীটি একটু কান পাততেই বুঝতে পারলেন, যুগ যুগ ধরে সমাজ স্বামীকুলকে যে হক দিয়েছে এস্থলে সে কুলেরই জনৈক বস্তি-সন্তান সেটি তার স্ত্রীর উপর কিঞ্চিৎ পশুবল সহ প্রয়োগ করছে। এস্থলে সুবুদ্ধিমান মাত্রই তিলার্ধ কাল নষ্ট করে না, কিন্তু আমাদের সমাজসেবীটি এ-কালের যারা 'সেবা'র নামে মস্তানী করে তাদের দলে পড়েন না। দরমার ঝাঁপ ধাক্কা মেরে খুলে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ব্যস, থামো। এসব কী বেলেল্লাপনা হচ্ছে! আমাদের পাব্লিক স্পিরিটেড ইয়ংম্যানটি নাটকের এর পরের দৃশ্যে অবশ্যই আশা করেছিলেন সেই অবলা মুক্তি পেয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে অঝোরে কৃতজ্ঞতাশ্রু ঝরাবে, এবং তিনিও তাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অদৃশ্য বাতাসের একাংশ অবহেলে দ্বিখণ্ডিত করে, 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ' (ইংরিজিতে যাকে বলে 'নটেটোলনটেটোল') বলতে বলতে আত্মপ্রসাদাৎ ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। ও হরি। কোথায় কি, স্বামী-স্ত্রী দুজনাই প্রথমটায় একটুখানি থতমতিয়ে তারপর বিপুল বিক্রমে হামলা করলে তাঁর দিকে। তিনি প্রায় পালাবার পথ পান না। ইতিমধ্যে বস্তির আরও দু-পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। সমাজসেবী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ওদেরও দরদ যুযুধান দম্পতির প্রতি।

এটা কিছু একটা উটকো ফ্যাচাং নয়। পরবর্তী যুগে আমি দেশবিদেশে—এস্তেক অতিশিক্ষিত মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপেও এহেন কীর্তন একাধিকবার শুনেছি। দুজনার কাজিয়া মেটাতে গিয়েছ কি মরেছ। দুজনা একজোট হয়ে তোমাকে মারবে পাইকিরি কিল।

এ তো গেল সাদামাটা পশুবল প্রয়োগের বর্বরতা ঠেকাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু যে স্থলে দুই পক্ষই সাতিশয় শিক্ষিত—বলতে কি, যেন দেশমাতৃকার উচ্চতম অনবদ্য শিক্ষিত সন্তান—এবং যা হচ্ছে সেটি মার্জিততম বাকযুদ্ধ, সেস্থলেও আপনি যদি ফৈসালা করে দিতে চান তবে ফল একই। উভয়পক্ষ একে অন্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত আপন আপন বাক্যবাণ তন্মুহূর্তেই সংবরণ করে আপনাকে করে তুলবেন এজমালি চাঁদমারির টারগেট।

এ তো হল সে-দুর্দৈবের কীর্তন যে-স্থলে আপনার নিজস্ব—আপন বিশ্বাস অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তৃতীয় মত আপনি পোষণ করেন না; আপনি সের্ফ উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক সুবিবেচনাসহ প্রণিধান করে সুলে-সুপারিশসহ একটা মধ্যপন্থা বাতলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেস্থলে আপনি তৃতীয় মত পোষণ করেন সেখানে—ঈশ্বর রক্ষতু!—আপনার অকালমৃত্যু অনিবার্য।

ভূমিকাটি আমার অনিচ্ছায় দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু প্রয়োজনাতীত বৃহল্লাঙুল নয়। কারণ ভবিষ্যতেও বহু-বহুবার বহু বাদানুবাদের সম্মুখে আমাকে ঠিক এইভাবেই সরকারী প্রাণ

(আজকালের ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের জমানায় ওটা আর পৈতৃক নয়, এ জন্মের পরও দুগ্ধাভাবে, অন্নাভাবে ওটা সরকারের হাতেই সমর্পিত) হাতে নিয়ে এগোতে হবে।

* * *

একদল গুণীজ্ঞানী বলছেন প্রত্যেক—আমি প্রত্যেক শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই—অধমের যা কিছু বক্তব্য সে ঐ প্রত্যেক (বা তাবৎ, কুল্লে) শব্দটি নিয়ে—ছাত্রটিকে শিখতে হবে নিদেন দুটি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, সে শিখবে (ক) আপন মাতৃভাষা ও ইংরিজি, কেউ কেউ বলেন (খ) মাতৃভাষা এবং হিন্দী। এঁরা ইহলোকের তাবল্লোককে দোভাষী বানাতে চান—একেবারে শব্দার্থে নয় (ইহসংসারে কটা লোকের মাত্র একবারের তরেও প্রফেশনাল দোভাষীর প্রয়োজন হয়?), ভাবার্থে। তফাত এঁদের মধ্যে এইটুকু : একদল মাতৃভাষা ও তদুপরি ইংরিজি শেখাতে চান, অন্য দল ইংরিজির বদলে হিন্দী। (আর যাঁদের মাতৃভাষাই হিন্দী তাঁদের কি হবে? সেটা এখনও স্থির হয়নি। তাঁরাই স্থির করবেন। অবশ্যই। কই সে মরদ যার মাতৃভাষা হিন্দী নয় এবং তৎসত্ত্বেও সে হিন্দীভাষীদের সামনে কোনও 'বাৎ প্রস্তাবও' করবে? হায়, আপসোস! কেন হিন্দীভাষী হয়ে জন্মালুম না?)

এ তো গেল দোভাষীর দল।

অন্য দল ত্রিভাষী। এঁরা বলেন, অত ঝগড়া ফ্যাসাদের কী প্রয়োজন? বিদ্যার্থী তিনটে ভাষাই শিখবে। (গ) মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরিজি অর্থাৎ মাতৃভাষা শিখতেই হবে, তারপর কেউ বলছেন সেকেন্ড ল্যানগুইজ হবে হিন্দী, কেউ বলছেন, না, ইংরিজী, আর এই ত্রিভাষীর দল মাতৃভাষা তো খাবেনই তদুপরি ডুডুও খাবেন টামাকও খাবেন।

এই দোভাষী ও ত্রিভাষীতেই ঝগড়া।

এ ছাড়া আরও বহুবিধ আছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার প্রধান ভাণ্ডার সংস্কৃতে। সেই সংস্কৃতই যদি বিদ্যার্থী না শিখল তবে সে নিজেকে ভারতীয় বলে কোন্ মুখে? যে বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন নিয়ে আমরা নিজে গর্ব অনুভব করি, বিশ্বজনের সামনে তুলে ধরি, সে-সবই তো সংস্কৃতে। এবং এই সংস্কৃতই একমাত্র বিদগ্ধ ভাষা যে-ভাষা একদা আসমুদ্রহিমাচল আর্য-অনার্য সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। আজ যদি আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় আমাদের কারিকুলামে সংস্কৃতকে স্থান না দি এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটে তবে ঐতিহ্যবিহীন হটেন্টটে ও ভারতীয়তে একদিন আর কোনও পার্থক্য থাকবে না। যুক্তিগুলো যে খুবই সত্য এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায় রণাঙ্গন থেকে ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রামে পরাজিত হওয়ার ফলে নয়। কারণ এঁদের বিরুদ্ধে কেউই সংগ্রাম ঘোষণা করে না—দেশের কর্তাব্যক্তিরা এঁদের সের্ফ অবহেলা করে, just by ignoring এদের hors de combat. রণাঙ্গন থেকে অপসারিত করেন। কারণ সংস্কৃত বাবদে এইসব কর্তাব্যক্তিদের বৃহত্তমাংশ ১০০% ignoramus। ...এরই পিঠ পিঠ মুসলমানরা বলেন, তাজমহল (কোনও মারকিন টুরিস্ট যখন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে কোনও ভারতীয় হিন্দুকে ঐ ইমারতের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানায় তখন সে তো মুখ বাঁকিয়ে বলে না, 'না মশাই, এটা আমার দেশের মাটিতে আছে বটে কিন্তু আমার ঐতিহ্যগত সম্পদের অংশ নয়, এটা মোচলমানদের—ইউ আর বারকিং আপ দি রঙ্ ট্রী!'), মোগল চিত্রকলা,

খেয়াল, ঠুংরি, ফারসীতে লিখিত ভুরি ভুরি ইতিহাসাদি অমূল্য গ্রন্থরাজি ভারতীয় সংস্কৃতির অংশবিশেষ—এদের সম্যক চর্চার জন্য ফারসী শেখানো উচিত, এবং ধর্মচর্চার জন্য যে আরবী ভাষা শিক্ষা ভিন্ন নান্য পন্থা বিদ্যতে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। সংস্কৃতওলাদের মত এঁরাও বারোয়ারিতে কল্কে পান না—উপরে উল্লিখিত একই কারণে।...এর পরে আছেন জৈন ধর্মাবলম্বী। এঁদের ধর্মগ্রন্থ অর্ধমাগধীতে। পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত আবেস্তার প্রাচীন পারসীকে। এদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য কিন্তু তাঁদের শাস্ত্রীয় ভাষা পালিকে নিরঙ্কুশ উপেক্ষা করলে আমরা 'বৃহত্তর ভারতে' মুখ দেখাতে পারবো না। আমার এ নগণ্য জীবনে যে দুটি বিদেশীর সঙ্গে আমি একই ডরমিটরিতে কিছুকাল বাস করি তাঁদের উভয়ই ছিলেন সিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ। শ্রমণ ধর্মপাল ও শরণাঙ্কর : এদেশে এসেছিলেন পালি ও সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য। এ ছাড়া শ্যামের রাজগুরুও বার্ধক্যে এসেছিলেন তথাগতের আপন দেশে নির্বাণ লাভার্থে। হিন্দুর বার্ধক্যে বারাণসীর ন্যায়। ...এবং আছেন খ্রীষ্টসম্প্রদায়, যদ্যপি বাইবেলের আদিমাংশ (পূর্ব মীমাংসা?) হীবরুতে ও নবীনাংশ (উত্তর মীমাংসা?) গ্রীকে, তথাপি খ্রীষ্টানদের সর্বজনমান্য বাইবেলের অনুবাদ 'ভুলগাতে' লাতিন ভাষায়। লাতিন ভিন্ন খ্রীষ্ট পাদরির শিক্ষাদীক্ষা অসম্পূর্ণ।

হালফিল বিজ্ঞানের জয়জয়কার! এ 'বিদ্যা' ষোল আনা রপ্ত করতে হলে নাকি জরমন ভাষা অবর্জনীয়।

অতি অবশ্য এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। নিতান্ত কট্টর ভিন্ন কোনও মহামহোপাধ্যায়ই বিধান দেন না যে সর্ববিদ্যার্থীকে ঘাড়ে ধরে সংস্কৃত শেখাতে হবে, কট্টর ভিন্ন কোনও মোল্লা তাবল্লোকের কল্‌মা ধরে বিসমিল্লা শেখাতে চায় না। প্রাগুক্ত দোভাষী এবং ত্রিভাষীরা কিন্তু যেসব ভাষা শেখাতে চান, সেগুলো ঘাড়ে ধরে শেখাতে চান। অতএব এই ভাষার রেস্-এ সংস্কৃত ফারসী পালিওয়ালাদের উপস্থিত also ran বলে খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু নির্ঘণ্ট নিরঙ্কুশ করার জন্য এদের উল্লেখ করলুম।

* * *

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত ত্রিগুণা সেন আসলে বৈজ্ঞানিক বটেন, কিন্তু হিউম্যানিটিজেও তাঁর আবাল্য অনুরাগ। তদুপরি তাঁর কমনসেন্‌স আছে। অতএব তিনি সার্থকনামা ত্রিগুণধারী সেন-এর বহুবচন সেন্‌স বা sense।

দোভাষী ত্রিভাষীদের সামনে আরেকটা জীবনমরণ সমস্যা : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? ইংরিজী, হিন্দী, আঞ্চলিক ভাষা—তিনটেরই সমর্থক আছেন।

এই সুবাদে আঞ্চলিক ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীসেন বলেন (হুবহু বাক্যগুলো আমার মনে নেই বলে শ্রীসেন তথা পাঠকের প্রতি যদি অবিচার করে ফেলি তবে কোনও সজ্জন যেন আমার মেরামতী করে দেন, পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়? শিক্ষামন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে আমাদের নিবেদন :—

একশ' বছরও হয়নি কবি হেম বাঁড়ুয্যে লিখেছিলেন—

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।"

সেই জাপানেও কি কখনও জাপানী ভিন্ন অন্য কোনও ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়েছে? বস্তুত পাঠক প্রত্যয় যাবেন না, মাত্র কিছুদিন হল ক্যান্সার রোগের এক স্পেশ্‌লিস্‌ট্‌ আমাকে বলেন, ঐ রোগের গবেষণা জাপানে যা হয়েছে সেটা না জেনে সে সম্বন্ধে আপটুডেট হওয়া যায় না। এবং ওর সব কিছুই হয় জাপানী ভাষাতে।...কিন্তু অত দূরে যাবার কি প্রয়োজন? আফগানিস্তানের জনসংখ্যা কত? দেশটা কি খুবই মডার্‌ন্‌? না তো। আমি যখন সে-দেশে পৌঁছই (১৯২৭) তখন সেখানে সবে প্রথমে কলেজের প্রথম বর্ষ আরম্ভ হব-হব করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অরুণোদয় হতে ঢের ঢের দেরি। অথচ পরের বছর যখন ঐ ফার্‌স্‌ট্‌ ইয়ার চালু হল তখন তার মাধ্যম হল ফারসী। কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয়। পাঠক একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যান্ডই বলুন আর বলিভিয়াই বলুন, শিক্ষার বাহন সর্বত্রই মাতৃভাষা।

* * *

এইবারে আমরা পৌঁছলুম রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

এই যারা দোভাষী ত্রিভাষী—হয় ইংরেজী নয় হিন্দী কিংবা উভয়ই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছেন তাঁদের শুধোই—শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্র এবং যন্ত্রের সঙ্গে টায় টায় গলা মিলিয়ে—'পৃথিবীর কোন্‌ সভ্য স্বাধীন দেশের কজন উচ্চশিক্ষিত লোক মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষা—উত্তমরূপে না হোক মধ্যম বা অধম রূপেই—জানে?'

আমি জনপদবাসী বা নগরের অর্ধশিক্ষিতদের কথা তুলেছিনে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রীতিমত বি-এ পাস করেছে, তাদেরই কজন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য আরেকটি ভাষা পড়তে পারে শুনলে বুঝতে পারে লিখতে পারে এবং মোটামুটি সাদামাটা কথাবার্তা বলতে পারে? বলা বাহুল্য, যারা কোনও বিদেশে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে না। সেস্থলে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোকও বিদেশী ভাষা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলে আপন আপন মেধা অনুযায়ী।

এ-দেশের কথাও হচ্ছে না। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মাত্র সেদিন (যদ্যপি এই কুড়ি বৎসরেই আমরা কী তীব্র গতিতেই না ইংরিজির খোলস বর্জন করছি—এ বর্জনের জন্য কোনও মেহনৎ কেরামতি করতে হয় না, আমাদের চৌকশ গোঁপখেজুরে আলস্যই এর পরিপূর্ণ ক্রেডিট পায়।[১] এবং এই দেশেই প্রায় সাতশ' বছর ফরাসী ছিল স্টেট ল্যান্‌গুইজ—সেইটে একদম পালিশ করে তুলতে আমাদের একশ' বছরও লাগেনি।

ফরাসী দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কত পারসেন্ট ইংরিজি বই পড়তে পারে? বলতে পারে? এক পারসেন্টও না। মারকিন উচ্চশিক্ষিত লোক—স্কুল-কলেজে আট বছর ফরাসী শিখেছে—ক' পারসেন্ট ফরাসী পড়তে বলতে পারে? ঠিক বি-এ পাসের পর? তার দশ বছর পর?

---

১ 'গোঁপখেজুরে'র গল্পটি অতি-প্রাচীন ক্ল্যাসিক পর্যায়ের : খেজুর গাছতলায় একটা লোক শুয়েছিল। একটা খেজুর কপালে পড়ে গড়াতে গড়াতে তার গোঁপে এসে ঠেকল। কিন্তু লোকটা এমনই হাড়-আলসে যে জিভ দিয়ে সেটা টেনে নিয়ে মুখে না পুরে অপেক্ষা করতে লাগল। দিনশেষে পদধ্বনি শুনে বিড়বিড় করে বললে, 'দাদা, এদিকে একটু ঘুরে যাবার সময় যদি দয়া করে তোমার পা দিয়ে ঐ খেজুরটা আমার মুখের ভিতর ঠেলে দাও! থ্যাঙ্কয়ু!'

অর্থাৎ স্বাধীন দেশের শিক্ষিত লোককেও দোভাষী করা যায় না। ওটা একটা ফ্যাশান—ইস্কুল-কলেজে সেকেন্‌ড ল্যান্‌গুইজ পড়ানো।

পেটের ধান্ধায় অনেকে দোভাষী হয়—স্কুলে না গিয়েও। মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী তামাম আসাম চষে খায়। ও! মারওয়াড়ের গ্রামে গ্রামে বুঝি সুবোশাম ইস্কুলে ইস্কুলে আসামী ভাষার দিগ্‌গজ পণ্ডিত বানানো হয়!

তাই বলি, দোভাষী ত্রিভাষী—এদেশের শিক্ষিত লোকও হবে না। থাকবে একভাষী। এবারে দোভাষী ত্রিভাষীর দল আপসের চুলোচুলি ভুলে গিয়ে একজোট হয়ে আমাকে—আমি, একভাষীকে—মারবেন পাইকিরি কিল। এখন বলুন, আমার ভূমিকাটি কি অতি দীর্ঘ হয়েছিল?

॥ ২ ॥

ব্যক্তি-বিশেষের বেলা পুরুষকারই যে রকম শেষ কথা নয়, একটা জাতি বা দেশের বেলাও তাই। আমরা যতই ভেবেচিন্তে পারলিমেন্‌টে তর্কাতর্কি করি, কাগজে কাগজে পাবলিসিটি দিয়ে আটঘাঁট বেঁধে একটা প্রোগ্রাম বা প্ল্যান চালু করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কি উতরাবে সে-সম্বন্ধে আগের থেকে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। একটা দেশের ধর্ম, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলো এমনই বিরাট বিরাট ব্যাপার যে এগুলোকে মানুষ আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা সে নিয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয়; মনে হয় কি যেন এক অদৃশ্য নিয়তি মানবসমাজকে শাসন করে চলেছে, তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব যদি বা থাকে সে অতিশয় যৎসামান্য। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কি তবে চিন্তা করবার কিছুই নেই? অন্ধ নিয়তিই সব? তার নাম অদৃষ্ট, কর্মফল, কিস্মৎ—যে নামেই তাকে ডাকুন।

হজরৎ মুহম্মদ একদিন বেদুইনদের সামনে পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর এক বেদুইন তাঁকে শুধালে, 'তবে কি, হজরৎ, উটগুলোকে আমরা দড়ি দিয়ে না বেঁধে আল্লার ভরসায় (কিস্মতের উপর) ছেড়ে দেব?' হজরৎ বললেন, 'না, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে তারপর আল্লার উপর ভরসা রাখবে।' অর্থাৎ আমরা আটঘাঁট বেঁধে যতই প্ল্যানিং করি না কেন, সকালবেলা বেদুইনের মতই হয়তো দেখবো, উট হাওয়া, প্ল্যান ভণ্ডুল। কিন্তু তবু উট বাঁধতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়।

বৌদ্ধধর্মও নাকি বলেন, মানুষের জীবন নদীস্রোতে নিচের দিকে চলমান গাছের গুঁড়ির মত; ধাক্কাধাক্কি করে সেটাকে খানিকটে ডাইনে বাঁয়ে সরানো যায় কিন্তু স্রোতের উল্টোদিকে চালানো যায় না।

এবং কার্‌ল্ মারক্‌স্‌ও নাকি বলেছেন, ইতিহাসের নিয়তি নানা সামাজিক প্যাটার্‌ন্ পরিবর্তিত করতে করতে সর্বশেষে প্রলেতারিয়া-রাজ আনবেই আনবে। মানুষ সজ্ঞানে আপন চেষ্টা দ্বারা তার গতি দ্রুততর করে দিতে পারে মাত্র।

অতএব তর্কবিতর্ক করি, চেষ্টা দিই :—কিন্তু জানি, শিক্ষার্থী আজ দোভাষীই হোক, আর ত্রিভাষীই বলুক—আখেরে সে একটি ভাষাই শিখবে, তাই দিয়ে জ্ঞানার্জন করবে, কাজকর্ম চালাবে।

পাঠককে ফের বলছি, এখানে আমি বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলছি। অর্থাৎ জোর করে দেশের তাবৎ ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীকে দুটো বা তিনটে ভাষা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা নিছক পরীক্ষা পাস করার জন্য ভাষা শিখবে কিন্তু পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় বা/এবং তৃতীয় ভাষার চাবি দিয়ে ঐ সব ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার খুলে ওই জ্ঞান জীবনে সঞ্চারিত করে চিন্তাধারাকে বহুমুখী করবে না—অথচ বিদেশী ভাষা শেখার প্রধান উদ্দেশ্য তো ওইটেই।

এবারে একটা উদাহরণ নিই।

নরমানরা ইংলন্ড জয় করে সেখানে চালালো ফরাসী ভাষা। শুধু যে রাজদরবারেরই ভাষা ফরাসী হয়ে গেল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষার বাহন, সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের মাধ্যম, নাট্যশালা সঙ্গীতের ভাষা—সব কিছুই তখন ফরাসী এবং ফরাসীর মাধ্যমে তার জননী লাতিন। পাকা তিনশ'টি বছর চললো ফরাসী ভাষার একচ্ছত্রাধিপত্য। ইংরিজীতেও যে কোনও প্রকারের চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সে-কথা দেশের ভদ্রজন সম্পূর্ণ ভুলে গেল। ফরাসী ভাষা নাকি আল্লাতালা স্বয়ং এমনই মধুর পরমপ্রিয় করে নির্মাণ করেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি (এদেশেও আমরা সংস্কৃতকে দেবভাষা খেতাব দিয়েছি এবং সন্ত তুকারাম তাই বক্রোক্তি করেছিলেন; "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয়, মারাঠী কি তবে চোরের ভাষা?")। পুরো তিনশ'টি বছর পর ইংলন্ডের রাজার মাতৃভাষা আবার হল ইংরেজী কিন্তু হলে কি হয় ফরাসী যদিও ক্রমে ক্রমে হটে যেতে লাগলো তবু দেখা যাচ্ছে এই সেদিন—১৭ শতাব্দী অবধি আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফরাসী।[১]

ইংরিজী একদিন পদ পেল বটে, তাই বলে কি ফরাসী 'কর্তার ভূত' কাঁধ থেকে অত সহজে নামে? ইংলন্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত M. Ed রা বলতে পারবেন কবে বিলেত থেকে ফরাসী কমপাল্সরি সবজেক্টরূপে লোপ পেল। কিন্তু তারপরও, আজ অবধি, ঐ ফরাসী অপ্শনাল হিসেবে পড়াবার জন্য বিলেত প্রতি বৎসর কত খরচা করে?

এবং আজও ইংরেজ ফরাসীকে নিয়ে যতই মস্করা করুক না কেন, জেবে দুটো কড়ি

---

১ আইন-ব্যবসায়ীদের মত রক্ষণশীল প্রাণী ত্রিলোকে দুর্লভ। ইংরিজী অবহেলিত বা বিতাড়িত হলে এই বেহেশ্‌তী ভারতভূমি যে কোন্ দোজখে পরিণত হবে তারই কল্পনায় অধুনা শ্রীযুক্ত ছাগলা [ওটা ছাগলাই, স্যর, চাগলা নয়। পর পর পুত্রসন্তান মারা গেলে যে রকম আমরা 'এককড়ি' 'ফকির' 'নফর' নাম রাখি, গুজরাতীরা তেমনি 'ছাগলা' (ছাগল), মাঁকড় (পিঁপড়ে, ক্রিকেটার), ঝিঁড়া (জিন্না, ছোট) রাখে] করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন : এই একশ' বছর ধরে আইন ব্যবসা যে (পর্বতপ্রমাণ) আইনের কেতাবপত্র ইংরিজীতে রচনা করেছেন সেটা লোপ পাবে, তার ব্যবহার থেকে ভারতবাসী বঞ্চিত হবে। এর উপর দীর্ঘ মন্তব্য না করে শুধু বলবো, 'এদেশ থেকে ইংরিজীকে নিরঙ্কুশ বিতাড়িত করার জন্য এই একটি মোক্ষম যুক্তি পাওয়া গেল বটে!' এবং ছাগলা সম্প্রদায়কে সবিনয় প্রশ্ন : 'তবে কি প্রলয়াবধি এদেশে আইন বাহন ইংরিজীই থাকবে?' কারণ যত দিন যাবে, পর্বত যে 'পর্বততর' হতে থাকবে! মায়া যে 'মায়াতর মায়াতম' হতে থাকবে! অবশ্য আমি ইংরিজী বিতাড়নের জন্য হন্যে হয়ে উঠিনি, একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের মত।

জমামাত্রই হলিডে করার জন্য 'পরাণ ভয়ে হরিণে'র মত ছুট লাগায় প্যারিস পানে[১]—মনে আশা সেই সব কুকীর্তি করবে, যেগুলো আপন দেশে করা যায় না—সিম্প্লি নট ডান্। ইংরেজী সাহিত্য যে ফরাসী সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী তার জরিপ করা আমার কর্ম নয়। শব্দবিদ না হয়েও বেপরোয়া আন্দাজে বলি, ইংরিজীর শতকরা নব্বইটি চিন্ময় শব্দ (অ্যাব্স্ট্রাক্ট ভকাবুলারি) হয় ফরাসী, নয় ওরই মারফৎ লাতিন গ্রীক থেকে নেওয়া।

আরও কত শত বাবদে আজও ইংরিজী ভাষা, সাহিত্য, রান্নাবান্না (মেনুটা এখনও ৮০% ফরাসিস; বীফ, মাটন্, পর্ক্, ভীল, ভেন্জন্ = গরু, ছাগল, শুয়োর, বাছুর, হরিণের মাংস—সব কটা শব্দ ফরাসী থেকে এসেছে), আদবকায়দা (R. S. V. P. থেকে P. P. C.), মদ্যাদি (কন্যাক্ থেকে শ্যামপেন) ফরাসীর কাছে ঋণী—বস্তুত বিলেতে, আজও সভ্যতা ভদ্রতার কোন্ না বস্তু ফরাসী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বা আছে?

একদা কতিপয় শিক্ষাবিদ ইংরেজের মনে প্রশ্ন জাগলো, এই যে আমরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শেখানোর জন্য আমাদের দেশে প্রায় হাজার বছর ধরে এত টাকা ঢেলেছি, দেখি তো, তার ফলটা কি হয়েছে? জনৈক ফরাসী ভদ্রলোককে নাবানো হল লন্ডনের রাস্তায়। যারই বেশভূষা আচার-আচরণ দেখে মনে হল লোকটি মার্জিত উচ্চশিক্ষিত তাকেই ফরাসী ভদ্রলোক ফরাসীতে শুধলো, 'আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, বলতে পারেন, কোন্দিকে গেলে সব চেয়ে কাছের ট্যুব স্টেশনে পৌঁছব?' কথিত আছে, ৯৩ না ৯৭ নম্বরের ভদ্রলোক প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন বটে কিন্তু ফরাসীতে উত্তর দিতে পারলেন না। ১০৩ না ১০৭ নম্বরের জন্য বুঝি কোনওগতিকে অতি ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে উত্তরটা দিলেন।

এরপর আরও নানা উদাহরণ, নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রাগুক্ত গবেষকগণ অতিশয় ন্যায্য প্রশ্ন শুধিয়েছেন, তাহলে ঐ 'পোড়া'র ফরাসী শেখাবার জন্য এদেশে অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালার কি প্রয়োজন?

* * *

এ বিষয়টি আরও সবিস্তর আরও উদাহরণ দিয়ে গুছিয়ে বলতে হয়। আমার শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি যখন জানি, যা হবার তা হবেই, তখন কেমন যেন উৎসাহের অভাবে কলমের কালি শুকিয়ে যায়। তবু লিখছি, এলোপাতাড়ি হাবিজাবি বিস্তর বেহুদা এক্স্পেরিমেন্ট করার পর মার খেয়ে খেয়ে যখন মাত্র একটি ভাষাই বাধ্যতামূলক করা যায় এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার করবো, যা অন্যান্য স্বাধীন দেশে করে ফেলেছে, তখন কেউ যেন না বলে, এযুগের, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগের লোকের বিন্দুপরিমাণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শক্তি ছিল না।

---

১ এস্থলে বক্ষ্যমাণ রচনাটি যদি আমাকে কপালের গর্দিশবশত ইংরিজীতে লিখতে হত তবে 'পরাণভয়ে হরিণের ছোটা'টা হুবহু ফরাসী ইডিয়মে লিখতুম—Ventre a terre—অর্থাৎ with belly to ground; এমনি সামনের দিকে ঝুঁকে প্রাণপণ ছুটছে যে মনে হয় মানুষটার পেটটা বুঝি মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে। (ফরাসী শব্দতাত্ত্বিকদের জন্য 'ভাঁৎর' ভেনট্রিলোকুইস্ট্, পেট থেকে যে কথা বের করে; 'তের' টেরেসট্রিয়াল = পার্থিব তুলনীয়।)

ইংরিজী তো এদেশে প্রায় একশ' বছর ধরে কমপালসারি ছিল। ইংরিজী শিখলে আর্থিক সামাজিক উন্নতি হবে বলেই লোকে ইংরিজী শিখেছে। জ্ঞানার্জন করে চিত্তপ্রসারের জন্য ইংরিজী শিখেছে এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। এখন বলুন ক'টা লোক অবসর সময় ইংরিজী বই পড়ে, ইংরিজী বই কেনে? এ তো সাধারণ জনের কথা, কিন্তু প্রত্যয় যাবেন না, আমার পরিচিত একটি ছোকরা ইংরিজীর লেকচারার সর্বক্ষণ বাঙলা বাঙলা করছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সুন্দর দখল, কৌতূহল প্রশংসনীয়। ওদিকে ইংরিজীর বেলা সেখানে পড়াশুনো করে আরও চৌকশ হবার কোনও চাড় নেই। জানে যেটুকু ইংরিজী রপ্ত আছে সেইটে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে সে একদিন রীডার ও যথারীতি প্রফেসরও হবে।

এই সেমি-কমপালসরি সংস্কৃত, ফরাসী, আরবী (বা পালি লাতিন) নিন। সায়েনসে সীট পায়নি বলে, বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, প্রায় অনিচ্ছায় বি-এ পাশের সময় সংস্কৃত ছিল। হয়তো বা অনার্সও ছিল। তাদের ক'জনকে আপনি অবসর সময় সংস্কৃত (বা ফরাসী) পড়তে দেখেছেন, তার শেলফে নূতন কেনা সংস্কৃত বই দেখেছেন? ফারসী তো অতি সরল ভাষা—ক'জন ফারসী অনার্সওলা গ্রাজুয়েট ফারসী 'আউট-বুক' পড়ে?

অবশ্য যাঁরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় দুই বা তিনটি ভাষা শেখেন—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক সত্যেন বোস স্বেচ্ছায় ফরাসী জরমন শিখেছেন। এখনও ওই দুই ভাষায় বই পড়েন।

॥ ৩ ॥

অগুনতি দফে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, 'ইংরিজীতে'ই চলবে তো? অন্য কোনও ভাষা না জানলেও চলবে—না? কনটিনেনটে তো সবাই ইংরিজী বোঝে,—না?'

হুঁ, বোজে। খুব বোঝে! তবে শুনুন। গল্পটি অবশ্য প্যারিস সংক্রান্ত নয়—যদিও খুদ প্যারিসেরই কোনও একটা মুদির দোকানে তেল নুন কেনার চেষ্টা করে দেখুন না ইংরিজীর মারফৎ—তবে এটি পৃথিবীর যে-কোনও জায়গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করেও বলা যায়।

প্রভাঁসের একটি দোকানের সামনে বেশ মোটা মোটা হরফে লেখা : 'ENGLISH SPOKEN'। এটার উদ্দেশ্য মারকিন ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করা। ইংরেজকে নয়। কারণ ফরাসী জাত বিস্তর মার খেয়ে খেয়ে ভালো করেই জানে, ইংরেজ কিপটেমিতে প্রায় তাকেও হার মানায় এবং জাতটার আগাপাস্তলা বেনেদের হাড্ডি দিয়ে তৈরি বলে দোকানের প্রত্যেকটি জিনিসের পাইকিরি ভাও, খুচরো দর, কমিশন, সেল ট্যাক্স দফে দফে জানে। তা সে-কথা থাক গে।...এস্থলে ঢুকেছে এক মারকিন। খাজা মারকিন ড্রল (আড়) সমেত একাধিকবার মারকিন জবানে বলে গেল তার প্রয়োজন অথচ কাউনটারের পিছনে ফরাসী দোকানীউলী শুধু মিটমিটিয়ে মৌরী হাসি চিবোয়—মাল কাড়বার কোনও নিশানাই নেই। মারকিন বার বার একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলো, মাদাম তার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে তখন সে সেই সাইনবর্ড-টার দিকে আঙুল তুলে বললে, 'তবে ওটা ওখানে ঝুলিয়েছ কি করতে? ইংরিজী যখন বোঝো না এক বর্ণও?'

এবারে যেন মাদাম ব্যাপারটা বুঝেছে—নিশ্চয়ই এ ফার্‌স্ আকছারই হয়—একগাল হেসে তার ইংরিজীভাষা ভাণ্ডারের শেষ শব্দটি খরচা করে বললে, 'উই, উই, ইয়েস ইয়েস, "এঙলিশ স্পোকেন!" সারতেনলি। আওয়ার কস্‌তোমার্‌স্ স্পীক—উই নৎ স্পীক'—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, "ইংরিজী বলা হয়" বই কি! আমাদের খদ্দেররা বলেন। আমি বলি না।'

এটি মনে রাখবেন। আপনার অন্য কোনও কাজে না লাগলেও এটি দিয়ে ব্যাকরণের প্যাসিভ ভইস এবং তস্য প্রসাদাৎ কি কি সুখ-সুবিধে হয় সেটা বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন। মাদাম তো আর নোটিশে বলেনি, 'উই স্পীক ইংলিশ', বলেছে 'ইংলিশ স্পোকেন'—এবং ইহসংসারে কে কোথায় ইংরিজী বলে কি না বলে, সেটা কুইনজ ইংলিশ না সাউথ ক্যারোলাইনার নিগার ইংলিশ সে খতিয়ান দেবার জিম্মেদারি তো বেচারী প্রভাঁসিনী দোকানউলীর নয়!

খোদ প্যারিসের মুদির কথা বলছিলুম। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'তুমিও য্যামন! আমি কি প্যারিস যাচ্ছি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলের জন্য!' এস্থলে আমাকে একটু কথা কাটতে হল। বলতে কি, আমার মনে হয়, এই সব বস্তু আপনি যদি প্যারিসে কিনে এদেশে চালান দিতে পারেন—অবশ্য অস্মদ্দেশীয় সদাশয় সরকার যদি তার উপর বেদরদ ট্যাক্‌শো না চাপান—তবে আপনার প্যারিস ভ্রমণের খরচটাই উঠে যাবে। আর ইতালির ব্রিন্‌দিসি, বারী অঞ্চলে চালের কিলো নিশ্চয়ই আড়াই/তিন টাকা নয়! সর্বোপরি অলিভ তেল! লাল হয়ে যাবেন, মোয়াই, লাল হয়ে যাবেন। ফ্রান্‌সের মার্সেই অঞ্চলের পাঁচসিকের তেল হেলায়—কালো বাজারে—নিদেন পঞ্চবিংশতি তঙ্কা! তা সে যাক্ গে! ইংরেজের সঙ্গে দু-শ' বছর ঘর করে আমি—সৈয়দের ব্যাটা—আমিও বেনে বনে গিয়েছি—প্যারিস পৌঁছে কোথায় না সন্ধান নেবো 'উবিগাঁ কোতি'র ভুরভুরে খুশবাই—তা না, ত্যালের কেলো, চেলের ভাও! লাও!

প্যারিসের—প্যারিসের কেন—পৃথিবীর পয়লা নম্বরী সর্ব হোটেলের ওয়েটার, 'রুমবয়', কাউন্টারের কেরানী এরা সবাই অল্প-বিস্তর ইংরিজী বলতে পারে। কিন্তু আপনি সে সব হোটেলে উঠবেন না—গ্যাঁটে আপনার অত রেস্তো নেই, থাকলে আমার লেখা পড়তেন না। আর যদি বলেন, না, আপনার সে রেস্তো আছে, তাহলে আর ভাবনা কি? আপনি কোন্ দুঃখে প্যারিস বার্‌লিনে কে কতখানি ইংরেজী বোঝে না তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন? রেখে দিন হাজার দুই আড়াইয়ের মাইনের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি—সে নিদেন আধা ডজন কন্‌টিনেনটাল ভাষা ঝাড়তে পারে, আপনাকে দেখতে হবে না। স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন তখন পোলাওই খান, ভাত খাচ্ছেন কেন, আর সে পোলাওয়ে ঘি ঢালতেই বা কঞ্জুসি কচ্ছেন কেন? বরদার মহারাজাকে দিনের পর দিন অনায়াসে মিশরে চলাফেরা করতে দেখেছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্র যখন প্রাগ বা বুডাপেশটে বক্তৃতা দিতেন তখন সেখানকার য়ুনিভারসিটির সব চেয়ে সেরা ইংরাজীবাগীশ অধ্যাপক হতেন তাঁর দোভাষী। এঁদের কথা আলাদা। আপনি যদি সে পর্যায়ের হন তবে আমার লেখা পড়ছেন কোন্ বদ্ বদ্‌কিসমতের গেরোতে?

পক্ষান্তরে দেখুন, জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধ খঞ্জ শ্রীধামে পৌঁছয় না, কেদার-বদরীর পুণ্যসঞ্চয় করে না! ভারতীয় কত কালা বোবা কপর্দকহীন প্রতি বৎসর মক্কায় গিয়ে হজ করে! রাখে আল্লা, মারে কে!

চলে যাবে, প্যারিসে ইংরিজী জানা না থাকলেও চলে যাবে, জানা থাকলে অল্পস্বল্প সুবিধে হতে পারে। লন্ডনে যদি শতেকে একজন লোক ফরাসী বলে, তবে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে প্যারিসের রাস্তায় হাজারে একজন ইংরিজী বলতো কিনা সন্দেহ। তাই আঁদ্রে মোরোয়া যিনি এই হালে গত হলেন, বা ল্যগুঈ কাজাম্যাঁ ফ্রান্স দেশের আজব চিড়িয়া, প্যারিসবাসী তাজ্জব মেনে শুধোবে 'ওরা ইংরিজী শিখেছিল! কি করতে? মরতে?'

জরমনিতে অবশ্য আপনার ইংরিজীজ্ঞান একটু বেশী কাজে লাগবে। যদ্যপি ওই দেশ ইংরেজের প্রতিবেশী নয়। তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার একটা কারণ আমাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বিজড়িত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জরমনির আপন ভূমির উপর কোনও সংগ্রাম হয়নি, অর্থাৎ কোনও বিদেশী সৈন্য সেখানে পদার্পণ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারকিনিংরেজ লড়াই করতে করতে, কদম কদম এগোতে এগোতে জরমনির এক বৃহদংশ দখল করে সেখানে থানা গাড়ে এবং কয়েক বৎসর সেখানে বাস করে। গোড়ার দিকের মারকিনিংরেজ চালিত মিলিটারী শাসনকর্তাদের ভাষা তখন যে অতি সামান্যও বলতে পেরেছে সে-ই রেশন সহজে পেয়েছে, ফালতো রুটিটা আণ্ডাটাও তার কপালে নেচেছে। আমার এক জরমন সতীর্থ ধরা পড়ে মারকিন দল জরমন সীমান্তে প্রবেশ করা মাত্রই। ইংরেজী বলতে তার ভালো অভ্যাস ছিল বলে (তার জন্য আমি স্বয়ং কিছুটা দায়ী। আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে আমি জরমন জানতুম না বলে সে তার টুটিফুটি ইংরেজী চালিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আমার জরমন খানিকটে সড়গড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে পুরনো অভ্যাস ছাড়েনি) মারকিনরা তাকে 'পত্রপাঠ' দোভাষীর—শব্দার্থে—নোকরি দিয়ে দেয়। ফলে তার বাচ্চাদের দুধের অভাব হয়নি, বৃদ্ধা রুগ্না শাশুড়ীর ওষুধপত্রের অভাব হয়নি। আর যে ভসভস করে অষ্টপ্রহর হাভানা সিগার ফুঁকেছে যা ইতিপূর্বে তার জীবনে কখনও জোটেনি। মার্কিন সৈন্য চলে যাওয়ার পর মনোদুঃখে সে ধূমপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। আমি তার জন্য গেল বারে বিড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। তার পুনরপি সেই মনস্তাপ। তবে আমি মাঝে-মধ্যে এখনও তাকে দু পাঁচ বাণ্ডিল পাঠাই। ভয়ে বেশী পাঠাতে পারিনে—জরমন কসটম্‌স আমাদের চেয়ে কম যান না।

১৯৪৪ থেকে জরমনির যা দুর্দিন গেছে বিশ্বের অর্বাচীন ইতিহাসে সেটা উল্লেখযোগ্য। মারকিনিংরেজ সেখানে থানা গাড়ার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাকে না রেশনের সন্ধানে ছুটতে হয়েছে ওদের পিছনে? সবাই পড়িমরি হয়ে তখন শিখেছে ইংরিজী। কবে কোন্ ঠাকুদ্দা একবার বেখেয়ালে একখানা 'গাইডবুক টু ইংলিশ' কিনেছিলেন, এ আমলের ঠাকুদ্দা তারই গা থেকে সন্তর্পণে ধূলি ঝেড়ে এক-পরকলাওলা চশমা নাকে চড়িয়ে লেগে গেলেন ইংরিজী অধ্যয়নে—ছাপাখানা আবার কবে বসবে, চশমার দোকান কবে খুলবে কে জানে?

এর পর আর কি আশ্চর্য যে প্রথম ইস্কুল ফের খোলা মাত্রই আণ্ডাবাচ্চারা ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করলো, তার তুলনায় আমাদের ঊনবিংশ সালের ইংরিজী শেখার প্রচেষ্টা ধূলির ধূলি।

একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়। চোখের জলে নাকের জলে শেখায়।

এই পরাধীনতাই পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা। আজ জগৎজোড়া মারকিনি ডলারের গরমাই। ইংরেজের তম্বী কমেছে, কিন্তু তিনিও আছেন। উভয়ের ভাষা মোটামুটি একই—ইংরিজী।

তাই আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি নে ইংরিজী না শিখে গুষ্টিসুদ্ধ দোভাষী না হয়ে আমাদের চলবে কি করে?

এ-কথা খুবই সত্য, ইংরিজী নিরঙ্কুশ বর্জন করা অনুচিত।

কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোককে ঘাড়ে ধরে দোভাষী বানিয়ে সে-সমস্যার সমাধান নয়।

ভঙ্গ বনাম কুলীন

যে-ভাষার প্রশংসায় এক শ্রেণীর মহাজন অধুনা পঞ্চমুখ সেই ভাষায় একটি প্রবাদ আছে : 'হে গভীর-সঙ্কট-সঙ্কুল-অরণ্যের-পথভ্রান্ত-পথিক, অরণ্য ভেদ করে জনপদে না পৌঁছবার পূর্বে হর্ষধ্বনি কোরো না।' অধম, আপ্তবাক্যটি বিস্মরণ করে হর্ষোল্লাস করে বসেছি, এমন সময় দেখি, আমি গভীরতম অরণ্যে। সেই শ্রেণীর সজ্জনগণ এখন আরও প্রাণপণ লড়াই দিচ্ছেন, ইংরিজী যেন সর্বাবস্থায় কলেজাদিতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বিরাজমান থাকে। বোধ হয়, অধুনা শিক্ষামন্ত্রী যে প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে দেখবেন বলে মনস্থির করে বসেছেন, এ সংবাদ এঁদের বিচলিত করেছে।

এই শ্রেণীর একাংশ কোনও তর্কাতর্কি না করে তারস্বরে ইংরিজী ভাষা-সাহিত্য ও তার প্রসাদগুণ কীর্তন করেন। সে কীর্তনের ঢংটি বড়ই মজাদার। সর্বপ্রথম তাঁরা বলেন, যাঁরা বাংলা বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে চান তাঁরা অজ্ঞ; তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মূল নীতিই জানেন না। যেহেতু এঁদের প্রবন্ধাদি ও ইংরিজী কাগজে ছাপা চিঠিতে এঁদের নাম থাকে তাই প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, এঁরা বুঝি সুনীতি চাটুয্যের গুরুসম্প্রদায়। কারণ এনারা যখন বলেন, আমরা লিনগুইস্‌টিক্ জানি না, তখন আমরা ধরে নিই, আমরা জানি আর নাই জানি, তেনারা অতি অবশ্যই জানেন। এবং লিনগুইস্‌টিক্‌স তো আর মাত্র একটি বা দুটি ভাষা শিখেই আয়ত্ত করা যায় না—অতএব এঁরা নিশ্চয় এন্তের, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভাষা, বিলক্ষণ রপ্ত করার পর আমাদের 'অজ্ঞ' বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। কিন্তু কই, এঁদের নাম তো ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের নাম করার সময় কেউ বলে না। এঁরা তা হলে নিশ্চয় ইংরেজ কবির আদেশানুযায়ীতে :

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে।
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে॥

'বিফলে' নয় 'বিফলে' নয়—আমরা সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। এবং চুপিচুপি বলছি, তাঁরা যে-প্রকারের ঢক্কানিনাদ করছেন তার থেকে সন্দ হয়, তাঁরাও নিঃসন্দেহ ছিলেন, আবিষ্কৃত হবেনই।

আইস সুশীল পাঠক, এবারে আমরা সেই সব 'জেম্'দের জলুস দেখে হতবাক হই

(ইংরিজীতে অবশ্য 'জেম্' বক্রোক্তিতে ব্যবহার হয়; যেমন কেউ যখন বলে, 'এই প্রেশাস ''জেম্''টি তুমি পেলে কোথায়?' তখন তার অর্থ 'এই আকাট পণ্টকটিকে তুমি আবিষ্কার করলে কোত্থেকে?' আমি কিন্তু দোহাই ধর্মের, সেভাবে বলছি নে), এঁদের সৌরভ শুঁকে কৃতকৃতার্থ হই।

কেউ কেউ বলেন, বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে ইংরিজি ভাষার বৃদ্ধি (গ্রোথ) অধ্যয়ন করলে রোমাঞ্চ হয় (এ থ্রিলিং স্টাডি)! অবশ্যই হয়! আমরা শুধোব, কোন্ ভাষার ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস পড়লে রোমাঞ্চ হয় না? তবে ইংরিজীর বেলা একটু বেশী হয়। কেন বেশী হয়? এই সম্প্রদায় বলেন, ইংরিজী তার শব্দসম্পদ আহরণ করছে অন্যান্য বহু ভাষা থেকে—যেমন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, হীব্রু, আরবী, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা—এস্তেক হিন্দী-বাংলা থেকে। তবেই নাকি সম্ভব হয়েছে, এঁদের মতানুসারে—শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ারড্স্ওয়ারথ্, টেনিসন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিস্তর ভাষা থেকে এন্তের শব্দ নিয়েছে বলে ইংরিজীতে অত-শত উত্তম কবি—এ সিদ্ধান্তটি পরে আলোচনা করা যাবে।

এই যে থ্রিলিং স্টাডি সেটা সম্ভব হয়েছে ইংরিজী অন্যান্য ভাষা থেকে বিস্তর শব্দ নিয়েছ বলে। সাধু প্রস্তাব!...এস্থলে আমরা তাহলে এ তথ্যের আরেকটু পিছনে যাই—যথা, ইংরিজী অত বিদেশী শব্দ নিল কোথায়, কেন, কি প্রকারে? আমি কথা দিচ্ছি, এটা আরও থ্রিলিং হবে।

(১) কোনও দেশ পরাধীন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও পরাধীন হয়ে যায়। নরমান বিজয়ের পর ইংরিজী যে প্রায় তিনশ' বছর অবহেলিত অপাঙ্ক্তেয় ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। এস্থলে বিজয়ী জাত যদি শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতায় বিজিত জাতের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয় তবে বিজিত ভাষা ক্রমে ক্রমে বিদেশী ভাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায়। তাই আজও ইংরেজ সব চেয়ে বেশী ঋণী ফরাসীর কাছে। এমন কি, যেসব গ্রীক লাতিন শব্দ নিয়েছে তার চোদ্দ আনা ফরাসীর মারফৎ।

হুবহু এই ঘটেছিল ইরানে, সে দেশে আরব বিজয়ের ফলে। তাদের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম হুবহু তিনশ' বছর ছিল আরবী। সে ভাষার প্রভাব ফারসীর উপর এতই প্রচণ্ড যে, আজ আরবী শব্দ বর্জন করলে ফারসী এক কদমও ('কদম' শব্দটাও আরবী) চলতে পারবে না। হুবহু তেমনি উর্দুর উপর (বা প্রাকৃত হরিয়ানার উপরও বলতে পারেন) ফারসীর প্রভাব পড়েছিল ও ফারসীর মারফৎ আরবীর।

পক্ষান্তরে ফ্রান্স বা জরমনির উপর কোন বিদেশী বেশী কাল রাজত্ব করেনি বলে ফারসী-জরমনে বিদেশী শব্দ—ইংরিজী যে রকম বে-এক্তেয়ার হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় মুষ্টিমেয়।

(২) এর পর যদি সেই বিজিত জাত—এস্থলে ইংরেজ—বিধির লেখনে আপন দেশ ছেড়ে বাণিজ্য করতে বেরয়, সেই বাণিজ্য রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্য জয় করতে আরম্ভ করে, এবং সর্বশেষে রাজত্ব করার ছলে ডাকাতি করে—চরকা পুড়োয়, আফিঙ গেলাবার জন্য সঙীন চালায়, শত্রু ঠেকাবার জন্য কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, ড্রাই-আরথ পলিসি এক্তেয়ার করে, নিরন্ধ্রবাগ-আবদ্ধ অসহায় নর-নারীকে যারা পাশবিক হুহুঙ্কারবলে গুলি করে মারে, তারা দেশে ফিরে স্বয়ং সম্রাটের আশীর্বাদাভিনন্দনসহ সূপপ্লেট সাইজের

মেডেল পায়—তবে, তখনই, সেই 'বাণিজ্য' সেই 'রাজত্ব' সেই ডাকাতি—এক কথায় সেই রক্তশোষণ, সেই এক্‌স্‌প্লয়টেশনের চৌকশ সুবিধার জন্য সেই সব মহাপ্রভুরা বহু ভাষা শেখেন এবং তারই ফলে তাদের আপন ভাষাতে বেনোজলের মত হুড়হুড় করে বিদেশী শব্দ ঢোকে।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস, যে-বিজিত জাত ইতিপূর্বেই বিজয়ী জাতের কাছ থেকে অকাতরে শব্দ নিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারাই পরবর্তীকালে অন্য জাতকে শোষণ করার সময় আরও অকাতরে শব্দ নিতে পারে। এদের তুলনায় ফরাসী-জরমন অনভিজ্ঞ বালখিল্য। তদুপরি এরা চেয়েছিল প্রধানত রাজত্ব করতে; 'বাণিজ্য' করতে নয়। এরা 'নেশন অব্ শপ্‌কীপার্‌জ' বা 'শপ্‌লিফ্‌টারজ' নয়। 'বণিকের মানদণ্ড' যখন 'পোহালে শবরী' দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে' তখন সে 'রাজদণ্ডে'র সর্বাঙ্গে বেনে-দোকানের কালিঝুলির চিত্র-বিচিত্র ছোপ আর সপসপে ভেজাল তেলের দুর্গন্ধ।

শুনেছি, কোনও কোনও আন্তর্জাতিক গণিকা বাইশটি ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারে। তাদের সেই ভাষাজ্ঞান নমস্য, কিন্তু পদ্ধতিটা গ্রহণ না করাই ভালো। ইংরেজের শব্দভাণ্ডার হয়তো বা নমস্য—আমি এস্থলে তর্ক করবো না, কিন্তু তার পদ্ধতিটা ঘৃণ্য। পাঠক এটা দয়া করে ভুলবেন না। যদ্যপি এস্থলে এটা ঈষৎ অবান্তর তবু মনে রাখবেন, প্রথম গোলাম হতে হবে, পরে ডাকাত হবেন, তবেই শব্দভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এবারে চরে খান্ গে—যার যা খুশী করুন। এবং স্বীকার করুন, এ স্ট্রাডি থ্রিলিংতর নয় কিনা?

কিন্তু দোহাই ধর্মের, পাঠক ভাববেন না, গোলামির কড়ি তথা লুটের মাল দিয়ে ভরতি ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করতে আমি অনিচ্ছুক। ডাকাতির মোহরও মোহর, পুণ্যশীলের মোহরও মোহর। ফোকটে পেয়ে গেলে ব্যবহার করবো না কেন? মধুভাণ্ডের রস তো আগাপাস্তলা চোরাই মাল—সেটা জেনেও তো কবিগুরু সিলেটের কমলালেবুর জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন। এটা তো তবু নির্দোষ উদাহরণ। শাহ-জাহানের হারেম ছিল ফেটে-যাওয়ার মত ভরতি। তথাপি তিনি মাঝে-মধ্যে বাজার থেকে রমণী আনতেন। অনুযোগ করাতে বলতেন, 'হালওয়া মিষ্টি, তা সে যে কোন দোকান থেকেই আসুক।' 'হালওয়া নীক অস্‌ত্,—অজ্ হর্ দুকান্ বাশ্‌দ'—না কি যেন বলে ফারসীতে।

কিন্তু প্রশ্ন, মিশ্রিত ভাষা হলেই বুঝি তিনি অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ একচ্ছত্রাধিপতি? ফরাসী ভাষা লাতিনসম্ভূতা, এবং সে কিছু গ্রীক শব্দ নিয়েছে। ইটিকে প্রায় অবিমিশ্র ভাষা বলা চলে। তবে কেন মিশ্রিত ভাষার পদগৌরবদম্ভমদমত্ত 'সায়েব-লোগ' হন্যে হবে অবিমিশ্রা ফারসী ভাষার পিছনে পড়িমরি করে? আসলে ভঙ্গজ চৌষট্টি-আঁসলা সর্বত্রই কুলীনের জন্য ছোঁক ছোঁক করে।

মিশ্র বলেই নাকি ইংরিজী শেক্সপীয়র, মিলটন পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তা হলে হায় কালিদাস! তোমার কি গতি হবে, বাছা? তোমার শকুন্তলা, রঘুবংশ, মেঘদূতের পেটে বোমা মারলেও যে তাদের জবান থেকে বিদেশী লবজো বেরুবে না!

হায় হোমর, ইস্‌কিলস, আরিসতোফানেশ, ইউরিপিদিশ!

কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজ তো এখনও প্রতি বৎসর এঁদের কাব্য লক্ষ্য লক্ষ্য ছাপায়—নয়া নয়া অনুবাদ করে!

প্রাচীন যুগের আধা-মিশ্র আরবী ভাষায় কবিকুল, ওল্‌ড টেস্‌টামেন্‌টের সল্, দায়ুদ

সলমনের 'সঙ অব্ সঙ্জ'—তোমরা তো বানের জলে ভেসে গেলে। দান্তের স্মরণে দীর্ঘনিঃশ্বাস দীর্ঘতর হল। সান্ত্বনা, চীন-জাপানের কবিদের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁরা অন্-ওয়েপ্ট, অন্-অনর্ড, অন্‌সাঙ হয়ে রইলেন।

· পাপমুখে কি করে আর বলি, এক পাল্লায় মিশ্রিত ভাষার কবি, অন্য পাল্লায় অবিমিশ্র ভাষার কবিকুল তুললে কোন্‌টা ওজনে ভারি হবে সে নিয়ে আমার মনে সন্দ আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, ইংরিজী কাব্যে যে ভেরাইটি আছে অন্য কাব্যে নেই। উত্তরে বলি, ফরাসী গদ্যে যে ভেরাইটি আছে; ইংরিজী গদ্যে তো নেই। এবং অনেকে বলতে পারেন, 'বত্রিশভাজা'ই দুনিয়ার সর্বোত্তম খাদ্য নাও হতে পারে। 'সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস!'

বি বি সি সম্প্রতি এক্‌সবারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ইংরিজীই এখন পৃথিবীর সব চেয়ে চালু ভাষা।' অবশ্যই। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে সেটা চালু হল—যার বয়ান এইমাত্র দেওয়া হল—সেটি বলতে ভুলে গেলেন। হয়তো বা সে-স্থলে সেটি অবান্তর ছিল। তারপর সগর্বে বললেন, 'হালের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন—থুড়ি, সেমিনারে—দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়; তার নটা ছিল ইংরেজীতে।

আমি বলি, 'অধুনা ডাক্তারদের একটি সেমিনারে দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়। তার ন'টি ছিল ক্যানসার সম্বন্ধে', তবে নিশ্চয়ই ক্যানসারের গর্ব অনুভব করা উচিত।

পদ্ধতিটা কি সম্পূর্ণ অবান্তর?

ইংরেজ তার মিশ্রিত ভাষার প্রশংসা করে। তাই শুনে শুনে এদেশের অনেকেই ইংরেজের গলার সঙ্গে বেসুরো গলা মেলান। কিন্তু তর্কস্থলে একবার যদি ধরে নিই, ইংরেজের ভাষা যদি ফরাসীর মত অপেক্ষাকৃত ঢের ঢের অবিমিশ্র হত, তা হলে কে কি করতো? নিশ্চয়ই উচ্চতর কণ্ঠে বলতো, 'ভো ভো ত্রিভুবন! শৃন্বন্তু বিশ্বে...ইত্যাদি ইত্যাদি...এই যে আমাদের ভাষা, সে কী নির্মল কী নির্ভেজাল! সে কোনও ভাষার কাছে ঋণী নয়, সে স্বয়ংপ্রকাশ। ওহো হো হো, সে কী পূত, পবিত্র—পর্বতনির্ঝরিণীর ন্যায় অপাপবিদ্ধ। আইস, ইহাতে অবগাহন করিবা!'

এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? সে তার আপন রক্ত অমিশ্র রাখতে চায়, ইস্তক তার ঘোড়া, তার কুকুরটাকে পর্যন্ত দো-আঁসলা হতে দেয় না। এদেশের হুদো হুদো পকেট-ছুঁচোর-কেত্তনওলা মী লাট্‌রা আপন আপন রক্তের বিশুদ্ধতা (অবশ্য কিঞ্চিৎ নরমান বেআইনী ভেজাল আছে বইকি!) ভাঙিয়ে মারকিন মুল্লুকে পয়সাউলী শাদী করছেন। প্রত্যয় যাবেন না, এই হালে বি বি সি-তেই এক ইংরেজ চারচিলের বিদেশী মাতার প্রতি ইঙ্গিত করে (যদ্যপি মাতা অধিকাংশ মারকিনের মত গোড়াতে ইংরেজই বটেন) বলেন, 'হী উয়োজ নেভার কুআইট ওয়ান অব আস।' শুনেছি চারচিল পার্লামেন্টে তাঁর জীবনে মাত্র একবার হুট্ হয়েছিলেন, তাঁর বক্তৃতা চিৎকারে অসমাপ্ত থেকে যায়—তিনি যখন ড্যুক অব উইন্‌জারের মারকিন রমণী বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করতে চান।

সব বাবদে ইংরেজ অবিমিশ্র থাকতে চায়—শুধু ভাষার বাবদে ব্যত্যয়!

আসলে ভাষাটা বর্ণসংস্কার হয়ে গিয়েছে যে! এখন এরই প্রশংসার আসমান ফাটাও!

আমরাও হুক্কা হুয়া করি। দু-একটা নরস্‌মেন, গোটা-দুই ফরাসীও করেছে। কেউ কিছু বললে, ওদের দোহাই দেব।

হিটলার পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদি পোড়াল নরডিক্ রক্ত অমিশ্র রাখার জন্য।
ইংরিজী ভাষা নির্মিত হল কত পরাধীন জাতের রক্তশোষণের পিঠ পিঠ।

কিন্তু ইহসংসারের সর্বাপেক্ষা মিশ্রিত, বর্ণসংকর ভাষা কোন্‌টি—ইংরিজী যার একশ' যোজনের পাল্লায় আসতে পারে না? বেদেদের, জীপসিদের ভাষা। নর্‌থ-পোল থেকে সাউথ-পোল, পৃথিবীর নগণ্যতম ভাষার অবদানও এ-ভাষাতে আছে। বস্তুত, মূলত ইটি কোন্ দেশের ভাষা, আর্য সেমিতি না মঙ্গোলীয় জাতের, সেই তর্কেরই সমাধান হয়নি।

বিবেচনা করি, এ ভাষাতে আরও ডাঙর ডাঙর শেক্‌সপীয়র-মিলটন গণ্ডায় গণ্ডায়—'অসংখ্য রতন, ডেজার্‌ট-ফ্লাউয়ারের ন্যায়'—ঘাপটি মেরে আপসে আপসে আব্‌জাব করছেন!

একাধিক গুণী বলেন, বেদেদের ভাষা মূলে ভারতীয়। বৎস! আর কি চাই! কেল্লা ফতেহ্। আইস ভ্রাতঃ! সবে মিলি বেদেদের ভাষা শিখি॥

অর্থমর্থম্

বিশ্বের অন্যতম অসাধারণ লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক, যোদ্ধা টমাস এড্‌ওয়ার্ড লরন্‌স্ (Lawrence) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরব জগতে যে সুখ্যাতি অর্জন করেন তার কিংবদন্তী আজও সে অঞ্চলে সুপ্রচলিত! সে-যুদ্ধের সময় তুর্কী রাষ্ট্রের পরাধীন আরব ভূমি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনোভাব দেখালে পর তাঁর উপর ভার পড়ে আরবদের গেরিল্‌লা ও সাবোতাজ্ কর্মে পাকাপোক্ত করে তোলার।...একদা তুর্কী থেকে বেরিয়ে একখানা হজযাত্রী ট্রেন মদীনা যাবে। ওটাকে বিস্ফোরক দিয়ে কি করে ওড়াতে হয় তারই তালিম দিচ্ছেন লরন্‌স্ আরবদের। আসলে নিরীহ যাত্রীবাহী গাড়ি চুরমার করতে তাঁর মন মানছিল না। কিন্তু 'নবগীতা'য় নাকি 'সান্ধ্যসংস্কৃতে' আছে 'রণে চ প্রেমে চ দাক্ষিণ্য নৈব নৈব চ।' এন্তের তোড়জোড় করে লরন্‌স্ তো রেল লাইনের তলায় বিস্ফোরক পোঁতার কায়দাকেতা আরবদের শেখালেন বিশেষজ্ঞের গাম্ভীর্য ও তাচ্ছিল্য সহকারে। তারপর সবাই বিস্ফোরকের আওতার বাইরে এসে আশ্রয় নিলেন মরুভূমির একটা বালির ঢিপির পিছনে। দেখা গেল, দূর থেকে আসছে খেলনার গাড়ির মত হেলে দুলে মান্ধাতার আমলের ধাপামার্কা যাত্রীগাড়ী। সক্কলের চোখ গাড়িটার উপর ডাকটিকিটের মত সাঁটা। এই এল—এই এল—এই এসে গেল—বিস্ফোরকের বিসুভিয়াসটার উপর—ঐয্যা—কোথায় কি! গাড়িখানা দিব্য ঝ্যাক ঝ্যাক করে কাশতে কাশতে ফাঁড়াটা মোলায়েমসে পেরিয়ে গেল। ...আরবরা 'বিশেষজ্ঞে'র দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিল কিনা বলতে পারব না। লরন্‌স্ বলেছেন, 'দ আরটিসট ইন মি ওয়োজ ফ্যুরিয়স, দ ম্যান ইন মি ওয়োজ হ্যাপি।' ইংরিজীটা আমার হুবহু মনে নেই, কিন্তু এটা পরিষ্কার এখনও যেন কানে বাজছে, ভাষাটি তাঁর ছিল চমৎকার আর বলার ধরনটি সরেসেরও সরেস।...যেখানে লরন্‌স্ হুনুরির মত ফাঁদ পাতছেন সেখানে তিনি আর্‌টিসট্ 'পার-একসেলাঁস', সেখানে বেবাক বন্দোবস্ত বরবাদ ভণ্ডুল হলে ভিতরকার আর্‌টিসট্ সত্তা তো চটে যাবেই। কিন্তু সেই আর্‌টিস্‌টের পাশেই যে দরদী মাটির মানুষটি রয়েছে সে তো কতকগুলো নিরীহ

বালবৃদ্ধকে খুন করতে চায়নি। সে তখন বগল বাজিয়ে নৃত্য করছে।

ঘটনাটি যে এতখানি ফুলিয়ে বললুম তার কারণ, এ ব্যাপারটা একটুখানি ভোল বদলে আমাদের জীবনে নিত্য নিত্য ঘটে। যেমন মনে করুন, আপনি উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তদুপরি শখের বাগান করেছেন বহু বহু বৎসর ধরে। আপনার প্রতিবেশী একটি আস্ত জানোয়ার—পাড়াটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনি একদিন দেখেন, পণ্টকটার প্রাণে শখ জেগেছে, কোত্থেকে একটি অতি সুন্দর কামিনীর চারা যোগাড় করে সেটা পুঁততে যাচ্ছে এমনভাবে যে, সজ্ঞানে চেষ্টা করলেও এর চেয়ে বেশী ভুল করা যায় না! জায়গাটা বাছাই করেছে ভুল, গর্ত যা করেছে এবং সেটাতে জল আর কাঁচা গোবর যা ঢেলেছে তাতে দিল্লীর মিঞা কুৎব্‌মিনার একবার পা হড়কে পড়ে গেলে কাগজে বেরুবে মিঞা কুৎব্ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। পূর্বেই বলেছি—না বলিনি?—ফাঁসুড়েটার আশু পঞ্চত্ব কামনা করে আপনি কালীঘাটে শির্নি মানত করেছেন।...কিন্তু তখন আপনি আর থাকতে পারবেন না। আপনার ভিতরে যে হুনুরি, যে আর্‌টিস্‌ট ঘুমিয়ে আছে সে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠে চিৎকার করে করে বলবে, 'ওরে ও আহাম্মুখ, কামিনী এ ভাবে পোঁতে?'—তারপর ইন্‌স্পাইট অব ইওর সেল্‌ফ্ অর্থাৎ আপনার ভিতরকার হুনুরি আপনার ভিতরকার দুশমন মানুষটাকে পরোয়া না করে তাকে বাৎলে দেবে চারা পোঁতার কায়দাকেতা!!!

ভূমিকাটি মাত্রাধিক দীর্ঘ হয়ে গেল; তা হবেই। কথায় বলে

> বাইরে যাদের লম্বা কোঁচা
> ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি।
> খেতে মাখতে তেল জোটে না
> কেরোসিনে বাগায় তেড়ি॥

কালোবাজারীকে আমি আমার দুশমন বলে বিবেচনা করি। কালোবাজারী মাত্রই ক্যাপিটালিস্‌ট্; অবশ্য সর্ব ক্যাপিটালিস্‌ট্ই কালোবাজারী নয়। কম্যুনিস্‌ট্‌রা আবার সর্ব ক্যাপিটালিস্‌ট্‌কেই দুশমন সমঝেন। অর্থাৎ কম্যুনিস্‌ট্‌রা আমার দুশমনের দুশমন। ফারসীতেও বলে,

'দোস্‌ৎনীস্ত (নাস্তি), দুশমন-ই-দুশমন অস্‌ৎ (অস্তি)'—দোস্ত নয়, কিন্তু আমার দুশমনের দুশমন!...

পূর্বেই বয়ান দিয়েছি, মানুষের ভিতরকার আর্‌টিসট্ দুশমনকেও সাহায্য করে আর আমি দুশমনের দুশমনকে করবো না? কারণ আমার ভিতরেও একটা আর্‌টিসট্ রয়েছে। আত্মশ্লাঘা? আদৌ না। কোন্ মানুষের রক্তে আর্‌টিস্‌টের ছোঁয়াচ বিলকুল লাগেনি বলতে পারেন? এমন কি আমরা যাকে অভদ্র ভাষায় মিথ্যুক বলি সেও তো বেচারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ইংরিজীতে যেমন দড়কচ্চা-মারা গাছের বেলা 'এটার গ্রোৎ স্টান্‌টিড্'—ঔপন্যাসিক, কবি, এক কথায় আর্‌টিসট্। নোট যে লোক জাল করে সেও সুযোগ-থেকে-বঞ্চিত রবিবর্মা।

অতএব আমি যখন কম্যুনিসট্ ভায়াদের সদুপদেশ দিই তখন সেটা দম্ভজনিত আত্মশ্লাঘা বশত নয়। অবশ্য তাঁরা সেটা নেবেন কিনা, সেটা নিতান্তই তাঁদের বিবেচ্য। এবং আমি মনের কোণে এ-আশাও পোষণ করি যে তথাকথিত ধর্মভীরুজনও এদিকে

খেয়াল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অর্থনীতিবিদ শূমপেটার বলেছেন :—মারক্স যখন বিশ্বশ্রমিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন অনুমান করতে পারেননি যে, পৃথিবীর যে-কোনও স্থলে প্রথম ইন্‌কিলাবের ফলস্বরূপ প্রথম প্রলেতারিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই অন্যান্য দেশের ক্যাপিটালিস্‌টরা সেটা দেখে তার থেকে লেস্‌ন্ ড্র করে নিজেদের সেই অনুযায়ী এড্‌জাস্‌ট্ করে নেবে, মানিয়ে নেবে।[১] অর্থাৎ এযাবৎ যে যে বেধড়ক শোষণনীতি চালিয়েছিল সেটাকে মডিফাই করে প্রলেতারিয়াকে কিছু পরিমাণে ব্যবসাতে হক্ক দিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার, পেনশন, বেকারীর সময় ডোল, চিকিৎসার ব্যবস্থা, নানাবিধ ইনসিওরেন্‌স দিয়ে এমনই তার স্বার্থ নিজের স্বার্থে জড়িয়ে ফেলবে যে "একদিন সে দেখবে হি হ্যাজ মোর টু লুজ দ্যান মিয়ারলি ফেটারজ" অর্থাৎ ইন্‌কিলাব এনে সে অর্থনৈতিক পায়ের বেড়ি হাতের কড়ার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার ইনসিওরেন্‌সের সুবিধাও হারাবে। নবীন প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র বিনা মেহন্নতে ফোকটে পয়সা কামানোটা বিলকুল বরদাস্ত করে না। ক্যাপিটালিস্‌ট্‌দের এই এড্‌জাস্‌ট্ করে নেওয়াটাকে শুমপেটার তুলনা করেছেন রোগের বীজাণুর সঙ্গে; তারা যে রকম প্রাণঘাতী ওষুধের ইনজেকশন খেয়ে খেয়ে কালক্রমে ওষুধের সঙ্গে নিজেদের এড্‌জাস্‌ট্ করে নেয় তারপর সহজে নির্মূল হতে চায় না।

প্রশ্ন উঠবে, আমি কি তবে কম্যুনিস্‌ট্ ভায়াদের লেলিয়ে দিচ্ছি ধর্মের পিছনে, আর ওদিকে ধর্মানুরাগীজনকে বলছি, 'সাধু, সাবধান!'?

পাঠক যদি অনুমতি দেন, তবে এ প্রশ্নের উত্তরটি আমি উপস্থিত মুলতবী রাখবো। কারণ শুধু এরই জন্য আমাকে পুরো এক কিস্তি 'পঞ্চতন্ত্র' লিখতে হবে। উপস্থিত যেটা লিখছি তাতে এর স্থান সঙ্কুলান হবে না।

* * *

কম্যুনিস্‌ট্‌রা একটা মোক্ষম তত্ত্ব-কথা বলেন যেটা সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত। বস্তুত এ অধম এ-বাবদে গত ত্রিশ বছর ধরে চিন্তা করেছে, দলিল-দস্তাবেজ সন্ধান করেছে, ফের চিন্তা করেছে, এখনও করছে, উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

তাঁরা বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সব প্রগতিশীল আন্দোলন—ইন্‌কিলাব—যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখতে পাই তার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক কারণ—ইকনমিক্ কন্‌ডিশন্।'[২]

সকলেই স্বীকার করবেন, পৃথিবীতে সাতটি বড় বড় আন্দোলন—পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সাতটি প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়, এবং তার পাঁচটি এখনও পৃথিবীতে

---

১ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গত সপ্তাহে বিড়িওলাদের মিছিল গেল—বিড়ির পুঁজিপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। তারা ইনকিলা-া-া-ব দোহাই পেড়ে বলছিল 'ইনক্লাব জিন্দা-া-বাদ।' শিক্ষিত লোককেও আমি 'ইনক্লাব' উচ্চারণ করতে শুনেছি। আসল উচ্চারণ ইন্‌কিলা-া-া-ব —'লা'টা যতদূর চান দীর্ঘ করবেন। তারপর জিন্দাটা হ্রস্বে হ্রস্বে সারবেন। তারপর 'বাদ'টা বা-া-দ্ যতদূর খুশী দীর্ঘ। অর্থাৎ ইন্/কলা-া-া-ব্॥ জিন্/দা/বা-া-া-া দ॥

২ সর্ব ইনকিলাবের পিছনে যে অর্থনৈতিক কারণ থাকে সেটাই বিপ্লবের একমাত্র কারণ কিনা, কিংবা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিনা, সে আলোচনা এস্থলে থাক।

নানা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সে-সাতটি সচরাচর 'ধর্ম' নামে পরিচিত। ধর্মের নাম শুনে পাঠক অসহিষ্ণু হবেন না। 'আগে কহি'।

তার তিনটির জন্ম এ-দেশে—হিন্দু (সনাতন) বৌদ্ধ, জৈন। এ তিনটি আর্যধর্ম। শেষের জৈনধর্ম এখন পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধধর্মের রঙ্গভূমি বহু যুগ ধরে ভারতের বাইরে।

আর তিনটি আরব-প্যালেস্টাইন নিয়ে যে সেমিতি (সেমেটিক) ভূমি সেখানে : ইহুদি, খ্রীষ্টান ও 'মুসলমান ধর্ম' (ইসলাম)। এ-তিনটি সেমিতি ধর্ম। ইহুদিধর্মের বিশ্বাসীজন প্রায় দু হাজার বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর অধুনা সগৌরবে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, '—বিশ্বলোক ভাবিছে বিস্ময়ে/যাহার পতাকা/অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে/কোথা ছিল ঢাকা/'।

সপ্তমটির জন্মস্থল ভারত এবং সেমিতি ভূখণ্ডের মাঝখানে। এটিও খাঁটি আর্যধর্ম। প্রাচীন ইরানে এর জন্ম ও জরথুস্ত্রী বা জরথুস্ত্রের ধর্ম নামে পরিচিত। লোকমুখে এরা 'অগ্নি-উপাসক' আখ্যায় পরিচিত। ভারতবর্ষে এখন এই পার্সীদের—একমাত্র না হলেও—প্রধান নিবাসস্থল। ইহুদিদের সাত শত বৎসর পূর্বে এঁরা রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নেন। কিন্তু আজ যদি এঁরাও ইহুদিদের মত দুই সেন—মারকিন জনসেন আর ইংরেজ উইলসেনকে হাত করে প্রাচীন ইরানে অধুনা আফগানিস্তানে অবতীর্ণ হয়ে বল্‌খ্‌ (সংস্কৃতে হিল) বদখ্‌শান দখল করে 'আরিয়ানা' (আর্য) রাষ্ট্র প্রবর্তন করে তবে অন্তত আমরা আশ্চর্য হব না। বল্‌খ্‌ অঞ্চল রুশ সীমান্তের এ-পারে—মাঝখানে মাত্র আমুদরিয়া (নদী)—এবং এশিয়ার বুকের মধ্যিখানে। এখানে মারকিন-ইংরেজের একটি কলোনী বা ঘাঁটির বড়ই প্রয়োজন।...লাওৎসে, কন্‌ফুৎসর নীতিবাদ 'ধর্ম' নামে পরিচিত হয় না।

যে অর্থনৈতিক বাতাবরণের দরুন নবীন ধর্ম সৃষ্টি হয় তার অনুসন্ধান করতে গেলে ইসলাম নিয়ে আরম্ভ করাই প্রশস্ততম, কারণ এটি সর্বাপেক্ষা নবীন এবং ইসলামের পরে আর কোনও বিশ্বধর্ম জন্মগ্রহণ করেনি। তদুপরি আরবরা গোড়ার থেকে জাত-ঐতিহাসিক। তারা হজরৎ সম্বন্ধে যতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে গেছে তার তুলনায় খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের জীবনী অনেক কাঁচা হাতে মহাপুরুষদের তিরোধানের প্রচুর সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে। ফলে তাঁদের ছবিগুলো আইডিআলাইজড—আরটিস্‌ট্‌ কল্পনার উপর নির্ভর করেছেন বিস্তর।[১]

---

১ আমি এস্থলে বুদ্ধ যীশুর একমাত্র চিন্ময় রূপের মধ্যেই (অর্থাৎ আমরা যে কল্পনার বা আইডিআলাইজড বর্ণনার বুদ্ধ যীশুর ধারণা করি) নিজেকে সীমাবদ্ধ করছি। ওয়েল্‌স্‌ মৃন্ময় দিকটা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

'Jesus was a penniless teacher, who wandered about the dusty sun-bit country of Judea, living up·· casual gifts of food; yet he is always represented (অর্থাৎ ইয়োরোপীয় চিত্রে ভাস্কর্যে) as clean, combed and sleek in spotless raiment, erect and with something motionless about him as though he was gliding through the air.' এর পর ওয়েল্‌স্‌ দেখাচ্ছেন, এই মৃন্ময় ছবির উপরও চিন্ময় ছবির প্রভাব ফেলেছে—

হজরৎ যখন মক্কায় একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন তখন মক্কাবাসী সাড়ে তিনশ’ দেবতা স্বীকার করতো। আরেকটি বাড়লে আপত্তিটা কি? আর নামাজ রোজাতেই বা কি? পুজোপাট তারাও করে, আর উপোসটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু যে-ই তিনি প্রচার করলেন ধনীর উপর ট্যাকশো বসিয়ে সে-ধন তিনি গরীবদের, ‘হ্যাভনট’দের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তখনই লাগলো গণ্ডগোল। ওদিকে ‘হ্যাভনট’রা জুটলো তাঁর চতুর্দিকে—টাকাকড়ি নয়া করে ভাগাভাগি হলে তারাই হবে লাভবান! ধনী আদর্শবাদী জুটলেন অত্যল্পই, মক্কাবাসীরা তখন স্থির করলো, একে খুন না করে নিষ্কৃতি নেই।

খ্রীষ্টের বেলাও তাই।

তিনিও তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করেছিলেন সমাজের দরিদ্রতম স্তরের গরিব জেলেদের নিয়ে। অধ্যাত্ম জগৎ তথা নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সব উপদেশ তিনি দিলেন সেগুলো আজও পূর্ণ জীবন্ত কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলছেন কেউ তোমার জামাটি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিলে তাকে স্বেচ্ছায় জোব্বাটিও দিয়ে দিয়ো। এক পুণ্যশীল ধনীকে বলছেন, তোমরা সব-কিছু বেচে ফেলে গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

জেরূসলমের ইহুদি পুঁজিপতির দল তবু এসব গ্রাহ্য করেনি। ইতিমধ্যে সুলেমানমন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর রাজা হেরড দা গ্রেট নির্মাণ করেছেন এক বিরাট নবীন ঐশ্বর্যমণ্ডিত য়াহভে-মন্দির। কিন্তু মন্দির হোক আর সিনাগগই হোক জাব-ইহুদি ওটাকে দুদিন যেতে না যেতেই ব্যবসায়ের কেন্দ্রভূমি করে তুলেছে। সেখানে চলেছে গরুবলদের কেনাবেচা এবং তার চেয়েও মারাত্মক সুদখোর ইহুদি মহাজনরা সেখানে চালিয়েছে টাকার লেনদেন, সর্‌রাফের (ক্ষুদে ক্ষুদে বাঙ্‌কারের) বাট্টা নিয়ে টাকাকড়ির বদলাবদলি। বস্তুত এই সব পুঁজিপতিরাই তখন পুণ্যভূমির অধিকাংশ তাদের টাকার জোরে কব্জায় এনে ফেলেছে।

ইহুদিভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশ থেকে সহস্র সহস্র শিষ্যশিষ্যা, বিশ্বাসী গ্রামবাসী অনুগতজনকে নিয়ে প্রভু যীশু সগৌরবে প্রবেশ করলেন জেরূসলমে। সেখানে গেলেন সেই সর্বজনমান্য মন্দিরে। ব্যবসায়ীদের কারবার দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন, তবে তাঁর আচরণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

মহাজন, ক্রেতা-বিক্রেতাদের তিনি ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন মন্দিরের বাইরে। চতুর্থ সুসমাচার লেখক সেন্ট জন্ বলছেন (St. John) তিনি সুতোর দড়ি পাকিয়ে চাবুক বানিয়ে তাদের চাবকাতে চাবকাতে সেখান থেকে তাড়ালেন। টাকার থলেগুলো উজাড় করে ঢেলে দিলেন মাটিতে, ব্যাঙ্কারদের টেবিল করে দিলেন চিৎপাত। বললেন, ‘শাস্ত্রে আছে : আমার ভবনের নাম হবে “উপাসনা ভবন”; আর তোরা এটাকে করে তুলেছিস “চোরের আড্ডা” (ডেন্ অব থীভ্‌জ্)।’

সেই সময়েই স্থির করলে পুঁজিপতি ও তাদের ইয়ার যাজকসম্প্রদায়—যীশুকে বিনষ্ট

‘This alone has made him unreal and incredible to many people who cannot distinguish the core of the story from the ornamental and unwise additions of the unintelligently devout.’

বুদ্ধের সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ বাবদে হজরৎ অতিশয় সাবধান ছিলেন।

করতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে হবে।

* * *

ধনদৌলত-টাকাকড়ি।

অর্থমনর্থম্ বলেন গুণীজন। কিন্তু এও সত্য,—অর্থের সন্ধানে বেরুলে অর্থ (টাকাকড়ি) নাও পেতে পারেন, কিন্তু অর্থ পেয়ে যাবেন অর্থাৎ অর্থটা—মানেটা—বুঝে যাবেন। তাই অর্থমর্থমও বটে॥

আবার আবার সেই কামান গর্জন!

খুন করার পরই খুনীর প্রধান সমস্যা মড়াটা নিশ্চিহ্ন করবে কি প্রকারে? সমস্যাটা মান্ধাতার চেয়েও প্রাচীন। আমাদের প্রথম পিতা আদমের বড় ছেলে কাইন তাঁর ছোট ভাই আবেলকে খুন করেন। তাঁর সামনেও তখন ঐ একই সমস্যা, মৃতদেহটা নিয়ে করবেন কি? সাধারণ সাদামাটা বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি সেটাকে পুঁতে ফেললেন মাটির ভিতর। কিন্তু মাটিকে আমরা মা-টিও বলি; তিনি সইবেন কেন এক পুত্রের প্রতি অন্য পুত্রের এ রকম নৃশংসতা। তাই পরমেশ্বর কাইনকে বললেন, 'এ তুমি করেছ কি? মাটির (মা ধরণীর) তলা থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত যে আমাপানে চিৎকার করছে।' অর্থাৎ মাটিতে পুঁতেও নিস্তার নেই। তাই পৃথিবীর একাধিক ভাষাতে এটা যেন প্রবাদ হয়ে গিয়েছে। সন্দেহবশত গোর খুঁড়ে লাস বের করে পোস্ট-মরটমের ফলে যখন ধরা পড়ে লোকটার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল তখন ঐসব ভাষাতে বলা হয়, মৃতের রক্ত বা মা ধরণী মাটির তলা থেকে চিৎকার করছিল প্রতিশোধের জন্য।[১,২]

খুন-খারাবীর ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন লাস গায়েব করার জন্য যুগ যুগ ধরে খুনী কত না আজব-তাজ্জব কায়দাকেতা বের করেছে। অবশ্য খুনী যদি ডাক্তার হয় (না পাঠক, ডাক্তার-বদ্যি-হেকিম 'চিকিৎসা'র অছিলায় যে 'খুন' করে তার কথা হচ্ছে না) তবে তার একটা মস্ত বড় সুবিধা আছে। বছর বিশেক পূর্বে বিলাতবাসী এক 'কালা-আদমী' সার্জন তার মেম বউকে খুন করে; বাথটাবে লাস ফেলে সেটাকে ডাক্তারি

---

১ মূল গল্পের ধারা অনেক ক্ষেত্রে ফুটনোটের আধিক্যবশত বাধা পায়। অধম কিন্তু ফুটনোট শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দেয়—অর্থাৎ কোনও পাঠক যদি ফুটনোট আদৌ না পড়েন তবে তিনি মূল গল্পের (টেক্স্‌টের) কোনও প্রকারের সারবস্তু থেকে বঞ্চিত হবেন না। ফুটনোটে থাকবার কথা মূল গল্পের—বক্তব্যের—সঙ্গে সম্পর্কিত নানাপ্রকারের আশ-কথা পাশ-কথা, যেগুলো অত্যধিক কৌতূহলী পাঠক পড়েন যাতে করে কিঞ্চিত ফালতো জ্ঞান সঞ্চয় হয় কিংবা/এবং যাঁরা বইখানা পয়সা দিয়ে কিনেছেন বলে বিজ্ঞাপনতক্ বাদ দেন না। অন্যদের জন্য মিষ্টান্নই যথেষ্ট—অর্থাৎ আটপৌরে পাঠক টেক্স্‌ট্ পড়েই সন্তুষ্ট। ফুটনোটে এমন কিছু দেওয়া যেটা না পড়লে মূল কাহিনী বুঝতে অসুবিধা হয়—লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

২ ভ্রাতৃহত্যার চিহ্নস্বরূপ সদ্যপ্রভু কাইনের কপালে একটি লাঞ্ছন এঁকে দেন। লেখকের 'প্রেম' অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

কায়দায় টুকরো টুকরো করে কেটে ড্রইংরুমের চিমনিতে ঢুকিয়ে দিয়ে সমুচহ লাসটা পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু 'পাক প্রণালীতে' করলো একটা বেখেয়ালির ভুল। তখন ভর গ্রীষ্মকাল—ড্রইংরুমে আগুন জ্বালাবার কথা নয়। দু'একজন প্রতিবেশী ঐ ঘরের চিমনি দিয়ে যে ধুঁয়ো উঠছে সেটা লক্ষ্য করলো। ডাক্তারের বউ যে হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়, সে যে মাঝে মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে 'সাইড-জাম্প্' দিত, স্বামী-স্ত্রীতে যে ইদানীং আক্ছারই বেহদ্দ ঝগড়া-ফসাদ হত এসব তত্ত্ব পাড়াপড়শীর অজানা ছিল না। পুলিশ সন্দেহের বশে সার্চ করে চিমনিতে ছোট্ট ছোট্ট হাড় পেল, চানের টাব্টা যদিও অতিশয় সযত্নে ধোওয়া-পোঁছা করা হয়েছিল তবু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে মানুষের রক্তের অভ্রান্ত চিহ্ন পাওয়া গেল। ...মোদ্দা ডাক্তারকে ইহলোক ত্যাগ করার সময় মা ধরণীর সঙ্গে সমান্তরাল (হরাইজন্টাল) না হয়ে লম্বমান (পারপেন্ডিকুলার) হয়েই যেতে হয়েছিল।

অবশ্য ডাক্তারের ফাঁসি হওয়ার পর তার আপন লাস নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না—কারোরই। যে সরকারী কর্মচারী—অশ্লীল ভাষায় যাকে বলে 'হ্যাঙম্যান'—ডাক্তারের গলায় প্রয়োজনাতীত দীর্ঘ প্রয়োজনাধিক দৃঢ় একটি নেক্টাই সযত্নে পরিয়ে ডাক্তারের পায়ের তলার টুলটি হঠাৎ লাথি মেরে ফেলে দেয় সে এই 'অপকর্ম্ম'-টি করেছিল জজসাহেবের আদেশে, সামনে ঐ ডাক্তারেরই পরিচিত আরেক ডাক্তারকে এবং জেলারসাহেবকে সাক্ষী রেখে। শুনেছি, এদেশের সরকারী ফাঁসুড়ে আসামীর গলায় দড়ি লাগাবার সময় তাকে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'ভাই, আমার কোনও অপরাধ নিয়ো না; যা করছি সরকারের হুকুমে করছি।' ইউরোপীয় ফাঁসুড়েদের এ-রকম ন্যায়ধর্মজাত কোনও সূক্ষ্মানুভূতি নেই। সেখানে ফাঁসুড়ে তার মজুরির উপর ফাঁসির দড়াটা বকশিশ পায় এবং সে সেটা ছোট ছোট টুকরো করে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আক্রাদরে বেচে—ফাঁসির দড়ি নাকি বড্ড পয়মন্ত।

কিন্তু সরকার, রাজা বা ডিক্টেটর যেখানে বেআইনী খুন করে সেখানে এদের সামনেও সেই সমস্যাই দেখা দেয়। যখন পাইকিরি হিসেবে খুন করা হয় তখন দেখা দেয় আরও দুটি সমস্যা :

(১) যাদের খুন করা হবে তাদের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কি প্রকারে তাদের একজোট করা যায়?

(২) খুন করার জন্য অল্প খরচে অল্প সময়ে কি প্রকারে বিস্তর লোকের ভবলীলা সাঙ্গ করা যায়?

জরমন মাত্রই স্ট্যাটিস্টিকসের ভক্ত। একশ'টি মেয়েছেলের মধ্যে যদি নব্বুইটি কুমারী হয়, এবং দশটি গর্ভবতী হয় তবে তারা টরেটক্কা হিসেব করে বলে এই একশ'টি মেয়ের প্রত্যেকটি নব্বুই পারসেন্ট্ অক্ষতযোনী কুমারী এবং দশ পারসেন্ট্ গর্ভবতী।

হিটলার এই ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন করে বললেন, 'নব্বুই পারসেন্ট্ তো ইহুদি—বাদবাকি দশ পারসেন্ট্ জিপ্সি, পাগল (বসে বসে শুধু খায়, লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনও সাহায্যই করে না) ইত্যাদি। ঐ হল!—জিপ্সিও নব্বুই পারসেন্ট্ ইহুদি।' হিসেবে মিলে গেল।

দেখা গেল, হিটলারের তাঁবেতে ১৯৪১-৪২ সালে যে-সব রাষ্ট্র এসেছে এবং আসছে তাতে আছে প্রায় আশি লক্ষ ইহুদি—এখানে আমি জিপ্সি, পাগল, হিটলারবৈরী ফরাসী-

জরমন-রুশ ইত্যাদিকে বাদ দিচ্ছি। হিটলার ডাকলেন হিমলারকে। ইনি পুলিস, সেকুরিটি, ইনটেলিজেন্স, হিটলারের আপন খাস সেনাদল (এরা দেশের সরকারী সৈন্য বিভাগের অংশ নয়) কালো কুর্তীপরা এস এস এবং আরও বহু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিকারী 'ফ্যুরার'। হিটলার এঁকেই হুকুম দিলেন 'চালাও, কৎল্-ই-আম্।' অর্থাৎ পাইকারি কচুকাটা! নাদির তীমুর যখন দিল্লীতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তখন 'কৎল্-ই-আম্'ই করেছিলেন। 'আম'= সাধারণ (দিওয়ান-ই-আম তুলনীয়) আর 'কৎল'=কতল। অবশ্য নাদির-তীমুর কৎল্-ই-আম্ করেছেন প্রকাশ্যে। হিটলার হিমলার করলেন অতিশয় সঙ্গোপনে।[১] বস্তুত হিমলার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন সেটা যেমন অভিনব এবং কুটিল, তেমনি ক্রূর এবং মোক্ষম। তদুপরি বাইরের থেকে তাবৎ ব্যাপারটা যেন করুণাময়ের স্বহস্তে নির্মিত নিষ্পাপ কবুতরটি; ভিতরে ছিল শয়তানের সাঙাৎ কালকুটেভরা বেইমান, অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী, কালনাগিনী। এ এক অভিনব সমন্বয় : বাইরে কবুতর, অন্তরে বিষধর।

পূর্বেই বলেছি, প্রথম সমস্যা : তাবৎ ইহুদি একত্র করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে? এই মর্মে একটি গোপন সভা আহ্বান করলেন হিমলারের ঠিক নীচের পদের কর্তা হাইডেরিষ বার্লিনের উপকণ্ঠে তাঁর শৌখিন ভিলা ভানজেতে। এ-সভায় আইষমানকেও ডাকা হয়, যদিও পদগৌরবে তিনি এমন কিছু কেষ্টবিষ্টু ছিলেন না। কিন্তু হাইডেরিষ ছিলেন সত্যিকার 'আদম শনাস' মানুষের জৌরি—তিনি জানতেন আইষমান তালেবর ছোকরা, যতই ঝুট-ঝামেলার ঝকমারি ব্যাপার হক না কেন সেটার বিলিব্যবস্থা করে সব কিছু ফিটফাট করে নিতে সে পয়লা নম্বরী! সেই সুদূর স্তালিনগ্রাদ থেকে ফ্রান্সের পূর্ব উপকূল, ওদিকে নরওয়ে থেকে উত্তর আফরিকা অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ইহুদিগোষ্ঠী। আইষমানের উপর ভার পড়লো আড়কাঠি হয়ে এদের কয়েকটি কেন্দ্রে জড়ো করা।

আইষমান সম্বন্ধে বাঙলাতেও বই বেরিয়েছে; কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হবে না। শুধু একটি কথা এখানে বলে রাখি; বাঙলা বইয়ে আছে আইষমান পাঁচ লক্ষ ইহুদির মৃত্যুর জন্য দায়ী। এটা বোধ হয় স্লিপ। পাঁচ লক্ষ নয়, হবে পাঁচ মিলিয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ।

শব্দার্থে ছলে বলে এবং কৌশলে আইষমান যে ভাবে ইহুদিদের জড়ো করে ছিলেন সেটা এত সুচারুরূপে আর কেউ সম্পন্ন করতে পারতো না এ-কথা তাবৎ নাৎসি, অ-নাৎসি সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

---

১ হিটলারের খাস 'ভালে' ছিলেন লিঙে। তিনি এতই বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন যে হিটলার-প্রিয়া (পর-স্ত্রী) এফা ব্রাউনের বিছানা পর্যন্ত করে দিতেন। যুদ্ধ শেষে দশ বৎসর রুশদেশে বন্দীজীবন কাটিয়ে জরমনি ফিরে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। 'হিটলারের প্রেম' ও 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' (পুস্তকাকারে প্রকাশিত) প্রবন্ধে এঁর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লিঙেকে যখন পরবর্তীকালে শুধনো হয়, ইহুদি নিধন সম্বন্ধে বহু জরমন কিছুই জানতো না কেন, তিনি বলেন, হিটলার-হিমলার বহুবার সম্পূর্ণ একলা একলা গোপন সলাপরামর্শ করতেন। সে সময়ে সেখানে লিঙের চা-কফি নিয়ে যাওয়াও মানা ছিল।

অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, ইহুদিদের প্রতি হিটলারের এই যে আক্রোশ এর তো তুলনা পাওয়া ভার। এর কারণটা কি?

এর উত্তর দিতে হলে তিনভলুমী কেতাব লিখতে হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের কিছুকাল পর থেকেই আরম্ভ হয় খ্রীষ্টান কর্তৃক ইহুদি নিপীড়ন এবং এরাই সর্বপ্রথম নয়—সেই খ্রীষ্টজন্মের হাজার তিন বছর আগে থেকে পালা করে মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, রোমান সবাই এদের উপর অত্যাচার করেছে। মধ্যযুগে স্পেনে একবার এক লক্ষ ইহুদিকে খেদিয়ে আফরিকায় ঠেলে দেওয়া হয়, এবং হাজার হাজার ইহুদিকে স্রেফ ধর্মের নামে খুন করা হয়।

কিন্তু হিটলার তো খ্রীষ্টান কেন কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করতেন না। পারলে তিনি এ সংসারে কোন ধর্মেরই অস্তিত্ব রাখতেন না।

হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মাঝে-মিশেলে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন কিন্তু সেগুলো আকছারই পরস্পরবিরোধী। একদিকে বলতেন, ইওরো-আমেরিকার অধিকাংশ ক্যাপিটাল ইহুদিদের হাতে—যত বেকার সমস্যা, যত রক্তাক্ত বিপ্লব, যত যুদ্ধ ইওরোপে হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে ইহুদি পুঁজিপতি। আবার একই নিশ্বাসে বলতেন, যে রুশ-কম্যুনিজম ইওরোপের সভ্যতা সংস্কৃতি ধনদৌলত সমূলে বিনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তার আগাপাস্তলা ইহুদি প্ররোচনায়। অর্থাৎ ইহুদি একাধারে কম্যুনিস্ট এবং ক্যাপিটালিস্ট। এবং যাঁরা তাঁর একমাত্র 'বই' মাইন কাম্‌প্‌ফ্‌ফ্‌' ('মাই স্ট্রাগল'—এর ঠিক ঠিক অনুবাদ নয়—'আমার জীবন সংগ্রাম' বললে অনুবাদটা মূল জরমনের আরও কাছাকাছি আসে। মোদ্দা 'আমি আমার জীবন আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি সর্ব দুশমনের সঙ্গে যে লড়াইয়ের পর লড়াই যুঝেছি তার ইতিহাস) পড়েছেন তাঁরা জানেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দলিলপত্র পেশ করে কখনও সপ্রমাণ করেননি, করবার চেষ্টা দেননি। এর কারণটি অতিশয় সরল।

ইহুদি যে এ পৃথিবীর সর্ব দুঃখের কারণ এটা হিটলারের কাছে স্বতঃসিদ্ধ টেনেট অব ফেৎ (অন্যতম 'মৌলিক বিশ্বাস')। খ্রীষ্টান মুসলমান যে রকম যুক্তিতর্কের অনুসন্ধান না করে সর্ব সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করে ইহসংসারের সর্ব পাপ সর্ব দুঃখ সর্ব অমঙ্গলের জন্য শয়তানটাই দায়ী, হিন্দু যেমন বিশ্বাস করে মানবজাতির সর্ব যন্ত্রণার জন্য তার পূর্বজন্মকৃত কর্মই দায়ী, ঠিক তেমনি হিটলার তাঁর সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করতেন বিশ্বভুবন জোড়া সর্ব অশিবের জন্য ইহুদি জাতটা দায়ী—অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ অবলা শিশু ইহুদি, সব সব, সবাই দায়ী। তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে তিনি অসংখ্যবার বলেছেন ইহুদিকুল ছারপোকা ইঁদুরের মত প্রাণী (ভারমিন)। ছারপোকা ধ্বংস করার সময় তো কোনও করুণা মৈত্রীর কথা ওঠে না, ইঁদুরের বেলাও কোন্‌টা ধেড়ে কোন্‌টা নেংটি সে প্রশ্নও অবান্তর।

এ-কথা সত্য আমরা ছারপোকা নির্বংশ করার সময় কোনও বাছবিচার করি নে; এবং যে কোনও প্রকারের প্রাণী হত্যা করলেই যে এদেশের কোনও কোনও সম্প্রদায় আমাদের 'খুনী' বলে মনে করেন সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়। তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যিই কি মানুষে ছারপোকাতে কোনও পার্থক্য নেই? ওদিকে আবার বহু খ্রীষ্টান সাধুসজ্জন ইহুদি ছারপোকাতে পার্থক্য করতেন বটে কিন্তু সেটা সামান্যই। আমি কাইন এবং আবেলের যে-বাইবেল কাহিনী দিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেটিকে রূপকার্থে

নিয়ে ঐসব সাধুসজ্জন কাইনকে ধরেন ইহুদিদের সিনাগ (ধর্ম প্রতিষ্ঠান) রূপে এবং আবেলকে খ্রীষ্ট চার্চরূপে—অর্থাৎ ইহুদি তার আপন ধর্মবিশ্বাস দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে যেখানে খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্মকে পায় সেখানেই তাকে নিধন করে। ইহুদি ভ্রাতৃহন্তা, সে বিশ্বঘ্ন।... পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি হিটলারের ইহুদি নিধন সমর্থন করছি। আমি এ প্রবন্ধ লিখছি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এস্থলে আমি শুধু তাঁর বিশ্বাসের পটভূমিটির প্রতি ইঙ্গিত করছি; তাঁর মত আরও বহু 'বিশ্বাসী' যে পূর্ববর্তী যুগেও ছিলেন তারই প্রতি ইঙ্গিত করছি।

তা সে যাই হোক, এইসব ইহুদিদের এক জায়গায় জড়ো করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি—ছারপোকাতে ইহুদিতে ঐখানেই তফাৎ, ছারপোকা এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে তো আধেক মুশকিল আসান! গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ইহুদি মুরুব্বীদের বলা হত, তাবৎ ইহুদি পরিবার যেন এক বিশেষ জায়গায় জড়ো হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কলনি পত্তন করা হবে। তারপর ট্রেনে মোটরে করে কানসানট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়েই একটা লম্বা নালা খোঁড়ানো হত। তারপর আদেশ হত, নালার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। একদল এস এস ('ব্ল্যাক শার্ট'—হিটলারের খাস সেনাবাহিনী) পিছন থেকে গুলি করতো। অধিকাংশ ইহুদি গুলির ধাক্কায় সামনেব নালাতে পড়ে যেত। বাকিদের লাথি মেরে মেরে ঠেলে ঠেলে নালাতে ফেলা হত। সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেত তা নয়—সব সময় তাগ অব্যর্থ হয় না। এদের কেউ কেউ নালা থেকে হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করতো তারা মরেনি—উদ্ধারলাভের জন্য চিৎকারও শোনা যেত। ওদিকে দৃকপাত না করে তাদের উপর নালার মাটি ফেলা হত এবং সর্বশেষে তার উপর স্টীমরোলার চালিয়ে দিয়ে মাটিটা সমতল করা হত।

নালা খোঁড়া, তার উপর ফের মাটি ফেলা এ-সব কাজের জন্য ইহুদিই যোগাড় করার জন্য কোনও বেগ পেতে হয়নি। একদল ইহুদিকে এই নিধনকর্মটি দাঁড় করিয়ে দেখানোর পর বলা হত তারা যদি গুলি করা ছাড়া অন্য সর্ব কার্যে সহায়তা করে তবে তারা নিষ্কৃতি পাবে। বলাই বাহুল্য এরা নিষ্কৃতি পায়নি। আখেরে ওরা ঐ একই পদ্ধতিতে প্রাণ হারায়—সাক্ষীকে ছেড়ে দেওয়া কোনও স্থলেই নিরাপদ নয়।

এইসব নিহতজনের অধিকাংশই বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে, কোলের শিশু এবং রুগ্ন অসমর্থ যুবক-যুবতী। সমর্থদের বন্দীদশায় একাধিক বড় বড় কারখানায় বেগার খাটার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। আখেরে, অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, যুদ্ধশেষের কিছুদিন পূর্বে এদেরও মেরে ফেলা হয়। যুদ্ধপূর্ব জরমনিতে ছিল ৫,৫০,০০০ ইহুদি, যুদ্ধশেষে রইল ৩০,০০০। পোলান্ডের সংখ্যা বীভৎসতর; যুদ্ধপূর্বে সেখানে ছিল তেত্রিশ লক্ষ, যুদ্ধশেষে মাত্র ত্রিশ হাজার। এবং আশ্চর্য এই, ত্রিশ হাজারের চোদ্দআনা পরিমাণ লোক আপন দেশ ছেড়ে পুণ্যভূমি ইহুদি স্বর্গ ইজরাএলে যেতে রাজী হয়নি। অনেকেই বলে, 'জরমনি আমার পিতৃভূমি (ফাটেরলান্ট্), এদেশ ছেড়ে আমি যাব কেন? যে পিতৃভূমিতে সে তার অধিকাংশ আত্মজন হারালো তার প্রতি এই প্রেম প্রশংসনীয় না কাণ্ডজ্ঞানহীন একগুঁয়েমির চূড়ান্ত—জানেন শুধু সৃষ্টিকর্তা!

আমি বর্ণনাটা সংক্ষেপে সারলুম, কারণ ইহুদি নিধনের এটা অবতরণিকা মাত্র—'চলি চলি পা পা' মাত্র। যেমন যেমন এস এস-দের নিধনকর্মে অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল

হননকর্ম, তেমন তেমন সূক্ষ্মতর, বিদগ্ধতর ও ব্যাপকতর হতে লাগল।

ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পের অধিকর্তা, যাঁরা গুলি মারার আদেশ দিতেন তাঁদের কয়েকজন যুদ্ধশেষে ধরা পড়েন। তাঁদের একজন ওলেনডর্‌ফ্। মিত্রশক্তি কর্তৃক জরমনির ন্যুর্‌ন্‌বের্গ শহরে সাক্ষ্যদানকালীন ওলেনডর্‌ফ্ আসামীপক্ষের উকিল আমেনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি এই পদ্ধতির সমর্থন করিনি।'

উকিল আমেন : 'কেন?'

ওলেনডর্‌ফ্ : 'এ পদ্ধতিতে নিহত ইহুদি এবং যারা গুলি ছুঁড়তো, উভয় পক্ষেরই মাত্রাহীন অসহ মানসিক যন্ত্রণা বোধ হত।

ইহুদিদের প্রতি কসাই ওলেনডর্‌ফের এই 'দরদ' অভিনব, বিচিত্র। এই কুম্ভীরাশ্রুর একমাত্র কারণ তিনি তখন নিজেকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন।

কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য, যে-সব এস এস সৈন্য গুলি ছুঁড়তো তাদের অনেকেই এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ফলে হঠাৎ সাতিশয় মন-মরা হয়ে যেত, মদ্য-মৈথুন ত্যাগ করতো, অবসর সময়ে সঙ্গীসাথী বর্জন করে এককোণে বসে বসে শুধু চিন্তা করতো। হিটলারের আদেশে তাদের গুলি ছুঁড়তে হবে—এ-কথা তাদের স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের কোনও প্রশ্নই উঠে না—বছরের পর বছর তারা ট্রেন্‌ড্ হয়েছে 'বশ্যতা'মন্ত্রে—অবিডিয়েন্‌স্ এবাভ অল, ফ্যুরারের আদেশে কোনও ভুল থাকতে পারে না, আপ্তবাক্যের ন্যায় তাঁর আদেশ অভ্রান্ত, ধ্রুব সত্য।

কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাটাও তো নির্মম সত্য!

হাল বয়ান করে হিমলার-যমকে জানানো হল। ইস্পাতের তৈরি সাক্ষাৎ যমদূত-পারা ক্বচিৎ এস এস-এর নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের খবর পেয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন কিনা সে খবর জানা নেই। তবে একটা 'কেলেঙ্কারি'র খবর অনেকেই জানতো : ইহুদি নিধন যজ্ঞের গোড়ার দিকে হিমলারের একবার কৌতূহল হয়, 'ম্যাস-মারডার'—'পাইকারি কচু-কাটা' দেখার! একশ' জন ইহুদি নারী পুরুষকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি চালানো হল। সে দৃশ্য দেখে স্বয়ং শ্রীমান হিমলার ভিরমি যাচ্ছিলেন। সঙ্গীরা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলো। স্বয়ং যম যদি মৃত্যু দেখে চোখে-মুখে পাঙাস মারেন তবে বাল্যখিল্য যমদূতেরা 'কোজ্জাবে' মা?[১] এবং আশ্চর্য! স্বয়ং হিটলারও চোখের সামনে রক্তপাত সহ্য করতে পারতেন না। এবং প্রাণীহত্যা আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না বলে তিনি ছিলেন কড়া নিরামিষভোজী। মাংসাসীদের বলতেন 'শবাহারী'।

হিমলারের আদেশে দুখানা বিরাট মোটর ট্রাক তৈরি করা হল। দেখতে এমনি সাধারণ ট্রাকের মত, তবে চতুর্দিক থেকে টাইট্ ঢাকা এবং বন্ধ। শুধু বাইরের থেকে একটা পাইপ

---

১ এই একশ জনের ভিতর এক যুবতীকে দেখে হিমলার রীতিমত বিস্মিত হন। চেহারা, চুল, নাক আদৌ ইহুদির মত নয়। যে নরডিক্ (বিশুদ্ধতম আর্যরক্তের জরমন) জাত হিটলার হিমলার আদর্শ বলে ধরতেন তাদেরই মত ব্লনড চুল, নীল চোখ, ব্রিজহীন সোজা নাক ইত্যাদি। হিমলারের ডাকে সে এগিয়ে এলে হিমলার তাকে বললেন, 'তুমি ইহুদি নও।' গর্বিত উত্তর : 'না আমি ইহুদি।' তুমি বলো, তুমি ইহুদি নও, আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দেব।' গর্বিততর কণ্ঠে, 'না, আমি ইহুদি।' তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে গিয়ে আপন জায়গায় দাঁড়ালো।

ভিতরে চলে গেছে। মোটর চালানোমাত্র বিষাক্ত গ্যাস ভিতরে যেতে থাকে, এবং দশ-পনেরো মিনিটের ভিতর অবধারিত মৃত্যু। ততক্ষণ অবধি ভিতর থেকে চাপা চীৎকার আর দরজার উপর ধাক্কা আর ঘুষির শব্দ শোনা যেত। প্রাচীন পাপী ওলেনডর্‌ফ্‌কে আদালতে শুধানো হল, 'ওদের তোমরা ট্রাকে তুলতে কি করে?'

ওলেনডর্‌ফ্‌ : 'ওদের বলা হত তোমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

কিন্তু এ পন্থাতেও এস এস-দের কেউ কেউ সেই প্রাচীন চিত্তাবসাদে ভুগতে লাগলো। ট্রাক থেকে বের করার সময় দেখা যেত মৃতদেহের মুখ বীভৎস রূপে বিকৃত। গাড়িময় রক্ত মলমূত্র। একে অন্যের শরীরে জামাকাপড়ে পর্যন্ত—। একে অন্যকে এমনই জড়িয়ে ধরে আছে যে লোহার আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে ছাড়াতে শরীর ঘেমে উঠতো, মুখ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে যেত, মগজে ভূতের নৃত্য আর চিন্তাধারায় বিভীষিকা।

অকল্পনীয় এই খুনে গাড়ি দুটোর অভাবনীয় মৌলিক আবিষ্কারক ডক্টর বেকারকে জানানো হল। আসলে ইনি এস এস-এস-দের চিকিৎসক (এবং স্বয়ং এস এস)। ইনি কিন্তু আমাদের সেই স্ত্রীহন্তা ডাক্তারের মত নন। তিনি 'একমেবা' করেই প্রসন্ন। ইনি ভূমার সন্ধানে আবিষ্কারক হয়ে গিয়েছিলেন!

ঈষৎ বিরক্তির সুরে তিনি লিখলেন, 'আমি যে "ব্যবহার পদ্ধতি" লিখে দিয়েছিলুম (ঠিক যেভাবে তিনি ওষুধের প্রেসক্রিপশনে 'সেবন পদ্ধতি' ডাইরেকশন ফর ইউজ' লিখে থাকেন) সেভাবে কাজ করা হয়নি। অপ্রিয় কর্ম তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য গ্যাসযন্ত্র পরিচালক গ্যাস ছাড়ার হ্যান্ডিলটা একধাক্কায় সর্বশেষ ধাপে নিয়ে যায়; ফলে ইহুদিরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। হ্যান্ডিল ধীরে ধীরে চালালে এরা আস্তে আস্তে এবং আপন অলক্ষ্যে মৃদুমধুর নিদ্রায় প্রথম ঘুমিয়ে শেষনিদ্রা আস্তে আস্তে এতে করে আরও কম সময়ে এদের মৃত্যু হয়। দরজায় ঘুষি, মলমূত্র ত্যাগ, বিকৃত মুখভঙ্গি, একে অন্যে মোক্ষম জড়াজড়ি—এসব কোনও উৎপাতই হয় না।'

অত্যুত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তাহলেও তো বিরাট সমস্যার সমাধান কণা পরিমাণও হয় না। কারণ ফি ট্রাকে মাত্র পনেরো থেকে পঁচিশ জন প্রাণী লাদাই করা যায়। ওদিকে হিটলার হিমলার যে বিরাট সংখ্যার দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে আছেন, এসব গাড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় বানিয়েও তো সেখানে পৌঁছনো যাবে না। ঐ সময়েই রাশার কিয়েফ শহরের কাছে প্রায় চৌত্রিশ হাজার প্রাণীকে—এদের অধিকাংশই ইহুদি—মাত্র দু'দিনের ভিতর খতম করার হুকুম এল, এবং জরমন কর্মতৎপরতা সে কর্ম সম্পূর্ণ করলোও বটে। গ্যাসভান দিয়ে এত লোক, অল্পসময়ে নিশ্চিহ্ন করা যেত না।

হিটলারের হিমলারের আদেশে জরমনির ভিতরে বাইরে—বিশেষ করে পোলানডে অনেকগুলো কনসানট্রেশন ক্যাম্প্ (ক ক) নির্মাণ করা হয়। সর্ববৃহৎ ছিল আউশ্‌ভিৎস্-এ। তার বড়কর্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত হয়েস্।[১] হিমলার তাঁকে ডেকে বললেন, 'ফ্যুরার (হিটলার) হুকুম দিয়েছেন, ইহুদিদের খতম করতে হবে, প্রথমত—খুব তাড়াতাড়ি, দ্বিতীয়ত—গোপনতম গোপনে।' কি পরিমাণ ইহুদিকে খতম করতে হবে তার মোটামুটি

১ ইনি হিটলারের ডেপুটি রুডল্‌ফ্ হেস (Hess) নন, যিনি সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে ইংলন্ডে যান। এঁর নাম Hoess।

হিসেব হিমলার দিলেন। ইয়োরোপে তখন এক কোটি ইহুদি; অবশ্য বহু জায়গা হিটলারের তাঁবেতে নয় বলে অসংখ্য ইহুদিকে পাকড়াও করা যাবে না।

ইতিমধ্যে ছোটখাটো দু-চারটি ক ক-তে ইহুদি নিধন সমস্যার খানিকটে সমাধান হয়ে গিয়েছে। মাঝারি রকমের একটি নিরন্ধ্র হলঘরে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয়। দরজা বন্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয় মনক্সাইড গ্যাস। আধঘণ্টার ভিতর এদের মৃত্যু হয়। কিন্তু এসব জায়গা ছ' মাসে আশি হাজারের বেশী প্রাণী নিশ্চিহ্ন করা যায় না। তা হলে তো হল না।

হয়েস্ খাঁটি জরমনদের মত পাকা লোক। কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সব কটা ক ক দেখে নিলেন। (যুদ্ধশেষে হয়েস্ এক চাষা-বাড়িতে আশ্রয় নেন; সেখানে ধরা পড়েন। ন্যুর্ন্বের্গে শহরে গ্যোরিঙ, হেস্, রিবেনট্রপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন মিত্রশক্তি মোকদ্দমা চালাচ্ছেন তখন হয়েস্ সাক্ষীরূপে যা বলেন তার নির্গলিতার্থ—)

'আমি ক ক-গুলো পরিদর্শন করে আদপেই সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। প্রথমত মনক্সাইড গ্যাস যথেষ্ট তেজদার গ্যাস নয়, দ্বিতীয় চাবুক মেরে মেরে গ্যাস-ঘরে ঢোকাতে হলে বিস্তর লোকের প্রয়োজন, তৃতীয় সেই প্রাচীন সমস্যা লাসগুলোর সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কারণ ইতিমধ্যে দেখা গেল, গ্যাস-ভর্তি লাস পুঁতলে তারই ঠেলায় গোরের উপরের মাটি ফুলে ওঠে—কয়েকদিন অপেক্ষা করে তবে স্টীম-রলার চালানো যায়। তদুপরি লক্ষ লক্ষ লাসের 'বেশাতি'। অতখানি জায়গা কোথায়? আউশভিৎস জায়গাটি ছিল নিকটতম গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে, নির্জনে এবং কাছেপিঠে লোক চলাচলের কোন সদর রাস্তাও তার গা ঘেঁষে যায়নি। তবু কেউ সেদিক দিয়ে যাবার সময় সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের দেউড়ির উপরের দিকে তাকালে দেখতে পেত লেখা রয়েছে "স্নান প্রতিষ্ঠান", গেট দিয়ে দেখতে পেত, প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের দু পাশে কাতারে কাতারে শৌখিন মরসুমী ফুলের কেয়ারি। দূর থেকে 'নৃত্যসম্বলিত' হাল্কা গানের কনসারট সঙ্গীত ভেসে আসছে। কে বলবে সেখানে পৃথিবীর অভূতপর্ব বিরাটতম নরনিধনালয়!

মেন রেল লাইন থেকে একটা সাইড লাইন করিয়ে নিলেন হের হয়েস্ তাঁর ক ক পর্যন্ত। যেদিন যে সংখ্যার নরনারী শেষ করা সম্ভব সেই সংখ্যার ইহুদি গরুভেড়ার মালগাড়ির ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয়েছে পোলান্ড থেকে, হাঙগেরি থেকে, সুদূর রুশ থেকে। এদের খেতে দেওয়া হয়নি, ট্রাকে পানীয় জলের শৌচের ব্যবস্থা নেই। ট্রাক খোলা হলে দেখা যেত শতকরা আট থেকে দশজনা—বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে—মরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। শীতকালে শুধু জমে গিয়েই এর সংখ্যা দেড়া হয়ে যেত।

এদের নামানো হত রেলকর্মচারীদের বিদেয় দেওয়ার পর।

ইহুদিদের বলা হয়েছে, এখানে এদের বিশেষ ওষুধ মাখানো জলে স্নান করিয়ে গা থেকে উকুন সরানো হবে (ডিলাউজিং)। তারাও দেউড়িতে দেখতে পেত লেখা রয়েছে 'স্নান প্রতিষ্ঠান'। ফুলের কেয়ারি, ঘনসবুজ লন্, আর আবহাওয়া উত্তম হলে সেই লনের উপর বসেছে সুবেশী তরুণীদলের কনসারট। চটুল নৃত্য-সঙ্গীত শুনতে শুনতে তারা এগুতো রেসেপসনিস্ট্-এর কাছে। ইতিমধ্যে দুজন এস এস ডাক্তার ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কারা কর্মক্ষম আর কারা যাবে গ্যাস চেম্বারে। শতকরা পঁচিশ জনের মত

কর্মক্ষম যুবক-যুবতীকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হত অন্য দিকে। যুবতী মা-দের কেউ কেউ আপন শিশু হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বলে আপন স্কারটের ভিতর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো, কিন্তু হয়েস্ বলেছেন, এস এস-দের তারা ফাঁকি দিতে পারতো না। এদিকে যারা গ্যাস চেম্বারে যাবে তাদের বলা হয়েছে তাদের টাকাকড়ি, গয়না, ঘড়ি, মণিজওহর—মূল্যবান যাবতীয় বস্তু আলাদা করে রাখতে যাতে করে স্নানের শেষে যে যার মূল্যবান জিনিস ঠিক ঠিক ফিরে পায় (দেশ থেকে এদের নিয়ে আসার সময় তাদের বলা হয়েছে,—তারা ভিন দেশে নূতন কলনি [দণ্ডকারণ্য?] গড়ে তুলবে; আপন দেশে ফেরবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তাই—হীরা-জওহর টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে)। ওদিকে কনসারটে পলকা নৃত্যসঙ্গীত বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে। 'তামাশা'টা পরিপূর্ণ করার জন্য কোনও কোনও দিন এদের ভিতর আবার স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের পিকচার পোস্ট কার্ড দেওয়া হত—আত্মীয়স্বজনকে পাঠাবার জন্য। তাতে ছাপা রয়েছে : 'আমরা মোকামে পৌঁচেছি এবং চাকরি পেয়েছি; এখানে খুব ভালো আছি; তোমাদের প্রতীক্ষা করছি।' ইতিমধ্যে কয়েকজন অফিসার হন্তদন্ত হয়ে বলতেন, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন; নইলে পরের ব্যাচকে খামখা বসে থাকতে হবে যে!' তারপর সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ঢুকতো সেই গ্যাস চেম্বারে।

হয়েস্ বলেছেন, 'ব্যাপারটা যে কি কখনই কেউই বুঝতে পারতো না তা নয়। তখন ধুন্ধুমার, প্রায় বিদ্রোহের মত লেগে যেত। তখন অন্যান্য ছোটখাটো ক ক-তে যে-রকম বেধড়ক চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয় তাই করা হত।

একটা হল্-এ প্রায় দু-হাজারের মত লোক ঠাসা যেত।

এত লোককে একসঙ্গে শাওয়ার-বাথে ঢোকানো হল—তাই দেখে অন্তত তখন, অনেকেরই মনে বিভীষণ সন্দেহ জাগতো। কিন্তু ততক্ষণে 'টু লেট।' ফ্রিজিডেরের দরজার মত নিরন্ধ্র বিরাট দু পাট দরজা তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের কাছে যারা দাঁড়িয়েছে তারা শাওয়ারের চাবি খুলে দেখে জল আসছে না।...এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসতে লাগল অন্য জিনিস...দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর লন-এ উপস্থিত একজনের দিকে ইসারা দেওয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে সেই এস এস সেখানে একটা পাইপ খুলে ছেড়ে দিত এক টুকরো নিরেট ক্রিসটেলাইজড 'সাইক্লন বী' গ্যাস।[১] এই বস্তুটি অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসামাত্রই মারাত্মকতম গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে উন্মুক্ত শাওয়ারের ছিদ্র দিয়ে বেরুতে থাকতো। এক নিশ্বাস নেওয়া মাত্রই মানুষ ক্লরফরম্ নেওয়ার মত সংজ্ঞা হারায়। যাদের নাকে তখন গ্যাস ঢোকেনি তারা তখন চিৎকার আর ধাক্কাধাক্কি করতো বন্ধ দরজার দিকে এগোবার জন্য, আর যারা দরজার কাছে, তারা আপ্রাণ ঘুষি

---

১ কোন্ প্রকারের গ্যাস, কেমিকেল ইত্যাদি সম্বন্ধে এ-লেখকের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। জরমন এন্‌সাইক্‌লপীডিয়া বলেন Zyklon (ৎসাইক্লন) এক প্রকারের অতি মারাত্মক বিষাক্ততম প্রাসিক (হাইড্র সায়েনিক) এসিড। হয়েস্-এর উৎসাহে এক বৈজ্ঞানিক 'ৎসাইক্লন বী' Zyklon B আবিষ্কার করেন। এরই অন্য নাম Zyanwasserstoffkristalle; অর্থাৎ Zyankali Cyanide of Potassium, Wasserstoff = hydrogen॥ মূল ৎসাইক্লন ব্যবহার করা হত খাদ্যশস্যবিনাশকারী কীট পতঙ্গ ইঁদুর মারার জন্য। নামটা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত।

মারতো বন্ধ দরজার উপর। সেই মৃত্যুভয়ে ভীত প্রাণাতঙ্কে উন্মত্ত জনতা দরজার দিকে ঠেলে ঠেলে সেখানে মনুষ্য-পিরামিডের আকার ধারণ করতো।

মোক্ষম পুরু কাঁচের ছোট্ট একটি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে 'করুণাসাগর' এস এস-রা (তিন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব শেষ—আবহাওয়া ও মৃত্যোৎসর্গিত প্রাণীর উপর নির্ভর করতো সময়ের তারতম্য)। যখন দেখতো অচৈতন্য শরীরগুলো আর থেকে থেকে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে না, তখন ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে ভিতরকার গ্যাস শুষে নেওয়া হত। বিরাট দরজা খোলা হত।

গ্যাস মাস্ক্ (ছিদ্রহীন মুখোশ), রবারের হাঁটু-ছোঁয়া বুট পরে হাতে হোস পাইপ নিয়ে ঢুকতো একদল ইহুদি—পূর্বেই বলেছি এদের লোভ দেখানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় কাজ করে দিলে এদের মুক্তি দেওয়া হবে।

দরজা খোলামাত্র লাশের পিরামিড, এমন কি যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরেছে তারাও, মাটিতে পড়ে যেত না। একে অন্যকে তখনও তারা জাবড়ে আঁকড়ে ধরে আছে। নাকমুখ দিয়ে বেরোনো রক্ত, ঋতুস্রাবের রক্ত, মলমূত্র সব লাশ ছেয়ে আছে, মেঝেতেও তাই। ইহুদিদের প্রথম কাজ হত হোস দিয়ে সব কিছু সাফসুৎরো করা। তারপর আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে মৃতদেহগুলো পৃথক পৃথক করা। এরপর লাশগুলোর হাত থেকে আংটি সরানো হত, ডেনটিস্‌ট্‌রা এসে সাঁড়াশি দিয়ে মুখ খুলে সোনার সোনা বাঁধানো দাঁত—দরকার হলে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে—বের করে নিত। মেয়েদের মাথার চুল দু-চারবার কাঁচি চালিয়ে কেটে নিয়ে বস্তায় পোরা হত—পরে কৌচসোফা এই দিয়ে তুলতুলে করা হবে এবং যুদ্ধের অন্যান্য কাজে লাগবে। সর্বশেষ ইহুদি 'জমাদাররা' স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের গোপনস্থলে 'পরীক্ষা' করে দেখে নিত হীরকজাতীয় মহা মূল্যবান কোন বস্তু লুকনো আছে কিনা।

ন্যুরন্‌বের্গ মোকদ্দমায় বলা হয় যে কোনও কোনও ক ক-তে লাসের চর্বি ছাড়ানো হত সাবান ইত্যাদি তৈরী করার জন্য, এবং কোনও এক বিশেষ ক ক-র প্রধান কর্মচারীর শৌখিন পত্নী মানুষের চামড়া দিয়ে ল্যাম্প্‌-শেড্ তৈরী করাতেন। কিন্তু এগুলো সপ্রমাণ হয়নি। অধমের নিবেদন, অনাহারে অত্যাচারে রোগব্যাধি তথা অসহ মানসিক ক্লেশে ইহুদিদের দেহে তখন যেটুকু চর্বি অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে একটি কবরেজী বড়িও হয় না।

মণিমাণিক্য অলঙ্কারাদি জরমন স্টেট ব্যাঙ্কে পাঠানো হত। এ পদ্ধতিতে স্টেট ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ মাল পেয়েছিলেন তার হিসাব যুদ্ধশেষে নির্ধারিত করা যায়নি। তবে ব্যাঙ্ক বেশীর ভাগ বিক্রি করে দেওয়ার পরও যা পাওয়া গিয়েছিল তাই দিয়ে যুদ্ধশেষে মারকিনরা তিনটে বিরাট বিরাট ভলট কাঁঠাল-বোঝাই করেছিল। এবং একখানা চিঠি থেকে কি পরিমাণ মাল যোগাড় করা হয়েছিল তার কিছুটা হদিস মেলে। স্টেট ব্যাঙ্ক সরকারী লগ্নী প্রতিষ্ঠানকে সে চিঠিতে লেখেন, 'এই দুসরা কিস্তিতে আমরা যা পাঠাচ্ছি তার মধ্যে আছে, ১৫৪ সোনার পকেট-ঘড়ি, ১৬০১ সোনার ইয়ারিং, ১৩২ ডায়মনড্ আংটি, ৭৮৪ রুপোর পকেট ঘড়ি, ১৬০ বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত সোনার দাঁত, ইত্যাদি ইত্যাদি—অতি দীর্ঘ সে ফিরিস্তি। চিঠি লেখা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ এবং ইহুদি নিধন চালু ছিল 'ফুল্‌' (গ্যাস) স্টিমে ১৯৪৪-এর শেষ-পর্যন্ত—এবং তারপর মন্দগতিতে। মারকিনরা এখনও তাই ঠিক ঠিক 'মোট-জমা' প্রকাশ করতে পারেননি।

কিন্তু এসব জিনিস থাক। যে-জিনিসটা জনৈক মারকিন অফিসারকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল (এবং আমাকেও করেছে) সেটা নিবেদন করার পূর্বে বলি, এই অফিসারটি রীতিমত হারড্ বয়েল্ড ঝাণ্ডু—বিস্তর লড়াই লড়েছেন, বীভৎস্ সব বহু বহু দৃশ্য দেখেছেন, গণ্ডায় গণ্ডায় গুপ্তচরকে তাঁর সামনে তাঁরই আদেশে গুলি করে মারা হয়েছে (যুদ্ধের সময় গুপ্তচর নিধন আন্তর্জাতিক আইনে বাধে না); সে-সবের ঠাণ্ডা-মাথা হিমশীতল বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ওসব ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের নেকটাইটি পর্যন্ত এক মিলিমিটার এদিক-ওদিক হয়নি কিন্তু তার 'ওয়াটারলু'-এর যুদ্ধের পর, আউশভিৎস দেখতে গিয়ে, টুরিস্ট্রূপে (এখনও ওটি সে-অবস্থাতেই রাখা আছে—পাঠক নেকসুট্ ট্রিপে সেটা দেখে নেবেন। আমি হিম্মৎ করতে পারিনি।) মারকিন অফিসার গ্যাস চেম্বার পোড়াবার জায়গা, বন্ধ চুল্লি খোলা চুল্লি সব—সব দেখলেন। সর্বশেষে গাইড নিয়ে গেল একটা গুদোম ঘরে যেখানে নিহত ইহুদিদের অপেক্ষাকৃত কম দামী জামা-কাপড়, জুতো-মোজা সারে সারে সাজানো ছিল।

তারই এক অংশে তিনি দেখতে পেলেন চল্লিশ হাজার জোড়া জুতো। ক্ষুদে ক্ষুদে। নিতান্ত কাঁচা-কচি শিশুদের।

এবারে আমরা যে-প্রসঙ্গ নিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে ফিরে যাই।

মারকিন মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ গিলবারট্ আউশ্ভিৎস ক্যাম্পের কর্তা হয়েস্‌কে আশ্চর্য হয়ে শুধোন, 'এত অসংখ্য লোককে তোমরা মারতে কি করে?' হয়েস্ বাধা দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনি তাবৎ জিনিসটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। মারাটা তো সহজ। মিনিট পনেরো লাগে কি না লাগে, দু হাজার লোককে মেরে ফেলতে (হয়েস্ বোধ করি জানতেন না যুদ্ধের শেষের দিকে এক জরমন ডাক্তার 'চমৎকার' একটি ইনজেকশন বের করেন, এবং মোদ্দা কথা তার দাম ফীনলের চেয়েও কম;—ঘাড়ের কাছে সে ইনজেকশন আনাড়িতেও দিতে পারে, শিকার খতম হয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিতর)। কিন্তু আসল সমস্যা লাশগুলো নিশ্চিহ্ন করা যায় কি করে। বিরাট বিরাট চুল্লি তৈরী করে এবং সেগুলো চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও আমরা ঐ সময়ের ভিতর দশ হাজারের বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। মনে রাখতে হবে, চুল্লি থেকে মাঝে মাঝে হাড় আর ছাই বের করতে হত। হাড়গুলো মেশিনে গুঁড়ো করে ছাইসুদ্ধ পাশের নদীতে ফেলে দেওয়া হত (শুনেছি তো হাড়ের গুঁড়ো আর ছাই উত্তম সার—তবে জরমনরা এটা বরবাদ করতো কেন?—যেস্থলে চুল পর্যন্ত কাজে লাগানো হচ্ছে—লেখক)। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা আউশভিৎসে ২৭ মাসে ২৪৩০০০০ (প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ) লোক মেরেছি।'

আইসম্যান গর্ব করে বলেছিলেন, সব কটা ক ক-তে মিলে সবসুদ্ধ পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণী খতম করা হয়। হয়েস্ স্বীকার করেছেন, শত চেষ্টা সত্ত্বেও লাশ নিশ্চিহ্ন করার কাজটা গোপন রাখা যায়নি। অর্থাৎ গ্যাস চেম্বারে নিধনকর্মটি গোপন রাখা যায়, কিন্তু মাটিতেই পোঁতো আর পুড়িয়েই ফেল—সেটা কিন্তু গোপন রাখা যায় না। লাশ-পোড়ানোর তীব্র উৎকট গন্ধ, আর চিমনির চোঙ্গা থেকে যে ধুঁয়ো বেরুচ্ছে তার ছাই ছড়িয়ে পড়তো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত চতুর্দিকের গ্রামে। তারা বুঝে যেত ঐ নিরীহ "স্নান-প্রতিষ্ঠান" কোন্

'বিশ্বপ্রেমের খয়রাতী রাজকার্যে' লিপ্ত আছেন এবং শুধু সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতো বাতাস যেন তাদের আপন বসতগ্রামের দিকে না যায়! এটা কিছু নূতন নয়। যুদ্ধের গোড়াতেই এই নিধনযজ্ঞ হিটলার আরম্ভ করেন জরমনির পাগলা-গারদগুলো দিয়ে—পাগলদের ভিতর অবশ্য কিছু ইহুদিও ছিল, কিন্তু অধিকাংশই খাঁটি জরমন। নামকে ওয়াস্তে একটা কমিশন বসলো—এত অল্পসংখ্যক পাগল রেহাই পেল, যদি আদৌ কেউ পেয়ে থাকে, যে সেটার কোনও উল্লেখ পর্যন্ত নেই—এবং পাগলদের কতকগুলো কেন্দ্রে জড়ো করে গ্যাস মারফৎ মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হল। এটা স্রেফ খুন। জরমন আইনে নিকটতম তিনজন আত্মীয়ের অনুমতি ভিন্ন পাগলকে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরানো পর্যন্ত যায় না—নিধন করার (যাকে ভদ্রভাষায় বলা হয় 'মার্‌সি কিলিং'='অনন্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবার জন্য দয়াবশত কাউকে হত্যা করা' কিংবা 'অনারোগ্য ক্যানসারের অসহ যন্ত্রণায় রোগী যখন বিষ খেতে চায় তাকে বিষ এনে দেওয়া।' ডাক্তারি আইনে একে বলা হয়—Euthanasia, গ্রীক সমাস) তো কোন কথাই ওঠে না। পাগলদের মেরে পুড়িয়ে ফেলার প্রধান কেন্দ্র ছিল হাডামার নামক গ্রামে। তারই পাশের লিম্‌বুর্‌গ্‌ শহর। সেখানকার বিশপ জরমনির আইনমন্ত্রীকে একখানা চিঠিতে জানান "ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সেই বন্ধ বাসগুলো চেনে, যার ভিতরে করে পাগলদের হাডামারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর কোনও একটাকে দেখলেই ছেলেরা বলে ওঠে—ঐ যাচ্ছে 'খুনের বাক্‌স্‌='মারডার বক্‌স্‌'। তাচ্ছিল্যভরে কথায় একে অন্যকে বলে, 'ক্ষেপলি নাকি?—যাবি নাকি হাডামারের বেকিং বক্‌সে (যাতে কেক বানানো হয়; এস্থলে পোড়াবার চুলি)?' হাডামারের চিমনি ছাড়ে ধুঁয়ো আর সেখানকার অধিবাসীরা are tortured with the ever present thought of depending on the direction of the wind. তবু এ কথা সত্য এসব খুন-খারাবী লাশ পোড়ানোর খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। যারা জানতো, তারা জানতো। অন্য কাউকে বলতে গিয়ে কেউ গেস্তাপোর ('গোপন পুলিস'—এদের প্রধানতম কর্ম ছিল রাজনৈতিক, অনেকটা রুশের 'ওগপু'র মত—এদের কাহিনী ক ক-এর চেয়েও বীভৎসতর) হাতে ধরা পড়লে তার কল্পনাতীত নানা অত্যাচার এবং এতেও যদি সে না মরে তবে সর্বশেষে তাকে কোনও একটা ক ক-তে সমর্পণ এবং সেখানে গ্যাস-চেম্‌বারে মৃত্যু। কাজেই হাডামার বা ক ক-গুলোতে কি হচ্ছে সে-সম্বন্ধে মুখ খুলে কেই রা-টি কাড়তো না। তাই ঐ আমলে একটা চুটকিলা রসিকতা সৃষ্ট হয়—

'তুই নাকি, ভাই, ডেনটিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস?'

'বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল। কেউ যে মুখ খুলতে রাজী হয় না।'

লিমবুরগ্‌-এর বিশপের চিঠি পেয়ে আইনমন্ত্রী হিটলারের আপন আইন উপদেষ্টার কাছে এ-বাবদে অনুসন্ধান করলেন। আইন-উপদেষ্টা হিটলারের সেই চিঠি দেখালেন। আইনমন্ত্রী বললেন, 'এটা তো তাঁর নির্দেশ। এটা তো আইন নয়। আপনারা তা হলে এটাকে আইনের রূপ দিন, সেটাকে তারপর দেশে প্রবর্তিত করুন।' তা হলে তো চিত্তির! কারণ, জরমন পারলিমেন্ট আইন করার সর্বক্ষমতা সর্ব অধিকার হিটলারকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আইন মাত্রই সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হয়। তারপর একবার এক বছর কেটে গেল, আইনমন্ত্রী কোন উত্তর পেলেন না। ইতিমধ্যে দেশের সব পাগল খতম।

সমস্যাটার সুচারু সমাধান হয়ে গেল আপ্‌সে আপ্! কোনও কোনও দেশে যে রকম দুর্ভিক্ষের সমস্যা আপ্‌সে আপ্ সমাধান হয়ে যায় কয়েক লক্ষ লোক না খেয়ে মরে যাওয়ার পর।

লাখ তিরিশ বা পঞ্চাশেক ইহুদিকে যে ওপারে পাঠানো হল তার জন্যও কোনও 'আইন' বিধিবদ্ধভাবে তৈরী করা হয়নি। কিন্তু সে মামেলা নিয়ে কখনও কোনও লেখালেখি হয়নি,—ফরিয়াদ করবে কে?—হলেও সেটা লোকচক্ষুগোচর হয়নি। পবিত্র পিতা পোপের কাছে কোনও নিধনই অজানা ছিল না। তিনি থেকে থেকে বিশ্বজন তথা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হিটলারের কাছে 'এপীল' করতেন 'ক্রিস্‌টিয়ান চ্যারিটি' দেখাবার জন্য। এর বেশী তিনি কিছু করে উঠতে পারেননি।[১]

হিটলার ক ক-তে কত লক্ষ ইহুদি, রুশ, বেদে ইত্যাদিকে নিহত করেন সেই সংখ্যা নিয়ে যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছে তখন আসামীদের একজন ছিলেন ফ্রানক্। (এঁরই আদেশে অসংখ্য ইহুদিকে আইসম্যানের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং বিচারে ফাঁসি হয়। ঐ বিচারে উনিই একমাত্র আসামী যিনি নিজেকে 'দোষী' বলে স্বীকার করেন) সেই তর্কাতর্কির ভিতর আসামীদের কাঠগড়ার পিছনে যে মারকিন সান্ত্রী দাঁড়িয়েছিল সে শুনতে পেল (যে-সব মারকিন জোয়ান উত্তম জরমন জানতো তাদেরই এ-কাজে নিয়োজিত করা হত এবং এরা ভাবখানা করতো যেন জরমন বিলকুল বোঝে না—ফলে আসামীরা নিজেদের ভিতর এমন সব কথা বলে ফেলত যেগুলো সান্ত্রীরা ফরিয়াদি পক্ষের মারকিন উকীলকে জানিয়ে দিত। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত বেআইনী ব্যাপার। কিন্তু মারকিন 'আইনকানুন' যেন 'শিবঠাকুরের আপন-দেশে আইন কানুন সর্বনেশে।') ফ্রান্‌ক্ ফিসফিস করে তাঁর সহআসামী হিটলারের অন্যতম মন্ত্রী রোজন্‌বের্‌ক্‌কে বলছেন, 'এরা—অর্থাৎ মারকিনিংরেজসহ মিত্রশক্তি—চেষ্টা করছে, আউশ্‌ভিৎসে দৈনিক যে দু হাজার ইহুদি মারা হত তার কুল্লে গুনাহ্ কাল্‌টেনব্রুনারের উপর চাপাবার।[২] কিন্তু ঐ যে মার্‌কিনিংরেজের বোমাবর্ষণের ফলে ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর

---

১ যুদ্ধের পর হিটলারের প্রতি পোপের আচরণ নিয়ে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়—তামাম ইয়োরোপ আমেরিকা জুড়ে। পোপবৈরীরা তাঁকে যে পরিমাণে দোষী সাব্যস্ত করেছেন সেটা সাধারণত রাজনৈতিকের পক্ষে মারাত্মক হত। এঁরা স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জরমন রাষ্ট্রের চ্যান্‌সেলর (সর্বাধিকারী) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পোপ জরমনিতে আপন রোমান ক্যাথলিক চার্চ্ ও তস্য বিশ্বাসীগণকে নাৎসি নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে একটি চুক্তি (কন্‌করডাট্) করেন। এতে করেই বিশ্বজন সমাজ মাঝে হিটলারের জল চল হয়ে যায়। তারপর আর সে 'পাগলা জগাই'-কে আর ঠেকায় কে? এই তাবৎ মামেলা নিয়ে মধ্য ইয়োরোপে ফিলিম এবং নাট্যও দেখানো হয়। ক্যাথলিক সমাজ স্বভাবতই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। কলকাতাবাসীদের মনে থাকতে পারে, বহু বৎসর পূর্বে অংশতম পোপবিরোধী 'মারটিন লুথার' নামক একটি ফিলিম দেখবার সময় তথাকার ক্যাথলিকগণ ফিলিমটির বিরুদ্ধে রচিত ছাপা হ্যান্ড-বিল বিতরণ করেন, এবং সেটাকে বয়কট করার জন্য অনুরোধ জানান।

২ নাৎসি রাজত্বে ক্ষমতার ধাপগুলো ছিল : হিটলার—হিমলার—কাল্‌টেন্‌ব্রুনার—আইষম্যান্। হিটলার হিমলার আত্মহত্যা করেন—আইষম্যান তখন ফেরার। ফলে সব চাপ গিয়ে পড়ে কালটেনব্রুনারের উপর। এরও ফাঁসি হয়। নিষ্ঠুরতায় এর সমকক্ষ লোক পাওয়া কঠিন।

হামবুর্গ বন্দরে ত্রিশ হাজার লোক মারা গেল তার কি? এদের বেশীর ভাগই তো ছিল শিশু এবং অবলা। তার পর ঐ যে জাপানে এটম্ বম্ ফেলে আশি হাজার লোক মারা হল তার কি? এই বুঝি ন্যায়, এই বুঝি ইনসাফ্?

রোজেন্‌বের্‌ক্ হেসে উত্তর দিলেন, আমরা যুদ্ধে হেরেছি যে।[১]

ইতিপূর্বে যে মনস্তত্ত্ববিদ মারকিন ডাক্তার গিলবার্‌টের উল্লেখ করেছি, তিনি এই কথোপকথনের উপর ফোড়ন দিয়ে বলেছেন, 'এ হল গে টিপিক্যাল নাৎসি যুক্তিপদ্ধতি।'

বট্যে? তা সে যাক্ গে—আমরা এস্থলে আউশ্‌ভিৎস হিরোশিমার তুলনামূলক আলোচনা করবো না।[২] শুধু একটি সামান্য খবর পাঠককে দিই।

হিরোশিমায় এটম বম ফাটানো হয় ৬ই অগস্ট ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পক্ষাধিক কাল পূর্বে মহাভারতের সঞ্জয়ের ন্যায় জাপান জয়াশা ত্যাগ করে যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনের মারফৎ যুদ্ধবিরতি কামনা করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায় (এর মাসতিনেক পূর্বে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হিমলার তাঁর প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে ঐ সুইডেনের মারফৎই মিত্রশক্তির নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠান, কিন্তু দুই মহাপ্রভুর কেউই খ্রীষ্টের উপদেশ মানতেন না বলে বামহস্তটি অর্থাৎ হিটলার খবরটা জানতে পান এবং আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হিমলারকে পদচ্যুত করেন) কিন্তু মারকিন তখন হন্যে হয়ে উঠেছে, নবাবিষ্কৃত এটম বম্ একটা ঘন-বসতিওলা শহরে ছাড়লে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা জানবার জন্য। জাপানদত্ত সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করলে তো আর বোমাটার এক্সপেরিমেন্ট চালানো যায় না—অতএব, চালাও যুদ্ধ আরও কয়েকদিন, বোমা ফাটিয়ে দেখা যাক ক'হাজার লোক স্রেফ পুড়ে মরে, শহর কতটা ধ্বংস হয়। বলা নিতান্তই বাহুল্য—হিটলারের ক ক-তে গ্যাসে মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন, এটম বমে জাপানীরা জ্বলন্ত জামাকাপড় নিয়ে ছুটোছুটি করে মরেছে বহু সহস্র, এবং অসংখ্য জন মরেছে বোমার ফলে নানাবিধ অজানা অচেনা রোগের যন্ত্রণায় বৎসরের পর বৎসর জীবন্মৃত হয়ে। এবং কর্তারা একটা বোমা ফেলেই প্রসন্ন দক্ষিণং মুখং ধারণ করেননি। আমরাও জানি, এক সংখ্যাটাই বড্ডই অপয়া—নিদেন দুটো বাতাসা খেতে হয়।

স্পর্শকাতর পাঠক এতক্ষণে হয়তো কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছেন, আমি এসব পুরনো কাঁসুন্দী ঘাটছি কেন। তবে কি আমি মডার্ন লেখকদের পাল্লায় পড়ে বীভৎস রসের অবতারণা করে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়তে চাই? 'ঈশ্বর রক্ষতু!' আমার সে-রকম কোনও উচ্চাশা নেই। বরঞ্চ বলবো, মডার্নদের এই যে নূতন টেকনিক—আগেভাগে সব

---

১ রোজেনবের্‌ক্‌কে নাৎসী দলের 'চিন্ময় নেতা'='স্পিরিচুয়াল ফ্যুরার' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর প্রখ্যাততম গ্রন্থ 'বিংশ শতাব্দীর মিথ' গ্রন্থে তিনি উঠে পড়ে লাগেন, আর্যরাই যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জাতি সেইটে প্রমাণ করার জন্য।

২ হিরোশিমার এটম বম বর্ষণ বাবদে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জাপানী চিকিৎসকের একটি বয়ান আমার হাতে এসে পৌঁচেছে—inspite of the sharks, popularly and mistakenly known in Calcutta as Foreign Book-seller।

সুযোগ পেলে সেটি পাঠকের হস্তে সমর্পণ করবো। ডাক্তারটি বোমা পতনের ফলে আহত হয়ে কয়েক বৎসরের ভিতরই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যান।

কিছু বলে দিয়ে, কোনও প্রকারের সারপ্রাইজ এলিমেন্ট না রেখে পানসে মারা 'ধূসর' মারকা প্লট্ বিবর্জিত গল্প লেখা (এদের বক্তব্য; বাস্তব জীবনে সারপ্রাইজ নেই—আছে একঘেয়েমির ধূসরিমা, পান্তাভাতের পানসেমি, মরা ইঁদুরের পাঙাশ-মরা পেট)—এটা আমি রপ্‌তো করতে পারবো না।...আমার যেটা মূল বক্তব্য সেটাতে আসি সর্বশেষে।

এই মাস, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, আজকের ঠিক ২০ বৎসর পূর্বে শ্রীযুত চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ে, দুজনাতে, গণতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের করকমলে সমর্পণ করেন।

গুণ্ডামি আরম্ভ হয় সেই সময় থেকে। ক ক তার শেষ।

আজ আবার এরা—গণতন্ত্র দেশের লক্ষ্মীছাড়া সব পলিটিশানরা—চেকশ্লভাকদের তাড়াচ্ছে।

অথচ, পাঠক, দেখো, চেক-শ্লভাকদের সাহায্য করার রত্তিভর ক্ষ্যাম্‌তা ওদের নেই।

তাই তারা জরমনির দুই লক্ষ সৈন্যকে তিন লক্ষ, না পাঁচ লক্ষে ওঠবার অনুমতি দিয়েছেন।

একদা যে রকম গণতন্ত্রের মুনিব চেম্বারলেন-দালাদিয়ে চেকশ্লভাকদের হিটলারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ ঠিক তেমনি তাদের বংশধররা, চেক-শ্লভাকদের তাড়িয়ে দিয়ে, রুশদের হাতে ছেড়ে দেবেন।

আবার শুরু হবে ক ক।

গ্যাস চেম্বার!

শা-লা!

প্রেম

কি কায়দায় আলাপ হয়েছিল সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ছোকরা আইন পড়ে।

একদিন বললে 'চ, একটা ইনট্রেসটিং মোকদ্দমা হচ্ছে।' এদেশের নিয়ম, আইন পরীক্ষা দেবার পূর্বে ছ'বার না দশবার—আমার সঠিক মনে নেই—আদালতে হাজিরা দিতে হয়, বোধ হয় সরকারী উকিলের অ্যাসিসট্যান্ট রূপে দু'চারবার কাগজপত্রও দুরস্ত করে দিতে হয়।

সুইস্ আদালত আদৌ ভীতি উৎপাদক নয়। কেমন যেন ঘরোয়া-ঘরোয়া ভাব।

অথচ মোকদ্দমাটা বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এক যুবতী। সুন্দরী বলা চলে না, সাদামাটা, তবে দেখতে ভালই। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মুখের রঙটি যেন শিশিরে ভেজা। জানা গেল, মেয়েটি সুইস ইতালিয়ান।

দোস্ত ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'জানিস তো, জাতে সুইস হলেও এই ইতালিয়ানরা একটু আনস্টেভি—' অর্থাৎ "উড়ুক্কু" ভাব ধরে।

প্রেমট্রেমের ব্যাপার আদালত সংক্ষেপেই সারে। তবে এ-স্থলে বিবরণীটি নিশ্চয়ই

কোনও রোমান্টিক ছোকরা পুলিস লিখেছিল। প্রেমটা হয়েছিল গভীরই। প্রতি ছুটির দিনে উইক-এন্ড, এমন কি কাজকর্মের ফাঁকে-ফিকিরে সিনেমা-কাবারে-সুইমিং পুল। বেশ স্ফূর্তিতে কেটেছে দিনগুলো—কোনও সন্দেহ নেই। এবং কোনও সন্দেহ নেই মেয়েটাই মজেছিল মরমে মরমে।

সরকারি উকিল গলাখাঁকরি দিয়ে বললেন, 'এবং খর্চাটা মেয়েটির কষ্টে জমানো টাকা থেকে।'

আমার কান ছিল বিবরণীর দিকে, চোখ মেয়েটির পানে। এতক্ষণ তার মুখে কোনও ভাবের পরিবর্তন হয়নি। এবারে তার ঠোঁটের কোণে যেন ঈষৎ অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা গেল।...উকিল পড়ে যেতে লাগলেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। প্রকাশ, ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আসামীকে বিয়ে করবে। আসামীর পিতামাতা ধর্মভীরু, সেও প্রতি রববারে গীর্জেয় যেত। আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে জানামাত্রই ছেলেটা পালায়।'

এবারে বিবরণী প্রথম পুরুষে—মেয়েটির বাচনিক।

'আমার এই বিপদে আমাকে সাহায্য করবার মত সে-শহরে কেউ ছিল না; জমানো কড়িও ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন স্থির করলুম, গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলবো। তাঁরা আঘাত পাবেন জানতুম, কিন্তু এছাড়া আমি অন্য পথ খুঁজে পেলুম না।

বাড়ি ফিরে যে অবস্থা দেখলুম তাতে বাবা-মাকে সব কিছু খুলে বলার সাহস আমার আর রইল না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমার দু বছরের ছোট বোনটি—সেও শহরে গিয়েছিল কাজ নিয়ে, সেও ফিরে এসেছে পেটে বাচ্চা নিয়ে। তাকে কে দাগা দিয়েছে শুধোইনি। আমি কী কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। সে বাবা-মাকে সব খুলে বলেছে। আমাকে বললে, তাঁরা বড় আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেছেন, বাচ্চাটাকেও মানুষ করবেন।

আমি তখন করি কি? দু'দুটো মেয়ে কুপথে গেল—অথচ তাঁরা কত যত্নেই আমাদের মানুষ করেছিলেন। আমি তাঁদের কি করে বলি, আমিও কুপথে গিয়েছি। আর দু'দুটো বাচ্চা তাঁরা পুষবেনই বা কি করে?

আমি স্থির করলুম, আমার বাচ্চাটাকে আমি বিসর্জন দেব। হাজার হোক, আমার ছোট বোন। তার হক্ক বেশী। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই।—সে বেচারী একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমিও যদি মুখে কলঙ্কের ছোপ মাখি তবে তার হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই দেব কি করে?

আমি মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলুম। সে যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

এবারে সরকারী উকিল বললেন, 'নদীপারে নির্জনে আসামী বাচ্চা প্রসব করে তাকে জলে ফেলে দেয়।' তারপর একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু সেখানে আর কেউ ছিল না বলে প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন, বাচ্চাটা মৃতাবস্থায় জন্মেছিল কি না।'

সমস্ত আদালত-ঘর নিস্তব্ধ, নীরব।

এইবারে প্রথম জজ মুখ খুললেন। সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শুধোলেন, 'বাচ্চাটা জন্মের সময় জীবিত না মৃত ছিল?'

মেয়েটি একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করলো। বললে, আমি সত্যই

শপথ করে বলতে পারবো না। আমি—আমার—আমি তখন সব-কিছু বুঝতে পারিনি।'

আশ্চর্য, জজ তো নয়-ই, সরকারী উকিল পর্যন্ত কোনও রকম জেরা বা চাপাচাপি করলেন না, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য। কারণ এটা তো আইনত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা জ্যান্ত জন্মে থাকলে এটা খুন—হয়তো মারডার নয়, ম্যানস্লটার—আর মৃতাবস্থায় জন্মে থাকলে বা জন্মের পরেই যদি মরে গিয়ে থাকে তবে বাচ্চা প্রসবের কথা পুলিসকে জানায়নি বলে অপরাধটা কঠিন নয়—হাইডিং অব্ এভিডেন্স্, সত্য তথ্য নির্ধারণের প্রমাণ গোপন করেছে শুধু।

মোকদ্দমা এখানেই শেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু জজ তবু একটা প্রশ্ন শুধোলেন, 'আচ্ছা, তুমি সেই ছেলেটার সন্ধান নিলে না কেন? তাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করালে না কেন?'

কুণ্ডুলি পাকানো গোখরো সাপ যে রকম হঠাৎ ফনা তুলে দাঁড়ায় মেয়েটা ঠিক সেই রকম বলে উঠলো, 'কী! সেই কাপুরুষ—যে আমাকে অসহায় করে ছুটে পালালো! তাকে বিয়ে করে আমার বাচ্চাকে দেব সেই কাপুরুষের, সেই পশুর নাম!' তারপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। গোঙরানোর শব্দ কানে এল।

আমি তার মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারিনি।

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণায় পরিণত হতে পারে তার বিকৃত মুখে দেখলুম—পূর্বেও দেখিনি, পরেও দেখিনি।

আমি বসেছিলাম একেবারে দরজার পাশে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম।

দু'দিন পরে দোস্তের সাথে ফের দেখা।

বললে, 'ছোঃ, তুই বড্ড কাঁচা। পালালি?'

'কি সাজা হল?'

'চার মাস। কিন্তু জেলে যেতে হবে না। গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবের কাছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে হাজিরা দিতে হবে—গুড্ কনডাকটের রিপোরট দেবার জন্য। আদালত বললেন, 'সমস্ত পরিবার যে বদনামের পাবলিসিটি পেল, সে-ই যথেষ্ট সাজা—আর যার ফাঁসি হওয়া উচিত সে তো আদালতে নেই।'

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণার—

শেষ

গ্রন্থ-পরিচয়

১

'টুনি মেম' মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-১২ থেকে ১৩৭০ সালের চৈত্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে বইয়ের আকার ছিল ডবল ডিমাই ১/১৬ সাইজ, ৩৬৮ পৃষ্ঠা। প্রথম সংস্করণ পাইকা হরফে ছাপা ছিল। ষষ্ঠ মুদ্রণের গ্রন্থ থেকে রচনাবলী করা হয়েছে। এই মুদ্রণ স্মল-পাইকা হরফে ছাপা, পৃষ্ঠা সংখ্যা স্বভাবতই কম, ৮০। 'টুনি মেম' গ্রন্থটি ডাক্তার শ্রীলা ঘোষকে উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থে দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশের নাম 'টুনি মেম'—এই অংশে আছে টুনি মেম ও এক পুরুষ নামে দুটি বড় গল্প, চেখফের জীবনী এবং চেখফের একটি গল্প ও একটি নাটকের অনুবাদ। বলা বাহুল্য, টুনি মেম গল্পের নামেই গ্রন্থের নামকরণ। পরবর্তী অংশের নাম 'শেষ চিন্তা'। এই অংশে আছে রম্যরচনা ও রাজনীতি-ধর্ম-সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ। টুনি মেমের কয়েকটি রচনা করুণ রসাশ্রিত। করুণ রস-সৃষ্টিতে লেখকের অসাধারণ ক্ষমতার নিদর্শন এই রচনাগুলি। 'টুনি মেম' গল্পটিই লেখকের 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসের বীজ—এই মত অনেকে পোষণ করেন।

২

'রাজা উজীর' গ্রন্থটি মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-১২ থেকে ১৩৭৬ সালের বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইয়ের আকার ডবল মিডিয়ম ষোড়শাংশিত, পৃষ্ঠা ২৪৫। লেখক 'রাজা উজীর' গ্রন্থটি বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রকে উৎসর্গ করেন। 'রাজা উজীরে'র অধিকাংশ রচনাই রাজনীতি সম্বন্ধীয় বা রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কিত। তার মধ্যে হিটলার ও জার্মানী বিষয়ের রচনাই প্রধান। সম্ভবত প্রবন্ধগুলির এই বিষয়বস্তুর জন্যই গ্রন্থের 'রাজা উজীর' নামকরণ। অধিকাংশ প্রবন্ধই লেখকের পরিণত বয়সের রচনা। এই রচনাগুলি পাঠ করলে রাজনীতি সম্বন্ধে লেখকের গভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণ-শক্তি বোঝা যায়। এই গ্রন্থ পাঠকালে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার বিষয় পাঠকের স্মরণে রাখা আবশ্যক।

নকুল চট্টোপাধ্যায়

“ আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে
বর্জন ক'রে নয়,
তার সম্যক উন্নতি সাধন ক'রে,
এবং আমার আরো বিশ্বাস
প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে
বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবে না। ”